ভারতের সাধক

নাথ রায়

ভারতের সাধক

৫ম খণ্ড

শঙ্কর নাথ রায়

প্রদীপ পাবলিশার্স

চতুর্থ সংস্করণ ঃ
১৩১৪—ঝুলন পূর্ণিমা

প্রকাশনা ঃ
প্রদীপ কুমার দাস
প্রদীপ পাবলিশার্স
৫৫, শম্ভু হালদার লেন
সালকিয়া, হাওড়া

প্রচ্ছদপট
সুপ্রকাশ সেন

মুদ্রণ ঃ
জগদীশ চন্দ্র দাস
শ্রীগুরু আর্ট প্রেস
১৬, নলিনী সরকার ষ্ট্রীট
কলিকাতা-৪

বাঁধাই ঃ
সেঞ্চুরী বাইণ্ডার্স
৪৫, বৈঠকখানা রোড
কলিকাতা-৯

পরিবেশনা ঃ
হিমাদ্রি সংসদ
১৬, গণেশচন্দ্র এভেনিউ
কলিকাতা-১৩
আইডিয়েল বুক এম্পোরিয়াম
১৩, সূর্য সেন ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-১২

আট টাকা

সূচীপত্র

প্রকাশকের নিবেদন

'ভারতের সাধক'-এর পঞ্চম খণ্ডের তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হলো। এই মহান গ্রন্থের বিভিন্ন খণ্ডগুলি বাংলার বিশিষ্ট সমালোচক ও সংবাদপত্রের অভিনন্দন বহু পূর্ব্বেই লাভ করেছে। পাঠক সাধারণও জ্ঞাপন করেছেন তাঁদের আন্তরিক সমর্থন। তদুপরি ১৩৭০ সালের রবীন্দ্র-পুরস্কার জয়ী হয়ে এই জীবনীগ্রন্থ বাংলা তথা ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাহিত্যকীর্ত্তি রূপে গণ্য হয়েছে।

সম্প্রতি 'ভারতের সাধক'-এর হিন্দি সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে এবং হিন্দি সাহিত্যের পাঠকদের মধ্যে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছে।

বিভিন্ন খণ্ডে মুদ্রিত আর কোন একক বাংলা গ্রন্থ সাম্প্রতিক কালে বাংলা বা বহির্বাংলায় এমন জনপ্রিয়তা লাভ করেছে বলে আমরা জানিনে।

হাজার হাজার বছর ধরে ভারতের ধর্ম্ম, সমাজ ও সংস্কৃতির প্রাণরস জুগিয়ে আসছেন আমাদের সাধকেরা—অধ্যাত্মজীবনের মহাশিল্পীরা। এঁদের ভেতর রয়েছেন যোগী, বৈদান্তিক, তান্ত্রিক ও মরমিয়া সাধক-গোষ্ঠী। বিচিত্র সাধনা ও বিচিত্র মতবাদের ভেতর দিয়ে তাঁরা গড়ে তুলেছেন মানবধর্ম্মের ঐক্যতান। এই সাধকদেরই পরম রম্য জীবনী রচনা করেছেন গ্রন্থকার, আর সেই সঙ্গে ফুটিয়ে তুলেছেন ভারতসাধনার পরিচয়। বলা বাহুল্য, এই পরিচয়ের ভেতরেই নিহিত আমাদের সত্যকার আত্মপরিচয়।

মনীষা, আত্মিক বিশ্লেষণ ও সাহিত্যিক প্রতিভার দীপ্তিতে এ গ্রন্থের প্রত্যেকটি রচনা হয়ে উঠেছে প্রাণবন্ত, লোকোত্তর মহাপুরুষেরা এসে ধরা দিয়েছেন আমাদের মত সাধারণ মানুষের দৃষ্টির সম্মুখে। এজন্যই 'ভারতের সাধক' হয়ে উঠেছে এমন অনন্যসাধারণ, বাংলা সাহিত্যে অধিকার করেছে চিরস্থায়ী আসন।

এই কল্যাণকর গ্রন্থের বর্ত্তমান খণ্ডের তৃতীয় সংস্করণটি প্রকাশের সুযোগ পেয়ে প্রকাশক হিসেবে নিজেদের আমরা কৃতার্থ মনে করছি।

—প্রকাশক

কেউ তাকাতে পারছিনে। আর তোমার শিশু কন্যা? তার ভবিষ্‌
কে ভাববে বল তো? আচ্ছা, সংসারে থেকে কি ধর্ম্ম হয় না? মো
মিলতে পারে না?"

কিন্তু বর্দ্ধমান যে আজ কৃতসঙ্কল্প। দৃঢ়স্বরে উত্তর দেন, "বৃথা আ
আমায় তোমরা বাধা দেবার চেষ্টা করো না। সংসার আমায় ত্যা
করতেই হবে, নইলে কর্ম্মের বন্ধন তো দূর হবে না! মুক্তিও হ
থাকবে সুদূরপরাহত।"

"মনে রেখো, আমাদের পিতা গ্রহণ করেছিলেন পার্শ্বনা
নিগ্রন্থধর্ম্ম। ধার্ম্মিক শ্রাবক বলে তাঁর খ্যাতিও ছিল অসাধার
তাঁর কিন্তু ভাই, গৃহত্যাগ করার দরকার হয়নি।"

"সত্যিই পিতা আমাদের ছিলেন পরমধার্ম্মিক, ছিলেন আ
গৃহী সাধক। তাঁর রোপণ-করা সেই ধর্ম্মের বীজই যে আজ মুকুলি
হতে চাইছে আমার জীবনে। এ সত্য যে আমি মনে প্রাণে উপল
করছি। তাই তো শ্রমণধর্ম্মে দীক্ষা নিয়ে জীবনের সেই স্বাভাবি
পরিণতিকেই আমি এগিয়ে দিতে চাই।"

আত্মপ্রত্যয়ের কথা, আপন উপলব্ধির কথা বর্দ্ধমান বলিতে
এখানে তাই তর্ক চলে না। তবুও আর এক যুক্তি টানিয়া
নন্দীবর্দ্ধন কহিলেন, "কিন্তু ভাই, ক্ষত্রিয়ের কাজ হচ্ছে, শা
সংসারকে ধর্ম্মের দিকে ধারণ করে রাখা। সন্ন্যাসী হয়ে
ধর্ম্মকেই কি তুমি ত্যাগ করছো না?"

"দাদা, তুমি কি ভুলে গিয়েছো, ঋষভদেব থেকে পার্শ্ব...
তেইশটি তীর্থঙ্করই ছিলেন ক্ষত্রিয় তনয়। জীন বা বিজেতার
এঁরাই পেয়েছেন, ষড়রিপুজয়ী এই ক্ষত্রিয়েরাই যে বাঁচিয়ে রে
আসল ক্ষাত্রধর্ম্ম। এঁদের পদচিহ্ন ধরেই তো আমি এগোতে যা

নন্দীবর্দ্ধন বুঝিলেন, ভ্রাতা তাঁহার আপন লক্ষ্যে অবিচল।
ফেরানো যখন যাইবেই না, আরো কিছুকাল তাঁহার এই সন্ন্য
ঠেকাইয়া রাখার চেষ্টা করা যাক না কেন?

কহিলেন, "ভাই, অন্ততঃ একটা অনুরোধ তুমি আমার রাখো। আরো কয়েকটা বৎসর তুমি গৃহে থেকে যাও। তাহলে আত্ম-পরিজনদের কিছুটা সান্ত্বনা হয়তো থাকবে।"

"দু বৎসর আগে, বাবা আর মা যখন লোকান্তরে যান, তখনি আমি সংসার ত্যাগ করতে চাই। কিন্তু তোমার চাপে পড়ে তা পারিনি। তোমায় তখন কথা দিয়েছিলাম, আর দু বৎসর আমি গৃহে থাকবো।"

"হ্যাঁ, স্বীকার করি, তোমার সে প্রতিশ্রুতি তুমি রেখেছো।"

দৃঢ়স্বরে বর্দ্ধমান এবার ভ্রাতাকে জানাইয়া দিলেন তাঁহার শেষ কথা—"দাদা, তুমি জানো, এ দু বৎসর গৃহে আমি থেকেছি বটে, কিন্তু ভোগ-বিলাসের কোন উপকরণই কখনো স্পর্শ করিনি। সংযম, ত্যাগ ও তিতিক্ষার ভেতর দিয়ে গড়ে তুলতে চেয়েছি আমার ভাবী শ্রমণ-জীবনের প্রস্তুতি। আজ আমার প্রতীক্ষিত লগ্ন এসেছে, আর তোমরা আমায় বাধা দিয়ো না। শ্রমণ-ধর্ম্মে দীক্ষা নিয়ে আমায় বেরিয়ে পড়তে দাও মুক্তিসাধনার পথে।"

অগ্রহায়ণ মাসের অপরাহ্ন। ষণ্ডবনের আকাশে বাতাসে জড়াইয়া আছে শীতের শ্লথ মধুর আমেজ। স্বজন পরিবেষ্টিত বর্দ্ধমান আসিয়া ...রুর নীচে

...সালের রবীন্দ্রপুরস্কার-জয়ী মহান জীবনীগ্রন্থ

সত্য, অচৌর্য্য ব্রহ্মচর্য্যের ব্রত। সুখ-দুঃখ, জীবন-মৃত্যু
করিবেন কর্ম্মবন্ধনের মূলোচ্ছেদ।

সংসার জীবনে এবার চিরবিচ্ছেদের পালা। পতি
হৃদয়-বেদনা ফাটিয়া পড়ে কান্নার অঝোর ধারে। কন্যা
আয়ত নয়ন দুইটি সজল হইয়া উঠে। সহস্র সহস্র নর-
নামিয়া আসে শোকের ছায়া। অঘ্রাণের হিমেল হ
করুণ দীর্ঘশ্বাসে ভারী হইয়া উঠে।

ভাবাবিষ্ট বর্দ্ধমানের কোন দিকেই ভ্রূক্ষেপ নাই।
অজানা রত্নের আশায় ডুবুরির মত অগাধ জলে ডুব দি

ষণ্ডবন ত্যাগ করিয়া ধীর পদক্ষেপে তিনি প
বাহির হইয়া পড়িলেন।

এবার হইতে তিনি এক নিগ্রন্থ শ্রমণ—গ্রন্থিহীন, ব
মুমুক্ষু সন্ন্যাসী।

যে কটিবস্ত্র ও উত্তরীয় পরিধানে ছিল, তের মাস
চিহ্নমাত্রও রহিল না। নিজের জীর্ণ বস্ত্র এক ভিখারীর গ
দিয়া বর্দ্ধমান হইলেন একেবারে দিগম্বর। সর্ব্বস্বত্যাগের
পাশ-[illegible] যিনি পা বাড়াইয়াছেন, অশন-বসনের প্র
[illegible] তর্ক চলে না। [illegible] গিয়াছে
[illegible] কাজ [illegible]

কহি

আরো কয়ে

পরিজনদের

"তু বৎ

আমি সংসা

তোমায় ত

"হ্যাঁ, স্বা

দৃঢ়স্বরে

কথা—"দাদা

কিন্তু ভো

ত্যাগ ও

শ্রমণ-জী

তোমরা

বেরিয়ে পড়

অ

আছে শা



ভারতের সাধক

ভূমিকা

ধর্ম্ম ও সংস্কৃতির মধ্য দিয়ে গড়ে উঠেছে ভারতের সভ্যতা, জগৎসভায় যেজন্য আমাদের প্রতিষ্ঠা, আমাদের গর্ব্ব। আর এ ধর্ম্ম-সংস্কৃতির ধারক ও বাহক হচ্ছেন এ দেশের সিদ্ধ সাধকগণ।

স্থূল ও সূক্ষ্ম, জড় ও চৈতন্যের ব্যবধান ঘুচে যায় এ সাধকদের তপস্যাধৃত জীবনে, অপার্থিব আনন্দের জ্যোতি সেখানে হয়ে ওঠে ওতপ্রোত। লৌকিক, জীবনে এঁরা আশ্রিত জনগণের জন্য ভরে তোলেন কল্যাণ ও আনন্দের মঙ্গলঘট, লোকোত্তর জীবনে আহরণ ক'রে আনেন চিন্ময়-লোকের অমৃত-বার্ত্তা। গ্রন্থকার এঁদেরই চরিতকথা রচনা করেছেন। স্থূল ও সূক্ষ্ম উভয় লোকে এ সাধকদের গতায়াত, এঁরা উভচর—তাই এঁদের স্বরূপ ফুটিয়ে তোলা, জীবনের রেখাচিত্র অঙ্কিত করা, নিতান্ত সহজসাধ্য নয়। কিন্তু তত্ত্বানুসন্ধানী লেখকের লেখনী-নৈপুণ্যে তা সম্ভব হতে পেরেছে।

কবে কোন্ অজানা মুহূর্ত্তে সাধকের হৃদয়ে ফুটে ওঠে হঠাৎ-আলোর ঝল্‌কানি, সর্ব্বস্ব ত্যাগ ক'রে কখন তিনি সর্ব্বময়ের সন্ধানে ঝাঁপ দেন তা কে জানে? অমোঘ আহ্বান জানিয়ে কোথায় লুকিয়ে আছেন তাঁর চিহ্নিত গুরু, কে দেবে তাঁর সন্ধান? চাওয়ার পর হয় তাঁর পাওয়ার পালা—মহামুক্তির আলো ঐশী কৃপারূপে মুমুক্ষুর দুয়ারে নেমে আসে। গুরুকরণ, দীক্ষা ও মন্ত্রচৈতন্যের মধ্য দিয়ে অধ্যাত্ম-শিল্পীর সাধনা হয় শুরু, দীর্ঘ তপস্যার মধ্য দিয়ে তিনি হয়ে ওঠেন আপ্তকাম, কৌপীনবন্ত হন ভাগ্যবন্ত।—এই সিদ্ধ সাধকদের জীবন ও সাধনার বহুবিচিত্র পথরেখা অনুসৃত হয়েছে এ গ্রন্থে। বর্ণে বর্ণে, রেখায় রেখায় এগুলো ফুটে উঠেছে অপরূপ হয়ে।

বিভিন্নপন্থী সাধকদের প্রামাণ্য ও পূর্ণাঙ্গ জীবনী বাংলা ভাষায় এই প্রথম।

পর্য্যাপ্ত পরিমাণ তথ্য গ্রন্থকার এতে সন্নিবেশিত করেছেন। কিন্তু সাধকদের নিজেদের স্মৃতিকথা, চিঠিপত্র, সমসাময়িক মহাপুরুষদের স্বীকৃতি প্রভৃতি থেকে যেমন তথ্যাদি এতে আহরণ করা হয়েছে, তেমনি জীবনীকারদের নানা রচনা, সমকালীন সাহিত্য ও সংবাদ থেকেও কম উপকরণ সংগৃহীত হয়নি। সাধক জীবনের অন্তর্গূঢ় তত্ত্বের নির্ণয়ে লেখক যে মনোভঙ্গী নিয়ে অগ্রসর হয়েছেন, তাতে বিচার ও যুক্তিনিষ্ঠার সঙ্গে মিলেছে শ্রদ্ধা ও অন্তর্দৃষ্টি। ফলে প্রত্যেকটি চরিত্র জীবন্ত হয়ে উঠেছে।

পরিকল্পনা অনুযায়ী জীবনীগুলো খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হচ্ছে। আর এদের প্রত্যেকটিতে রয়েছে যোগী, তান্ত্রিক, বৈষ্ণব প্রভৃতি বিভিন্নপন্থী সাধকদের সমাহার, আর গ্রন্থের মূল অধ্যাত্ম-সঙ্গীতের ভেতর মিলেছে নানা সুরের গুঞ্জরণ। সর্ব্বোপরি বিভিন্ন ভঙ্গীর চরিত্রগুলো একত্রে সন্নিবেশিত হওয়ায় পাঠকদের কাছে এ বই হয়ে উঠেছে বৈচিত্র্য-সুন্দর ও মনোলোভন।

ভারতের সাধকদের কিছু কিছু জীবন-কাহিনী ও দু'চারটি জীবনী সংগ্রহ বাংলা ভাষায় আছে বটে, কিন্তু সেগুলো আজকের দিনের উন্নত দাবী মেটাতে সক্ষম নয়। এদিক দিয়ে 'ভারতের সাধক' এক বড় অভাব পূরণ করতে পারবে, বাংলা জীবনীসাহিত্যের এক বিশিষ্ট সংযোজনরূপেও গণ্য হবে।

শঙ্করনাথ রায় লেখকের ছদ্মনাম, এ নামের আড়ালে থেকেই আরব্ধ কার্য্য সম্পন্ন করতে তিনি ইচ্ছুক। এ অন্তরালের নিভৃতি থেকে তাঁকে বাইরে টেনে আনতে চাইনে। ইতি—

নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়

সূচীপত্র

আচার্য্য রামানুজ

ভোর হইতে না হইতেই দাক্ষিণাত্যের পার্থসারথির মন্দিরে সেদিন ভীড় জমিয়াছে। কাছেই কৈরবিণী সাগরসঙ্গমের তীর্থ। প্রতি বৎসর চন্দ্রগ্রহণের সময় যাত্রীরা দলে দলে এ অঞ্চলে আসিয়া জুটে। স্নান তর্পণ সারিয়া এ মন্দিরের বিগ্রহ দর্শন করে, ভক্তিভরে সমাপন করে পূজা অর্চ্চনা। এবারও দলে দলে সবাই আসিয়াছে।

পেরেম্বুদুরের সর্ব্বজনপ্রিয় পণ্ডিত, আসুরি কেশবাচার্য্যও আজ সস্ত্রীক এখানে উপস্থিত। বেদবিদ্ ও যজ্ঞনিষ্ঠ এই ব্রাহ্মণের খ্যাতি প্রতিপত্তির সীমা নাই। পাণ্ড্যরাজ্যের ব্রাহ্মণেরা সবাই মিলিয়া তাঁহাকে উপাধি দিয়াছেন—'সর্ব্বক্রতু'!

বিগ্রহের সম্মুখে দাঁড়াইয়া কেশব ও তাঁহার স্ত্রী অর্ঘ্য নিবেদন করিলেন। ব্যক্ত করিলেন প্রাণের গোপন আকাঙ্ক্ষা।

দীর্ঘ বিবাহিত জীবন যাপনের পরও গৃহে তাঁহাদের সুখ নাই। কারণ, পুত্রমুখ দর্শনে এযাবৎ বঞ্চিত রহিয়াছেন। পূজা সমাপনের পর পণ্ডিত সেদিন তাই মন্দির সন্নিহিত তিরুইল্লি-কেণিতে, কুমুদ সরোবরে অনুষ্ঠান করিলেন এক পুত্রেষ্টি যজ্ঞ।

কাজকর্ম্ম শেষ হইয়া গেল। সারাদিনের পর ক্লান্ত দেহে কেশবাচার্য্য নিদ্রায় ঢলিয়া পড়িলেন। গভীর নিশীথে দেখিলেন এক বিচিত্র স্বপ্ন—

ভগবান পার্থসারথি জ্যোতির্ম্ময় মূর্ত্তিতে তাঁহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন। প্রসন্ন-মধুর কণ্ঠে ঠাকুর বলিতেছেন, "বৎস সর্ব্বক্রতু, তোমার ভক্তি, নিষ্ঠা ও শরণাগতিতে আমি তুষ্ট হয়েছি। কোন চিন্তা নেই। বর দিচ্ছি, অচিরে তুমি এক পরম ভাগবত পুত্র লাভ করবে। আত্মাভিমানী পণ্ডিতদের দমনের জন্য শক্তিধর আচার্য্যরূপে হবে তাঁর

আবির্ভাব। তোমার এই তনয় আসবে এক প্রেরিত পুরুষরূপে, আর জ্ঞানমিশ্রা ভক্তির ধারাকে এযুগে সে নামিয়ে আনবে।”

দেবতা অন্তর্হিত হইলেন। সঙ্গে সঙ্গে আনন্দের উচ্ছ্বাসে পণ্ডিতের নিদ্রা টুটিয়া গেল। তাড়াতাড়ি পত্নীকে জাগাইয়া তুলিয়া শুনাইলেন এই আনন্দময় দৈবী বার্ত্তা।

বৎসর না ঘুরিতেই প্রভু পার্থসারথির এ স্বপ্নাদেশ বাস্তবে রূপ নেয়। ১০১৭ খ্রীষ্টাব্দে কেশবাচার্য্যের গৃহ আলোকিত করিয়া শুভলগ্নে ভূমিষ্ঠ হয় এক দিব্যকান্তি শিশু। এই শিশুই উত্তরকালের বহুকীর্ত্তিত মহাপুরুষ—আচার্য্য রামানুজ। এই বিরাট সাধকের আবির্ভাব শুধু দক্ষিণ ভারতকেই উজ্জীবিত করিয়া তুলে নাই, সমগ্র ভারতের ধর্ম্ম ও সাংস্কৃতিক জীবনেও আনয়ন করে এক নূতন তরঙ্গোচ্ছ্বাস। এ তরঙ্গের শীর্ষে দেখা দেয় বহুখ্যাত দার্শনিক তত্ত্ব—বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ।

বৌদ্ধ ও শঙ্কর-যুগের পরে, শ্রেষ্ঠ ভক্তিবাদী আচার্য্যরূপে রামানুজ আবির্ভূত হন। তিনি প্রচার করেন—ব্রহ্ম আমাদের উপাসনা ও সেবার যোগ্য। ভগবৎ-প্রেম আর শরণাগতির পরম তত্ত্ব নূতন করিয়া মানুষের কাছে তিনি ঘোষণা করেন। অসামান্য মনীষা ও সাধন-শক্তি বলে স্থাপন করেন নিজস্ব ভক্তিতত্ত্ব। তাঁহার বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ শুধু শঙ্কর-মতের প্রতিদ্বন্দ্বীই হয় নাই, সমকক্ষ বলিয়াও সারা দেশে খ্যাত হইয়া উঠে।

ভারতের ধর্ম্মজীবন ও সাধনক্ষেত্রে রামানুজের প্রভাব হয় সুদূর-প্রসারী। তাঁহার আবির্ভাব বৈষ্ণবমতের প্রতিষ্ঠাকে এদেশে ত্বরান্বিত করিয়া তুলে। তাঁহার প্রচারিত বিষ্ণু-উপাসনা ও ভক্তি-আন্দোলন প্রভাবিত করে মধ্ব, নিম্বার্ক, বল্লভ, চৈতন্য প্রভৃতি আচার্য্যদের। ভক্তিধৃত এই মহান জীবনের সাধনা আত্মপ্রকাশ করে এ যুগের ভক্তি-ধর্ম্মের যমুনোত্রীরূপে।

বাল্যকাল হইতেই রামানুজের অসাধারণ শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। দুরূহ পাঠসমূহ অতি সহজে সে আয়ত্ত করিতে থাকে,

এই মেধা ও প্রতিভা দেখিয়া অধ্যাপকেরা অবাক হইয়া যান। যে ধর্ম্মজীবন উত্তরকালে অনন্যসাধারণ হইয়া ফুটিয়া উঠিবে, তাহার সূত্রপাত দেখা যায় এই অল্প বয়সেই। তাছাড়া, ধর্ম্মকথা ও সাধু-সজ্জনের সঙ্গ পাইলে তো কথাই নাই, তখন আর বালকের কোন দিকে হুঁস থাকে না।

রামানুজের অধ্যাত্মজীবনে দুইটি বিশেষ ধারাকে মিলিত হইতে দেখা যায়। পিতা কেশবাচার্য্য শাস্ত্র-পারঙ্গম, সাধননিষ্ঠ যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণ। তাঁহার জীবন হইতে রামানুজের মধ্যে সঞ্চারিত হয় জ্ঞান ও কর্ম্মের প্রবাহ, আর মাতৃকূল হইতে সে প্রাপ্ত হয় ভক্তি ও প্রপত্তি। মাতা কান্তিমতীর বংশে ভক্তি-সম্পদের অভাব ছিল না, তাঁহার ভ্রাতা প্রবীণ ভক্ত ও সাধক শৈলপূর্ণ ছিলেন বৈষ্ণবনেতা যামুনাচার্য্যের শ্রেষ্ঠ শিষ্য। বালক বয়স হইতেই মাতা ও মাতুলবংশের অতুলনীয় ভক্তি রামানুজ প্রাপ্ত হন।

সন্ধ্যার অন্ধকার সেদিন পেরেমবুদুরের পথে প্রান্তরে ঘনাইয়া আসিতেছে। বালক রামানুজ চতুষ্পাঠী হইতে সবেমাত্র ঘরে ফিরিয়াছে। অদূরে রাজপথে এক প্রিয়দর্শন সাধুকে দেখিয়া অমনি সে তাড়াতাড়ি সেদিকে আগাইয়া যায়। অপূর্ব্ব দিব্যকান্তি তাঁহার। আনন্দোজ্জ্বল নয়ন দুইটি কোন্ এক অজানিত আকর্ষণে মানুষকে চঞ্চল করিয়া তোলে। সাধুটি অচেনা নন, এ পথে প্রায়ই তাঁহাকে আনাগোনা করিতে দেখা যায়—দেবপূজার জন্য তিনি কাঞ্চী শহর হইতে পুনামেলি গ্রাম অবধি পরিব্রাজন করেন।

রামানুজদের গৃহের সম্মুখ দিয়াই এই মহাত্মার গমন পথ। এক পরম ভাগবত মহাপুরুষরূপে এ অঞ্চলে তাঁহার খ্যাতি আছে—নাম কাঞ্চীপূর্ণ। বিষ্ণুকাঞ্চীর জাগ্রত বিগ্রহ, বরদরাজের তিনি পরম ভক্ত, আপন জন। লোকের ধারণা, শ্রীবিগ্রহ তাঁহার এই চিহ্নিত ভক্তের মুখ দিয়া নিজের লীলাকাহিনী প্রকাশ করেন, ভক্তদের নির্দ্দেশাদি দেন।

বালক রামানুজ এতসব কথা জানে না। কিন্তু এই মহাসাধকের ভাবময় দৃষ্টি, আনন্দঘন রূপ সদাই তাহার প্রাণ-মন কাড়িয়া নেয়। সুযোগ পাইয়া আজ সে কাঞ্চীপূর্ণের সম্মুখীন হয়।

ব্যাকুল-কণ্ঠে বালক অনুরোধ জানায়, আজ রাত্রে মহাত্মাকে কৃপা করিয়া তাহাদের গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করিতে হইবে। পরদিন প্রভাতে উঠিয়া তিনি গন্তব্যস্থল পুনামেলিতে যাইতে পারিবেন।

কি যেন এক অমোঘ আকর্ষণ রহিয়াছে কেশবাচার্য্যের পুত্র এই ক্ষুদ্র বালকের মধ্যে। চোখে মুখে এক মহাসাধকের লক্ষণ পরিস্ফুট, —সর্ব্ব অঙ্গে মাখান রহিয়াছে দিব্য লাবণ্যশ্রী। সাধু কাঞ্চীপূর্ণ বালকের সাগ্রহ আহ্বান সেদিন কিছুতেই প্রত্যাখ্যান করিতে পারিলেন না। আতিথ্য তাঁহাকে গ্রহণ করিতেই হইল।

বালক পুত্রের এ আবার কি খেয়াল? পিতা কেশবাচার্য্য কিন্তু মনে মনে খুশীই হইলেন। সাধুকে উত্তমরূপে ভোজন করান হইল। রাত্রে তিনি পালঙ্কে বিশ্রাম করিতেছেন, এ সময়ে রামানুজ পদ-প্রান্তে আসিয়া বসিল, সে তাঁহার পদ সম্বাহন করিতে চায়।

ভক্ত কাঞ্চীপূর্ণ ব্যস্ত সমস্ত হইয়া উঠিয়া বসিলেন। কহিলেন, "সেকি কথা, বৎস! তুমি আমার পদসেবা কি ক'রে ক'রবে বলত? তুমি ব্রাহ্মণ সন্তান—আর আমি নীচ জাতীয় শূদ্র। ছিঃ—ছি, এমন প্রস্তাব কখনো ক'রো না।"

রামানুজ হটিবার পাত্র নহে। উত্তর দেয়, "প্রভু, উপবিত ধারণ করলেই কি ব্রাহ্মণ হয়? হরিভক্তিপরায়ণ ব্যক্তি-ই তো প্রকৃত ব্রাহ্মণ। দেশ বিখ্যাত ভক্ত তিরুপ্পান আড়বার কি চণ্ডাল হয়েও শত শত ব্রাহ্মণের পূজা পাননি? বুঝেছি, আমার অদৃষ্ট মন্দ, তাই আপনার মত মহাপুরুষের সেবার অধিকার আমি পাব না।"

এ কি অদ্ভুত কথা এই ক্ষুদ্র বালকের মুখে! কাঞ্চীপূর্ণের বিস্ময়ের সীমা রহিল না। বুঝিলেন, এ বালক ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নি, অসামান্য সম্ভাবনা ইহার মধ্যে প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে।

শুধু একটি রাত্রির ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য ও অন্তরের স্পর্শ—কিন্তু বালক রামানুজের জীবনে ইহার প্রভাব অনতিবিলম্বে সুদূরপ্রসারী হইয়া উঠে। শ্রীবরদরাজের প্রিয়ভক্ত, কাঞ্চীপূর্ণ সেদিন তাহার জীবনের মূলে এক প্রকাণ্ড নাড়া দিয়ে যান।

পুত্র ষোড়শ বৎসরে পদার্পণ করার পর সৎ বংশের এক সুন্দরী কন্যার সহিত কেশবাচার্য্য তাহার বিবাহ দেন। পণ্ডিতের গৃহ এ উৎসবের আনন্দে মুখর হইয়া উঠে। কিন্তু এ আনন্দ মাসখানেকের বেশী বিরাজিত থাকে নাই। পরিবারের সকলকে শোকসাগরে ভাসাইয়া কেশবাচার্য্য হঠাৎ একদিন পরলোকে চলিয়া গেলেন।

ক্রমে শোকসন্তাপ কিছুটা কমিয়া আসিল। রামানুজ এবার নিজের জীবন গঠনে ব্রতী হইলেন। স্থির করিলেন, উচ্চতর শাস্ত্রাদি অধ্যয়ন করিয়া হইবেন এক লোকমান্য মহাপণ্ডিত।

কাঞ্চীতে তখন অদ্বৈতবাদী আচার্য্য যাদবপ্রকাশের প্রচণ্ড প্রতাপ। বহু শিষ্য পরিবৃত হইয়া তিনি নগরে বাস করেন—পাণ্ডিত্য গৌরবের তাঁহার সীমা নাই। রামানুজ পরম উৎসাহে ইহারই নিকট অধ্যয়ন শুরু করিয়া দিলেন।

নবাগত ছাত্রের মেধা ও প্রতিভা দর্শনে আচার্য্য তো মহা উল্লসিত। অল্পদিনের মধ্যে রামানুজ তাঁহার প্রিয়তম ছাত্ররূপে পরিচিত হইয়া উঠিলেন।

সেদিন ছাত্রদের ভোরবেলায় পাঠ সমাপ্ত হইয়াছে। অধ্যাপক যাদবপ্রকাশ স্নানের জন্য প্রস্তুত হইতেছেন। সেবানিষ্ঠ ছাত্র রামানুজ তাঁহার দেহে তৈলমর্দ্দনে রত। এসময়েও পণ্ডিতের অবসর নাই। উচ্চতর শ্রেণীর এক পড়ুয়া আগাইয়া আসিয়া ছান্দোগ্য উপনিষদের শ্লোকের ব্যাখ্যা সম্বন্ধে প্রশ্ন করিয়া বসিল।

'তস্য যথা কপ্যাসং পুণ্ডরীকমেবমক্ষিণী'—এ মন্ত্রাংশের 'কপ্যাসং' কথাটি নিয়াই যত গোল বাধিয়াছে। সূর্য্যমণ্ডলস্থ পুরুষের চক্ষু

দুইটি রক্তবর্ণ—কিন্তু তাহা ঠিক কিরূপ ? না, কপির গুহ্যদ্বারদেশের মত ! অর্থাৎ, সেই হেমকান্তি পুরুষের নয়ন দুইটি বানরের গুহ্যদ্বারের ন্যায় লোহিত বর্ণের যে পদ্ম, তাহারই সদৃশ। মন্ত্রটির বহু প্রচলিত ব্যাখ্যাই অধ্যাপক প্রকাশ করিলেন।

পরমপুরুষ শ্রীভগবানের নয়নকমল সম্বন্ধে একি অবাঞ্ছিত, হীন উপমার প্রয়োগ !—ভক্ত রামানুজের ব্যথিত হৃদয়ে তখন বার বার এই প্রশ্নই আন্দোলিত হইতেছে যিনি নিখিল সৌন্দর্য্যের আকর, সর্ব্ব কল্যাণ ও গুণের উৎস, তাঁহার আঁখিপদ্ম দুইটিকে বানরের গুহ্যদ্বারদেশের সহিত তুলনা করা ! এ যে অসহ্য !

ক্ষোভে, দুঃখে, অভিমানে স্বভাব-ভক্ত রামানুজ কাঁদিয়া ফেলিলেন। নয়ন বাহিয়া অশ্রু ঝরিতে লাগিল। বার বার ভাবিতে লাগিলেন—'এ কখনও হইতে পারে না, ব্রহ্মজ্ঞ ঋষিদের উদ্গীত এ মন্ত্রে নিশ্চয় অন্য কোন অর্থ প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে।'

অধ্যাপকের অনাবৃত জানুদেশে হঠাৎ দুই ফোঁটা ঈষদুষ্ণ জল গড়াইয়া পড়ে। তিনি চমকিয়া উঠেন। তৈলমর্দ্দনকারী রামানুজের দিকে তাকাইয়া দেখেন, তরুণ শিষ্যের দুই চোখে অশ্রুরাশি টলমল করিতেছে। সে কি ! কোন্ মনোবেদনায় সে এমন মুহ্যমান ! ব্যাকুল হইয়া কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন।

উত্তর শুনিয়া অধ্যাপকের বিস্ময়ের সীমা রহিল না।

বেদনাহত কণ্ঠে রামানুজ নিবেদন করিলেন, "প্রভু, আপনার মত আচার্য্যের মুখে একি কথা ! উপনিষদের এ ব্যাখ্যায় আমি মর্ম্মাহত হয়েছি। সচ্চিদানন্দ বিগ্রহের নয়নকমলের সঙ্গে বানরের অপান দেশের তুলনা! এ শুধু অশোভনই নয়, পাপজনকও বটে। আপনার মত প্রাজ্ঞ মহাত্মার মুখ থেকে এ কদর্থ আশা করিনি !"

অধ্যাপক যাদবপ্রকাশ গম্ভীর হইয়া উঠিলেন। কহিলেন, "বৎস, তোমার দাম্ভিকতা আমাকে আজ মর্ম্মাহত করেছে। বেশ ! এ থেকে উৎকৃষ্টতর ব্যাখ্যা কি তুমি করতে পার ?"

"প্রভু, আপনার আশীর্ব্বাদে অনেক কিছুই সম্ভব হতে পারে।"

"ভাল, ভাল। তোমার নূতনতর ব্যাখ্যাটি আমায় শোনাও দেখি! তুমি দেখছি আচার্য্য শঙ্করকেও ছাড়িয়ে উঠবে।"

রামানুজ করযোড়ে নিবেদন করিলেন, "আজ্ঞে, আপনার আশীর্ব্বাদে তাই বা অসম্ভব হবে কেন? প্রভু, আমি কিন্তু এ মন্ত্রের অন্য প্রকার অর্থ ক'রে ঐ হীন উপমার দোষটি দূর করতে চাচ্ছি। কপ্যাস শব্দের কং পদের অর্থ জল। আর পিবতি অর্থ—যে পান বা আকর্ষণ করে, অর্থাৎ সূর্য্য। আর মন্ত্রের 'আস' শব্দটি আস ধাতুর রূপ, এর নিহিতার্থ—'বিকশিত'। সুতরাং সমগ্র বাক্যটির অর্থ হচ্ছে সূর্য্যের দ্বারা যা বিকশিত হয়, অর্থাৎ—পদ্ম। এদিক থেকে মন্ত্রাংশের অর্থ দাঁড়ায়—সেই স্বর্ণবর্ণ সবিতৃমণ্ডলমধ্যবর্ত্তী পুরুষের নয়নদ্বয় সূর্য্যবিকশিত কমলের ন্যায়।"

ব্যাখ্যা শুনিয়া অধ্যাপক রুষ্ট হইলেন। কহিলেন, "হুঁ! কিন্তু তুমি যা বললে তা মুখ্যার্থ নয়, গৌণার্থ মাত্র—এ তোমার মনোভিলাষ অনুযায়ী তুমি তৈরী ক'রেছ। যাক্, তোমার ব্যাখ্যান কৌশল অবশ্যই প্রশংসনীয়।"

সুচতুর যাদবপ্রকাশ সেদিন হইতেই বুঝিয়া নিলেন, শিক্ষার্থী রামানুজ শুধু ভগবদ্ভক্ত ও সুপণ্ডিতই হন নাই, এক তীক্ষ্ণধী দ্বৈতবাদী শাস্ত্রবিদের সম্ভাবনা তাঁহার জীবনে ধীরে ধীরে দৃঢ়ভাবে ফুটিয়া উঠিতেছে। শুদ্ধাদ্বৈতবাদী প্রতিভাধর শিষ্য রামানুজ যাদবপ্রকাশ মতবাদের ধারক ও বাহক হইবে, ইহাই ছিল তাঁহার মনোগত ইচ্ছা। এজন্য এই তরুণ শিষ্যের প্রতি এতকাল কম স্নেহ ও অনুগ্রহ প্রকাশ করেন নাই। কিন্তু আজিকার এই ঘটনার পর তাহা অনেকটা হ্রাস পাইয়া গেল। ভিতরে ভিতরে ক্রোধ খুবই হইয়াছে, কিন্তু নিজের মনোভাব কিছুই তিনি প্রকাশ করিলেন না।

আচার্য্য যাদবপ্রকাশ শুধু শাস্ত্রজ্ঞ হিসাবেই খ্যাত ছিলেন না, মন্ত্রবিদ্যায়ও তাঁহার অধিকার ছিল যথেষ্ট। সে-বার কাঞ্চীর রাজকন্যা

এক দুষ্ট প্রেতাত্মার প্রভাবে পতিত হন। বহু চিকিৎসায়ও তাঁহাকে সারান যাইতেছে না। অবশেষে রাজা নিরুপায় হইয়া মন্ত্রবিদ্যায় পারদর্শী যাদবপ্রকাশের কাছে দূত পাঠাইলেন।

শিষ্যগণসহ আচার্য্য প্রাসাদে উপস্থিত হইলেন। সাড়ম্বরে রোগিণীর সম্মুখে শুরু হইল মন্ত্রপাঠ।

প্রেত কিন্তু রাজকুমারীর মুখ দিয়া এক অদ্ভুত কথা বলিয়া বসে, "পণ্ডিত, আমি রাজকুমারীকে ত্যাগ ক'রে যাব, কিন্তু তার পূর্ব্বে সম্মুখে দণ্ডায়মান তোমার শিষ্য রামানুজকে আমার শিরে পদস্পর্শ করতে দাও। তোমার এ শিষ্যের দেহ পরম পবিত্র, সে এক শক্তিমান বিষ্ণু-ভক্ত ব্রাহ্মণ।"

কথাটি শুনিয়া যাদবপ্রকাশের বিস্ময়ের সীমা রহিল না। প্রেতের অনুরোধ রক্ষা করিতেই হইল, নহিলে রোগ সারিবে না। আচার্য্যের ইঙ্গিতে রামানুজ তখনি সর্ব্বসমক্ষে রোগিণীর মস্তকে চরণ স্থাপন করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে দেখা গেল, প্রেতাবিষ্টা রাজকুমারী সুস্থ হইয়া উঠিতেছে।

ঘটনাটি সামান্য, কিন্তু ইহাকে কেন্দ্র করিয়া কাঞ্চীর রাজসভা ও জনজীবনে রামানুজের প্রসিদ্ধি সেদিন ছড়াইয়া পড়ে। পুণ্যাত্মা সাধক ও বিশিষ্ট পণ্ডিতরূপে ধীরে ধীরে তিনি সর্ব্বত্র পরিচিত হইয়া উঠেন।

অধ্যাপকের সঙ্গে রামানুজের দৃষ্টিভঙ্গির রহিয়াছে এক মৌলিক পার্থক্য। আর এ পার্থক্য ক্রমেই বড় হইয়া দেখা দেয়। রামানুজ নিজ কর্ম্মকাণ্ডের পক্ষপাতী, খ্যাতনামা বিষ্ণু-উপাসক বংশে তাঁহার জন্ম। তাহা ছাড়া, বালক বয়স হইতেই তাঁহার হৃদয়ে ছোঁয়া লাগিয়াছে পরম ভাগবত কাঞ্চীপূর্ণের, প্রপত্তি ও শুদ্ধাভক্তির উপর জাগিয়াছে অটুট আস্থা। অপর দিকে অধ্যাপক যাদবপ্রকাশ হইতেছেন এক শুষ্ক অদ্বৈতবাদী পণ্ডিত। শঙ্কর মত হইতে এক ভিন্নতর অদ্বৈত-মত ব্যাখ্যাতা রূপে তিনি সুপরিচিত, আত্মাভিমানে স্ফীত হইয়া ধরাকে তিনি সরা জ্ঞান করেন।

এতদিন অধ্যাপক ও ছাত্রের মতবিরোধ ছিল প্রচ্ছন্ন—এবার মাঝে মাঝে ঘটিতে থাকে প্রকাশ্য সংঘাত। অসামান্য ধীশক্তি ও প্রতিভা নিয়া রামানুজ জন্মিয়াছেন, এই শক্তিবলে প্রায়ই যাদব-প্রকাশের মত তিনি খণ্ডন করিতেন। যুক্তিতে আঁটিতে না পারিয়া আচার্য্যের অন্তর্দাহ আরও বাড়িয়া উঠিত।

একদিনকার বিতর্ক চরমে উঠিল। আচার্য্য ক্রোধে ফাটিয়া পড়িলেন। সর্ব্বসমক্ষে রামানুজকে অপমানিত তো করিলেনই, তারপর তাঁহাকে আশ্রম হইতে করিলেন বহিষ্কৃত।

অধ্যাপকের পদবন্দনা করিয়া রামানুজ নতমস্তকে সেখান হইতে চলিয়া গেলেন। মেধা ও উন্মেষশালিনী বুদ্ধি তাঁহার যথেষ্টই রহিয়াছে, এবার স্বগৃহে বসিয়াই শুরু করিলেন শাস্ত্রচর্চ্চা।

রামানুজকে তাড়াইয়া দিবার পর যাদবপ্রকাশ আরো বেশী দুশ্চিন্তায় পড়িলেন। যে বিপুল শক্তি তাঁহার মধ্যে রহিয়াছে, তাহা অধ্যাপকের অজানা নহে। অল্প কিছুদিন আগেই তো রাজকুমারীর রোগমুক্তির দিন হঠাৎ তাহার কিছুটা প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছিল। তখনকার ঐ ঘটনাকে কেন্দ্র করিয়া রাজসভাতেও পণ্ডিত যাদব-প্রকাশের কম মর্য্যাদাহানি হয় নাই।

তাহা ছাড়া, আশ্রমে অদ্বৈতবাদ ও দ্বৈতবাদের বিতর্কে রামানুজ অনেকবারই তাঁহাকে কোণঠাসা করিয়াছেন। শিষ্যদের সম্মুখে আচার্য্য পরাজয় স্বীকার করেন নাই বটে, কিন্তু রামানুজের যুক্তি-তর্ক যে অকাট্য, অনেকেরই তাহা বুঝিতে কষ্ট হয় নাই।

রামানুজ শুধু চতুষ্পাঠী ত্যাগ করিয়া গেলেই সমস্যার সমাধান হয় কই? অসামান্য পাণ্ডিত্য তাঁহার। এ পাণ্ডিত্যের আঘাতে, দ্বৈতবাদের যুক্তিতর্কে, শীঘ্রই হয়ত সে যাদবপ্রকাশের সমস্ত কিছু মান মর্য্যাদা ভূলুণ্ঠিত করিয়া দিবে। তখন কি আর কাঞ্চীনগরে তিনি মুখ দেখাইতে পারিবেন?

আহত আত্মাভিমান ক্রমে অধ্যাপক যাদবপ্রকাশকে হিংস্র

করিয়া তুলে। যাহা কিছু সৎপ্রবৃত্তি ছিল, উত্তেজনার মুখে তাহাও নষ্ট হইয়া যায়। এই বিকৃত মানসিকতা নিয়া জনকয়েক শিষ্যসহ তিনি এক জঘন্য ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হন।

রামানুজ বাঁচিয়া থাকিতে অধ্যাপকের মর্য্যাদা কোনদিনই আর রক্ষা করা যাইবে না—তাহা ছাড়া, এ অঞ্চলে অদ্বৈত মতের প্রচারও নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হইবে না। শিষ্যদের কাছে এ পরিস্থিতি অসহনীয়। সকলে পরামর্শ করিয়া স্থির করিলেন, কোন দূর তীর্থে রামানুজকে নিয়া যাওয়া হইবে। সেখানে করা হইবে তাঁহার প্রাণসংহার।

ষড়যন্ত্র ঠিক করিবার পর যাদবপ্রকাশ একদিন রামানুজকে ডাকাইয়া আনিলেন। স্নেহাভিনয় করিয়া কহিলেন, শিক্ষাগুরু ও ছাত্রের সম্পর্ক চির-অচ্ছেদ্য। তাহা ছাড়া, মেধা, প্রতিভা ও শাস্ত্র-জ্ঞানের দিক দিয়া রামানুজ অদ্বিতীয়, অধ্যাপকের তিনি প্রিয়তম শিষ্য। আবার তাঁহাকে আশ্রমে গ্রহণ করা হইল।

অল্প কিছুদিন পরেই আচার্য্য ঘোষণা করিলেন : তিনি শিষ্যগণ-সহ তীর্থদর্শন ও গঙ্গাস্নানে যাইবেন। মনে রহিল দুরভিসন্ধি, পথে কোন গহন অরণ্যে রামানুজের প্রাণনাশ করা হইবে।

আচার্য্য ও সতীর্থদের সহিত তীর্থ ভ্রমণ, এ যে তাঁহার এক পরম সুযোগ। রামানুজ সোৎসাহে সকলের সঙ্গে তীর্থযাত্রায় বাহির হইয়া পড়িলেন। অন্যতম সতীর্থ, তাঁহার মাস্তুতো ভাই, গোবিন্দও হইলেন তাঁহার সহযাত্রী।

তীর্থযাত্রীর দল সেদিন বিন্ধ্যপ্রদেশের গোণ্ডা অরণ্যে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। চারিদিকে দূরবিস্তারী গহন বন! জনমানবের বসতি কোথাও নাই। হিংস্র জন্তু ও শ্বাপদে সর্ব্বস্থান পূর্ণ। কুচক্রীরা ঠিক করিল, এখানেই রামানুজকে বধ করিবে। তারপর তাহাদের কার্য্য শেষে রটাইয়া দিলেই চলিবে, নরখাদক বাঘের আক্রমণে তাঁহার জীবনান্ত হইয়াছে।

নিভৃতে বসিয়া সকলে পরামর্শ আঁটিতেছে, এ সময়ে তাহাদের

কথাবার্ত্তা হঠাৎ গোবিন্দের কানে যায়। সে মহা দুশ্চিন্তায় পড়িল। কি করিয়া রামানুজকে বাঁচান যায়? দিন শেষে রামানুজ একটি সরোবরে হাত পা ধুইতে গিয়াছেন, এই সুযোগে গোবিন্দ তাঁহাকে ষড়যন্ত্রের কথা খুলিয়া বলেন। অবিলম্বে তাঁহাকে পলায়ন করিতে হইবে, নহিলে নিস্তার নাই। দুর্ব্বৃত্তেরা আজ রাত্রেই তাঁহাকে হত্যা করিবে।

গোবিন্দের নির্ব্বন্ধাতিশয্যে রামানুজকে সেই মুহূর্ত্তে গুরুর সঙ্গ ত্যাগ করিতে হইল। আর কোনদিকে না চাহিয়া তিনি বনজঙ্গল ভেদ করিয়া ধাবিত হইলেন।

কাঞ্চীনগরী দক্ষিণ দিকে—সেই দিক লক্ষ্য করিয়াই শুরু হইল তাঁহার পদযাত্রা।

রাত্রিতে দলের মধ্যে রামানুজের খোঁজ পড়িল। তাইত! কোথায় তিনি অন্তর্হিত হইলেন?

গহন অরণ্যাঞ্চলে তখন ঘন অন্ধকার নামিয়া আসিয়াছে। সারা পথ হিংস্র জন্তুসঙ্কুল। এ অঞ্চলে এ সময়ে একাকী কোথাও যাওয়া মানেই মৃত্যুবরণ।

যাদবপ্রকাশ ও তাঁহার শিষ্যেরা ধরিয়া লইলেন, রামানুজ নিশ্চয়ই বাঘের কবলে পড়িয়াছে। পরদিন ভোর বেলায় সবাই নিশ্চিন্তমনে গঙ্গাতীরের তীর্থ অভিমুখে রওনা হইয়া গেলেন।

এদিকে রামানুজ ক্ষিপ্রপদে অগ্রসর হইয়া চলিয়াছেন। হিংস্র বাঘ ভল্লুক ও শ্বাপদকুলে ভরা এই বনপথ। এ ঘোর বিপদে একমাত্র আশ্রয় শ্রীভগবান। তাঁহারই নাম জপ করিতে করিতে দুর্গম পথ তিনি অতিক্রম করিতেছেন।

একদমে বেশ খানিকটা দূরে চলিয়া আসা গিয়াছে, এবার এক বৃক্ষের উপর রাত্রি যাপন করিলেন। পরের দিন গহন জঙ্গলের মধ্য দিয়া আবার শুরু হয় তাঁহার পথ চলা। মধ্যাহ্ন পর্য্যন্ত অবিরত তিনি হাঁটিয়া আসিয়াছেন। দেহ তাঁহার বড় অবসন্ন। তীব্র পিপাসায়

ছাতি ফাটিবার উপক্রম। একটি বৃক্ষের ছায়ায় বসার পর কিছুকালের মধ্যেই মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন।

বাহ্যজ্ঞান ফিরিয়া আসিলে রামানুজ দেখিলেন, বেলা গড়াইয়া গিয়াছে। কিন্তু একি অদ্ভুত ব্যাপার! তাঁহার দেহের শ্রান্তি ক্লান্তি কোথায়? সব যেন কাহার মন্ত্রবলে অদৃশ্য হইয়াছে।

আরও এক বিচিত্র দৃশ্য! এক ব্যাধদম্পতি শিয়রে বসিয়া সস্নেহে তাঁহার পরিচর্য্যায় রত! এই গভীর অরণ্যে মনুষ্যমূর্ত্তি দেখিয়া খানিকটা আশ্বস্তও হইলেন।

রামানুজ ধীরে ধীরে উঠিয়া বসিলে ব্যাধ-পত্নী স্নেহমাখা সুরে প্রশ্ন করিল, "বাবা, তুমি কে বলত? এ জঙ্গলে ঢুকতে যে ডাকাতরাও ভয় পায়, তুমি কি ক'রে, কোথা থেকে, এখানে এলে? কোথায়ইবা যেতে চাও?"

"মা, আমি এক বিদ্যার্থী ব্রাহ্মণ সন্তান। তীর্থযাত্রায় বেরিয়েছিলাম। তারপর সঙ্গীদের শত্রুতার জন্য এদিকে পালিয়ে এসেছি। আমি দক্ষিণে, কাঞ্চীনগরে যাব। ভগবানই আজ তোমাদের মিলিয়ে দিয়েছেন, দয়া করে আমায় পথ দেখিয়ে দাও।"

ব্যাধ আশ্বাস দেয়, "বেশ তো বাবা, আমরাও যে কাঞ্চীরই যাত্রী। চল, সবাই এক সঙ্গেই যাওয়া যাবে।"

ব্যাধপত্নীর দেওয়া সামান্য কিছু ফলমূল খাইয়া রামানুজ তাহাদের সঙ্গে আগাইয়া চলিলেন।

সূর্য্য বহুক্ষণ যাবৎ অস্তমিত। রাত্রির অন্ধকার ধীরে ধীরে নামিয়া আসিতেছে। সেদিনকার মত পথচলা শেষ হইল।

রামানুজ নিদ্রার উদ্যোগ করিতেছেন, এমন সময় অদূরে শায়িত দম্পতির অস্ফুট কথাবার্ত্তা তাঁহার কানে গেল। সারাদিন পথশ্রমের পর ব্যাধরমণীর বড় তৃষ্ণা পাইয়াছে। স্বামীকে সে বলিতেছে, "ওগো, খুব কাছেই তো সেই নামকরা কূয়ো! তা থেকে কিছুটা জল নিয়ে এসোনা, তেষ্টা মেটাই!"

স্বামী বুঝাইতেছে, "এ জঙ্গলে, গভীর অন্ধকারে কেন আর ছুটাছুটি করা ? রাতটা কোনমতে কাটিয়ে দাও, ভোর হলেই জল এনে দেব।"

রামানুজ ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিলেন। সে কি ! যে স্নেহময়ী নারী এই দুর্গম পথে তাঁহার এত সেবাযত্ন করিয়াছে, আশ্রয় দিয়া ও পথ দেখাইয়া প্রাণ বাঁচাইয়াছে, তাহার তৃষ্ণার জল মিলিবে না ? তিনি নিজেই উহা আনিতে যাইবেন। হোক্ না অন্ধকারময় রাত্রি, তাহাতে কি আসে যায় ?

ব্যাধ দম্পতির নিকটে গিয়া রামানুজ কূপের পথ-সন্ধান জিজ্ঞাসা করিলেন। কিন্তু তাহারা কিছুতেই এই রাত্রিতে বনপথ দিয়া তাঁহাকে যাইতে দিতে রাজী নয়। উভয়েই বলিয়া উঠিল, "না বাবা, এত তোমার ব্যস্ত হবার দরকার নেই। রাত তো শেষ হয়ে এলো বলে। কাল সকালে জল আন্‌লেই চলবে।"

পরদিন প্রত্যুষে উঠিয়া ব্যাধপত্নী রামানুজকে বলিল, "বাবা, কাল রাতে তুমি জল আন্‌তে চেয়েছিলে। খুব কাছেই সে কূয়ো। চল, সেদিকেই আমরা সবাই মিলে যাই।"

অরণ্যের শেষ সীমায় আসিয়া দেখা গেল, অদূরে শালকুঞ্জের নীচে এক বৃহৎ কূপ। প্রস্তর-সোপান বাহিয়া বহু নর-নারী উপরে উঠিতেছে এবং জল সংগ্রহ করিতেছে। রামানুজ সানন্দে সেখানে গিয়া হাত মুখ ধুইলেন, অঞ্জলি পুরিয়া স্নিগ্ধ শীতল জল আনিয়া ব্যাধপত্নীকে পান করাইলেন। তিন তিনবার জল আনিয়া দিয়াছেন, কিন্তু রমণীর পিপাসা যেন মিটিতেই চাহে না। রামানুজ আরও একবার কূপের দিকে ছুটিয়া গেলেন। কিন্তু কি আশ্চর্য্য, ফিরিয়া আসিয়া দেখেন, স্বামী-স্ত্রী ইতিমধ্যেই কোথায় অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে। চারিদিকে কত খুঁজিলেন, কোন সন্ধানই মিলিল না।

এবার কূপের কাছে ফিরিয়া গিয়া রামানুজ একটি মেয়েকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ওগো, এই অঞ্চলের নাম কি ? কাঞ্চী এখান থেকে কতদূর বলতে পার ?"

এমন অদ্ভুত কথা যেন কেহ কখন শোনে নাই! রামানুজের চারিদিকে কৌতূহলী মানুষের ভীড় জমিতে আরম্ভ করিল।

কয়েকজন তাঁহাকে চিনিয়াও ফেলিয়াছে। সহাস্যে তাহারা কহিল, "সে কি গো, তোমায় কি ভূতে পেয়েছে? তোমার সারা জীবনের চেনা কাঞ্চীনগরকে তুমি এ ক'দিনের ভেতর ভুলে গেলে? তুমি আচার্য্য যাদবপ্রকাশের ছাত্র, অথচ এ-জায়গার স্মৃতি তোমার মনে নেই! দেখতে পাচ্ছ না, অদূরে ঐ বরদরাজের মন্দিরচূড়ো? আর এ কূপ যে মহা পবিত্র শালকূপ—তাও দেখছি চিনলে না। শেষটায় মাথা খারাপ হ'ল নাকি গো?"

এ কি বিচিত্র ইন্দ্রজাল! রামানুজের তখন বাক্‌স্ফূর্ত্তি হইতেছে না। তাঁহার সর্ব্বশরীরে পুলক-রোমাঞ্চ, নয়নে বহিতেছে আনন্দাশ্রু। ভাবিতেছেন, মধ্যপ্রদেশের অরণ্য অঞ্চল হইতে সুদূর কাঞ্চীতে এক অপরাহ্ণ মাত্র হাঁটিয়া কি করিয়া তিনি উপস্থিত হইলেন! সঙ্গে সঙ্গেই হৃদয়ে জাগিয়া উঠিল দিব্য অনুভূতির ঝলক। উপলব্ধি করিলেন, ব্যাধ-দম্পতির বেশে স্বয়ং বৈকুণ্ঠপতি ও লক্ষ্মীদেবীই তাঁহাকে এখানে আনিয়া দিয়া হঠাৎ অন্তর্হিত হইয়াছেন।

তীব্র ভাবাবেগে রামানুজের সারা দেহ কম্পিত হইতেছে। শালকূপের সম্মুখে তিনি মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন।

বহুক্ষণ পরে বাহ্যজ্ঞান ফিরিয়া আসিল। দেখিলেন, চারিপাশে জানা-অজানা বহু লোকের ভীড়। কাহারও প্রশ্নের সদুত্তর দেওয়া সম্ভবপর হইল না! দুই নয়নে কেবলই অঝোর ধারে অশ্রু ঝরিতেছে, মর্ম্মমূলে গিয়া প্রবিষ্ট হইয়াছে শরণাগতি ও ভগবৎভক্তির পরমবোধ।

রামানুজের জীবনপ্রভু সেদিন কৃপা করিয়া আবির্ভূত হইয়াছেন। অলৌকিক দিব্যলীলার মধ্য দিয়া দিয়াছেন তাঁহার হাতছানি। জীবনের এক নূতনতর অধ্যায় উন্মোচিত হইয়াছে।

ঘরে ফিরিয়া রামানুজ নিজের ধ্যান ধারণা ও শাস্ত্র অধ্যয়নে

ব্যাপৃত হইলেন। কয়েকদিন পরে ভক্ত কাঞ্চীপূর্ণ হঠাৎ তাঁহার সাক্ষাৎ করিতে আসেন। শ্রীবিষ্ণুর দাস্যভাবে এই মহাসাধক সদা ভাবিত, তাই তাঁহার দর্শনে রামানুজের আনন্দ উথলিয়া উঠিল।

বিন্ধ্যারণ্যে যাহা কিছু ঘটিয়াছে সমস্তই তিনি মহাত্মার কাছে বিবৃত করিলেন। এত কিছু নিগ্রহের মধ্যে ব্যাধদম্পতির ছদ্মবেশে লক্ষ্মী-নারায়ণ তাঁহাকে যে অহেতুক অনুগ্রহ দেখাইয়া গিয়াছেন, পুলকাঞ্চিত দেহে বর্ণনা করিলেন সেই কাহিনী।

সিদ্ধভক্ত কাঞ্চীপূর্ণ বরদরাজ-বিগ্রহের নিত্যদাস। প্রভুর অনুধ্যানে সদাই তিনি বিভোর। ভাবাবেশে কখনও কাঁদেন, কখনও হাসেন—কখনও বা প্রভুর সহিত থাকেন কথপোকথনে রত। আনন্দময় শ্রীহরির এই পরমভক্তের দেহে মনে আনন্দ-হিল্লোল বহে অবিরাম। মধু ঋতুর মতই তাঁহার আবির্ভাব ও প্রভাব—কাঞ্চীর যে পল্লীতে যে গৃহেই তিনি যান, সেখানেই খেলিয়া যায় অপার্থিব আনন্দের ঢেউ।

সমস্ত কাহিনী শুনিয়া ভক্ত কাঞ্চীপূর্ণ ভাবাবিষ্ট হইলেন। তারপর কহিলেন, "বৎস, ভগবান শ্রীবরদরাজ তোমার প্রতি বড় প্রসন্ন, তাই তোমার প্রাণরক্ষা পেয়েছে। আর তুমি যে তাঁর একান্ত প্রিয়, তাতেও কোন সন্দেহ নেই। ছদ্মবেশে স্বয়ং লক্ষ্মীদেবী তোমার করপুটের জল পান করেছেন। তোমার জীবনের সকল পিপাসা মিটিয়ে দেবেন বলেই তো তোমার দেওয়া জলে নিজেদের পিপাসা মেটাবার ভান তাঁরা করে গেলেন। বৎস, তুমি এখন থেকে প্রভুর নিত্য সেবায় ব্রতী হও। শালকূপের জল রোজ শ্রীবরদরাজের জন্য বহন করে আন, বিগ্রহকে স্নান অভিষেক করাও। আমি বলছি, অচিরে তোমার মনস্কামনা পূর্ণ হবে, ঘটবে পরম প্রাপ্তি।"

কাঞ্চীপূর্ণের প্রতি বাল্যাবধি স্বাভাবিক শ্রদ্ধা ও প্রীতির আকর্ষণ রামানুজ অনুভব করিতেন। এবার তাহা যেন আরও তীব্র হইয়া উঠিল। এই সিদ্ধ মহাপুরুষের কাছে দীক্ষা নিতে তিনি চির-উৎসুক, আজও সেই কাতর প্রার্থনাই বার বার করিতে লাগিলেন।

কিন্তু কাঞ্চীপূর্ণ দাস্যভাবের মূর্ত্ত বিগ্রহ। দীক্ষাদানে তাঁহাকে রাজী করান বড় কঠিন। কাঞ্চীর লোকে তাঁহাকে যত মর্য্যাদাই দিক, দৈন্যময় বৈষ্ণবীয়তা নিয়া তিনি বাস করেন, নিজেকে শূদ্রাধম বলিয়া একান্তে সরিয়া থাকেন। রামানুজকে তাই এড়াইয়া গেলেন।

রামানুজ কিন্তু এ মহাভক্তের চরণে চিরকালের জন্য আত্মসমর্পণ করিয়া বসিয়াছেন। এখন হইতে প্রকৃত দাস্যভক্তির বীজ তাঁহার জীবনে কাঞ্চীপূর্ণের প্রসাদেই অঙ্কুরিত হইতে থাকে।

তীর্থপর্য্যটন সারিয়া যাদবপ্রকাশ কাঞ্চীতে ফিরিয়া আসিয়াছেন। লোকমুখে হঠাৎ সেদিন সংবাদ পাইলেন, রামানুজের প্রাণ বিনষ্ট হয় নাই—বিন্ধ্যারণ্য হইতে নিরাপদে গৃহে আসিয়াছেন।

দেখা হইবামাত্র আচার্য্য কপট সমবেদনা দেখাইলেন। কহিলেন, "বাবা রামানুজ, সেদিন বনাঞ্চল হ'তে তুমি অন্তর্হিত হবার পর আমার যে কি দুশ্চিন্তায় কাল কেটেছে, তা আর কি বলব! পথ হারিয়ে তুমি হিংস্র পশুর মুখেই হয়ত পড়েছ, এই আশঙ্কা হয়েছিল। যাক্, এবার তোমায় নিরাপদ দেখে প্রাণে শান্তি এসেছে। আশীর্ব্বাদ করি, তুমি দীর্ঘজীবী হও, বাবা।"

আচার্য্যের পদবন্দনা করিয়া রামানুজ সবিনয়ে কহিলেন, "প্রভু, সেই হিংস্রজন্তুসঙ্কুল গহন বনে প্রাণরক্ষা পাওয়া সত্যিই সম্ভব নয়। এ যে শুধু আপনার আশীর্ব্বাদ ও অনুগ্রহেই ঘটেছে, এতে আমার কোন সন্দেহ নেই।"

পূর্ব্ববৎ শ্রদ্ধা ও সৌজন্যের প্রকাশ দেখিয়া আচার্য্য কতকটা নিশ্চিন্ত হইলেন। ভাবিলেন—'তবে রামানুজ তাঁহার কপট অভিসন্ধি ও হত্যার ষড়যন্ত্র টের পায়নি।'

আচার্য্য ভিতরে ভিতরে নিজের আচরণের জন্য কিছুটা লজ্জিত যে না হইলেন, তাহাও নয়। পরদিন হইতে রামানুজকে চতুষ্পাঠিতে যোগ দিতে বলিলেন। রামানুজের যাতায়াত আবার আরম্ভ হইল।



আচার্য্য রামানুজ

কিছুকাল পরের কথা। প্রসিদ্ধ ভক্তসাধক, শ্রীরঙ্গনাথের একান্ত সেবক যামুনাচার্য্য সেদিন কাঞ্চী নগরে উপস্থিত হইয়াছেন। জাগ্রত বিগ্রহ বরদরাজের দর্শন ও আরাধনার জন্যই তাঁহার এই আগমন। মন্দির হইতে ফিরিবার সময় তিনি বেদান্তবিদ আচার্য্য যাদবপ্রকাশের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে গেলেন।

শতবর্ষ বয়স্ক বৃদ্ধ, সর্ব্বজনশ্রদ্ধেয় এই বৈষ্ণব মহাপুরুষকে দর্শনের জন্য সেদিন রাস্তায় ভীড় জমিয়া গেল। আশ্রমের তরুণ শিক্ষার্থীরা সবাই যামুনাচার্য্যকে সম্বর্দ্ধনা করিতে আগাইয়া গেলেন। রামানুজেরই স্কন্ধে ভর দিয়া প্রবীণ বৈষ্ণব ধীরে ধীরে যাদব-প্রকাশের চতুষ্পাঠীতে প্রবেশ করিলেন।

মহাপুরুষের প্রসন্ন দৃষ্টি এ সময়ে রামানুজের উপর পতিত হইল। দিব্যকান্তি, তেজঃপুঞ্জকলেবর কে এই তরুণ? দৃষ্টিপাত মাত্রেই লোকের মন-প্রাণ কাড়িয়া নেয়! এ ছাত্রটির পরিচয়লাভের জন্য যামুনাচার্য্য ব্যগ্র হইলেন।

তাঁহার প্রশ্নের উত্তরে কাঞ্চীর এক ভক্ত কহিলেন, "আলওয়ান্দার, কাঞ্চীর এ যুবক এক রত্নবিশেষ। প্রভু বরদরাজের ইনি পরম ভক্ত, মহাপুরুষ কাঞ্চীপূর্ণেরও ইনি অনুগৃহীত। তাছাড়া ইনি প্রতিভাবান শাস্ত্রবিদ্। সম্প্রতি 'সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম' এই মন্ত্রের এক ভক্তিপ্রধান, বিস্তৃত ব্যাখ্যা প্রণয়ন ক'রে পণ্ডিত ও ভক্ত সমাজে আলোড়নের সৃষ্টি করেছেন।"

যামুনাচার্য্য দাক্ষিণাত্যের ভক্তি-ধর্ম্মের অন্যতম ধারক ও বাহক। এ সংবাদে তিনি মহা পুলকিত হইয়া উঠিলেন। তাঁহার মনে হইল, এ দিব্যকান্তি যুবক যেন শ্রীহরির এক চিহ্নিত সেবক—বিরাট সম্ভাবনা নিহিত রহিয়াছে ইঁহার মধ্যে। কিন্তু শুষ্ক তার্কিক ও অদ্বৈতবাদী পণ্ডিত যাদবপ্রকাশের অভিভাবকত্বে এতদিন সে বড় হইয়াছে, ইহাই সব চাইতে উৎকণ্ঠার কথা। ইচ্ছা সত্ত্বেও সেদিন লোকের ভীড়ে যামুনাচার্য্য রামানুজের সহিত কথাবার্ত্তার তেমন সুযোগ পাইলেন না। লোকজন

পরিবৃত হইয়া তিনি চতুষ্পাঠীতে ঢুকিয়া পড়িলেন। তারপর আচার্য্য যাদবপ্রকাশের সহিত কিছুটা শিষ্টাচার ও বাক্যালাপের পর বিদায় গ্রহণ করিলেন।

হঠাৎ-দেখা তরুণ ভক্তের স্মৃতি কিন্তু দীর্ঘদিন যামুনাচার্য্যের অন্তরপট হইতে মুছিয়া যায় নাই। তাছাড়া, নিজের দেহত্যাগের পূর্ব্বে, বৈষ্ণব জগতের এক ভবিষ্যৎ দিক্‌পালরূপে রামানুজকে তিনি ভক্তজন সমক্ষে চিহ্নিত করিয়া দিয়া যান। ভক্তিরসের শ্রেষ্ঠ ভাণ্ডারীর কণ্ঠে অনাগত বৈষ্ণব নেতার মাঙ্গলিকী উদ্‌গীত হয়। যামুনাচার্য্যের রচিত সেই শ্লোকের শেষাংশ—

লক্ষ্মীশ পুণ্ডরীকাক্ষ কৃপাং রামানুজে তব।
নিধায় স্বমতে নাথ প্রবিষ্টংকর্ত্তু মর্হাসি ॥

অর্থাৎ হে কমলনয়ন শ্রীপতে!—রামানুজের উপর তোমার কৃপা স্থাপন ক'রে তাঁকে স্বীয় মতে আনয়ন কর, নাথ।

রামানুজ কিন্তু আগের মতই অধ্যাপক যাদবপ্রকাশের কাছে অধ্যয়ন করিতেছেন। অসামান্য মেধা ও প্রতিভা নিয়া শাস্ত্রসাগরের মন্থন চলিয়াছে, আর এসঙ্গে মিলিত হইয়াছে তাঁহার আজন্মলব্ধ ভক্তি ও ভাবুকতা। শ্রীহরির দাস্যভাবে সদা বিভোর কাঞ্চীপূর্ণের সান্নিধ্যও এসময়ে তাঁহার জীবনকে রসস্নিগ্ধ করিয়া তুলিতেছে।

যাদবপ্রকাশ সেদিন ছাত্রদের কাছে উপনিষদ্‌ ব্যাখ্যা করিতেছেন। মন্ত্রের ব্যাখ্যায় তাঁহার পারদর্শিতা অপূর্ব্ব, কিন্তু এ সবই চরম অদ্বৈতমতের ব্যাখ্যা। জীব ও ঈশ্বরের সেব্য-সেবক ভাবের চিহ্নমাত্র নাই। ভক্ত রামানুজের পক্ষে এ বড় অসহ্য হইয়া উঠিল। সবিনয়ে তিনি আপত্তি প্রকাশ করিলেন।

আচার্য্য যাদবপ্রকাশও ছাড়িবার পাত্র নহেন। উভয়ের মধ্যে শুরু হইল তুমুল বিচারদ্বন্দ্ব। অপূর্ব্ব প্রতিভা বলে রামানুজ আচার্য্যের ব্যাখ্যা খণ্ডন করিয়া চলিলেন।

সিদ্ধান্তের সমর্থনে শ্রুতি হইতে নানা যুক্তি প্রমাণ তিনি উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতেছেন। আচার্য্য আর কোন দিক দিয়াই শিষ্যের এই তর্কজাল ছিন্ন করিতে পারিতেছেন না। অবশেষে ক্রোধোদ্দীপ্ত হইয়া বলিয়া উঠিলেন, "রামানুজ, তোমার ধৃষ্টতা আজ কিন্তু সীমা অতিক্রম করেছে। তুমি যদি এমন শাস্ত্রপারঙ্গমই হয়ে থাক তবে আমার টোলে অধ্যয়ন করার তোমার আর কি প্রয়োজন? আগেও তোমায় ত্ব'বার মার্জ্জনা করেছি, কিন্তু আর নয়। তোমার মত উদ্ধত শিষ্যের মুখ দর্শন আমি করতে চাইনে। এখনি তুমি দূর হও।"

রামানুজ টোল ত্যাগ করিলেন। ভাবিলেন, যাঁহার কাছে পড়িলে ভগবৎ-ভক্তি লোপ পায় এমন আচার্য্যের সান্নিধ্য ত্যাগ করাইয়া প্রভু আজ তাঁহার কল্যাণসাধনই করিলেন। ঘরে ফিরিয়া একান্তভাবে দ্বৈতবাদী শাস্ত্রের চর্চ্চায়ই তিনি ব্রতী হইলেন। তাছাড়া, আরো এক বড় সেবাকার্য্যের ভার তিনি নিয়াছেন। প্রতিদিন নিষ্ঠা সহকারে পবিত্র শালকূপ হইতে জল বহন করিয়া আনেন এবং শ্রীবরদরাজকে স্নান করান। সর্ব্বোপরি পাইতেছেন পরম ভাগবত কাঞ্চীপূর্ণের ঘনিষ্ঠ সঙ্গলাভ। এই পরিবেশে তাঁহার অধ্যাত্মজীবন ধীরে ধীরে ফুটিয়া উঠিতে থাকে।

বৃদ্ধ যামুনাচার্য্য কিছুদিনের মধ্যে খুব অসুস্থ হইয়া পড়িলেন। শেষের দিনটি তাঁহার সকলেই বুঝিল আগাইয়া আসিতেছে। কিন্তু বিস্ময়ের বিষয়, শ্রীরঙ্গমে বসিয়া এই মহাপুরুষ তাঁহার অন্তিম সময়েও তরুণ ভক্ত ও রামানুজকে স্মরণ রাখিতে ভুলেন নাই। কাঞ্চীর এক ব্রাহ্মণের নিকট জানিলেন, রামানুজ অধ্যাপক যাদবপ্রকাশের সহিত তাঁহার সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করিয়াছেন। সাধু কাঞ্চীপূর্ণের নির্দ্দেশে এবার হইতে তিনি ভক্তিসাধনার পথে অগ্রসর হইতে কৃতসঙ্কল্প। এ সংবাদে যামুনাচার্য্যের আনন্দের সীমা রহিল না। তখনই অন্তরঙ্গ শিষ্য মহাপূর্ণকে নির্দ্দেশ দিলেন, তিনি যেন অবিলম্বে কাঞ্চীতে যান এবং রামানুজকে তাঁহার নিকটে উপস্থিত করেন।

কাঞ্চীর বরদরাজ মন্দিরে পৌঁছিয়া মহাপূর্ণ শুনিলেন, রামানুজ প্রতিদিন এই পথেই শালকূপের পবিত্র বারি নিয়া শ্রীমন্দিরে আসেন। প্রভুর স্নান সমাপনান্তে আবার ফিরিয়া যান নিজ গৃহে। তাই মন্দিরের কাছে দাঁড়াইয়া মহাপূর্ণ নিবিষ্ট মনে যামুনাচার্য্যের রচিত অপূর্ব্ব শ্লোকগাথা গাহিতে লাগিলেন।

রামানুজ রাজপথ দিয়া আসিতেছেন, মাথায় তাঁহার শ্রীবিগ্রহের স্নান-জলের ভাণ্ড। হঠাৎ বিস্ময়ে থমকিয়া দাঁড়াইলেন। একি তিনি শুনিতেছেন? এমন অপরূপ স্তোত্রমালা তো কখনো শোনেন নাই। সম্মুখে আগাইয়া আসিয়া তিনি কাষায় পরিহিত বৈষ্ণব সাধক মহাপূর্ণকে প্রশ্ন করলেন, 'প্রভু, দয়া করে একবার বলুন, এ রসমধুর স্তব কে রচনা করেছেন?"

"ভাই, এর রচয়িতা আমার প্রভু মহামুনি যামুনাচার্য্য—রঙ্গনাথজির যিনি নিত্যসেবক, সারা দাক্ষিণাত্যের বিষ্ণুভক্তদের যিনি মধ্যমণি। দাস্যভাবের মহাতত্ত্বের মধ্য দিয়েই যে তিনি এতকাল শ্রদ্ধা ভক্তি ছড়িয়ে আসছেন। তুমি কি তাঁর অপূর্ব্ব স্তবগাথা শোননি?"

আগ্রহভরে রামানুজ মহাপূর্ণকে নিবেদন করিলেন, "মহাত্মন, আপনি এখানে কোথায় অবস্থান করবেন? চলুন, অনুগ্রহ করে আজ এই দীনের গৃহেই ভিক্ষা গ্রহণ করুন।"

স্মিতহাস্যে মহাপূর্ণ কহিলেন, "আমি যে ভাই তোমার কাছেই এসেছি। আমার প্রভু মহামুনি যামুনাচার্য্যের দেহরক্ষার সময় আসন্ন হয়েছে। তাই অবিলম্বে তোমার সঙ্গে দেখা করবার জন্য তিনি বড় ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। তোমায় নিয়ে যাবার জন্যই যে আজ আমার কাঞ্চীতে আসা।"

একি অভাবনীয় প্রস্তাব! দক্ষিণী বৈষ্ণবজগতের একপত্রী পণ্ডিত, মহাপুরুষ যামুনাচার্য্য তাঁহার মত এই নগণ্য ব্যক্তিকে আজ স্মরণ করিয়াছেন? স্নানাভিষেকের জল তাড়াতাড়ি মন্দিরে পৌঁছাইয়া দিয়া রামানুজ ফিরিয়া আসিলেন। মহাপূর্ণের সঙ্গে তখনি শ্রীরঙ্গমের

পথে তিনি পা বাড়াইলেন। ঘরে ফিরিয়া জননী ও স্ত্রীকে সংবাদ দিবারও তর সহিল না।

চারদিন পদব্রজে চলিবার পর কাবেরীর অপর তীরে রঙ্গনাথজীর মন্দির দেখা দিল। অদূরে এক বিরাট জনতা দেখিয়া উভয়ে চমকিয়া উঠিলেন। নিকটে অগ্রসর হইয়া যে দৃশ্য দেখিলেন তাহা মর্ম্মান্তিক। বৈষ্ণবগুরু যামুনাচার্য্য আজ সকলকে শোকসাগরে ভাসাইয়া দেহরক্ষা করিয়াছেন।

মহাপুরুষকে ঘিরিয়া দাঁড়াইয়া আছে অগণিত মানুষ। নিষ্প্রাণ দেহের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া রামানুজ হঠাৎ লক্ষ্য করিলেন, তাঁহার ডান হাতের তিনটি অঙ্গুলি রহিয়াছে মুষ্টিবদ্ধ। নিবিষ্ট মনে তিনি ভাবিতে লাগিলেন, তবে কি দেহত্যাগের সময় মহাপুরুষের মনে কোন বিশেষ সঙ্কল্প উদিত হইয়াছিল? এই বদ্ধমুষ্টি কি তাহারই কোন সঙ্কেত বহন করিতেছে?

সঙ্গে সঙ্গেই এক দিব্যভাবে রামানুজ আবিষ্ট হইয়া উঠিলেন। বিগতপ্রাণ যামুনাচার্য্যের শায়িত দেহকে উদ্দেশ করিয়া তিনি উচ্চকণ্ঠে সদ্যরচিত এক শ্লোকে নিজের সঙ্কল্পবাণী উচ্চারণ করিলেন। এ বাণীর মর্ম্ম এই—'বিষ্ণুমতে দৃঢ়নিষ্ঠ থেকে অজ্ঞানমোহিত জনগণকে আমি ক'রবো পঞ্চসংস্কারযুক্ত দ্রাবিড়বেদে শিক্ষিত, আর শ্রীনারায়ণে যারা শরণাগত তাদের সদাই ক'রবো রক্ষণ।'

সঙ্গে সঙ্গে একি অলৌকিক কাণ্ড! মৃত আচার্য্যের হস্তের বদ্ধমুষ্টি হইতে একটি অঙ্গুলি সোজা হইয়া খুলিয়া গেল। এই দৃশ্য দেখিয়া জনতা তো বিস্ময়ে হতবাক্।

ভাবতন্ময় রামানুজ আবার এক শ্লোক গাহিয়া উঠিলেন—'লোক-রক্ষার উদ্দেশ্যে আমি রচনা ক'রবো শ্রীভাষ্য, যা হবে সর্ব্বার্থসংগ্রহ, কল্যাণকর ও তত্ত্বজ্ঞানময়।'

দেখা গেল, মৃত যামুনাচার্য্যের আর একটি অঙ্গুলিও সোজা হইয়া গিয়াছে। ইহার পর উচ্চারিত হইল রামানুজের কণ্ঠে শ্লোকবদ্ধ তৃতীয়

সঙ্কল্প-বাক্য—'যে কৃপাময় পরাশর মুনি বদ্ধ জীবের উদ্ধার সাধনের জন্য ঈশ্বরতত্ত্ব ও সাধন-পদ্ধতি প্রচার ক'রেছেন, পুরাণরত্ন বিষ্ণুপুরাণ রচনা করেছেন, আমি কোন সুপণ্ডিত বৈষ্ণব সাধককে তাঁরই নামে ক'রব চিহ্নিত।'

পরম আশ্চর্য্যের বিষয়, এ শ্লোক উদ্‌গীত হইবার পর দেখা গেল—যামুনাচার্য্যের তৃতীয় অঙ্গুলিও সরল হইয়া গিয়াছে।

সঙ্কল্পবাণী তিনটি উচ্চারিত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই সেদিন নিষ্প্রাণ যামুনাচার্য্যের বদ্ধমুষ্টিটি খুলিয়া গেল। এই অলৌকিক দৃশ্য দেখিয়া সমাগত ভক্ত ও দর্শনার্থীদের বিস্ময়ের অবধি রহিল না। চারিদিকে কেবলই শোনা যাইতেছে কৌতূহলের গুঞ্জনধ্বনি—কে এই শক্তিধর তরুণ ব্রাহ্মণ? রঙ্গনাথজীর চিহ্নিত সেবক, দক্ষিণের সমগ্র বৈষ্ণব সমাজের নেতা যামুনাচার্য্য আজ চিরনিদ্রায় নিদ্রিত। কিন্তু তাঁহার সহিত এ তরুণের একি অলৌকিক যোগাযোগ।

অল্প সময়ের মধ্যে রামানুজ সে অঞ্চলে প্রসিদ্ধি অর্জ্জন করিলেন। যামুনাচার্য্যের ভক্ত ও শিষ্যদের সংখ্যা যথেষ্ট, তদুপরি শ্রীরঙ্গনাথের মন্দিরে তীর্থযাত্রীরা দলে দলে আসিয়াছে। সেদিন ইহাদের দ্বারা তাঁহার নামটি এই অলৌকিক ঘটনার মাধ্যমে ছড়াইয়া পড়ে।

রামানুজ কিন্তু শ্রীরঙ্গমে আর একটুও অপেক্ষা করেন নাই। এমন ব্যাকুলভাবে ছুটিয়া আসিয়াও জীবিতাবস্থায় তিনি যামুনাচার্য্যকে দর্শনে বঞ্চিত হইলেন, এজন্য তাঁহার মনস্তাপের অবধি নাই। ব্যথিত হৃদয়ে সোজাসুজি তাই স্বগৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

কাঞ্চীপুরে ফিরিয়া আসার পর, তাঁহার জীবনে এবার ঘটিল নব রূপান্তর। এখন হইতে হইলেন স্বল্পভাষী ও ভাবগম্ভীর—আর অন্তরে জাগিল পরমতত্ত্ব লাভের তীব্র আকাঙ্ক্ষা। অবিলম্বে দীক্ষা নিবার জন্য তিনি ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন।

কাঞ্চীপূর্ণের পুণ্যময় সান্নিধ্য ও ভক্তির প্রভাবে কিছুকাল যাবৎ তাঁহার সাধন-জীবন গড়িয়া উঠিতেছিল। শ্রীহরির এই প্রিয়সেবক ও

সিদ্ধ ভক্তের জন্য তাঁহার শ্রদ্ধাও রহিয়াছে অপরিসীম। এবারও এই ভক্তশ্রেষ্ঠের কাছে তিনি দীক্ষা নিতে চাহেন। কিন্তু কাঞ্চীপূর্ণকে সম্মত করানো বড় কঠিন। দাস্যভাবে ভাবিত মহাপুরুষ রামানুজকে এড়ানোর জন্য বলিলেন, "বৎস, আমার মত শূদ্রাধমকে আর পাপে লিপ্ত ক'রো না। তোমার মত পুণ্যবান ব্রাহ্মণ সন্তানের গুরু হওয়া দূরের কথা—কারুর গুরু হবার যোগ্যতা আমার নেই।"

রামানুজ একদিন তাঁহাকে বড় বেশী চাপিয়া ধরিলেন। কাঞ্চীপূর্ণ স্নেহভরে কহিলেন, "বৎস, তুমি এত ব্যস্ত হয়ো না। তুমি ব্রাহ্মণ, আর আমি শূদ্র—ব্যবহারিক দিকটাও তো মানতে হয়? জান তো, শাস্ত্রে আছে, ব্রাহ্মণকে মন্ত্রদানের অধিকার শূদ্রের নেই। শ্রীবিষ্ণুই তোমার চিহ্নিত গুরুকে ঠিক সময় পাঠিয়ে দেবেন, তুমি নিশ্চিন্ত হয়ে সাধন ভজন করো।"

রামানুজ কাঞ্চীপূর্ণকে আর একদিন ধরিয়া বসিলেন, গুরুকরণ ও সাধন ভজন সম্পর্কে শ্রীবরদরাজের নির্দ্দেশ তাঁহাকে আনিয়া দিতে হইবে। কাঞ্চীপূর্ণকে অগত্যা সম্মত হইতে হইল। কহিলেন, "বেশ ভাই, আমি প্রভুকে তোমার কথা নিবেদন ক'রবো।"

সেদিন গভীর রাত্রিতে কাঞ্চীপূর্ণ ধ্যানতন্ময় রহিয়াছেন, এমন সময় শ্রীবরদরাজ তাঁহার সম্মুখে আবির্ভূত হইলেন। প্রভুর শ্রীমুখে যে শ্লোক কয়টি সেদিন উচ্চারিত হয়, আচার্য্য অধ্যাত্মজীবন ও প্রচারিত দর্শনতত্ত্বের উপর তাহার প্রভাব অসামান্য। বরদরাজের বাণীর মর্ম্ম এইরূপ: তুমি শীঘ্র রামানুজাচার্য্যকে আমার এই বিশেষ তত্ত্ব কয়টি বল—আমিই জগৎ কারণ, প্রকৃতির কারণ পরব্রহ্ম; জীব ও ঈশ্বরে ভেদ স্বতঃসিদ্ধ; মুমুক্ষুদের মুক্তির একমাত্র কারণ আমার পাদপদ্মে আত্মসমর্পণ—অন্তিম সময়ে আমায় স্মরণ করতে সক্ষম না হলেও তাদের মোক্ষ অবশ্যম্ভাবি; দেহত্যাগ হলেই আমার ভক্তগণ পরম পদ প্রাপ্ত হয়। হে রামানুজ, এবার হতে তুমি মহাত্মা মহাপূর্ণের আশ্রয় গ্রহণ কর।

প্রত্যাদেশগুলি শুনিয়া ভক্ত রামানুজের আনন্দ আর ধরে না। যে কয়েকটি প্রশ্ন এযাবৎ তাঁহার চিত্তকে বেশী করিয়া আলোড়িত করিতেছে, প্রভুর বাণীতে সেগুলির উত্তর আজ মিলিয়া গেল। দীক্ষা গ্রহণের জন্য এযাবৎ তিনি ব্যাকুল ছিলেন। দীক্ষাগুরুর নামটিও আজ প্রভুর কৃপায় জানিতে পারিলেন। আনন্দে অধীর হইয়া সেদিন বার বার নিষেধ সত্ত্বেও কাঞ্চীপূর্ণের চরণে দণ্ডবৎ করিয়া বসিলেন। তারপর উন্মাদের মত ছুটিয়া বাহির হইলেন যামুনাচার্য্য-শিষ্য মহাত্মা মহাপূর্ণের উদ্দেশ্যে, শ্রীরঙ্গমের পথে।

যামুনাচার্য্যের তিরোধানের পর শ্রীরঙ্গম মঠের অধ্যক্ষ হইয়াছেন শ্রীতিরুবরাঙ্গ। পরম দাস্যভাবে এই সাধক সদা ভাবিত। শাস্ত্র ব্যাখ্যা অপেক্ষা ভগবানের আরাধনায়ই বেশীরভাগ সময় তাঁহার অতিবাহিত হয়। ফলে মঠের নেতৃত্বের ভার বহন করা তাঁহার পক্ষে ক্রমেই দুরূহ হইয়া উঠে। যামুনাচার্য্য জীবিত থাকা কালে শাস্ত্র ব্যাখ্যার দিক দিয়া এই মঠের যে গৌরব ও প্রসিদ্ধি ছিল, ক্রমে তাহাও যেন লোপ পাইতে বসিয়াছে।

তিরুবরাঙ্গ একদিন মঠের ভক্ত সাধকদের আহ্বান করিয়া নিজের মনোভাব সরলভাবে ব্যক্ত করিলেন। কহিলেন, "তোমাদের বোধ-হয় মনে আছে, প্রভু যামুনাচার্য্য তাঁর দেহরক্ষার আগে কাঞ্চীনগরের তরুণ সাধক, শাস্ত্রবিদ্ রামানুজকে আন্‌বার জন্য লোক পাঠিয়ে-ছিলেন। এই তরুণ আচার্য্য অসামান্য প্রতিভার অধিকারী এবং শুদ্ধসত্ত্ব বৈষ্ণব। সাধন-ঐশ্বর্য্যও রয়েছে প্রচুর। দাক্ষিণাত্যের বৈষ্ণব সমাজের নেতৃত্ব গ্রহণের যোগ্যতা এঁর রয়েছে।

"মহাত্মা কাঞ্চীপূর্ণের আশীর্ব্বাদ ও শিক্ষায় এই বৈষ্ণব আচার্য্যের আধ্যাত্ম-জীবন গঠিত। প্রভু যামুনাচার্য্যও এঁকে নেতারূপে একরকম চিহ্নিত করে দিয়েই গেছেন। তাছাড়া, মহামুনির শেষকৃত্যের সময় যে অলৌকিক কাণ্ড এই নবীন আচার্য্যকে কেন্দ্র করে সঙ্ঘটিত হয়, তাও

তোমাদের অজানা নেই। যামুনা মুনির নিজস্ব মতবাদ প্রচারের সঙ্কল্পই রামানুজ সেদিন ঘোষণা করেন, আর বিগতপ্রাণ মহামুনি বদ্ধমুষ্টি খুলে দিয়ে তাঁর সমর্থনও জানিয়ে দেন। আমার মতে, রামানুজই বিশিষ্টাদ্বৈত মত প্রচারের উপযুক্ত শক্তি ধারণ করেন। তাঁকেই ডেকে এনে এই মঠের অধ্যক্ষ করা হোক।"

সকলেই এ প্রস্তাব একবাক্যে অনুমোদন করিলেন। স্থির হইল, মহাত্মা মহাপূর্ণ স্বয়ং অবিলম্বে কাঞ্চীতে গিয়া রামানুজকে দীক্ষাদান করিবেন।

শ্রীতিরুবরাঙ্গ মহাপূর্ণকে আরও বলিয়া দিলেন, "মনে হচ্ছে যে, দীক্ষাদানের সঙ্গে সঙ্গেই রামানুজ শ্রীরঙ্গমে আসতে সক্ষম হবেন না। প্রয়োজন হ'লে তুমি সেখানে বৎসরখানেক থাকবে এবং ইতিমধ্যে তাঁকে সযত্নে দ্রাবিড় আম্নায় শিক্ষা দেবে। হয়তো তোমাকে সেখানে কিছুদিন স্থায়ীভাবেই বসবাস করতে হতে পারে। তাই বরং তোমার স্ত্রীকেও সঙ্গে নিয়ে যাও।"

মঠাধীশের নির্দ্দেশ অনুসারে মহাপূর্ণ সস্ত্রীক কাঞ্চী অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

এদিকে রামানুজ দ্রুতপদে শ্রীরঙ্গম অভিমুখে ধাবিত হইয়াছেন। পথেই পড়ে মাহুরান্তকের প্রসিদ্ধ বিষ্ণুমন্দির। ঠিক করিলেন, নিকটস্থ সরোবরে স্নান সমাপন করিয়া বিগ্রহ দর্শনে যাইবেন। কিন্তু উহার তীরে পৌঁছিয়া তাঁহার বিস্ময়ের অবধি রহিল না। একি অদ্ভুত কাণ্ড! যে মহাপূর্ণের আশ্রয় গ্রহণের নির্দ্দেশ বরদরাজ তাঁহাকে দিয়াছেন, স্বয়ং তিনিই যে সস্ত্রীক সেখানে উপস্থিত। উভয়ের মিলনে আনন্দের বান ডাকিয়া উঠিল।

স্নান সমাপনের পর মহাপূর্ণের নিকট তিনি বৈষ্ণব মন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ করেন। যজ্ঞ, অঙ্কন, উর্দ্ধপুণ্ড্র, মন্ত্র ও দাস্যনাম দ্বারা তাঁহাকে সংস্কৃত করা হয়। অতঃপর নবলব্ধ গুরু ও গুরুপত্নীকে তিনি সাদরে কাঞ্চীতে নিজের গৃহে নিয়া আসেন।

রামানুজের একান্ত অনুরোধে মহাপূর্ণ তাঁহার স্ত্রী জমাম্বাকেও দীক্ষা প্রদান করেন। নিজ গৃহের একাংশে গুরুও গুরুপত্নীকে রাখিয়া নবদীক্ষিত শিষ্য সযত্নে তাঁহাদের সেবায় ব্রতী হন। মহাপূর্ণের কাছে ভক্তিশাস্ত্র অধ্যয়নের ফলে বৈষ্ণবশাস্ত্রে রামানুজের অধিকার এবার পূর্ণতর হইতে থাকে।

দ্রাবিড় আম্নায় বা তামিল-বেদে চারি হাজার ভক্তিরসাত্মক শ্লোক রহিয়াছে—তিরুবাইমুড়ি নামে এগুলি খ্যাত। ছয়মাসের মধ্যে তিনি এসব আয়ত্ত করিয়া ফেলিলেন।

শ্লোক পাঠ সেদিন সমাপ্ত হইয়াছে। রামানুজ তাঁহার গুরুদক্ষিণা দিবার জন্য মহা উৎসুক হইয়া উঠিলেন। প্রভাতে ফল-ফুল পূজার নানা উপচার ও নববস্ত্রাদি সংগ্রহের জন্য তিনি বাজারে চলিয়া গেলেন। ইতিমধ্যে তাঁহার অনুপস্থিতিতে এক চাঞ্চল্যকর ঘটনা তাঁহার গৃহে ঘটিয়া গেল।

ভক্তি সাধনা ও ভক্তিশাস্ত্র অধ্যয়নে রামানুজ সম্প্রতি একেবারে ডুবিয়া গিয়াছেন। তদুপরি গুরু ও গুরুপত্নীর সেবার অধিকার পাইয়া তাঁহার আনন্দের অবধি নাই। ঘর সংসারের আনন্দ ও আকর্ষণ আজকাল ক্রমেই কমিয়া যাইতেছে। পত্নী জমাম্বা কিন্তু তাঁহার এই পরিবর্ত্তনকে মোটেই সুচক্ষে দেখেন নাই। ধীরে ধীরে স্বামী যেন তাঁহার নিকট হইতে কেবলি দূরে চলিয়া যাইতেছেন। ধর্ম্মচর্চ্চা ও গুরুসেবা নিয়াই দিন-রাত উন্মত্ত। পত্নীর খোঁজ-খবর কতটুকু রাখেন? জমাম্বার রুদ্ধ আক্রোশ ক্রমে পুঞ্জীভূত হইয়া উঠিতে থাকে। সুযোগ পাইয়া অবশেষে একদিন ঘটে বিস্ফোরণ।

সেদিন ভোরে জমাম্বা কূয়ার ধারে জল আনিতে গিয়াছেন। গুরুপত্নীও কলসীকক্ষে সেখানে উপস্থিত। প্রায় একই সময়ে উভয়ে জল উঠাইতেছেন—হঠাৎ গুরুপত্নীর কলসীর জল তাঁহার কলসীর উপর গড়াইয়া পড়িল।

জমাম্বা ক্রোধে ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া গেলেন। চীৎকার করিয়া কহিতে লাগিলেন, "হ্যাঁগা, তুমি কি চোখের মাথা একেবারেই খেয়ে বসেছো? দিলে তো আমার কলসীর সমস্তটা জল নষ্ট করে। তোমার পিতৃকুল আমার পিতৃকুল থেকে কত ছোট তা কি তোমার জানা নেই? তোমার ছোঁয়া জল কি করে আমি ব্যবহার করবো? গুরুপত্নী বলে কি মাথায় চড়ে বসবে?"

গালাগালির পালা শেষ হইল। রামানুজের স্ত্রী এবার আঙিনায় পা ছড়াইয়া কাঁদিতে বসিলেন। বিনাইয়া বিনাইয়া কহিতে লাগিলেন, "সবই আমার কর্ম্মফল, নইলে এমন কাণ্ডজ্ঞানহীন স্বামীর হাতে পড়ে আমায় এত কষ্ট পেতে হবে কেন?"

মহাপূর্ণের পত্নী স্বভাবতঃ শান্ত ও ধর্ম্মনিষ্ঠ, কিন্তু এবারকার আঘাত তাঁহার বড় বাজিল। ঘরে ফিরিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে স্বামীকে সমস্ত ঘটনা জানাইলেন।

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া ভক্ত মহাপূর্ণ কহিলেন, "ওগো, তুমি এজন্য দুঃখ ক'রো না। এতে যে শ্রীনারায়ণেরই ইঙ্গিত আমি দেখতে পাচ্ছি। বোধহয় তাঁর ইচ্ছে নয় যে, এখানে আমরা দু'জন আর অবস্থান করি। প্রভু যা করেন তা মঙ্গলেরই জন্য। অনেকদিন তো রঙ্গনাথজীর পাদপদ্ম পূজা করিনি, চল আমরা আজই শ্রীরঙ্গমের দিকে রওনা হই।"

উভয়ে তখনি পথে বাহির হইয়া পড়িলেন। রামানুজ সে সময়ে কার্য্যান্তরে কোথায় গিয়াছেন। পাছে ফিরিয়া আসিয়া তিনি বাধা দেন, এ ভয়ে মহাপূর্ণ আর এক মুহূর্ত্তও দেরী করেন নাই।

কিছুকাল পরেই রামানুজ ফিরিয়া আসিয়াছেন। কিন্তু একি? তাঁহার পূজ্যপাদ গুরু ও গুরুপত্নী কোথায়? তবে কি তাঁহারা কাঞ্চী ছাড়িয়া কোথাও চলিয়া গেলেন?

প্রকৃত সত্য গোপন করিয়া জমাম্বা কহিতে লাগিলেন, "শুন্‌ছো, আজ ভোরে তো জল আনতে গিয়ে গুরুপত্নীর সাথে আমার ঝগড়া

হয়ে গেল। তবে আমি কিন্তু তাঁকে কটু কথা কিছু বলিনি। অথচ এই সামান্য ঘটনার কথা শুনেই তোমার গুরুর এমন ক্রোধ হল যে, সস্ত্রীক ঘর ছেড়ে চলে গেলেন! শুনেছি, সাধু মহাত্মারা অক্রোধী হন। কিন্তু এ কি ধরণের সাধুপুরুষ, তা তো বুঝিনে! তোমার এমন সাধুর পায়ে দূর থেকে আমি গড় করি।"

প্রকৃত ঘটনা বুঝিয়া নিতে রামানুজের দেরী হয় নাই। ধর্ম্ম-জীবনের প্রতি স্বামীর তীব্র আকর্ষণ কোনদিনই জমাম্বার মনঃপূত ছিল না। এই কারণেই এ-গৃহে গুরুপত্নীর থাকাটা তিনি সুচক্ষে দেখিতেন না। তাই সামান্য অজুহাতের ছলে আজ ঝগড়া করিয়া তিনি তাঁহাদের তাড়াইয়াছেন। ক্রুদ্ধ, ক্ষুব্ধ রামানুজ স্ত্রীকে তিরস্কার করিতে করিতে ঘরের বাহির হইলেন। অতঃপর বরদরাজ মন্দিরে গিয়া হৃদয়ের সন্তাপ জুড়াইতে বসিলেন।

ভিন্ন রুচি, ভিন্ন মনোবৃত্তিসম্পন্না তাঁহার স্ত্রী। ইহাকে নিয়া রামানুজকে এমন দুর্ভোগ ও মনস্তাপ প্রায়ই ভুগিতে হয়। এক এক দিন দুরবস্থা তাহার চরমে পৌঁছে।

সেবার রামানুজের গৃহে এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ আসিয়া উপস্থিত। জমাম্বার নিকট কাতর স্বরে বার বার কিছু আহার্য্য চাহিতে থাকেন, কিন্তু প্রত্যুত্তরে মিলে শুধু কঠোর ভর্ৎসনা। হতাশ হইয়া ব্রাহ্মণটি ফিরিয়া চলিয়াছেন, পথেই রামানুজের সঙ্গে হয় সাক্ষাৎ।

ব্রাহ্মণকে দেখিয়া রামানুজের বড় দয়া হইল, তিনি তাঁহাকে তাঁহার গৃহেই ভোজন করিয়া যাইতে অনুরোধ করিলেন। কিন্তু প্রত্যুত্তরে শুনিলেন, এইমাত্র তাঁহার গৃহ হইতেই তাড়া খাইয়া আসিয়াছেন তিনি, জমাম্বার কটুবাক্য শুনিবার পর আর সেখানে ফিরিতে রাজি নন।

রামানুজের ক্রোধ ও ক্ষোভের সীমা রহিল না। তাঁহার গৃহ হইতে অভুক্ত ব্রাহ্মণ বিতাড়িত! এ যে মহাপাপ! প্রশ্রয় পাইয়া জমাম্বা অনেকবারই এমন হীন কাজ করিয়াছে, মুখ বুজিয়া তিনি দিনের পর

দিন তাহা সহ্য করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু আর ইহা এরূপভাবে চলিতে দেওয়া যায় না। সঙ্গে সঙ্গেই মন স্থির করিয়া ফেলিলেন, বিরুদ্ধ-ধর্ম্মী স্ত্রীর সাহচর্য্যে আর থাকা নয়। চিরতরে সংসার ত্যাগের জন্য এবার তিনি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

একাজ করিতে হইলে পত্নীকে এখুনি দূরে পাঠান প্রয়োজন। রামানুজকে তাই এক কৌশল অবলম্বন করিতে হইল।

ব্রাহ্মণটিকে নিয়া তখনি তিনি এক দোকানে ঢুকিলেন। সেখানে বস্ত্র, তাম্বুল, ফলমূল প্রভৃতি কিনিয়া নিয়া সেই সঙ্গে তাঁহার হাতে এক পত্র দিয়া দিলেন। সে পত্র রামানুজেরই উদ্দেশে, আর লিখিতেছেন যেন তাঁহারই শ্বশুর মহাশয়।

নূতন রকমের সাজগোজ করিয়া ব্রাহ্মণ আবার রামানুজ-পত্নীর নিকট গিয়া উপস্থিত। লিপিটি দিয়া কহিলেন, "ওগো, আমি তোমার পিত্রালয় থেকে আসছি। তোমার ছোট বোনের বিয়ে ঠিক হয়েছে। তাই তোমার বাবা তোমাদের নিয়ে যাবার জন্য আমায় পাঠিয়েছেন, এই দেখ। রামানুজের নামে তাঁর পত্র।"

জমাম্বা আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিলেন। এবার ব্রাহ্মণের স্নান ভোজনের ব্যবস্থা করিতে আর বিলম্ব হইল না।

কিছুক্ষণ পরেই রামানুজ গৃহে ফিরিলেন। শ্বশুরের পত্র পড়িয়া তাঁহার যেন আনন্দ ও উৎসাহের অন্ত নাই। পত্নীকে বলিতে লাগিলেন, "ওগো, শুভকার্য্যে দেরী করা উচিত নয়, তুমি এখনি এই ব্রাহ্মণের সঙ্গে যাত্রা কর। আমার হাতে দু'একটি জরুরী কাজ রয়েছে, এগুলি শেষ করেই আমি পরে আসছি।"

জমাম্বা মনের আনন্দে জিনিসপত্র গুছাইয়া রওনা হইলেন।

এবার রামানুজ নিষ্কণ্টক। তৎক্ষণাৎ তিনি বরদরাজ মন্দিরে চলিয়া গেলেন। সদ্‌গুরু শ্রীবরদরাজ বিগ্রহের সম্মুখে সেদিন তাঁহার সন্ন্যাস-দীক্ষা সমাপ্ত হইল। কাঞ্চীপূর্ণ সারাক্ষণ সেখানে ভাবাবিষ্ট হইয়া বসিয়া ছিলেন। অনুষ্ঠানের শেষে রামানুজকে সম্বর্দ্ধনা

জানাইয়া কহিলেন, "বৎস, আজ থেকে তুমি হলে যতিরাজ।"

দিব্যকান্তি, তেজঃপুঞ্জদেহ এই নবীন সন্ন্যাসীকে দেখিতে সেদিন বরদরাজ-মন্দির চত্বরে ভীড় জমিয়া যায়।

রামানুজের প্রতিভা, বিদ্যাবত্তা ও পবিত্রতার কথা, তাঁহার প্রতি যামুনাচার্য্য ও কাঞ্চীপূর্ণের গভীর স্নেহের কথা বৈষ্ণবদের অবিদিত ছিল না। এবার তিনি সুন্দরী তরুণী ভার্য্যা ও সংসার ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছেন। দেশের চারিদিকেই তাই তাঁহার জনপ্রিয়তার সীমা নাই। অবিলম্বে তিনি কাঞ্চীর বরদরাজ-মঠের নেতা নির্ব্বাচিত হইলেন।

রামানুজের এক ভাগিনেয়—দাশরথি (আণ্ডান) তাঁহার নিকট সর্ব্বাগ্রে দীক্ষা গ্রহণ করেন। হরিভক্তির সহিত বেদান্তের প্রগাঢ় জ্ঞান এই নবীন শিষ্যের মধ্যে সম্মিলিত হইয়াছিল। রামানুজের দ্বিতীয় শিষ্য হইলেন কুরেশ (আলওয়ান)। ইনি অতুলনীয় স্মৃতিশক্তি ও শাস্ত্র-জ্ঞানের জন্য পূর্ব্ব হইতেই প্রসিদ্ধি ছিল। সংসারাশ্রমে ইনি এক বড় ভূম্যধিকারী ও দানবীররূপেও পরিচিত ছিলেন।

মঠ-প্রাঙ্গণে বসিয়া এই দুই প্রতিভাধর শিষ্যসহ, উর্দ্ধপুণ্ড্র অঙ্কন-শোভিত তেজোদৃপ্ত রামানুজ শাস্ত্রালোচনায় রত হইতেন। ভক্ত ও মুমুক্ষু নর-নারী দলে দলে তাঁহাদের ঘিরিয়া দাঁড়াইত। এইভাবে রামানুজের আচার্য্যজীবন শুরু হইয়া যায়।

রামানুজের প্রাক্তন শিক্ষক যাদবপ্রকাশের মাতা সেদিন বরদরাজ মন্দিরে আসিয়াছেন। দেবোপম এই নবীন সন্ন্যাসীকে দেখিয়াই তিনি মুগ্ধ হইয়া গেলেন। রামানুজের মধুর বাক্য ও শাস্ত্রালোচনা শুনিয়া তাঁহার হৃদয়ে উঠিল এক বিচিত্র ভাবের আলোড়ন। ঘরে ফিরিয়া পুত্র যাদবপ্রকাশের কাছে রামানুজের কথাই বৃদ্ধা বার বার কহিতে লাগিলেন।

জননী জানিতেন, যাদবপ্রকাশ রামানুজের সহিত নানা অসৎ-

ব্যবহার করিয়াছেন। পূর্ব্বকৃত আচরণের কথা স্মরণ করিয়া যাদবপ্রকাশের অন্তরেও স্বস্তি নাই। বৃদ্ধা জননী পুত্রকে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ জানাইয়া কহিলেন, "ওরে, তুই তোর সব অহমিকা ভুলে এখনি এই দেবতুল্য সন্ন্যাসীর শিষ্যত্ব গ্রহণ কর্।"

সেকি! নিজ ছাত্রের শিষ্যত্ব গ্রহণ? যাদবপ্রকাশ ক্ষুব্ধ কণ্ঠে প্রতিবাদ করিয়া উঠিলেন, একাজ কখনো তিনি পারিবেন না। কিন্তু পুরাতন পাপকাহিনী—নিজের অত্যুগ্র অভিমান, নিরপরাধ শিষ্যের প্রাণনাশের চেষ্টার কথা, সব কিছু একের পর এক তাঁহার মনে পড়ে, আর হৃদয়ে অনুশোচনার তীব্র দহন আরম্ভ হয়। মায়ের কাছে পণ্ডিত অবশেষে একদিন বলিলেন, সন্ন্যাসী রামানুজকে একবার তিনি অবশ্যই দেখিতে যাইবেন।

রাত্রিতে আচার্য্য যাদবপ্রকাশ সেদিন এক অদ্ভুত স্বপ্ন দেখিলেন। এক দিব্যপুরুষ নয়ন সমক্ষে আবির্ভূত হইয়া বলিতেছেন, "যাদব, অবিলম্বে তুমি নবীন সন্ন্যাসী রামানুজের নিকট সন্ন্যাস-দীক্ষা নাও। যে মহাপাপ তুমি করেছ, এ ছাড়া তার কোন প্রায়শ্চিত্ত নেই!"

প্রভাতে উঠিয়া আচার্য্য বার বার এই কথাই ভাবিতেছেন, এমন সময়ে হঠাৎ কাঞ্চীপূর্ণের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ। আচার্য্য কহিলেন, "আমার অন্তরে সদাই অশান্তির আগুন জ্বলছে। শুনতে পাই, আপনি বরদরাজের শ্রীমুখস্বরূপ—সর্ব্বজ্ঞ মহাপুরুষ। দয়া করে বলে দিন, এ অশান্তি কি করে দূর হবে?"

কাঞ্চীপুর্ণ তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ বিনয়ের সহিত কহিলেন, "মহাত্মন্, আমি নিতান্ত সামান্য ব্যক্তি। তবে আপনি যখন আদেশ করেছেন, প্রভুর কাছে জিজ্ঞাসা করে কাল আপনাকে বলব।"

পরদিনই তিনি জানাইলেন, বরদরাজ নির্দ্দেশ দিয়াছেন—সন্ন্যাসী রামানুজের কাছেই যাদবপ্রকাশ শিষ্যত্ব গ্রহণ করুক, এতেই নিহিত রয়েছে তাঁর কল্যাণ।

যাদবপ্রকাশ সেদিন ধীর পদবিক্ষেপে রামানুজের মঠে আসিয়া উপস্থিত। স্বপ্নের নির্দ্দেশ বা কাঞ্চীপূর্ণের প্রাপ্ত প্রত্যাদেশ, কোন কিছুই চূড়ান্তভাবে গ্রহণ করিবার পাত্র তিনি নহেন। রামানুজের নব রূপান্তর তিনি নিজে আজ পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন।

প্রাক্তন শিক্ষাগুরুকে দেখিয়া রামানুজ সসম্মানে তাঁহার অভ্যর্থনা করিলেন, আসন বিছাইয়া দিলেন।

যাদবপ্রকাশ কহিলেন, "বৎস, তুমি দেখছি সন্ন্যাস গ্রহণ করেও উর্দ্ধপুণ্ড্রসহ দুই বাহুতে পদ্ম ও চক্র চিহ্ন ধারণ করেছ। বুঝতে পারছি, সগুণ ব্রহ্মের আরাধনার প্রতি এখনো তুমি অনুরক্ত। এবার তোমার মতবাদের নির্য্যাসটুকু আমায় শোনাও দেখি।"

রামানুজ শান্ত, বিনয়পূর্ণ কণ্ঠে কহিতে লাগিলেন, "প্রভু, ব্রহ্মকে সবিশেষ বা সগুণ বলে অভিহিত করছি—কারণ, যাতে কোন বিশেষ নেই, যা অদ্বিতীয়, এক রস—বহুর উৎপত্তি তা থেকে কি করে হয়? নামরূপময় বৈচিত্র্য কি করে ঘটে? মূলতঃ দ্বৈতহীন যে সত্তা তা কি করে দ্বৈতের জনক হয়? দ্বৈতহীন সত্তা থেকে দ্বৈত উৎপন্ন হলে বলতে হবে যে, কারণ ব্যতীতই কার্য্য সঙ্ঘটিত হচ্ছে। এতে যুক্তির দিক দিয়ে দোষ ঘটে না কি? কাজেই বলতে হয় এই জগৎপ্রপঞ্চের মূলে রয়েছে অদৃশ্য ও অতি সূক্ষ্ম প্রপঞ্চময় এক ব্রহ্মরূপ বা কারণ বস্তু। সৃষ্টির মূল কারণরূপেও রয়েছে এই চিদ ও অচিদ বিশিষ্ট ব্রহ্ম বা সৃষ্টির মূল কারণ। নির্গুণ ও নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মকে কারণ বলা তাই অসঙ্গত। শ্রীবরদরাজ সেদিন কৃপা করে এই তত্ত্বই আমাকে তাঁর নিত্য সেবক কাঞ্চীপূর্ণের মুখ দিয়ে বলেছেন।"

যাদবপ্রকাশের প্রশ্নের উত্তরে রামানুজ তাঁহার বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে আরও কহিলেন, "প্রভু, আমি এ কথাই সার বুঝেছি, মুক্তিতে জীব একেবারে ব্রহ্মে মিশে যায় না, জীব হচ্ছে ভগবানের নিত্যদাস, তার পক্ষে শ্রীভগবানের নিত্যদাস্যই হচ্ছে প্রকৃত মুক্তি—এই দাস্যে কেবলি নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ। এতেই রয়েছে পরমা মুক্তি,

কারণ, জীব স্বরূপতঃই যে ভগবানের দাস। এই ভগবৎ-দাস্যরূপ নিজ স্বরূপ হতে বিচ্যুত হয়েই সে দুঃখ পায়।"

"বেশ কথা, এবার তোমার এ মতবাদের সমর্থনে শাস্ত্রীয় যুক্তির কথা বল।"

শিষ্য কুরেশের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া রামানুজ কহিলেন, "প্রভু, শাস্ত্র প্রমাণ সম্পর্কে কুরেশ আপনাকে সব কিছু নিবেদন করতে পারবে। সে যেমন মেধাবী তেমনি সর্ব্বশাস্ত্রবিদ্।"

অতঃপর গুরুর নির্দ্দেশে শিষ্য কুরেশের কণ্ঠ হইতে অনর্গলভাবে শাস্ত্রীয় প্রমাণসমূহ নির্গত হইতে থাকে।

পূর্ব্বকৃত পাপের অনুতাপে আচার্য্য যাদবপ্রকাশ এতদিন জ্বলিয়া মরিতেছিলেন। তারপর আসিয়াছে মাতার অনুরোধ। স্বপ্ন দর্শন ও বরদরাজের প্রত্যাদেশের কথাও তাঁহার স্মৃতিতে জাগরূক রহিয়াছে। তারপর এবার কুরেশের কণ্ঠে ভক্তিমার্গীয় শ্লোকরাশি শুনিয়া পণ্ডিতের অন্তর গলিয়া গেল। সম্মুখে তাঁহার তেজঃপুঞ্জদেহ রামানুজ ভাবাবিষ্ট হইয়া বসিয়া আছেন। এবার আর তিনি স্থির থাকিতে পারিলেন না। দীর্ঘ দিনের আত্মম্ভরিতার শিলাস্তূপ নবোদ্গত ভক্তির ভাবপ্রবাহে মুহূর্ত্তে কোথায় ভাসিয়া চলিয়া গেল।

পণ্ডিত কাঁদিতে কাঁদিতে রামানুজের সম্মুখে ভূতলে পতিত হইলেন। সানুনয়ে কহিতে লাগিলেন, "রামানুজ, তুমি সত্যই রাঘবের অনুজ। আমি বিদ্যাভিমানে মত্ত হয়ে তোমার মহিমা বুঝতে পারিনি। আমার সব অপরাধ মার্জ্জনা ক'রে আজ তোমার আশ্রয় দাও।"

আচার্য্যকে এই অবস্থায় দেখিয়া রামানুজ স্থির থাকিতে পারিলেন না, চকিতে উঠিয়া দাঁড়াইলেন। তারপর প্রেমভরে তাঁহাকে বারবার আলিঙ্গন দিতে লাগিলেন।

সেই দিনই রামানুজের নিকট যাদবপ্রকাশের সন্ন্যাসদীক্ষা সম্পন্ন হইল। নব নামকরণ হইল গোবিন্দ দাস। এবার হইতে এক পরম ভক্তিনিষ্ঠ বৈষ্ণবরূপে তিনি পরিচিত হইয়া উঠিলেন। পূর্ব্বের সে

গর্ব্বোদ্ধত মহাতার্কিক, অদ্বৈতবাদী আচার্য্য আর নাই। এখন তিনি এক ত্যাগ-তিতিক্ষাময় পরমভাগবত সাধকে পরিণত হইয়াছেন। ভক্তি প্রেমের আবেগে নয়নে তাঁহার সদাই প্রবাহিত হইতেছে অশ্রুধারা। পরম দৈন্যময়, শুদ্ধসত্ব এই বৈষ্ণবকে দেখিয়া লোকের বিস্ময়ের আর সীমা নাই।

কিছুদিন পর রামানুজ একদিন গোবিন্দদাসকে ডাকিয়া কহিলেন, "বড় আনন্দের কথা—আপনার চিত্ত এখন নির্ম্মল হয়ে গিয়েছে। আপনি এখন ভক্তি সাধনার পথে যথেষ্ট অগ্রসরও হয়েছেন। পূর্ব্বে বৈষ্ণবদের আপনি কম নিন্দা বিদ্রূপ করেননি, এবার নব রূপান্তরের পর আপনি বৈষ্ণবের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে একখানি প্রামাণ্য গ্রন্থ রচনা করুন, তাহলেই আপনার পূর্ণ শান্তি লাভ হবে।"

গোবিন্দদাস অচিরে এই কার্য্যে ব্রতী হইলেন। এই রচনা যখন সমাপ্ত হয়, তখন তাঁহার বয়স হইবে প্রায় আশী বৎসর। তাঁহার প্রণীত 'যতিধর্ম্মসমুচ্চয়' বৈষ্ণবশাস্ত্রের এক বিশিষ্ট ভক্তিগ্রন্থরূপে কীর্ত্তিত হইয়া রহিয়াছে।

বিখ্যাত অদ্বৈতবাদী যাদবপ্রকাশকে শিষ্যরূপে গ্রহণ করার পর হইতেই সমগ্র দাক্ষিণাত্যে রামানুজের নাম ধ্বনিত হইতে থাকে। এক অপ্রতিদ্বন্দ্বী বৈষ্ণব আচার্য্য ও সিদ্ধ মহাপুরুষরূপে তাঁহার জীবনে সূচনা হয় এক গৌরবময় অধ্যায়।

আচার্য্য রামানুজের এই খ্যাতিতে শ্রীরঙ্গম মঠের ভক্তদের আনন্দের সীমা রহিল না। মহাপূর্ণ রামানুজের গৃহ হইতে চলিয়া আসিবার পর হইতে সেখানকার ভক্তগণ বড় দুঃখিত হইয়া পড়েন। রামানুজ তাঁহাদের নেতৃত্ব গ্রহণে আর সম্মত হইবেন কিনা, তাহাও তাঁহারা বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছিলেন না। এবার তাঁহার সন্ন্যাস গ্রহণ ও বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী আচার্য্যরূপে তাঁহার অভ্যুদয় দেখিয়া মঠে আনন্দের সাড়া পড়িয়া গেল।

এই সময়ে মহাপূর্ণ শ্রীরঙ্গনাথের এক প্রত্যাদেশ প্রাপ্ত হন।

প্রভু তাঁহাকে বলেন, "ছাখো, তোমরা রামানুজকে কাঞ্চীপুর থেকে নিয়ে আসতে ব্যস্ত হয়েছো। কিন্তু শুধু রামানুজকে অনুরোধ করলেই তো সম্ভব হবে না। ভক্তি-সঙ্গীতে নিপুণ বররঙ্গকে এখনি তোমরা কাঞ্চীতে পাঠাও। স্তুতি গেয়ে প্রভু বরদরাজকে সে সন্তুষ্ট করুক, আর রামানুজকে এখানে নিয়ে আসবার প্রার্থনা জানাক্। অনুমতি ছাড়া রামানুজ প্রভুর পাদমূল ছেড়ে আসতে পারবে কেন?"

প্রত্যাদেশ অনুসারে ভক্তপ্রবর বররঙ্গ শ্রীবরদরাজ মন্দিরে গিয়া উপস্থিত প্রার্থিত অনুমতিও সঙ্গে সঙ্গে মিলিল। এবার রামানুজ সশিষ্য শ্রীরঙ্গম মঠে উপনীত হইলেন। ভক্ত ও সন্ন্যাসীগণ একবাক্যে তাঁহাকেই রঙ্গনাথজীর সেবার ভার দিলেন, মঠ-প্রধানের পদ ও মর্য্যাদা তিনি প্রাপ্ত হইলেন।

কথিত আছে, এ সময়ে শেষনাগশায়ীদেব শ্রীরঙ্গনাথ রামানুজের প্রতি প্রসন্ন হইয়া দুইটি বিশেষ বিভূতির অধিকার দান করেন। তাহার একটি—মানুষের সন্তাপ নিবারণের ক্ষমতা, অপরটি ভক্ত প্রতিপালনের উপযুক্ত ঐশী শক্তি।

শ্রীরঙ্গনাথের পুণ্যভূমিতে শক্তিমান মহাবৈষ্ণব রামানুজ এবার ভক্তি-প্রেমের দানসত্র খুলিয়া বসেন। দিক্‌বিদিক হইতে বিষ্ণুভক্ত নর-নারী দলে দলে এই বিরাট পুরুষের কৃপা লাভের আশায় ছুটিয়া আসিতে থাকে।

আচার্য্য রামানুজ এখন মঠাধীশ, যামুনাচার্য্যের আসন তিনি লাভ করিয়াছেন। রাজোচিত সম্মান ও বিরাট বৈষ্ণব সমাজের নেতৃত্বের অধিকারী তিনি। কিন্তু ইহা সত্ত্বেও জীবনের মহাব্রত হইতে ক্ষণ-তরে বিচ্যুত হন নাই। ভারতে বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ স্থাপনের ভার তাঁহার উপর। এই মহান্ কার্য্য সাধনের জন্য শাস্ত্রবারিধি তাঁহাকে মন্থন করিতে হইবে, অধ্যাত্মসাধনার সিদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে লোকগুরুর অধিকারও তাঁহাকে করিতে হইবে অর্জ্জন। নিরভিমান, মহাবৈষ্ণব

রামানুজ তাই এখনও গুরু মহাপূর্ণের এক শিক্ষার্থীরূপেই শাস্ত্রপাঠ চালাইয়া যাইতে থাকেন। তাছাড়া, মহাত্মা মহাপূর্ণের অসামান্য ভক্তিব্যাখ্যার আলোকে এসময়ে তিনি ন্যাসতত্ত্ব, গীতার্থসংগ্রহ, সিদ্ধিত্রয়, ব্যাসসূত্র পঞ্চরাত্রাগম প্রভৃতি অধ্যয়ন শেষ করেন।

তাঁর অলৌকিক প্রতিভা দর্শনে শিক্ষাদাতা ও গুরু মহাপূরণের বিস্ময়ের অবধি রহিল না। ইহার কিছুদিন পরেই নিজের পুত্রকে মহাপূর্ণ রামানুজের শিষ্যত্ব গ্রহণ করান।

মহাপূর্ণ সেদিন রামানুজকে ডাকিয়া কহিলেন, "বৎস ইতিমধ্যেই ভক্তিশাস্ত্রে তোমার যথেষ্ট অধিকার জন্মেছে। কিন্তু আরো তোমার অনেক কিছু তত্ত্ব জানবার আছে। অবশিষ্ট শিক্ষার জন্য তোমায় এবার পরম ভাগবত গোষ্ঠিপূর্ণের চরণতলে শরণ নিতে হবে। এই বৃদ্ধ ও সর্ব্বজনমান্য বিষ্ণু-উপাসক মহাত্মা যামুনাচার্য্যের এক অন্তরঙ্গ শিষ্য। ভক্তিশাস্ত্রে পারদর্শিতার দিক দিয়ে দাক্ষিণাত্যে তাঁর জুড়ি নেই। সাধনলব্ধ নিগূঢ় অর্থসহ বিষ্ণুমন্ত্র অধিগত করতে হলে তাঁর কৃপা ছাড়া চলবে না। নিকটেই তিরুকোষ্ঠির-এ তাঁর বাস। তাঁর পদপ্রান্তে তুমি শীগ্‌গীর আশ্রয় নাও।"

রামানুজ ভক্তিভরে গোষ্ঠিপূর্ণের নিকট উপস্থিত হইলেন। কিন্তু এই প্রবীণ বৈষ্ণব সাধক কোনমতেই তাঁহাকে গ্রহণ করতে চান না। রামানুজও ছাড়িবার পাত্র নন। বারবার তিরুকোষ্ঠির-এ গিয়া তিনি গোষ্ঠিপূর্ণের নিকট মনের আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করিতে থাকেন।

এই ব্যাকুল মিনতি বারবার ব্যর্থ হইতে থাকে। আঠার বার প্রত্যাখ্যাত হইবার পর রামানুজ শ্রীরঙ্গমে আসিয়া হতাশভাবে বসিয়া পড়েন, অবিরাম ধারে ঝরিতে থাকে নয়নাশ্রু।

গোষ্ঠিপূর্ণের এক প্রবীণ, প্রিয় শিষ্য এ সময়ে সেখানে উপস্থিত। এ দৃশ্য তাঁহাকে বড় বিচলিত করিয়া তুলিল। তিরুকোষ্ঠির-এ ফিরিয়া গিয়াই গুরুকে তিনি চাপিয়া ধরিলেন। কহিলেন, "প্রভু, আমাদের সকলের আশা ভরসার স্থল এই রামানুজ। আপনি কি তাঁর প্রতি

নির্দ্দয় হয়ে তাঁকে একেবারে মেরে ফেলতে চান ?" আচার্য্য এবার নরম হইলেন। প্রসন্ন কণ্ঠে উত্তর দিলেন, "বৎস, উত্তম কথা। রামানুজকে আমি তাঁর প্রার্থিত মন্ত্রার্থ দেব। কিন্তু সে যেন শুধু দণ্ড ও কমণ্ডলু নিয়ে একাকী এখানে উপস্থিত হয়। যখনই সে আমার কাছে আসে, সঙ্গে দুটো চেলা নিয়ে হাজির হয় কেন ?"

এই সংবাদ পাইবার সঙ্গে সঙ্গে রামানুজ সেখানে ছুটিয়া গেলেন। বরাবরের মত এবারও তাঁহার সঙ্গে রহিয়াছে দুই পরিকর, দাশরথি ও শ্রীবৎসাঙ্ক। রামানুজকে দেখিয়াই গোষ্ঠিপূর্ণ গম্ভীর হইয়া কহিলেন, "আমি তো তোমায় একলাই, শুধু দণ্ড কমণ্ডলু সঙ্গে নিয়ে আসতে বলেছি। এদের তবে সঙ্গে আনলে কেন ?"

রামানুজ সহজ কণ্ঠে উত্তর দিলেন, "প্রভু, দাশরথি ও শ্রীবৎসই যে আমার দণ্ড ও কমণ্ডলু!"

শিষ্যদ্বয়ের প্রতি আচার্য্য রামানুজের এ কি গভীর ভালবাসা— এ কি অদ্ভুত একাত্মতা! গোষ্ঠিপূর্ণের হৃদয় সেই মুহূর্ত্তে গলিয়া গেল। এবার তিনি তাঁহার প্রতি সদয় না হইয়া পারিলেন না। বিষ্ণুমন্ত্র তাঁহাকে প্রদান করিলেন।

বড় জাগ্রত এ মন্ত্র! প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে রামানুজের হৃদয়কন্দর দিব্য আলোকের ছটায় উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল! তিনি তখন এক নূতন মানুষে রূপান্তরিত। গোষ্ঠিপূর্ণ কহিলেন, "বৎস, এ মন্ত্রের মাহাত্ম্য খুব কম সাধকই জানে। তুমি এক শক্তিমান আধার, তাই জেনেই এ মন্ত্র আমি দিয়েছি। মন্ত্রচৈতন্যসহ যে কেহ এ বস্তু গ্রহণ করবে সে-ই যাবে বৈকুণ্ঠে। প্রকৃত অধিকারী ছাড়া কাউকে তুমি কিন্তু এই পরম বস্তু দেবে না।" অলৌকিক অনুভূতি ও দিব্য আনন্দে রামানুজের দেহ তখন ঘন ঘন কম্পিত হইতেছে। ভক্তিভরে মহাত্মা গোষ্ঠিপূর্ণের চরণে প্রণিপাত করিয়া তিনি বিদায় গ্রহণ করিলেন।

কথিত আছে, দিব্য আনন্দে বিহ্বল হইয়া রামানুজ ইহার পর

তিরুকোষ্ঠিরস্থিত বিষ্ণুমন্দিরে ছুটিয়া যান। পরম উৎসাহে লোক জড়ো করিয়া এই মন্ত্র তাহাদের দান করেন।

এই সংবাদ মহাত্মা গোষ্ঠিপূর্ণের নিকট পৌঁছিতে দেরী হয় নাই। তিনি মহা ক্রুদ্ধ হইয়া উঠেন। রামানুজ সহাস্যে তাঁহার কাছে উপনীত হইলে ভৎ‍‍র্সনা করিয়া বলেন, "নরাধম, এখনই তুমি এখান হ'তে দূর হও। তোমার মুখ দর্শন আমি করতে চাইনে। পবিত্র ও নিগূঢ় মহামন্ত্র তোমায় আজ আমি দিয়েছিলাম। কিন্তু এমনভাবে যে তার অসদ্ব্যবহার করে সে মহাপাতকী ছাড়া আর কি? অনন্ত নরকই হচ্ছে তোমার উপযুক্ত স্থান।"

এই তীব্র তিরস্কারের পরও কিন্তু রামানুজকে ভীত হইতে দেখা গেল না। প্রশান্ত কণ্ঠে উত্তর দিলেন, "প্রভু আপনার শ্রীমুখ থেকেই শুনেছি এ মহামন্ত্র যে পাবে, সে লাভ করবে পরমাগতি। আমি এক নগণ্য মানুষ। আমার অনন্ত নরক বাসের বদলে সহস্র সহস্র লোকের ভাগ্যে যদি মুক্তিলাভ ঘটে, তবে সেই অনন্ত নরকই আমার জন্য তোলা থাকুক। বৈকুণ্ঠবাস অপেক্ষা তাই যে আমার কাছে গণ্য হবে পরম কাম্যরূপে!"

গোষ্ঠীপূর্ণ চমকিয়া উঠিলেন। তাই তো! লোকমঙ্গলের জন্য যে মানুষ এমন আত্মবিলুপ্তি ঘটাইতে চায়, নিজের মুক্তি সম্পদকে অবহেলায় দূরে নিক্ষেপ করে, পৃথিবীতে তাঁহার তুলনা কোথায়? মুহূর্ত্ত-মধ্যে তিনি গলিয়া গেলেন।

প্রেমভরে রামানুজকে আলিঙ্গন করিয়া প্রবীণ বৈষ্ণব কহিলেন, "রামানুজ, তুমি ধন্য—ধন্য তোমার মানবপ্রেম। শিষ্য হয়েও আজ আমায় তুমি তত্ত্বজ্ঞান শেখালে। এমন মহান যার হৃদয় সে তো লোকপিতা—বিষ্ণুর অংশ সে, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই।"

রামানুজ গোষ্ঠিপূর্ণের চরণে পতিত হইয়া করজোড়ে কহিলেন, "প্রভু, আপনি আমার নিত্যগুরু। আপনার কৃপাশক্তি পেয়ে আমি ধন্য হয়েছি, আর সেই কৃপাই করেছে আজ অগণিত লোকের

কল্যাণ সাধন। তাই আপনার চরণে আমার কোটি কোটি প্রণাম।"

গোষ্ঠিপূর্ণ অতঃপর স্বীয় পুত্রকে রামানুজের শিষ্যত্ব গ্রহণ করান। রামানুজের মতবাদ ও সিদ্ধান্তসমূহের মধ্যে প্রকৃত বৈষ্ণবতত্ত্বের বীজ দেখিতে পাইয়া তিনি পরিতৃপ্ত হন। শুধু তাহাই নয়, প্রবীণ সাধক এ সময়ে নিজে শিষ্যদের নির্দ্দেশ দেন, এখন হইতে সমুদয় বিষ্ণু-উপাসনার সিদ্ধান্তকে 'রামানুজ সিদ্ধান্ত' বলিয়া যেন তাহারা অভিহিত করিতে থাকে।

এবার শিষ্যগণসহ রামানুজ শ্রীরঙ্গমে ফিরিয়া আসেন। এই সময় হইতে জনসাধারণ তাঁহাকে দেবাংশসম্ভূত বলিয়া মনে করিতে থাকে। বহু ভক্তের দৃষ্টিতে তিনি গণ্য হন শ্রীরামচন্দ্রের অনুজ লক্ষণের দ্বিতীয় অবতাররূপে।

অন্তরঙ্গ ভক্ত কুরেশ এক সময়ে রামানুজের নিকট হইতে গীতার চরমতত্ত্ব, কৃষ্ণের শরণাগতি-ধর্ম্মের গূঢ়ার্থ শ্রবণ করিয়া ধন্য হন।

অতঃপর ভক্ত দাশরথিও বড় ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন। কুরেশের মত গীতার নিহিতার্থ না জানিয়া তিনি ছাড়িবেন না। বারংবার তিনি মিনতি জানাইতে লাগিলেন। দাশরথির বেলায় কিন্তু রামানুজের ব্যবস্থা হইল অন্যরূপ। তিনি জানিতেন, দাশরথি তাঁহার পরম ভক্ত হইলেও কিছুটা বিদ্যা-অভিমানী। শিষ্যের সাধন-পথের এ বাধা সদ্‌গুরু রামানুজকে এবার চূর্ণ করিতেই হইবে। তাছাড়া, গীতার মূলতত্ত্ব অধিগত করাইতে হইলেও তাঁহার এই অহঙ্কার নিষ্কাশন না করিলে নয়।

তাঁহাকে জানাইয়া দিলেন, "বৎস, এজন্য তোমায় বেশ কিছুদিন শুদ্ধাচারীভাবে থেকে অপেক্ষা করতে হবে।"

ইতিমধ্যে একদিন বড় অদ্ভুত কাণ্ড ঘটিয়া গেল। রামানুজগুরু মহাপুর্ণের এক কন্যা ছিল, তাঁহার নাম অত্তুলা। দূর গ্রামাঞ্চলে তাঁহার বিবাহ হইয়াছে কিন্তু শ্বশুরবাড়ীতে তাঁহাকে নানা দুর্ভোগ

ভুগিতে হয়, বিশেষতঃ রান্নাবান্নার কাজ করিতে গেলে কষ্টের অন্ত থাকে না। নিকটে জলের ব্যবস্থা নাই, বহু দূর হইতে জল বহিয়া আনিয়া রান্না করিতে হয়। বৃদ্ধ শ্বশুরকে একদিন একথা জানাইলে তিনি ক্রোধে গালাগালি দিতে থাকেন।—এত টাকাকড়ি তাঁহার নাই যে, পুত্রবধূর জন্য পাচক রাখিবেন। এতই যদি অসহ্য হইয়া থাকে, অত্তুলা তাঁহার বাবাকে বলিয়া জল টানিবার জন্য এক ভৃত্য নিযুক্ত করিলেই পারে? পিতৃগৃহে ফিরিয়া আসিয়া অত্তুলা তাঁহার বাবাকে এসব কথা জানাইয়া কাঁদিতে লাগিল।

মহাপূর্ণ কহিলেন, "মা, এ ব্যাপারে আমার কিছু করবার সাধ্য নেই, তুমি বরং রামানুজকে সব জানাও। সে তোমার বড় ভাইয়ের মত, যা কিছু করা প্রয়োজন সে-ই করবে।"

শ্রীরঙ্গম মঠে আসিয়া অত্তুলা তাঁহার দুঃখের কাহিনী বলিলেন। সর্ব্বশাস্ত্রপারঙ্গম শিষ্য দাশরথিও ঠিক সে সময়ে সেখানে উপস্থিত। রামানুজ গুরুকন্যাকে সান্ত্বনা দিয়া কহিলেন, "বোন, তুমি এজন্য দুঃখ ক'রো না, আমি এখনি সব বিলি ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। আমার অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিষ্য, এই দাশরথিই আজ থেকে তোমার পাচক হবে। ছদ্মবেশে সে তোমার শ্বশুরবাড়ীতে গিয়ে বাস করবে।"

এ সিদ্ধান্ত শুনিয়া সকলে তো বিস্ময়ে হতবাক! পণ্ডিতাগ্রগণ্য দাশরথির জন্য গুরুদেবের আজ একি অদ্ভুত ব্যবস্থা। দাশরথি কিন্তু রামানুজের এ কঠোর নির্দ্দেশ তখনি সানন্দে মাথা পাতিয়া নিলেন। বুঝিলেন, গুরুদেব তাঁহার অভিমানের কণ্টকটি সমূলে উৎপাটন করিতে চাহেন। পাচকের কাজ নিয়াই এখন হইতে তিনি দিন যাপন করিতে লাগিলেন।

প্রায় ছয় মাস কাটিয়া গেল। সেদিন অত্তুলার শ্বশুরগৃহে এক বিখ্যাত বৈষ্ণব পণ্ডিত শাস্ত্র ব্যাখ্যা করিতে আসিয়াছেন। আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি একটি শ্লোকের ভুল ব্যাখ্যা করিয়া বসিলেন। পাচকরূপী পণ্ডিত দাশরথি এ সময়ে আর চুপ করিয়া থাকিতে পারিলেন না,

তীব্র প্রতিবাদ করিয়া উঠিলেন। বাদানুবাদের ফলে তিনি তখন মহা উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছেন। ঝোঁকের মাথায় ঐ শ্লোকের প্রকৃত তাৎপর্য্য সকলকে না বুঝাইয়া ছাড়িলেন না।

উপস্থিত সকলে ততক্ষণে এই পাচকের পাণ্ডিত্যে বিস্ময়ে হতবাক হইয়া গিয়াছেন। ছদ্মবেশী বক্তার প্রকৃত পরিচয় আর সেদিন গোপন রহিল না। জানাজানি হইয়া গেল, তিনিই দুর্দ্ধর্ষ পণ্ডিত দাশরথি—রামানুজাচার্য্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিষ্য।

দাশরথিকে সঙ্গে নিয়া এবার সবাই রামানুজের নিকট গিয়া উপস্থিত। তাঁহাদের মিনতি এড়ানো বড় কঠিন, তাই সেদিন হইতে দাশরথির অজ্ঞাতবাস ও পাচকবৃত্তি ঘুচিয়া গেল। এভাবে নিরভিমান শুদ্ধসত্ব হওয়ার পর গুরুদেবের নিকট হইতে দাশরথি পরমতত্ত্ব জ্ঞাত হইয়াছিলেন।

যামুনাচার্য্যের তিনজন অন্তরঙ্গ শিষ্য—কাঞ্চীপূর্ণ, মহাপূর্ণ ও গোষ্ঠিপূর্ণের কৃপা রামানুজ ইতিপূর্ব্বেই পাইয়াছেন। বাকি ছিলেন শুধু মালাধর ও বররঙ্গ। এবার এই দুই মহাপুরুষের চরণতলে বসিয়া তিনি বৈষ্ণবতত্ত্বের সকল শিক্ষা সমাপ্ত করিলেন। যামুনাচার্য্যের এই পঞ্চপ্রধান শিষ্যের প্রত্যেকে গুরুদেবের এক একটি পৃথক ভাবধারা গ্রহণ করিয়া সার্থক হইয়া উঠিয়াছিলেন। এবার এই পঞ্চধারা সামগ্রিকভাবে রামানুজের জীবনে সম্মিলিত হয়। সর্ব্বগুণান্বিত বৈষ্ণবনেতারূপে তিনি দাক্ষিণাত্যের ভক্ত ও জনসমাজে অভিনন্দিত হইতে থাকেন। এমন কি, অনেকে এ সময়ে শ্রীরঙ্গনাথের দ্বিতীয় বিগ্রহরূপেও তাঁহাকে শ্রদ্ধা ভক্তি জানাইতে শুরু করে।

রামানুজের আধিপত্য দেখিয়া শ্রীরঙ্গম মঠের প্রধান পূজারী কিন্তু বড় শঙ্কিত হইয়া উঠিলেন। যেভাবেই হোক এবার নিজের স্বার্থ ও প্রাধান্য রক্ষা করা প্রয়োজন। ঠিক করিলেন, অবিলম্বে তাঁহার প্রাণ বিনাশ করিতে হইবে।

পূজারীর গৃহে সেদিন আচার্য্য রামানুজের ভোজনের নিমন্ত্রণ

হইল। পত্নীকে পূজারী গোপনে বলিয়া রাখিলেন, অতিথি খাইতে বসামাত্র বিষ-মিশ্রিত অন্ন যেন তাঁহাকে দেওয়া হয়।

আদর অভ্যর্থনার পর রামানুজ মহা আনন্দে ভোজনে বসিয়াছেন।

পূজারীর পত্নী আহারের থালা নিয়া তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত। কিন্তু ঐ বিষাক্ত খাদ্য পাতে তুলিয়া দিতে গিয়াই মহিলার অন্তরে বড় অনুতাপ জাগিয়া উঠিল। কি দিব্য মূর্তি এই সর্ব্বজনশ্রদ্ধেয় মহাপুরুষের! কোন্ প্রাণে তিনি বিষ মিশ্রিত খাবার তাঁহাকে দিবেন? রামানুজের সম্মুখে দাঁড়াইয়া তিনি অনুশোচনায় কাঁদিয়া ফেলিলেন।

অস্ফুট স্বরে কহিলেন, "বাবা, যদি বাঁচতে চাও তবে অন্য কোথাও গিয়ে আহার কর। এখানকার অন্নে মেশানো রয়েছে প্রাণঘাতী বিষ! এ আমি তোমায় দিতে পারবো না।

বিস্মিত রামানুজ তখনি থালা ফেলিয়া উঠিয়া গেলেন। প্রাণনাশের ষড়যন্ত্র সেদিন বিফল হইল।

ব্যর্থকাম হইবার পর প্রধান পূজারীর ক্রোধ আরও বাড়িয়া যায়। স্বহস্তেই এবার তিনি রামানুজের প্রণনাশে বদ্ধপরিকর। রামানুজ সেদিন সধ্যাবেলায় শ্রীরঙ্গনাথ দর্শনে আসিয়াছেন। প্রধান পূজারী তাড়াতাড়ি ছুটিয়া আসিয়া তাঁহাকে পান করিতে দিলেন বিগ্রহের স্নানাভিষেক-জল। প্রাণঘাতী বিষ ছিল ইহাতে মিশ্রিত।

পরম শ্রদ্ধাভরে রামানুজ এ জল পান করিলেন, আর দেহে মনে জাগিয়া উঠিল অপূর্ব্ব ভাবাবেশ। বিষের আস্বাদ তো দূরের কথা, এ তখন তাঁহার কাছে অমৃতের মত উপাদেয় বস্তু!

এই পুণ্যবারি পান করিয়া তিনি আনন্দে অধীর। শ্রীরঙ্গনাথকে কহিতে লাগিলেন, "কৃপাময় প্রভু, দাসের প্রতি আজ তোমার একি অহৈতুকী করুণা! আজ আমি স্বর্গের অমৃত তোমার স্নান-জলের ভেতর দিয়ে পান করলাম! ধন্য তুমি, ধন্য তোমার কৃপা।"

স্তুতিবাদ করিতে করিতে রামানুজ রঙ্গনাথ-মন্দির হইতে বাহিরে আসিতেছেন, আর অপূর্ব্ব আনন্দাবেশে তাঁহার দেহ থর থর কারয়া

কাঁপিতেছে। পা দুটি টলটলায়মান। এই ভাবমত্ত অবস্থা দেখিয়া পূজারীর আনন্দ আর ধরে না। ভাবিলেন, বিষের ক্রিয়া এবার তবে শুরু হইয়াছে।

রাত্রি প্রায় শেষ হইয়া আসিল। প্রধান পূজারী আশায় আশায় দণ্ডের পর দণ্ড গুনিয়া চলিয়াছেন, কখন রামানুজের চিতাধূম আকাশে দেখিতে পাইবেন। যে তীব্র হলাহল স্বহস্তে তিনি পান করাইয়াছেন তাহাতে আজ তাঁহার মৃত্যু অবধারিত।

অল্পক্ষণ মধ্যেই অদূরে শোনা গেল হরিকীর্ত্তনের গগনভেদী ধ্বনি। মন্দিরের বাহিরে আসিয়া পূজারী যে দৃশ্য দেখিলেন, তাহাতে তাঁহার বিস্ময়ের সীমা রহিল না। শ্রীরঙ্গমের সহস্র সহস্র ভক্ত নর-নারী আজ রামানুজকে নিয়া কীর্ত্তনানন্দে মত্ত। ভক্তপ্রবর দিব্যভাবে বিভোর হইয়া তাহাদের সঙ্গে চলিয়াছেন। আয়ত নয়ন দুটি নিমীলিত, আননে অমানুষী জ্যোতির ছটা। সর্ব্বসত্তা যেন ঠাকুর রঙ্গনাথের পাদপদ্মে সমর্পিত হইয়া আছে।

অলৌকিক শক্তির বিরাট আধার, এই প্রেমিক পুরুষকেই তিনি বিষ প্রয়োগ করিয়াছেন। পূজারীর অন্তরাত্মা এবার তীব্র অনুশোচনায় কাঁদিয়া উঠিল। জনতার বেষ্টনী ভেদ করিয়া তিনি ছুটিয়া গেলেন, পতিত হইলেন রামানুজের পদতলে। কাতর স্বরে কহিতে লাগিলেন, "যতিরাজ, আমি মহা পাতকী, আমায় তুমি ক্ষমা কর। আমার মত দুরাত্মাদের উদ্ধারের জন্যই যে তোমার আবির্ভাব, এ সত্য আমি আজ বুঝতে পেরেছি। আমায় কৃপা কর, চরণে আশ্রয় দাও।"

অনুতপ্ত প্রধান অর্চ্চকের শিরে হাতখানি স্থাপন করিয়া রামানুজ আশীর্ব্বাদ করিলেন। কহিলেন, "ভাই, শ্রীরঙ্গনাথস্বামী যে পরম দয়াল। তিনি তোমার সমস্ত অপরাধ ক্ষমা করেছেন। এখন থেকে মানবপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে তুমি জীবের সেবায় ব্রতী হও।"

দুর্দ্ধর্ষ প্রধান পূজারী অতঃপর এক পরমভক্ত বৈষ্ণবে পরিণত হন। দাক্ষিণাত্যবাসী এক অদ্বৈতবাদী পণ্ডিত এই সময়ে সমগ্র উত্তর

ভারতে দিগ্বিজয় করিয়া বেড়াইতেছেন। ইহার নাম যজ্ঞমূৰ্ত্তি।

বৈষ্ণব সন্ন্যাসী রামানুজের অভ্যুদয় ও তাঁহার মায়াবাদ খণ্ডনের সংবাদ এ পণ্ডিতের কাণে গিয়াছে। তাই রামানুজকে পরাস্ত করিবার জন্য সেদিন তিনি শ্রীরঙ্গমে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সঙ্গে রহিয়াছে শকট-বোঝাই শাস্ত্র-গ্রন্থ এবং বহুতর শিষ্য।

সতের দিন ব্যাপিয়া রামানুজ ও যজ্ঞমূৰ্ত্তির মধ্যে তর্কযুদ্ধ ও বিচার চলে। শক্তিধর সন্ন্যাসীর বাগ্‌বিভূতি ও কূট তর্কে রামানুজ শেষের দিকে প্রায় কোণঠাসা হইয়া পড়েন। অবশেষে সেদিন মঠের শ্রীবিগ্রহের কাছে সকাতরে নিবেদন করিলেন, "প্রভু, তোমার শক্তিধর্ম্মের অনুপম মহিমা তুমি নিজ কৃপায় কবে জগতে প্রকাশ করবে, বল ? মায়াবাদী তার্কিকদের এ প্রচারই বা আর কতদিন চলতে থাকবে।"

রাত্রে ঠাকুর প্রত্যাদেশ জানাইলেন, "বৎস যতিরাজ! তুমি এত উদ্বিগ্ন হয়ো না। বিষ্ণুভক্তির মাহাত্ম্য প্রচার, ভক্তি-ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা যে তোমার ভিতর দিয়েই এদেশে ছড়িয়ে পড়বে।"

প্রত্যূষে শয্যা হইতে উঠিবার পর রামানুজের মধ্যে সেদিন দেখা গেল এক অলৌকিক শক্তির আবেশ। স্বর্গীয় জ্যোতির আভা তাঁহার মুখে চোখে ঝলমল করিতেছে, অপূৰ্ব্ব আত্মপ্রত্যয়ে হইয়া উঠিয়াছেন উদ্দীপিত মায়াবাদী সন্ন্যাসীর সম্মুখে আচার্য্য রামানুজ এক অসামান্য দৈবীশক্তিধর পুরুষরূপে আত্মপ্রকাশ করিলেন। তাঁহার অমানুষী দৃপ্তভঙ্গী ও জ্যোতির্ম্মণ্ডিত আনন দেখিয়া তর্কবীর যজ্ঞমূৰ্ত্তি অভিভূত হইয়া পড়িলেন। তাঁহার উপলব্ধি হইল, এ বৈষ্ণব-সন্ন্যাসী তো শুধু মহাশাস্ত্রবিদই নহেন, ইনি যে সত্যকার এক ঐশী শক্তিধর মহাপুরুষ। পবিত্রতা, প্রেম ও নিরভিমানতার মধ্য দিয়া ইনি এক পরমবস্তু প্রাপ্ত হইয়াছেন। আর শুষ্ক তর্কে বৃথা দিন কাটাইয়া যজ্ঞমূৰ্ত্তির এযাবৎ কি ফললাভ হইয়াছে ? ঈশ্বরপ্রাপ্তি তো দূরের কথা, চিত্তের নির্ম্মলতা ও শান্তিটুকুও জীবনে জুটে নাই।

এক অমোঘ অলৌকিক আকর্ষণে দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত রামানুজের

চরণে নিপতিত হইলেন। ইহার পর হইতে এই পণ্ডিত এক নিরভিমান বিষ্ণুপন্থী সাধকে পরিণত হন। দেবরাজ-মুনি নামে দক্ষিণের সর্ব্বত্র তিনি পরিচিত হইয়া ওঠেন।

রামানুজের নির্দ্দেশ অনুসারে এই বৈষ্ণব পণ্ডিত তামিল ভাষায় 'জ্ঞানসার' ও 'প্রমেয়সার' নামক দুইখানি শাস্ত্রগ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন।

শিষ্যদের মধ্যে বৈষ্ণবীয় দৈন্য ও ত্যাগ তিতিক্ষা আনয়ন করিতে রামানুজের সতর্কতার অন্ত ছিল না। একদিকে অপার স্নেহ ও প্রেম, অপরদিকে কঠোর পরীক্ষা, এই দুইয়ের মধ্য দিয়া তাঁহার আচার্য্য-জীবনের লীলা রূপায়িত হইয়া উঠিত।

সেবার আচার্য্য রামানুজ শিষ্যগণসহ তীর্থ ভ্রমণে বাহির হইয়াছেন। পথেই পড়ে অষ্ট সহস্র নামক এক গ্রাম। এই গ্রামে আচার্য্যের দুই বিশিষ্ট ব্রাহ্মণ শিষ্য বাস করেন। ইঁহাদের একজন অত্যন্ত ধনবান, নাম যজ্ঞেশ। অপর ব্যক্তি বরদাচার্য্য, এক কাঙাল ভক্ত—কোনমতে ভিক্ষা করিয়া তাঁহার সংসার চলে।

আচার্য্যের সঙ্গে রহিয়াছে বহু শিষ্য। ইঁহাদের আহার ও বাস-স্থানের ব্যবস্থা করা যজ্ঞেশের পক্ষে কঠিন কাজ কিছু নয়। তাই তাঁহার ওখানেই ভিক্ষা গ্রহণের সিদ্ধান্ত করা হইল। গ্রামের উপান্তে পৌঁছিয়াই রামানুজ আগমন-বার্ত্তা পাঠাইলেন।

দুইজন তরুণ শিষ্য দ্রুতপদে তখনি যজ্ঞেশের গৃহে গিয়া উপস্থিত। আচার্য্য রামানুজ কৃপা করিয়া তাঁহার গৃহে আসিতেছেন, যজ্ঞেশের তাই আনন্দের সীমা নাই। গুরুদেবের সম্বর্দ্ধনার ব্যবস্থা ও প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র সংগ্রহের জন্য তিনি ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। কিন্তু শ্রান্ত, ক্ষুৎ-পিপাসায় কাতর আগন্তুক শিষ্যদ্বয়ের পরিচর্য্যার কথা তিনি একেবারে ভুলিয়া গেলেন।

বলা বাহুল্য, যজ্ঞেশের এই ব্যবহারে তরুণ শিষ্য দুইটি কিছুটা

ব্যথিত হন। ফিরিয়া আসিয়া তাঁহারা সব রামানুজের চরণে নিবেদন করিলেন। যজ্ঞেশের একি অন্যায় আচরণ? গৃহে সমাগত অতিথি বৈষ্ণবের উপযুক্ত সম্বর্দ্ধনা সে করে নাই? রামানুজ রুষ্ট হইয়া কহিলেন, "শোন, যজ্ঞেশের ভবনে আমাদের যাওয়া হবে না। চল আমরা কাঙাল বৈষ্ণব বরদাচার্য্যের গৃহেই আজ ভিক্ষা গ্রহণ করি।"

সদলবলে রামানুজ এবার তাঁহার দরিদ্র শিষ্যের দ্বারেই উপনীত হইলেন।

জীর্ণ ঝুলিটী নিয়া বরদাচার্য্য নিত্যকার ভিক্ষায় বাহির হইয়াছেন। সামান্য যাহা কিছু মিলে, তাহাতেই রোজ নারায়ণ বিগ্রহের সেবা হয়, তারপর সাধ্বী পত্নী লক্ষ্মীদেবীসহ তিনি প্রসাদ গ্রহণ করেন।

শিষ্যগণসহ গুরুদেবকে দেখিয়া লক্ষ্মীদেবী আনন্দে অধীর হইয়া পড়িলেন। সাদর অভ্যর্থনা করিয়া তাঁহাকে বসানোর পরই কিন্তু শুরু হইল ঘোর দুশ্চিন্তা। ঘরে যে তাঁহার এক মুষ্টি চাল নাই, স্বামীও বাহিরে গিয়াছেন। কোথাও কিছু সংগ্রহ হইবে, এমন কিছু ভরসাও দেখা যাইতেছে না।

লক্ষীদেবী আচার্য্যকে কহিলেন, "প্রভু, আমার স্বামী বহুক্ষণ যাবৎ ভিক্ষায় বের হয়েছেন, এখনি ফিরবেন। আপনারা সকলে কিছুটা বিশ্রাম ক'রে সামনের ঐ পুষ্করিণীতে স্নানতর্পণ সেরে ফেলুন। এর ভেতর আমি ঠাকুরের ভোগ নৈবেদ্য তৈরী করে ফেলছি।"

ঠাকুর ঘরে আসিয়া ব্রাহ্মণ-পত্নী ভাবিতে বসিলেন। একি পরীক্ষায় নারায়ণ তাঁহাকে ফেলিলেন! আজিকার এই বিপদ হইতে তিনি কি উদ্ধার করিবেন না? কিন্তু এ অল্প সময়ের মধ্যে কোথা হইতে এত লোকের খাবার যোগাড় করা যায়? হঠাৎ মনে পড়ে প্রতিবেশী এক শ্রেষ্ঠীর কথা। এই ধনাঢ্য বণিক লক্ষ্মীদেবীর রূপে মোহিত, তাঁহার জন্য উন্মত্ত। কুপ্রস্তাব করিয়া সে দূতীও পাঠাইয়াছে, ঘৃণাভরে তিনি বারবার প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন। অতঃপর হতাশ হইয়া লোকটি আর অগ্রসর হয় নাই। স্থির করিলেন, তাহার কাছেই

এবার তিনি সাহায্য চাহিবেন। প্রয়োজন হইলে কামুক বণিকের লালসার আগুনে নিজেকে দগ্ধ করিতেও দ্বিধা করিবেন না।

মনে মনে কেবলি ভাবিতে লাগিলেন, শ্রীগুরু ঈশ্বর-স্বরূপ! তাঁহার সেবায় তিনি দেহাত্মবুদ্ধি কেন রাখিবেন? এই অনিত্য দেহ-পিণ্ডের শুভাশুভের কথাই বা চিন্তা করা কেন? দ্রাবিড় পুরাণে কলিঙ্গ নামে বিখ্যাত ভক্তের কথা তিনি পড়িয়াছেন। ইষ্ট সেবার জন্য চুরি করিতেও সে পশ্চাদপদ হয় নাই। ভগবান তাঁহার সেবানিষ্ঠার প্রীত হইয়া দর্শন দান করেন, তাঁহাকে কহেন, "মন্নিমিত্তিং কৃতং পাপমপি পুণ্যায় কল্পতে। মামনাদৃত্য তু কৃতং পুণ্যং পাপায় কল্পতে।"—হে ভক্ত আমার নিমিত্ত কৃত যে পাপ, তা তোমার পুণ্য। আর আমার অবহেলা ক'রে যে পুণ্য তুমি করবে অর্জ্জন, তা হচ্ছে পাপ।

সিদ্ধান্ত স্থির করিয়া ফেলিতে বেশী দেরী হইল না। বণিকের সহিত তখনই দেখা করিয়া জানাইলেন,—অতিথিদের সেবার উপযোগী দ্রব্যাদি তাঁহার এখনই প্রয়োজন। তারপর রজনীযোগে আসিয়া নিজেকে তাহার হস্তে সমর্পণ করিবেন।

বলা বাহুল্য বরদাচার্য্যের গৃহে তখনি ভারে ভারে অতিথি সেবার জিনিসপত্র পৌঁছিতে লাগিল। লক্ষ্মীদেবী পরম নিষ্ঠাভরে ভোগান্ন প্রস্তুত করিয়া ইষ্টদেব নারায়ণকে নিবেদন করিলেন। রামানুজ ও শিষ্যদের পরিতোষ সহকারে ভোজন করানো হইল।

গৃহস্বামী বরদাচার্য্য তো ফিরিয়া আসিয়া বিস্ময়ে হতবাক। এই কাঙালের গৃহে আগত সশিষ্য গুরুদেব শুধু ভালরূপে অভ্যর্থিতই হন নাই, উপাদেয় খাবারও সকলকে আজ প্রচুর পরিমাণে পরিবেশন করা হইয়াছে।

অন্তঃপুরে গিয়া বরদাচার্য্য নিভৃতে ব্রাহ্মণীকে প্রশ্ন করিলেন, "কিগো, ব্যাপারখানা কি? এত সব খাবার-দাবার কোথা থেকে তুমি জোটালে?"

লক্ষ্মীদেবী শান্ত ধীর কণ্ঠে স্বামীকে সমস্ত কথা খুলিয়া বলিলেন,

আজই রাত্রে পাপাশয় বণিকের অভিলাষ পূর্ণ করিতে তিনি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ, ইহাও স্বামীকে জানাইয়া দিলেন।

পত্নীর সব কথা শুনিয়া মহাভক্ত বরদাচার্য্যের আনন্দের সীমা নাই। সোল্লাসে বারবার কহিতে লাগিলেন, "তোমার মত সহধর্ম্মিণী পেয়ে আমি ধন্য। দেহাত্ম-বুদ্ধি ছেড়ে তুমি ভগবৎস্বরূপ সদ্-গুরুর সেবা করতে সক্ষম হয়েছ, আর চরম আত্মোৎসর্গ করতে রয়েছ প্রস্তুত। তোমার মত স্ত্রী ক'জনার ভাগ্যে হয়?"

রাত্রিতে ব্রাহ্মণপত্নী শ্রেষ্ঠীর আলয়ে উপস্থিত হইলেন। স্বামী বাহিরে দণ্ডায়মান। স্ত্রী শ্রীবিষ্ণুর প্রসাদান্নের থালাটি হাতে করিয়া ঘরের ভিতরে ঢুকিলেন! কামুক শ্রেষ্ঠীর হাতে ঐ প্রসাদ দেওয়া হইল। উহার আস্বাদ গ্রহণ করামাত্র, কোথা দিয়া কি ঘটিল কে জানে, তাহার সমস্ত পাপ প্রবৃত্তি অন্তর্হিত হইয়া গেল।

লক্ষ্মীদেবীর চরণে পড়িয়া কাঁদিতে কাঁদিতে সে কহিল, "মা, তুমি আমায় ক্ষমা কর। আমি কামার্ত্ত হয়ে এতদিন নরপশুতে পরিণত হয়েছিলাম। গুরুদেবের সেবার জন্য যে অতুল আত্মত্যাগ তুমি আজ দেখিয়েছ, তা আমার চোখ ফুটিয়ে দিয়েছে। তোমার মত সাধ্বী আমার চোখে মাতৃমূর্ত্তিতে অধিষ্ঠিতা। আমার প্রার্থনা, তোমার যে গুরুদেবের আগমন উপলক্ষে আমার মত মহাপাতকীর অনুশোচনা শুরু হ'ল, কৃপা ক'রে তুমি আমায় তারই পদপ্রান্তে পৌঁছে দাও। তিনি যেন আমায় উদ্ধার করেন।" প্রসাদান্নের এই অলৌকিক শক্তি দর্শনে বরদাচার্য্যের আনন্দ উথলিয়া উঠিল। প্রেমভরে তিনি বণিককে আলিঙ্গন করিতে লাগলেন।

অনুতাপদগ্ধ এই বণিক রামানুজের শরণ ও শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। গুরুদেবকে এই সময়ে তিনি প্রচুর ধনরাশিও উপঢৌকন দেন। দরিদ্র ভক্ত দম্পতিকে এসব দান করিয়া তাহাদের দারিদ্র্য-দুঃখ ঘুচাইবেন, ইহাই ছিল রামানুজের ইচ্ছা। কিন্তু বরদাচার্য্য করযোড়ে কহিলেন "প্রভু, আপনার আশীর্ব্বাদে আমাদের কোন অভাববোধই নেই।

ভিক্ষান্ন খেয়ে দিন তো কেটেই যাচ্ছে। অর্থ সম্পদ চিত্তের চাঞ্চল্যই শুধু বাড়িয়ে তোলে, এ দাসকে আপনি তা নেবার জন্য আর লোভ দেখাবেন না।” রামানুজ সেদিন ভরপুর মন লইয়া ব্রাহ্মণ দম্পতিকে আশীর্ব্বাদ করিলেন, বার বার সকলকে তাঁহাদের ভক্তি সম্পদের কাহিনী শুনাইতে লাগিলেন।

এদিকে ধনী শিষ্য যজ্ঞেশ রামানুজ স্বামীর এই কৃপালীলার কথা শুনিয়াছেন। ত্রস্তেব্যস্তে তিনি কাঙাল বরোদাচার্য্যের কুটিরে আসিয়া উপস্থিত। গুরুদেবকে কহিলেন, “প্রভু, এ অধমের গৃহে আতিথ্য গ্রহণ ক'রবেন ব'লে দয়া ক'রে নিজেই সংবাদ দিয়েছিলেন। কিন্তু কোন্ দোষে আমার প্রতি আপনি এরূপ হলেন? আমার গৃহে পদধূলি দিলেন না, সেবার অধিকার হ'তেই বা আমায় কেন বঞ্চিত ক'রলেন?”

উত্তর হইল, “বৎস, আমার দুই প্রিয় শিষ্য তোমার নিকটে আমার আগমন সংবাদ দেবার জন্য গিয়েছিল। কিন্তু কি আশ্চর্য্য তুমি তাদের কোন আদর আপ্যায়নই করনি। শ্রান্ত অতিথিদের বিশ্রাম ও পান ভোজনের কথা বিস্মৃত হয়ে শুধু আমার জন্যই অতিমাত্রায় ব্যস্ত হয়েছিলে। ঐ তরুণ বৈষ্ণবদের কাছে কি তোমার বৈষ্ণব-অপরাধ ঘটেনি? শুধু এই জন্যই সেদিন তোমার গৃহে সেবা গ্রহণ ক'রতে আমার রুচি হয়নি। অথচ দেখ, এই কপর্দ্দকহীন ব্রাহ্মণ আজ আমাকে কি পরিতোষপূর্ব্বকই না ভিক্ষা গ্রহণ করেছে। অভিমানের বালাই তার নেই। তাই তো সে এমনভাবে আমার আত্মার আত্মীয় হতে আজ পারলো। ধনগর্ব্ব ছেড়ে, বৈষ্ণবসেবার ব্রতই জীবনে গ্রহণ কর। তাতেই তোমার কল্যাণ হবে।”

শ্রীশৈলতীর্থ দর্শন করিতে গিয়া রামানুজ সেবার এক বৎসর কাল প্রবীণ আচার্য্য শৈলপূর্ণের গৃহে অবস্থান করেন। শৈলপূর্ণ তাঁহার মাতুল। তাছাড়া তাঁহার অন্যতম মাসতুতো ভাই ও সতীর্থ গোবিন্দ

ইহারই শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছেন, এক পরমভক্ত বৈষ্ণব সাধকে তিনি রূপান্তরিত হইয়াছেন। বাল্যকালে গোবিন্দের সহিত রামানুজের বড় হৃদ্যতা ছিল। আচার্য্য যাদবপ্রকাশের নিকট উভয়ে একত্রে অধ্যয়ন করিতেন। এই গোবিন্দই সেবার গোণ্ডা-অরণ্যে তাঁহার প্রাণরক্ষা করিয়াছেন। আজ তাঁহার জীবনে বৈষ্ণবীয় দাস্যভাবকে অপরূপ রূপে ফুটিয়া উঠিতে দেখিয়া আচার্য্যের বড় আনন্দ হইল।

একদিন রামানুজ লক্ষ্য করিলেন, গোবিন্দ তাঁহার গুরু শৈলপূর্ণের শয্যা নিজহস্তে রচনা করিলেন, তাহার উপর নিজেই কিছুক্ষণ শুইয়া রহিলেন। গুরুসেবা করিতে গিয়া একি অন্যায় আচরণ।

শৈলপূর্ণের কাণে সংবাদটি যথাসময়ে তোলা হইল। তখনি তিনি গোবিন্দকে ডাকিয়া কহিলেন, "বৎস, তুমি কি জানো না গুরুর শয্যায় শয়ন করা শিষ্যের পক্ষে মহাপাপ? সব জেনেও তুমি কেন রোজ এ অপরাধ করে যাচ্ছো?"

গোবিন্দ ধীর অচঞ্চল কণ্ঠে উত্তর দিলেন, "প্রভু, মহাপাতকের সম্ভাবনা রয়েছে জেনেও যে এ কাজ আমায় করতে হয়। শয্যারচনা নিখুঁৎ হ'য়েছে কিনা, আপনার দেবদুর্লভ দেহের পক্ষে সুখকর কিনা, তা জানবার জন্যই যে ওতে রোজ শুয়ে পড়ে আমায় পরীক্ষা করতে হয়। আপনার সামান্যতম সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের পরিবর্ত্তে মহাপাপের ভার গ্রহণে আমি সদাই প্রস্তুত। অনন্ত নরকবাসেও ভীত নই।"

স্বীয় সখা, ভক্তপ্রবর গোবিন্দের জীবনে সেবানিষ্ঠার এই অপূর্ব্ব প্রকাশ দেখিয়া রামানুজ বড় প্রসন্ন হইলেন।

আর একদিন রামানুজ সেখানে বসিয়া আছেন। হঠাৎ দেখিলেন গোবিন্দ একটি বিষধর সর্পের মুখবিবরে নিজের হস্ত প্রবেশ করাইয়া আবার তখনি তাহা টানিয়া নিলেন। সাপটি সঙ্গে সঙ্গে মাটিতে পড়িয়া যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্‌ করিতে লাগিল।

বিস্মিত হইয়া গোবিন্দকে তিনি ডাকিয়া কহিলেন—"ভাই বলতো, একি অদ্ভুত আচরণ? সাপের মুখে হাত দেওয়া—নিছক

পাগলামি ছাড়া আর কিছুই নয়। যে কোন মুহূর্ত্তে তোমার প্রাণনাশ হতে পারতো। তাছাড়া, দেখ দেখি, তোমার আঙুলটি সজোরে ঢোকানোর ফলে জীবটি মৃতকল্প হয়ে পড়ে আছে।"

গোবিন্দ সবিনয়ে জানাইলেন,—এ কাজ না করিয়া উপায় ছিল না। সাপটির গলার ভিতরে কাঁটা ফুটিয়া গিয়াছিল, অঙ্গুলি দিয়া উহা বাহির করিয়া না দিলে, কোন মতেই জীবন রক্ষা হইত না। কণ্টকমুক্ত হইবার পর এখন উহা শান্তভাবে পড়িয়া আছে।

জীবের সেবায় গোবিন্দের এরূপ নিষ্ঠা দেখিয়া আচার্য্য তাঁহাকে ধন্য ধন্য করিতে লাগিলেন। শ্রীরঙ্গমে ফিরিবার সময় গোবিন্দকে এবার তিনি সঙ্গে নিয়া যান, এখন হইতে গোবিন্দ তাঁহারই আশ্রয়ে বাস করিতে থাকেন।

নিজের সমগ্র জীবন গোবিন্দ রামানুজের সেবাপরিচর্য্যায় নিবেদন করিয়াছিলেন। এ কাজে তাঁহার ভক্তিনিষ্ঠা এবং আন্তরিকতা দেখিয়া আচার্য্যের শিষ্যগণ মুগ্ধ হইয়া যাইতেন। একদিন গোবিন্দকে তাঁহার গুণাবলীর জন্য সকলে খুব প্রশংসা করিতেছেন। তিনি গম্ভীরভাবে উত্তর দিলেন, "হ্যাঁ, আপনারা সবাই যা বলছেন তা খুবই ঠিক, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। আমার ভেতরকার এসব গুণ সত্যই দুর্লভ, সত্য সত্যই প্রশস্তি পাবার যোগ্য!"

সকলে চমকিয়া উঠিলেন। ভাবিলেন, সেবাযত্নে পটু হইলে কি হয়, স্পষ্টই দেখা যাইতেছে, গোবিন্দের আত্মম্ভরিতা নিতান্ত কম নয়। কথাটি সকলে সেদিন রামানুজের কানে তুলিতেও ছাড়িলেন না।

গোবিন্দকে সেখানে ডাকানো হইল। আচার্য্যের প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলিলেন, "প্রভু, আমার একথা বর্ণে বর্ণে সত্য! আপনার অপার করুণাতেই আমার সৎগুণাবলী স্ফুরিত হয়েছে। স্বভাবতঃই আমি নিতান্ত হীনমতি, তাই যা কিছু সৎপ্রবৃত্তি আমার ভেতর দেখা যায় তা একান্তভাবে আপনারই। তাইতো আমি এমন প্রকাশ্যে ও অকুণ্ঠভাবে নিজেই আমার এই সব সৎগুণ ও সদাচারের

প্রশংসা করতে পারি। এ প্রশংসা যে প্রকৃতপক্ষে আপনারই স্তুতিবাদ!" ভক্তগণ তাঁহার কথা শুনিয়া হতবাক্ হইয়া রহিলেন।

শুদ্ধাভক্তি ও দাস্যভাবের এক জীবন্ত মূর্ত্তি এই গোবিন্দ। সত্বরই রামানুজ স্বয়ং তাঁহাকে সন্ন্যাস ধর্ম্মে দীক্ষিত করিলেন। অসামান্য মর্য্যাদা দান করিয়া এ ভক্তের নামকরণ করিলেন—'মন্নাথ'।

এযাবৎ ভক্তেরা এই নামে একমাত্র রামানুজকেই ডাকিতেন। এবার নূতন ব্যবস্থায় বড় গোল বাধিল। দাস্যভাবে ভাবিত পরম বৈষ্ণব গোবিন্দ তাঁহার প্রভুর এ নাম কি করিয়া ব্যবহার করিবেন? তিনি একেবারে বাঁকিয়া বসিলেন। রামানুজকে তখন এক কৌশল অবলম্বন করিতে হইল। 'মন্নাথ' শব্দটির তামিল প্রতিশব্দ 'এম-পেরুমানার'—ইহার প্রথম অংশ 'এম' এবং শেষাংশ 'আর'—এই দুইটি একত্রে সংযোজিত করিলে দাঁড়ায় 'এমার'। অতঃপর এই নামেই গুরু তাঁহার প্রিয় শিষ্য গোবিন্দকে চিহ্নিত করিলেন। উত্তরকালে পুরীধামে যে প্রসিদ্ধ মঠ রামানুজ কর্তৃক স্থাপিত হয় গোবিন্দের নামানুসারেই তিনি উহার নামকরণ করেন। 'এমার-মঠ' নামে উহা পরিচিত হয়।

রামানুজ এই সময়ে শ্রীরঙ্গম মঠে তাঁহার প্রধান শিষ্যগণ দ্বারা পরিবৃত হইয়া সানন্দে বাস করিতেছেন। দাশরথি, কুরেশ, সুন্দরবাহু, শোট্টিনম্বি, সৌমনারায়ণ, যজ্ঞমূর্ত্তি, গোবিন্দ প্রভৃতি ইঁহাদের মধ্যে প্রধান। এই সুপণ্ডিত ও পরমত্যাগী ভক্তবীরগণ আচার্য্যদেবের মহান কর্ম্মের ধারক ও বাহক। দাক্ষিণাত্যের বৈষ্ণব সমাজে ইঁহারা এ সময়ে 'পীঠাধিপতি' বলিয়া সম্মানিত হইতে থাকেন। বিষ্ণু-অর্চ্চনা ও ভক্তিতত্ত্বের প্রচারে ইঁহাদের উদ্যম উৎসাহের অন্ত ছিল না।

এই প্রতিভাধর শিষ্যদিগকে রামানুজ দ্রাবিড় প্রবন্ধমালায় ব্যুৎপন্ন করিয়া তুলিয়াছেন, ইঁহাদেরই মাধ্যমে এই শাস্ত্রনিচয় সমগ্র দক্ষিণ ভারতে দ্রাবিড়-বেদরূপে পরিচিত হইয়া উঠিয়াছে। যামুনাচার্য্যের চিতার পাশে দাঁড়াইয়া যে কয়টি সঙ্কল্পবাণী তিনি

উচ্চাচরণ করেন, এই দ্রাবিড়-বেদের প্রচার তাহাদের অন্যতম। আরও একটি সঙ্কল্প তাঁহার ছিল—উহা হইতেছে শ্রীভাষ্য প্রণয়ন। আচার্য্য এবার এই বিষয়ে যত্নবান হইলেন।

এই মহাভাষ্য রচনায় বোধায়ন-বৃত্তির সাহায্য নেওয়া অতি আবশ্যক কিন্তু এ গ্রন্থ তখনকার দিনে নিতান্ত দুষ্প্রাপ্য। সংবাদ পাওয়া গেল কাশ্মীরের সারদাপীঠে উহার একখানি সংরক্ষিত আছে। প্রধান শিষ্য কুরেশ সহ অগৌণে তিনি কাশ্মীরে উপনীত হইলেন। কিন্তু কাজ সহজ নয়, কাশ্মীরী পণ্ডিতেরা এই মহাগ্রন্থ ব্যবহার করিতে দিতে রাজী নহেন। তাঁহাকে এড়ানোর জন্য বলা হইল, মন্দিরের গ্রন্থাগারে উহা নাই—কীট দংশনের ফলে নষ্ট হইয়া গিয়াছে। অথচ শ্রীরঙ্গম হইতে আচার্য্য এতদূর পথ এ জন্যই অতিক্রম করিয়া আসিয়াছেন। তাই তাঁহার মনস্তাপের অবধি রহিল না।

কথিত আছে, অলৌকিকভাবে রামানুজ এই গ্রন্থ সেদিন লাভ করেন। ক্লান্ত, বিষাদখিন্ন আচার্য্য গভীর রাত্রে শয্যায় শুইয়া আছেন, সহসা সারা কক্ষ স্বর্গীয় আলোকপ্রভায় ভরিয়া উঠিল। দেবী সারদা স্বয়ং তাঁহার সম্মুখে আবির্ভূতা হইলেন। হস্তে তাঁহার রহিয়াছে আচার্য্য বোধায়নের একখণ্ড গ্রন্থ। রামানুজকে তখনি উহা অর্পণ করিয়া দেবী কহিলেন, "বৎস, এ অমূল্য গ্রন্থ এখানে থাকা সত্ত্বেও তোমায় ওরা দিতে চায়নি। তোমার অভীষ্ট সাধনের জন্য এ গ্রন্থ আমি দিয়ে দিলাম। কিন্তু এখনি স্থান ত্যাগ না করলে এ তুমি রাখতে পারবে না।"

কুরেশ সহ রামানুজ প্রত্যুষেই দেশের দিকে রওনা হইলেন।

কয়েকদিন অতিক্রান্ত হইয়া গিয়াছে। ইতিমধ্যে হঠাৎ একদিন সারদা পীঠে এই গ্রন্থের জন্য আলোড়ন পড়িয়া গেল। গ্রন্থাগার হইতে উহা কোথায় নাকি উধাও হইয়াছে। সকলে সন্দেহ করিলেন, দাক্ষিণাত্যের পণ্ডিতদ্বয়েরই এই কাজ। কয়েকজন কাশ্মীরী তখনি

ঘোড়া ছুটাইয়া রামানুজ ও তাঁহার শিষ্যের পশ্চাদ্ধাবন করে। পথিমধ্যে আচার্য্যের সঙ্গে তাহাদের সাক্ষাৎ হয় এবং বলপূর্ব্বক তাহারা গ্রন্থটি ছিনাইয়া আনে।

এ ঘটনায় রামানুজ বড় হতাশ হইয়া পড়িলেন। শ্রীভাষ্য রচনাকে তিনি ঐশীনির্দ্দিষ্ট কাজ বলিয়াই গণ্য করিয়াছেন, অথচ ইহাতে কেন এমনতর বাধা বিঘ্ন আসিয়া পড়িতেছে? পথপ্রান্তে বসিয়া বিষণ্ণ চিত্তে ভাবিতে লাগিলেন, দেবীর কৃপায় দুষ্প্রাপ্য মহাগ্রন্থ যদিই বা মিলিল আবার তাহা হারাইয়া বসিলেন!

গুরুদেবকে চিন্তিত দেখিয়া কুরেশ করযোড়ে কহিতে লাগিলেন, "প্রভু আপনি একটুও ভাববেন না। এ কয়দিন আমি ঐ বোধায়নবৃত্তিটি পড়বার সুযোগ পেয়েছি। পথশ্রমে ক্লান্ত হয়ে আপনি রাত্রে গভীর নিদ্রায় অভিভূত হতেন, সেই অবসরে রোজ এ গ্রন্থ আমি পাঠ করতাম। ফলে এর সমস্তটাই আমার কণ্ঠস্থ হয়ে গিয়েছে। আপনি ব্যস্ত হবেন না, আমি কয়েকদিনের ভেতরই সমগ্র গ্রন্থটি আমার স্মৃতিতে লিখে ফেল্‌ছি।"

দুশ্চিন্তার মেঘ কাটিয়া গেল। প্রতিভাধর শিষ্যকে রামানুজ বারবার আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন। এইরূপে কুরেশের অসামান্য মেধার ফলে বোধায়নবৃত্তির পুনরুদ্ধার ঘটে এবং শ্রীরঙ্গম মঠে ফিরিয়া রামানুজ তাঁহার মহাভাষ্য রচনা সত্বর সমাপ্ত করেন। ইহার পর যে কয়েকখানি অমূল্যগ্রন্থ তিনি প্রণয়ন করেন তাহা—বেদান্তদীপন, বেদান্তসার, বেদান্তসংগ্রহ ও গীতাভ্যষ্যম্। আচার্য্য রামানুজের দার্শনিক মতবাদ এখন হইতে বিশিষ্টাদ্বৈতবাদরূপে ভারতের সর্ব্বত্র পরিচিত হইয়া উঠে।

শ্রীরঙ্গমে সেদিন গরুড়-মহোৎসব। গরুড়স্কন্ধে সমাসীন রঙ্গনাথজী বাদ্যভাণ্ডসহ সাড়ম্বরে শোভাযাত্রায় বাহির হইয়াছেন। জনতার ভীড়ে পথ অতিক্রম করা কঠিন। আচার্য্য রামানুজ শিষ্যগণসহ এই

রাস্তায় ফিরিতেছেন, সহসা একটি তরুণ ও তরুণীর উপর তাঁহার দৃষ্টি পতিত হইল। তরুণীটি পরম রূপলাবণ্যবতী। গরুড়-যাত্রা দর্শনের জন্য রাজপথে সে উৎসুক হইয়া দণ্ডায়মান। তাহার পাশেই একটি বলিষ্ঠ, সুন্দর সুঠাম যুবা—এক হাতে তাহার রহিয়াছে ছত্র, আর এক হাতে একটি পাখা নিয়া তরুণীকে সে ব্যজন করিতেছে। এক মুহূর্ত্তের তরেও সে তাহার চোখ দু'টি রূপসী প্রণয়নীর আনন হইতে সরাইয়া নিতে রাজী নয়।

এই প্রণয় আতিশয্য জনতার চোখ এড়ায় নাই। অনেকেই নানা উপহাস করিতেছে। যুবকের কিন্তু কোন ভ্রূক্ষেপই নাই।

রামানুজ তখনি তাঁহার এক শিষ্যকে দিয়া ঐ যুবকটিকে নিকটে ডাকাইলেন। কহিলেন, "বৎস, তুমি এই যুবতীর ভেতর এমন কি অমৃতোপম বস্তু পেয়েছো, যার জন্য লজ্জা ভয় ত্যাগে দ্বিধা হয়নি? সবার কাছে এমন উপহাসাস্পদই বা কেন হচ্ছো?"

তরুণ সহজ সরলভাবে উত্তর দিল, "প্রভু, এ পৃথিবীতে যত কিছু সুন্দর ও আনন্দময় বস্তু আছে, আমার কাছে সে সব কিছুর চাইতে আকর্ষণীয় হচ্ছে আমার প্রেমিকার পদ্মের মত ওই অনিন্দ্যনীয় নয়ন দু'টি। আমি বিশ্বের সব কিছু ভুলে গিয়ে, শুধু ওর চোখ দুটির দিকেই তাকিয়ে থাকতে চাই।"

আচার্য্যের প্রশ্নের উত্তরে যুবক জানাইল, এ রমণী তাহার বিবাহিত পত্নী নয়। যুবতীর নাম হেমাম্বা, আর তাহার নাম ধনুর্দাস। শ্রীরঙ্গমের কাছেই, নিচুল নগরে যুবকের বাস। এক নিপুণ মল্লবীর বলিয়া এ অঞ্চলে সে বিখ্যাত।

আচার্য্য বিরক্ত হন নাই, তাহার দিকে তাকাইয়া শুধু প্রসন্ন মধুর হাসি হাসিতেছেন। এবার ধীর কণ্ঠে কহিলেন, "বৎস ধনুর্দাস, আমি বুঝেছি, তুমি সৌন্দর্য্যের পূজারী। আচ্ছা, যদি তোমার প্রেমিকার নয়নের চাইতেও সুন্দরতর নয়ন তোমায় দেখাতে পারি, তাহ'লে? তুমি কি তা এমনিভাবে ভালবাসতে পারবে?"

ধনুর্দাস প্রত্যয়ভরা কণ্ঠে তখনি বলিয়া উঠিল, "প্রভু, আমি জানি, এর চাইতে সুন্দরতর চোখ আপনি আমায় দেখাতে পারবেন না। তা কখনও সম্ভব নয়। যদি সত্যই পারেন, আমি কথা দিচ্ছি, এই রমণীর নয়ন ছেড়ে, সেই নয়ন দুটির কাছেই আমি নিজেকে বিকিয়ে দেব।"

কথা রহিল, সায়ংকালে ধনুর্দাস রামানুজের নিকট যাইবে।

যুবকটি কথামত ঠিক সময় আসিয়া উপস্থিত। যতিরাজ তাহাকে সঙ্গে নিয়া প্রভু শ্রীরঙ্গনাথের সম্মুখে উপনীত হইলেন। সন্ধ্যার আরতি অনুষ্ঠিত হইতেছে। চন্দন, ধূপ ও গুগ্‌গুলের সুবাসে মন্দির প্রকোষ্ঠ ভরপুর। কর্পূরের আলোকে উদ্ভাসিত শ্রীবিগ্রহের দেহ হইতে আজ এক অলৌকিক মাধুরীধারা উৎসারিত হইতেছে। আয়ত নয়নপদ্ম দুইটিতে একি অপরূপ সৌন্দর্য্য? একি অপার্থিব দ্যুতি? সেদিকে চাহিয়া চাহিয়া ধনুর্দাস ভাব বিহ্বল, আত্মবিস্মৃত! দুই চোখ বহিয়া কেবলই ঝরিতেছে প্রেমাশ্রুধারা।

শ্রীবিগ্রহের লোচন-যুগল হইতে যেন অমৃত ক্ষরণ হইতেছে। এমন অনুভূতির এমন আকর্ষণ তো কোনদিনই ধনুর্দাসের হৃদয়ে জাগে নাই? এ কি শ্রীরঙ্গনাথের অহৈতুকী কৃপা, না যতিরাজ রামানুজেরই এক অলৌকিক বিভূতি লীলা? কারণ যাহাই হউক, তরুণ প্রেমিক ধনুর্দাসের জীবনে আসিয়া গিয়াছে পরম লগ্ন। সে আজ কৃতকৃতার্থ। শ্রীরঙ্গনাথের দিব্য নয়নপঙ্কজের অমোঘ আকর্ষণে চিরতরে সে বাঁধা পড়িয়া গিয়াছে।

ধনুর্দাস পরম দৈন্যভরে সেদিন রামানুজের শিষ্যত্ব গ্রহণ করে, প্রেমিকা হেম্বাকেও আচার্য্যের চরণাশ্রয়ে টানিয়া আনে।

মঠের সন্নিকটে এক ক্ষুদ্র কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া প্রেমিক প্রেমিকা একান্তভাবে সাধনভজন শুরু করিয়া দেয়। গুরুভক্তি, সরলতা ও নিরভিমানতার গুণে ধনুর্দাস এবং তরুণীটি অচিরে রামানুজের বিশিষ্ট কৃপাপাত্ররূপে পরিচিত হইয়া উঠে।

আচার্য্যের কৃপাকে কোন কোন ব্রাহ্মণ শিষ্য তেমন সুচক্ষে

দেখিতে পারেন নাই। রামানুজ ইহা জানিতেন, তাই একবার তিনি এ ব্যাপার নিয়া এক চমৎকার লীলাভিনয় করিলেন!

নিশীথ রাত্রি। মঠের ভক্তগণ গভীর নিদ্রায় মগ্ন। রামানুজ এই সুযোগে সকলেরই বস্ত্রাঞ্চল হইতে খানিকটা অংশ ছিঁড়িয়া নিলেন।

প্রভাতে উঠিয়াই কিন্তু সাধু ব্রহ্মাণদের মধ্যে তুমুল ঝগড়া বাধিয়া গেল, একে অন্যকে তাঁহারা দোষারোপ করিতে লাগিলেন। অবশেষে রামানুজের হস্তক্ষেপের ফলে শান্তি স্থাপিত হইল।

কয়েকদিন পরের কথা। কাজকর্ম্মের শেষে গভীর রাত্রে রামানুজ অনুযোগকারী শিষ্যদের কাছে ডাকাইলেন। কহিলেন, তিনি ধনুর্দাসকে কথাবার্ত্তার ছলে নিজের কাছে বসাইয়া রাখিবেন, তাহারা যেন সেই অবসরে চুপি চুপি ধনুর্দাসের প্রেমিকা হেমাম্বার অঙ্গ হইতে গহনাগুলি খুলিয়া নিয়া আসে। ইহার ফলে ভক্তপ্রবর ধনুর্দাস ও তাহার প্রেমিকার কোন মনোবিকার জন্মে কিনা, তাহাও সবাইকে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে লক্ষ্য করিতে বলিলেন।

ব্রাহ্মণ ভক্তগণ হেমাম্বার অঙ্গ হইতে আভরণ খোলার সঙ্গে সঙ্গে তাহার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল।

মঠের সাধুরা অলঙ্কার অপসারণ করিতেছে, ধরা পড়িয়া পাছে তাঁহারা লজ্জা পান এই ভয়ে হেমাম্বা নিশ্চলভাবে শুইয়া আছে। অঙ্গের এক পাশের গহনা সারানো শেষ হইলে সে ভাবিতে লাগিল, এবার ইহাদের কাজে কিছুটা সহায়তা করা দরকার। দেহের অপর দিকের অলঙ্কার খুলিয়া নিতে যাহাতে সুবিধা হয় এজন্য সে পাশ ফিরিয়া শুইল। আচার্য্যের শিষ্যেরা ভয় পাইলেন, এবার বুঝি হেমাম্বা ঘুম হইতে জাগিয়া পড়ে। তখনি দ্রুতপদে তাঁহারা প্রস্থান করিলেন।

ধনুর্দাস কিছুক্ষণ পরেই গৃহে ফিরিয়া আসিয়াছে। প্রণয়িনীর সঙ্গে তাহার কি কথাবার্ত্তা হয়, তাহা শুনিবার জন্য রামানুজ-শিষ্যগণ আড়াল হইতে উৎকর্ণ হইয়া আছেন।

হেমাম্বা ধনুর্দাসকে সমস্ত ঘটনা জানাইয়া বলিল, "দেখ, পাশ

ফিরে শুয়ে আমি কিন্তু অঙ্গের অপর দিককার অলঙ্কারগুলিও তাঁদের দিতে গিয়েছিলাম। অনর্থক ভয় পেয়ে, এগুলো না নিয়েই তাঁরা পালিয়ে গেলেন। এ আমার মহা দুর্ভাগ্য।"

ধনুর্দাস তীব্র তিরস্কার করিয়া বলিতে লাগিল, "ছি-ছি, কেন তুমি পাশ ফিরে শুতে গেলে? ঘোর অন্যায় তুমি আজ করেছ। তোমার আত্মাভিমান কি এখনো যাচ্ছে না? 'আমার অঙ্গ, আমার আভরণ আমি দান করবো।'—এ সব দুর্ব্বুদ্ধি তোমার এখনো রয়েছে কেন? বিষয়বিষ্ঠা ও কাঞ্চন বহনের ভার থেকে নিষ্কৃতি পাবার মহা সুযোগ তুমি পেয়েছিলে। কিন্তু নিজ দোষে আজ তা হারালে। অলঙ্কার চুরির সময় তোমার উচিত ছিল—ভগবানের চরণে আত্মসমর্পণ করে নিশ্চল হয়ে শুয়ে থাকা। তাহ'লে অপহরণকারী সাধুরা তোমায় নিদ্রামগ্ন জেনে কত সহজে সেগুলি নিয়ে যেতে পারতেন। তোমার দেহাত্ম-বুদ্ধি এখনো যায় নি, তাইতো এই বিপদ।"

হেমাম্বা নিজের অপরাধ বুঝিতে পারিয়াছে। কাঁদিয়া কহিল, "প্রিয়তম, তুমি ঠিক কথাই তো বলেছ। ভগবান আমায় কৃপা করুন, আজকের মত এমনতর অহংভাব যেন আমার অন্তরে আর কখনো প্রবেশ না করে।"

এই কথোপকথন শুনিয়া আড়ালস্থিত রামানুজ-শিষ্যদের বিস্ময়ের অবধি রহিল না। তাঁহারা ফিরিয়া আসিলে আচার্য্য তাঁহাদের বস্ত্রাঞ্চল ছিন্ন করার গোপন তথ্যটি ফাঁস করিলেন। সহাস্যে কহিলেন, "শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত ও নিষ্ঠাবান সাধক হয়েও সেদিন তোমরা সামান্য কাপড় ছেঁড়ার জন্য ঝগড়া শুরু করেছিলে। আর ছাখো, ধনুর্দাস ও হেমাম্বা তাদের সর্ব্বস্ব হারাতে না পেরে মনস্তাপে পুড়ে মরছে। প্রকৃত বৈরাগ্যবান সাধকের আচরণ কাদের, এবার বিচার ক'র!"

শিষ্যদের চিত্ত-শুদ্ধির জন্য রামানুজের দৃষ্টি এমনিভাবে সতত সজাগ ও সতর্ক থাকিত, আর প্রকৃত ভক্তের মূল্য নিরূপণের জন্য এমনতর ছিল তাঁহার বিচারপদ্ধতি।

চোল রাজ্যের অধীশ্বর কৃমিকণ্ঠ ছিলেন শৈব। বৈষ্ণব বিদ্বেষী বলিয়া তাঁহার বড় কুখ্যাতি ছিল। সমগ্র রাজ্যে নিজের ধর্ম্মমত তিনি জোর করিয়া চালাইতে চাহিতেন। স্তাবক সভাসদ ও শৈব আচার্য্যদের উস্কানীতে এ গোঁড়ামি আরো বাড়িয়া যায়। বিষ্ণু উপাসক রামানুজের বিরাট প্রতিষ্ঠা ক্রমে চোলরাজের অসহ্য হইয়া উঠে। ভাবিতে থাকেন, এই বৈষ্ণব আচার্য্যকে দূর না করিতে পারিলে শৈবমত কোনদিন প্রাধান্য অর্জ্জন করিতে পারিবে না।

রাজধানী কাঞ্চীনগর হইতে চোলরাজ সেদিন রামানুজকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। শ্রীরঙ্গম মঠের ভক্তগণ আতঙ্কে চঞ্চল হইয়া উঠিলেন। সকলেরই আশঙ্কা, আচার্য্যকে ছলে বলে হত্যা করাই এই বিষ্ণুদ্বেষী রাজার অভিসন্ধি।

ভক্ত-প্রধান কুরেশ বলিয়া উঠিলেন, "গুরুদেব, কোনমতেই আমরা আপনাকে এই নিশ্চিত অপমৃত্যুর মুখে ঠেলে দিতে পারবো না। আপনি বেঁচে থাকলে ধর্ম্ম ও সমাজ রক্ষা পাবে। শুধু তা-ই নয়, আপনি ছাড়া এই সংসারতাপদগ্ধ জীবের পথাশ্রয় আজ আর কে আছে? জীবকল্যাণের জন্যই আপনাকে বাঁচতে হবে। অত্যাচারী রাজার সামনে বরং আমিই উপস্থিত হ'ব। আপনার কাষায় বস্ত্রটি প'রে গিয়ে রামানুজ ব'লে আমি নিজের পরিচয় আমি সেখানে দেব এ—অনুমতি ভিক্ষা আজ আপনার কাছে আমি চাচ্ছি। আমার একান্ত মিনতি, এখানকার সব শিষ্যদের নিয়ে আপনি শ্রীরঙ্গম মঠ ত্যাগ করুন, এখনি দূর বনাঞ্চলে কোথাও চলে যান।"

সকলের নির্ব্বন্ধাতিশয্যে রামানুজকে সেদিন এ প্রস্তাব গ্রহণ করিতে হইল, সকলকে নিয়া তিনি অরণ্যে চলিয়া গেলেন।

এদিকে শিষ্য কুরেশ রাজসভায় গিয়ে উপস্থিত। চোলরাজ তাঁহাকেই রামানুজ বলিয়া ধরিয়া লইলেন। সরোষে বলিয়া উঠিলেন, "এই দুর্ব্বৃত্তের উপযুক্ত দণ্ড মৃত্যু। কিন্তু এক সময়ে এ আমার বোনকে দুরারোগ্য ব্যাধির কবল থেকে বাঁচিয়েছিল। তাই

প্রাণ সংহার না ক'রে আমি এর দণ্ডবিধান করলাম,—চির অন্ধত্ব। চোখ দুটো তোমরা এখনি শলাকা বিদ্ধ ক'রে নষ্ট কর।"

কুরেশের আনন্দের সীমা নাই, নিজের চোখ দুইটির পরিবর্ত্তে গুরুদেবের জীবন রক্ষা তিনি করিতে পারিবেন। ভাবিলেন, ইন্দ্রিয় সুখভোগের স্পৃহা তো অন্তর হইতে বিলুপ্ত হইয়াই গিয়াছে। এবার এ চক্ষু না থাকিলেই বা ক্ষতি কি?

দণ্ডাদেশ পালিত হইল। কুরেশ রাজা ও সভাসদ্‌দের ডাকিয়া কহিলেন, "ওগো, তোমরাই আমার প্রকৃত বন্ধু। জীবদেহের নয়ন জৈব বস্তু। পরম পুরুষের সম্মুখে তা পৌঁছায় না—বরং মায়াময় প্রপঞ্চের দিকেই সতত টেনে রাখে। এ হচ্ছে মানুষের পরম শত্রু! এ শত্রুর হাত থেকে তোমরা আমায় বাঁচিয়েছ—প্রকৃত বন্ধুর কাজই আজ করেছ। শ্রীরঙ্গনাথ তোমাদের মঙ্গল করুন।"

অন্ধ কুরেশ শ্রীরঙ্গমে ফিরিয়া গেলেন। ইহার অল্পকাল পরেই শুনা গেল, অত্যাচারী চোলরাজ এক উৎকট রোগ যন্ত্রণায় ভুগিয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছেন।

উত্তরজীবনে গুরুর কৃপায় পরমত্যাগী কুরেশের অন্ধত্ব অলৌকিক-ভাবে ঘুচিয়া যায়। আচার্য্য রামানুজ তখন কিছুকালের জন্য যাদবাদ্রি নামক স্থানে অবস্থান করিতেছেন। কুরেশ সেখানে গুরুদেবের চরণ বন্দনা করিতে উপস্থিত হইয়াছেন।

প্রিয়তম শিষ্যকে বুকে জড়াইয়া ধরিয়া রামানুজ পুলকাশ্রু বর্ষণ করিতে লাগিলেন। কহিলেন, "বৎস, তুমি শ্রীবরদরাজের নিকট নিজের নয়ন দুটি একবার ভিক্ষা চাও, অচিরে এ ধন তুমি ফিরে পাবে।"

গুরুর নির্দ্দেশে কুরেশ কাঞ্চীতে গিয়া বরদরাজের মন্দিরদ্বারে উপনীত হন। কিন্তু শ্রীবিগ্রহের সম্মুখে সেদিন যাহা তিনি প্রার্থনা করিলেন, তাহা বিস্ময়কর। রাজার আদেশে যে ব্যক্তি তাহার চক্ষু বিনষ্ট করিয়াছিল তাহার কল্যাণ, তাহার গ্রামের কল্যাণই তিনি চাহিয়া বসিলেন।

পরম ভক্তের সম্মুখে আবির্ভূত হইয়া প্রভু বরদরাজ সহাস্যে কহিয়া গেলেন, 'তথাস্তু'।

রামানুজের নিকট এ সংবাদ পৌঁছিল। তিনি কুরেশকে বলিয়া পাঠাইলেন, "বৎস, তোমার উদার শুভবুদ্ধির কথা আমি শুনেছি, পরার্থে এ প্রার্থনা করে তুমি নিজে আনন্দ লাভ ক'রেছ সন্দেহ নেই। কিন্তু এর ভেতরে নিজ স্বার্থটি দেখার ভাবই বর্ত্তমান রয়েছে। এবার তুমি নিজের বদলে আমাকে—তোমার গুরুকে—আনন্দ দান ক'রনা কেন? তোমার নয়ন ফিরে পেলে, আমার যে পরম আনন্দ। তুমি কি জান না যে, তুমি, তোমার শরীর ও মন—এ সমস্তই আমার, তোমার কিছুই নয়?"

ভক্ত কুরেশ এ সংবাদ শুনিয়া আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিলেন। কহিলেন, "এবার আমি কৃতার্থ। যতিরাজ আমার মত মহাবিষয়ীকে অঙ্গীকার করেছেন। এবার আমি শ্রীবরদরাজের কাছে নয়ন ভিক্ষা অবশ্যই চাইব।" কথিত আছে বরদরাজের কৃপায় কুরেশ তাঁহার চক্ষু দুইটি ফিরিয়া পাইয়াছিলেন।

একবার যাদবাদ্রিতে (বর্ত্তমানের মেলকোটা) ভ্রমণকালে রামানুজ বল্মীকস্তূপ হইতে যাদবাদ্রিপতির একটি পুরাতন শিলাময় বিগ্রহ আবিষ্কার করেন। শাস্ত্রীয় প্রথামত ইহার সংস্কার ও অভিষেক ইত্যাদি সম্পন্ন হয় এবং পূজাও পুনরায় প্রবর্ত্তিত হয়।

এই বিগ্রহ একদিন তাঁহাকে স্বপ্নযোগে কহিলেন, বৎস রামনুজ, তুমি আমায় পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করে ভালই করেছ, কিন্তু আমার একটি প্রতীক বিগ্রহ আছে, তার নাম—সম্পৎকুমার। সেটি স্থানচ্যুত হয়ে দূরে চলে গিয়েছে। এই প্রতীকের মাধ্যমেই আমি মন্দিরের বাইরে শুভযাত্রা করে থাকি! আমার উৎসবাদি একেই কেন্দ্র ক'রে উদ্‌যাপিত হয়। কিন্তু দ্বিতীয় বিগ্রহটি রয়েছে দিল্লীর মুসলমান সম্রাটের অন্তঃপুরে। তাকে তুমি সত্বর আনয়ন কর।"

কয়েকটি অন্তরঙ্গ শিষ্যসহ রামানুজ অচিরেই দিল্লীতে উপনীত হন। এই দিব্যকান্তি মহাপুরুষকে দর্শন ও তাঁহার সঙ্গে কথোপকথনের পর সম্রাট আনন্দ প্রকাশ করিতে থাকেন। আচার্য্য তাঁহার নিকট লুণ্ঠিত শিলাবিগ্রহটি চাহিতে আসিয়াছেন শুনিয়া তখনই তিনি উহা ফিরিয়া দিবার আদেশ দিলেন।

বিগ্রহটি কিন্তু ইতিমধ্যে সম্রাটনন্দিনী লছিমারের বড় প্রিয় হইয়া উঠিয়াছে। সর্ব্বদা নানা বেশভূষায় সাজাইয়া তিনি ইহার সেবা যত্ন করেন। লছিমার তখন ছিলেন দিল্লীর বাহিরে। তাঁহার অবর্ত্তমানেই সম্রাট সেদিন রামানুজকে ইহা ফেরৎ দিয়া দেন।

পরের দিন রাজপ্রাসাদে ফিরিয়া আসিয়া লছিমার মহা অনর্থ বধাইয়া তুলিলেন। এই বিগ্রহ যে তাঁহার প্রাণস্বরূপ। যেভাবেই হোক এখন ইহা ফিরাইয়া আনিতে হইবে। বার বার অশ্রুসজল চক্ষে তিনি পিতাকে মিনতি করিতে লাগিলেন।

সম্রাটের আদেশে একদল অশ্বারোহী সৈনিক তখনি রামানুজের পশ্চাদ্ধাবনে প্রেরিত হয়। সম্রাট দুহিতা লছিমার ও তাঁহার প্রণয়ী কুবেরও এই উদ্ধারকারী দলের সঙ্গে অগ্রসর হন।

রামানুজ কিন্তু এই বিপদের সম্ভাবনা টের পাইয়াছিলেন। তাই দ্রুতবেগে নির্দ্দিষ্ট স্থানে পৌঁছিয়াই তিনি যাদবাদ্রিপতির ঐ দ্বিতীয় বিগ্রহকে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। ইতিমধ্যে লছিমারও সেখানে আসিয়া উপস্থিত। বিষ্ণু বিগ্রহের প্রতি এই মুসলমান তরুণীর অসামান্য প্রেমভক্তি দর্শনে রামানুজ মুগ্ধ হন, মন্দিরস্থিত শ্রীবিগ্রহের সম্মুখে যাইতে তাঁহাকে সানন্দে অনুমতি দেন। দাক্ষিণাত্যে জনশ্রুতি আছে, পরম ভক্তিমতী লছিমার দেহ শ্রীসম্পৎকুমার বিগ্রহের মধ্যে সেদিন লীন হইয়া যায়। তাঁহার প্রণয়ী কুবেরও নাকি এই সময়ে স্বপ্নাদেশ পাইয়া নীলাচলে গমন করেন এবং অচিরে এক সার্থক বৈষ্ণব সাধকরূপে তিনি রূপান্তরিত হন।

পবিত্রতীর্থ শ্রীশৈলে (তিরুপতি) অবস্থান করার জন্য রামানুজ

একবার তাঁহার প্রিয় শিষ্য অনন্তাচার্য্যকে আদেশ করেন। শিষ্য তখনি গুরু সান্নিধ্যের আকর্ষণ ছাড়িয়া সেখানে চলিয়া যান এবং সস্ত্রীক ঈশ্বর আরাধনায় রত হন।

সে অঞ্চলে তখন বড় জলাভাব। লোকের দুর্দ্দশা দেখিয়া অনন্তাচার্য্য সঙ্কল্প স্থির করিলেন, জলের সুবিধার জন্য তিনি স্বহস্তেই এক সরোবর খনন করিবেন। এ কার্য্যকে তিনি তাঁহার সাধনা ও ভগবৎ কর্ম্মেরই এক অঙ্গ বলিয়া ধরিয়া নিলেন।

অনন্তাচার্য্য নিজে রোজ কোদাল দিয়া মাটি কাটেন, আর তাঁহার স্ত্রী ঝুড়ি মাথায় বহিয়া নিয়া যান। এমনি করিয়া বৎসরের পর বৎসর অতিবাহিত হইতেছে।

ইতিমধ্যে এক সময়ে আচার্য্যের স্ত্রী আসন্ন-প্রসবা হইয়া পড়িয়াছেন। মৃত্তিকার বোঝা বাহিতে আজকাল তাঁহার বড় কষ্ট হয়। কিন্তু উপায় নাই, ভক্ত দম্পতিকে খনন চালাইতেই হইবে।

সেদিন আচার্য্যপত্নী বড় বেশী ক্লান্ত বোধ করিতেছেন। মৃত্তিকার বোঝা বহন করিয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে উপরে উঠিলেন। অদূরেই প্রকাণ্ড এক বটবৃক্ষ শাখা বিস্তার করিয়া রহিয়াছে। শ্রান্তদেহে উহার ছায়াতলে তিনি বিশ্রাম করিতে বসিলেন, কখন যে নিদ্রায় ঢলিয়া পড়িলেন, হুঁস রহিল না।

এদিকে অনন্তাচার্য্য কিন্তু দেখিতেছেন, পত্নী পূর্ব্ববৎ মৃত্তিকা বহন করিয়া চলিয়াছেন। কিন্তু আগেকার সে মন্থর গতি তো নাই, বরং একটু বেশী কর্ম্মতৎপরই দেখা যাইতেছে।

প্রশ্ন করিলেন, "ব্রাহ্মণী, একি অদ্ভুত কাণ্ড! তোমার কর্ম্মক্ষমতা কি ক'রে আজ হঠাৎ এমন বেড়ে গেল?"

কর্ম্মরতা নারীমূর্ত্তি বোঝা মাথায় নিয়া শুধু এক রহস্যময় হাসি ছড়াইয়া চলিয়া গেল।

এ আবার কি ব্যাপার? আচার্য্য তাড়াতাড়ি তীরে উঠিয়া

আসিলেন। সবিস্ময়ে দেখিলেন, স্ত্রী ক্লান্ত দেহে গভীর নিদ্রায় অভিভূতা, বৃক্ষতলে এলাইয়া পড়িয়া আছেন।

স্ত্রীকে তখনি তিনি জাগাইয়া তুলিলেন, তারপরই ছুটিয়া গিয়া মৃদুহাস্যময়ী অপর নারী মূর্ত্তিটির পথ রোধ করিয়া দাঁড়াইলেন। সরোষে কহিলেন, "মায়াবী, একি তোমার নিষ্ঠুর লীলা? আমরা দুজন সামান্য কিঙ্কর কিঙ্করী। তোমার দাস্য ও সেবাকার্য্যে আত্মনিয়োগ করেছি। সৌভাগ্যটুকুও তুমি আজ হরণ করতে এসেছ? তা তো হতে দিতে পারিনে, প্রভু।"

মধুর হাসি হাসিয়া রহস্যময়ী নারী মুহূর্ত্তে কোথায় অদৃশ্য হইয়া গেলেন। সঙ্গে সঙ্গে দম্পতির সম্মুখে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল—পরম রসোজ্জ্বল শ্রীবিষ্ণুমূর্ত্তি! উভয়কে আশীর্ব্বাদ জানাইয়া নিমেষে প্রভু আকাশে মিলাইয়া গেলেন।

রামানুজ-শিষ্যের খনিত জলাশয়টি আজিও তিরুপতিতে দেখা যায়। অনন্ত সরোবর নামে ইহা পরিচিত। বহু পুণ্যকামী নরনারী এ সরোবরের পবিত্র বারি স্পর্শ করিয়া ধন্য হয়।

সেবার এক মুমুক্ষু ব্রাহ্মণ আচার্য্য রামানুজের শরণ নিয়া কহিলেন, "প্রভু, আমি আপনার দাস হয়ে, একান্তভাবে চরণসেবায় আত্মনিয়োগ করতে চাই। শুধু এর ফলেই আমার সাধনজীবনে শুদ্ধ ও পবিত্র হয়ে উঠবে ব'লে আমার দৃঢ় বিশ্বাস। আপনি লোকগুরু, পতিতপাবন—আমায় আপনি কৃপা করুন।"

স্মিতহাস্যে রামানুজ কহিলেন, "বিপ্রবর, দাস্য ও সেবা দ্বারাই মানুষ শুদ্ধবুদ্ধ হয়ে উঠতে পারে। এ সিদ্ধান্ত আমার ঠিকই হয়েছে। কিন্তু আমায় এখানে এই দাস-সাধন ক'রতে হলে আপনাকে যা ক'রতে হবে, তাতে কি রাজী হবেন?"

ব্রাহ্মণ ব্যগ্রভাবে কহিলেন, "প্রভু, আপনি আদেশ প্রদান করুন, এই মুহূর্ত্তে তা পালন করবো।"

আচার্য্য বলিতে লাগিলেন, "বিপ্রবর, আমি কিন্তু আজ থেকে

সঙ্কল্প করেছি, প্রতিদিন বিষ্ণু-আরাধনার আগে ভুবনপাবন ব্রাহ্মণ পাদোদক পান করবো। আমার মহা সৌভাগ্য, আপনার মত পবিত্রহৃদয় ব্রাহ্মণ আমার সম্মুখে আজ উপস্থিত। আপনাকে এই মঠে অবস্থান ক'রে রোজ আমায় পাদোদক দান করতে হবে। জানবেন, এতেই করা হবে আমার প্রকৃত সেবা। আমার ভৃত্য হতে চেয়েছিলেন, রোজ এই পাদোদক দানই হবে সেই ভৃত্যের কাজ?"

দাস্যভাবে বিভাবিত সরল ব্রাহ্মণ এই কাজই শুরু করিলেন। তাঁহার নিত্যকার কর্ত্তব্য হইল ভগবৎ-আরাধনার আগে দেশপূজ্য আচার্য্যকে নিজের চরণধৌত জল প্রদান করা। অটুট নিষ্ঠায় এ কাজ তিনি করিয়া যাইতে থাকেন।

সেদিন রামানুজ এক বিশেষ পুণ্যযোগে কাবেরী তটে গিয়াছেন। স্নান তর্পণ ও পূজা অর্চ্চনায় সমস্ত দিন কাটিয়া গেল। রাত্রিতেও ভক্তদের নিয়া ধর্ম্ম প্রসঙ্গে কম সময় অতিবাহিত হইল না। সেদিন গভীর রাত্রিতে মঠে ফিরিয়া তিনি দেখেন, তাঁহার পদোদক দাতা ব্রাহ্মণ প্রত্যেক দিনের নির্দ্দিষ্ট স্থানটিতে নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া আছেন। কিঙ্করের পদস্পৃষ্ট জল প্রভু রামানুজ ভোর হইতে গ্রহণ করেন নাই, তাই তিনিও সে স্থান ত্যাগ করিতে পারেন নাই।

রামানুজ তাঁহার এ সেবা-পরাকাষ্ঠা দেখিয়া ধন্য ধন্য করিতে লাগিলেন। সেবক ব্রাহ্মণের পাদোদক নিজে বারবার পান তো করিলেনই, শিষ্যদেরও গ্রহণ করাইতে ছাড়িলেন না। আচার্য্য নিজ শিষ্যদের সাধনসত্তায় দাস্যসেবার মাহাত্ম্যটি এমনিভাবে অঙ্কিত করিয়া দিতেন।

দীর্ঘ এক শত ত্রিশ বৎসর কাল আচার্য্য রামানুজ বাঁচিয়া যান। যামুনাচার্য্যের অভিলষিত কর্ম্মসূচী ইতিমধ্যে তিনি রূপায়িত করিয়াছেন। এই শক্তিধর মহাপুরুষকে কেন্দ্র করিয়া সারা দাক্ষিণাত্যে সেদিন এক বিরাট বিষ্ণুসেবী সাধকগোষ্ঠী গড়িয়া

উঠিয়াছে। ত্যাগ, তিতিক্ষা, শাস্ত্র-জ্ঞান ও বৈষ্ণবীয় দৈন্যে ইহাদের তুলনা বিরল। সমগ্র ভারতের দিকে দিকে এই রামানুজ-পন্থীদের আদর্শ ও প্রভাব সে সময় ছড়াইয়া পড়িতেছে।

প্রিয়তম শিষ্য কুরেশ ইতিমধ্যে মর জীবন সাঙ্গ করিয়া পরমপদে প্রবিষ্ট হইয়াছেন। তাঁহার প্রতিভাধর তরুণ পুত্র পরাশর এখন মণ্ডলীপতি। রামানুজের আশীর্ব্বাদ-ধন্য হইয়া বৈষ্ণবগোষ্ঠীর নেতৃত্ব এবার তিনিই গ্রহণ করিলেন।

রামানুজ এ সময় অতিশয় বৃদ্ধ হইয়া পড়িয়াছেন। অন্তরঙ্গ শিষ্যগণ তাই একদিন মিনতি করিয়া কহিলেন, "প্রভু, আপনি হয়তো যে কোন দিন এই মর্ত্তলীলায় ছেদ টেনে দেবেন, কিন্তু আপনার দিব্য মূর্ত্তির বিয়োগব্যথা আমরা কি ক'রে সহ্য ক'রবো ? কৃপা করে আপনি এর একটা ব্যবস্থা করুন।"

শিষ্য ও ভক্তদের মিনতিতে আচার্য্যদেব বিগলিত হইলেন। তাঁহার সম্মতি নিয়া এক সুনিপুন ভাস্করকে ডাকিয়া আনা হইল, নির্ম্মিত হইল শ্রীরামানুজের এক শিলাময় প্রতিমূর্ত্তি। আচার্য্য নিজেই এ প্রতিমূর্ত্তিতে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিলেন।

গুরুদেবের জীবন্ত দেহের প্রতিরূপ—তাঁহার জিবিতকালে গঠিত এই ভাস্কর্য্য এক পরম পবিত্র বস্তু। এটি পাইয়া ভক্তদের আনন্দের সীমা রহিল না।

এ মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠার কিছু দিন পরেই আচার্য্য রামানুজের লীলা-নাট্যের উপর যবনিকাটি নামিয়া আসে। ১০৫৯ শকাব্দে (খৃঃ অঃ ১১৩৭) মাঘী শুক্লা দশমীতে অধ্যাত্মগগনের এই মহাজ্যোতিষ্ক লোকলোচনের অন্তরালে নিজেকে অপসৃত করিয়া নেন।

শ্রীমধুসূদন সরস্বতী

ষোড়শ শতাব্দীর দ্বিতীয় পাদের কথা। দক্ষিণ বাংলার চন্দ্রদ্বীপে, বর্ত্তমানের বরিশাল অঞ্চলে, তখন স্বাধীন রাজা কন্দর্পনারায়ণের শাসন চলিতেছে। দিল্লীর সেনাবাহিনী ও রাজা মানসিংহের প্রতাপে সারা বাংলা সে সময়ে ভীত ও সন্ত্রস্ত। আসন্ন মুঘল ঝটিকার সম্মুখে এই ক্ষুদ্র হিন্দু রাজ্যটি সেদিন কাঁপিতেছে এক ক্ষীণ দীপশিখার মত।

দক্ষিণ বাংলার নদীনালার প্রাকৃতিক গড়খাই-এর মধ্যে বসিয়া রাজা কন্দর্পনারায়ণ কোনমতে স্বাধীনতা রক্ষা করিতেছেন। রাজ্য তাঁহার ক্ষুদ্র, কিন্তু রাজধানী কচুয়াতে রাজগৌরব ও জাঁকজমকের অন্ত নাই। বিদ্যোৎসাহী ও বদান্য বলিয়া চন্দ্রদ্বীপরাজের খ্যাতিও চারিদিকে যথেষ্ট। বহু লোকের তিনি আশ্রয় ও আশা ভরসা স্থল। তাই তাঁহার রাজসভা ঘিরিয়া প্রার্থী, আশ্রিত ও জ্ঞানী-গুণীর ভীড় সর্ব্বদা লাগিয়াই রহিয়াছে। ইঁহাদের মধ্যে বিশেষ করিয়া শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত, কবি ও বিদগ্ধজনের প্রতি গুণগ্রাহী কন্দর্পনারায়ণ সদা মুক্তহস্ত।

কোটালিপাড়ার উনসিয়া গ্রামের প্রসিদ্ধ পণ্ডিত শ্রীপ্রমোদন পুরন্দরাচার্য্য সেদিন চন্দ্রদ্বীপের রাজসভায় উপস্থিত হইয়াছেন। কবি ও শাস্ত্রবিদ্‌রূপে এই প্রবীণ আচার্য্যের খ্যাতির সীমা নাই। রাজা সোৎসাহে তাঁহাকে অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করিলেন।

পুরন্দরাচার্য্যের সঙ্গে তাঁহার বালক পুত্র মধুসূদনও এবার রাজসভায় আসিয়াছে।

পুত্রের সম্বন্ধে আচার্য্য কিন্তু বড় সচেতন। অসামান্য প্রতিভাধর এই বালক, তাই তাহার প্রশংসার বর্ণনায় পিতার আগ্রহ ও উৎসাহের অবধি থাকে না। সুবিধা পাইলেই তিনি পুত্রগৌরব

ঘোষণা করিয়া বসেন। বালককে সম্মুখে আগাইয়া দিয়া পুরন্দর স্মিতহাস্যে কহিলেন, "মহারাজ, এটি হচ্ছে আমার পুত্র শ্রীমান মধুসূদন। বয়স সবেমাত্র বারো বৎসর হ'লেও কাব্যরচনা ও শাস্ত্র-জ্ঞানের দিক দিয়ে সত্যই এ অসাধারণ। সাত আট বৎসর বয়স থেকেই এর প্রতিভা খ্যাতনামা পণ্ডিতদের কাছে বিস্ময়ের বস্তু হয়ে আছে। মধুসূদনের রচনা আপনি কিছুটা শ্রবণ করুন।"

কন্দর্পনারায়ণ প্রসন্ন হাসি হাসিয়া উত্তর দিলেন, "আজ্ঞে, তা বেশ বেশ। বালকের কবিতা অবশ্যই শোনা যাবে। আপনারা দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে এসেছেন, আজ বিশ্রাম করুন। পরে অবসর মত আমরা কাব্যচর্চ্চার জন্য মিলিত হবো।"

আচার্য্য এ অবসরে আরেকটি প্রার্থনাও রাজ সমীপে নিবেদন করিতে ভুলিলেন না। স্বগ্রামে যে ভূসম্পত্তি তিনি ভোগ করেন তাহা চন্দ্রদ্বীপরাজের অধিকারভুক্ত। জমিতে বড় বড় আমের বাগান রহিয়াছে। পুরন্দরাচার্য্যের সুবিধার জন্য রাজা তাঁহার নিকট হইতে রাজস্ব হিসাবে ধান্য অথবা অর্ঘাদি নেন না। প্রতি বৎসর তিনি এ হিসাবে এক নৌকা আম্রফল কর রূপে গ্রহণ করেন। বিদ্যোৎসাহী রাজার অনুরোধে এই ফল-কর লইয়া আচার্য্য নিজেই আসেন। এই উপলক্ষে সুকবি ও শাস্ত্রবিশারদ পুরন্দরের সঙ্গ লাভে রাজা ও তাঁহার অমাত্যদের আনন্দের সীমা থাকে না। এ সাক্ষাৎকে তাঁহারা এক পরম সৌভাগ্য মনে করেন। আচার্য্য কিন্তু আজকাল বড় বৃদ্ধ হইয়া পড়িয়াছেন, দীর্ঘ পথ অতিক্রম করিয়া রাজসভায় আসা সামর্থ্যে আর কুলায় না। তাই এবার রাজার নিকট নিবেদন করিলেন, এখন হইতে তিনি নিজে না আসিয়া কোটালিপাড়ার সরকারী কর্ম্মচারীর কাছেই ফল-কর জমা দিবেন।

আবেদনটি কিন্তু কন্দর্পনারায়ণের মনঃপুত হইল না। তিনি বলিলেন, "সে কি কথা আচার্য্যদেব? এ উপলক্ষে তবুও রাজধানীতে একবার ক'রে আপনার পদার্পণ ঘটে—রাজসভায় আনন্দের তরঙ্গ

উঠে। যতদিন একেবারে অশক্ত না হবেন, দয়া ক'রে দর্শন দানে আমাদের বঞ্চিত ক'রবেন না।"

এই সুযোগে পুরন্দর আবার রাজার দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া কহিলেন, "মহারাজ! আমার পুত্র মধুসূদনের প্রতিভার পরিচয় কিন্তু এখনো আপনাকে দেওয়া হয় নি। আপনার সভায় আমার পরিবর্তে বরং প্রতি বৎসর সে-ই আসতে পারবে। একবার তার রচিত রসমধুর পদগুলি শুনবেন কি?"

প্রতিভাধর বালক পুত্র যাহাতে রাজসভায় অবিলম্বে প্রতিষ্ঠা পায়, আর নিজেকেও প্রতি বৎসর কষ্ট করিয়া আসিতে না হয়, একথাই পণ্ডিত ভাবিতেছিলেন।

"বেশ তো, বেশ তো। অবসর মত সময়ান্তরে আপনার ও বালকের কাব্য আমরা সকলে মিলে উপভোগ ক'রবো।" ইহা বলিয়াই রাজা সেদিন তাড়াতাড়ি সভা ত্যাগ করিলেন।

সকলের সহিত সম্ভাষণাদির পর আচার্য্য তাঁহার পুত্রসহ রাজার অতিথিভবনে গমন করিলেন। কিন্তু রাজা কন্দর্পনারায়ণকে ধরা তাঁহার পক্ষে এবার যেন বড় কঠিন হইয়া পড়িল। কয়েকদিন অবিরত চেষ্টার পর পণ্ডিত অবশেষে রাজ দর্শনের সুযোগ পাইলেন। বালক মধুসূদনের নিজস্ব সদ্যরচিত চমৎকার কিছু শ্লোক কন্দর্প-নারায়ণকে শোনানোও হইল। কিন্তু রাজা যেন বড় উনমনস্ক, বড় উদাসীন। মধুসূদনের কয়েকটি প্রতিভাদীপ্ত কবিতা শুনিয়া তিনি সামান্য কিছু মৌখিক প্রশংসা প্রকাশ করিলেন। কিন্তু তাহার পরই দ্রুতবেগে কোথায় কার্য্যান্তরে চলিয়া গেলেন।

অভিমানাহত পুরন্দর ভাবিতে লাগিলেন, এননতর অমনোযোগ ও উপেক্ষা তো কখনো তাঁহার দীর্ঘ অভিজ্ঞতায় দেখা যায় নাই? রাজার বিদ্যোৎসাহ কি আজকাল স্তিমিত হইয়া আসিতেছে, না ইহা আচার্য্যের নিজেরই গ্রহ-বৈগুণ্যের ফল? আসল কথাটি কিন্তু অন্যরূপ। কন্দর্পনারায়ণ তখন এক আসন্ন রাজনৈতিক সঙ্কটের

মুখে রহিয়াছেন। মুঘলশক্তি তাঁহার ক্ষুদ্র রাজ্যটিকে পরিবেষ্টন করিতে অগ্রসর হইতেছে, সেই জন্যই তিনি সম্প্রতি বড় চিন্তাকুল। কাব্য-সাহিত্য, শাস্ত্রের আলোচনা বা সুধীসজ্জনের সঙ্গ তাই তাঁহার কাছে নীরস হইয়া উঠিয়াছে।

অতিথি ভবনে বাস করিয়া পুরন্দরাচার্য্য আরও দুই চারিবার চেষ্টা করিলেন, রাজাকে তাঁহার অবসর মত ধরা যায় কিনা। পুত্রের কাব্যপ্রতিভার মূল্য তাঁহাকে বুঝাইয়া তবে তিনি ঘরে ফিরিবেন। কিন্তু পরবর্ত্তী চেষ্টাও ব্যর্থ হইল। সাক্ষাৎ হইল বটে, কিন্তু রাজার তখন বড় সময়াভাব, পণ্ডিতের সহিত কোন কথাবার্ত্তাই তিনি বলিলেন না। ক্রুদ্ধ, ক্ষুব্ধ পুরন্দরাচার্য্য অগত্যা বাড়ী ফিরিবার জন্য পুত্রসহ নৌকায় আরোহণ করিলেন। কোটালিপাড়ায় চতুষ্পাঠীর অধ্যাপনা কয়েকদিনের জন্য বন্ধ করিয়া তিনি রাজদর্শনে আসিয়াছেন—এখন সত্বর স্বগ্রামে না পৌঁছিলে নয়।

নৌকা চলিতেছে। সৌম্যদর্শন বালক মধুসূদন ছই-এর নীচে নীরবে উপবিষ্ট। বর্ষার জলস্রোতে নদী-নালা মাঠ-ঘাট সমস্ত কিছু পরিপ্লাবিত। কখনো খাল বিলের পথে, কখনোও বা বাঁশঝাড়ের ভীড় ও ধানক্ষেত ঠেলিয়া নৌকা অগ্রসর হইয়া চলে। মাঝে মঝে অতর্কিতে দেখা দেয় মাছরাঙা আর পানকৌড়ির দল। ঘন-সবুজ গঙ্গা-ফড়িঙের দল ঝাঁকে ঝাঁকে ধানের শিষ ছাড়িয়া নৌকায় উঠিয়া লাফাইতে থাকে। কৌতূহলের এসব কোন বস্তুই কিন্তু আজ বালক মধুসূদনের মনে দোলা দেয় না। মৌন, বিক্ষুব্ধ বালকের দৃষ্টি শুধু নিঃসীম আকাশের বিস্তারে স্থির নিবদ্ধ।

হঠাৎ মধুসূদন পিতার চরণ ঘেঁসিয়া আসিয়া বসিলেন। ব্যর্থতার গ্লানি অন্তরে চাপিয়া বৃদ্ধ পুরন্দরাচার্য্য এতক্ষণ যাবৎ চুপ করিয়াই বসিয়া ছিলেন। পুত্র তাঁহাকে ডাকিয়া শান্ত দৃঢ়কণ্ঠে কহিতে লাগিলেন, "বাবা, আমি সিদ্ধান্ত স্থির ক'রে ফেলেছি, আর আমি গৃহে যাবো না। আপনি একলাই আজ দেশে ফিরে যান। আমি

ভেবে দেখলাম, মানুষের আরাধনা না ক'রে ভগবানের আরাধনাই এবার থেকে একান্তভাবে ক'রবো। রাজপ্রসাদ অপেক্ষা দেবতার প্রাসাদকেই আমার উপজীব্য আমি ক'রতে চাই। রাজার এই তাচ্ছিল্য কেবল নিজেরই অপমান নয়, আমার পিতারও অপমান হয়ে বুকে বেজেছে। সমগ্র ব্রাহ্মণ পণ্ডিত সমাজ ও বিদ্যাবত্তার মর্য্যাদা এতে ক্ষুণ্ণ হ'য়েছে। তাই শুধু নয়—এ আমাদের দেশের শাস্ত্র ও ধর্ম্মসংস্কৃতির অপমান, ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের অপমান!" তেজোদৃপ্ত, অভিমানহত বালকের অধরোষ্ঠ তখন রোষে কম্পিত হইতেছে।

কিছুক্ষণ পরে দৃঢ়কণ্ঠে বালক মধুসূদন আবার কহিলেন, "বাবা, আমি মনে মনে সঙ্কল্প ঠিক করেছি, অবিলম্বে সংসার ত্যাগ ক'রে সন্ন্যাস নেব। শাস্ত্রে রয়েছে, আপনার মুখেও শুনেছি, ভক্তের ভার ভগবানই বহন করেন। আশীর্ব্বাদ করুন—এখন থেকে একমাত্র ভগবৎ-প্রসাদের উপর নির্ভর করেই আমি যেন চলতে সক্ষম হই। শুনেছি, নবদ্বীপে শ্রীগৌরাঙ্গদেবের আবির্ভাব হয়েছে। আমি তাঁরই চরণে শরণ নেব ব'লে ঠিক করেছি। আপনি কৃপা করে আজ আমায় গৃহত্যাগের অনুমতি দিন।"

বৃদ্ধ পুরন্দরাচার্য্যের মুখে কথা সরিতেছে না। বার বৎসরের ক্ষুদ্র বালক আজ একি প্রস্তাব করিতেছে? যুক্তি তাহার অকাট্য! রাজানুগ্রহ অপেক্ষা রাজার রাজা শ্রীভগবনের প্রসাদ যে বহুতর গুণে শ্রেষ্ঠ, ইহা তো অস্বীকার করিবার যো নাই। এই শ্রেয়ের পথ যে তিনি নিজেই আজীবন খুঁজিয়া আসিয়াছেন, কিন্তু ইচ্ছা সত্ত্বেও মায়ার বন্ধন কাটাইয়া উঠিতে পারেন নাই। জ্ঞানবৃদ্ধ হইয়াও যে অভিলাষ তিনি পূর্ণ করিতে সক্ষম হন নাই, তাঁহার বালক পুত্র আজ উহা সাধন করিতে প্রস্তুত।

মিনতিভরা কণ্ঠে মধুসূদন বার বার পিতার কাছে তাঁহার সম্মতি ভিক্ষা চাহিতে লাগিলেন। আচার্য্য পুরন্দরের মুখ দিয়া অতর্কিতে বাহির হইল, "বেশ তো বাবা তাই হবে। আশীর্ব্বাদ করি, তোমার

মনস্কামনা সিদ্ধ হোক। তোমার শ্রেয়ের পথে আমি বাধা জন্মাবো না। তবে একটা কথা—তুমি আজই এখান থেকেই চলে যেয়ো না! আগে বাড়ি ফিরে চল সেখানে তোমার জননী রয়েছেন। তাঁর সম্মতিও তো নেওয়া দরকার!" বৃদ্ধ পিতার নয়নে তখন অশ্রুর রেখা চক্‌চক্‌ করিয়া উঠিয়াছে। মধুসূদন তাঁহার চরণে দণ্ডবৎ করিয়া ভাব গদ্‌গদ্‌ কণ্ঠে শুধু কহিলেন, "বাবা, তবে সত্যই আপনার সম্মতি পেলাম। আজ আমার জীবন ধন্য।"

গৃহে উপনীত হইবার পর মধুসূদন জননীর চরণে নিপতিত হইলেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাকে তিনি ধরিয়া বসিলেন, "মা, আমার একটি ভিক্ষা চাহিবার আছে। আগে আমায় কথা দাও, তুমি তা আমায় দেবে।"

"বল্‌ বাবা তুই কি চাস্‌? তোকে আমার অদেয় কি আছে? যা চাইবি তা দেব বৈ কি।"

মধুসূদন যুক্তকরে নিবেদন করিলেন, তিনি সন্ন্যাস গ্রহণে ইচ্ছুক হইয়াছেন, মা'কে আজ অনুমতি দিতেই হইবে।

জননীর মাথায় এ যেন এক অতর্কিত বজ্রপাত। ক্রন্দনে, বিলাপে তিনি গৃহ অঙ্গন মুখরিত করিয়া তুলিলেন। কিন্তু তাঁহার দেওয়া আশ্বাসের সুযোগে বালক মধুসূদন তাঁহার প্রার্থিত অনুমতিটি আজ পাইয়া গেলেন।

অতঃপর ক্রন্দনরতা জননীকে আশ্বস্ত করিয়া তিনি কহিলেন, "মা তুমি অধীর হয়োনা। আমি গৃহ ত্যাগ ক'রে একেবারে নিখোঁজ হয়ে যাচ্ছিনে। শুনেছি, নবদ্বীপে ভগবান শ্রীগৌরাঙ্গদেব আজ সাঙ্গোপাঙ্গসহ অবতীর্ণ। আমি সন্ন্যাসী হয়ে তাঁরই চরণতলে জীবন কাটাবো স্থির করেছি। নবদ্বীপ আর তেমন কি দূরের পথ? আমি তো তোমাদের কাছেই থাকবো, মা।"

বৃদ্ধ পুরন্দরাচার্য্য আগাইয়া আসিয়া পুত্রকে কহিলেন, "বাবা মধুসূদন, আমার একটি কথা তুমি স্মরণ রেখো—প্রকৃত জ্ঞানের উদয়

না হ'লে শুধু বাহ্যিক সন্ন্যাস গ্রহণ কিন্তু বৃথা। তুমি নবদ্বীপে যাচ্ছো যাও। সেখানে শাস্ত্রজ্ঞান লাভের মস্ত বড় সুযোগ রয়েছে। কিন্তু আমার অনুরোধ, আগে যথারীতি জ্ঞান আহরণ ক'রে তারপর তুমি সন্ন্যাস গ্রহণ ক'রো। এখনই যেন তাড়াহুড়া করে সন্ন্যাস নিতে যেয়ো না। আগে এই কঠিন আশ্রমের যোগ্যতা অর্জ্জন করে তারপর এর ভেতর প্রবেশ ক'রবে।"

মধুসূদন সম্মত হইলেন। বেশ তো, শাস্ত্রজ্ঞান আহরণ ও মানসিক প্রস্তুতির পরই তিনি সন্ন্যাস নিবেন। জনক জননীর আশীর্ব্বাদ নিয়া এক শুভ লগ্নে দ্বাদশ বর্ষীয় বালক চিরতরে অজানার পথে বাহির হইয়া পড়িলেন।

ক্ষুদ্র বালকের এ গৃহত্যাগকে কেন্দ্র করিয়া পূর্ব্ববঙ্গের কোটালিপাড়ার সারা সমাজজীবন সেদিন আলোড়িত হইয়া উঠে। কিন্তু যে বিপুল সম্ভাবনা ইহার মধ্যে লুক্কায়িত ছিল তাহার প্রকৃত সন্ধান সেদিন কে পাইয়াছে? ফরিদপুরের এই সংসার-বিরক্ত বালকটির মধ্য দিয়াই উত্তরকালে ভারতবর্ষের অন্যতম শ্রেষ্ঠ অদ্বৈতবাদীর অভ্যুদয় ঘটিবে, তাহাই বা কে ভাবিয়াছিল? পরিণত বয়সে এই বালকের মধ্যেই আত্মপ্রকাশ করে এক অপ্রতিদ্বন্দ্বী মহাবৈদান্তিক সন্ন্যাসী—আচার্য্য শঙ্কর ও স্বামী বিদ্যারণ্যের এক মহান্ উত্তরসাধক।

মধুসূদনের সাধনজীবনের বৈশিষ্ট্য ছিল বড় অপূর্ব্ব। ভক্তিবাদের সহিত ইহাতে অদ্বৈতজ্ঞানের, বিদ্যাবত্তার সহিত যোগসাধনার অপূর্ব্ব সমন্বয় সাধিত হয়। তাঁহার রচিত দার্শনিক মহাগ্রন্থ—'অদ্বৈতসিদ্ধিঃ' বিশ্বের বিদ্বজ্জন সমাজের কাছে এক বিস্ময়কর প্রতিভার নিদর্শন রূপে কীর্ত্তিত হয়। নব্যন্যায়ের বিচার প্রণালীর সহিত সন্ন্যাসী সাধকের তত্ত্বোজ্জ্বলা বুদ্ধির মিশ্রণ ঘটে ইহাতে। অদ্বৈত তত্ত্বের এক অন্যতম মহাগ্রন্থরূপে তাই ইহা চিরচিহ্নিত হইয়া রহিয়াছে। শাস্ত্রজ্ঞান, দৈবী মনীষা ও অধ্যাত্মশক্তির বলে মধুসূদন সরস্বতী

সমসাময়িক ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অদ্বৈতবাদী সন্ন্যাসীরূপে সেদিন কীর্ত্তিত হইয়া উঠেন।

মধূসূদনের জন্মভূমি উনসিয়া এক ঐতিহ্যসম্পন্ন ব্রাহ্মণপ্রধান গ্রাম, প্রাচীন বিক্রমপুরের ইহা অংশ বিশেষ। বর্ত্তমান ফরিদপুর জেলার কোটালিপাড়া পরগণার অন্তর্ভুক্ত ছিল। এস্থান এক সময়ে এই কোটালিপাড়া মাদারীপুরেরই অংশরূপে পরিগণিত হইত।

হিমাচলোদ্ভূত গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্রের পুণ্যধারা বহুতর বাহু বিস্তার করিয়া এই ভূমির বক্ষে লুটাইয়া পড়িয়াছে। প্রকৃতির খেয়ালে নিয়ত এখানে নব নব ভাঙাগড়া-লীলাখেলার অন্ত নাই। সাগরোত্থিত এই সমতল দেশের বৈশিষ্ট্য হইতেছে ইহার নূতন জমি, নূতন পলিমাটি আর নূতন সৃজনের এক নিরন্তর প্রয়াস।

মানসিকতা ও মনীষার প্রধান উপাদান মধুসূদন তাঁহার জন্মভূমি হইতেই প্রাপ্ত হন। অপর এক উপাদান নিহিত ছিল তাঁহার বংশগত মেধা ও সৃজনশীল প্রতিভার মধ্যে। বার শতকের শেষ পাদে এক সময় কাণ্বকুব্জ অঞ্চলটি সাহাবুদ্দীন ঘোরীর অত্যাচারে বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠে। ধর্ম্মপ্রাণ পণ্ডিত রামমিশ্র অগ্নিহোত্রী এই সময়ে স্বজনগণসহ নবদ্বীপে আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করেন। এই বংশেরই একটী শাখা কালক্রমে কোটলিপাড়ায় আসিয়া উপস্থিত হয়। ন্যায় ও বেদবেদান্ত শাস্ত্রে পারদর্শী বহু বিখ্যাত পণ্ডিতের আবির্ভাব ইহাদের মধ্যে ঘটে। বঙ্গদেশে বেদের প্রচার সাধনে সেকালে রামমিশ্রের সন্তানদের অবদান ছিল অসামান্য।

এই বংশেরই প্রমোদন পুরন্দরাচার্য্যের পুত্র—মধুসূদন সরস্বতী। ধর্ম্মশাস্ত্র ও সাহিত্যে পুরন্দরাচার্য্যের অগাধ পাণ্ডিত্য। প্রতিভাধর কবিরূপেও সর্ব্বত্র তাঁহার খ্যাতি ছিল। এই ধর্ম্মনিষ্ঠ প্রতিভাধর পাণ্ডিতের গৃহে, আনুমানিক ১৫২৫ খ্রীষ্টাব্দে মধুসূদন আবির্ভূত হন। পিতার তিনি চতুর্থ পুত্র।

মধুসূদনের প্রতিভার প্রকাশ দেখা যায় বালক বয়স হইতে। মাত্র আট বৎসর বয়সে কাব্য, অলঙ্কার ও ন্যায়শাস্ত্রে তিনি পারদর্শী হইয়া উঠেন। প্রতিভা ও জ্ঞানবত্তার দিক দিয়া বালক সে অঞ্চলের এক বিস্ময়।

পুরন্দর আচার্য্যের গৃহে প্রায়ই পণ্ডিতমণ্ডলী ও আত্মীয়স্বজনের সমাগম ঘটিত। কৌতুহলী হইয়া সকলে মধুসূদনকে কাব্য রচনায় উৎসাহিত করিতেন। সঙ্গে সঙ্গেই এই অষ্টম বর্ষীয় বালকের কণ্ঠ হইতে নির্গত হইত তাঁহার স্বরচিত উচ্চশ্রেণীর শ্লোকরাশি। বার বৎসর অতিক্রম করিতে না করিতেই তাঁহার প্রতিভার দীপ্তি কোটালিপাড়ার পণ্ডিত সমাজে চমক লাগাইতে থাকে।

নিঃসঙ্গ ও কপর্দ্দকহীন অবস্থায় মধুসূদন সেদিন ঘরের বাহির হইয়া পড়িলেন। নানা পথ প্রান্তর অতিক্রম করিবার পর সম্মুখে পড়িল স্ফীতকায়া মধুমতী নদী। নিকটে কোথাও লোকালয় নাই, একখানা নৌকাও দৃষ্টিগোচর হয় না। বালক বড় দুশ্চিন্তায় পড়িলেন। নদী পার হইবার উপায় ?

লৌকিক চেষ্টা ত্যাগ করিয়া অবশেষে নিরুপায় হইয়া তাঁহাকে দেবী জাহ্নবীর শরণ নিতে হইল।

কথিত আছে, ধ্যানাবিষ্ট বালকের সম্মুখে দেবী সেদিন আবির্ভূতা হন। বলেন, "বৎস, আমি তোমার প্রতি প্রসন্না হয়েছি। আশীর্ব্বাদ করি, অচিরে এ নদী তুমি পার হতে পারবে।"

মধুসূদন উত্তরে বলেন, "করুণাময়ী জননী। আমাকে শুধু এ নদী পার ক'রলেই চলবে না, যাতে ভবনদীও পার হতে পারি সেই বর আমায় দাও।"

'তথাস্তু' বলিয়া দেবী অন্তর্হিতা হইলেন।

কিছুক্ষণ পরেই দেখা যায়, ভাটার টানে ভাসিয়া মৎস্যজীবীদের এক নৌকা দ্রুতবেগে তাঁহার দিকে তীরাভিমুখে আসিতেছে। অসহায়

বালকের উপর জেলেদের দয়া হয়, ইহাদের সাহায্যে তিনি নদী অতিক্রম করেন।

বহু দুঃখ কষ্টের পর নবদ্বীপে আসিয়া মধুসূদন যে সংবাদ শুনিলেন তাহাতে তাঁহার মর্ম্মবেদনার অবধি ছিল না। প্রেমাবতার শ্রীগৌরাঙ্গ চিরতরে নবদ্বীপ ত্যাগ করিয়া নীলাচলে চলিয়া গিয়াছেন। গৃহত্যাগী বালকের সম্মুখে সে এক মহা সমস্যা ? কিছুদিন গৌরভক্তদের মধ্যে থাকিয়া তিনি নামকীর্ত্তন শ্রবণ করিলেন, পুণ্যস্থলগুলি দেখিয়া বেড়াইলেন। তারপর অন্তরে দুশ্চিন্তা হইল—সাধনজীবনে এখন তিনি কোন্ পথ অবলম্বন করিবেন ?

বৈরাগ্য ও মুমুক্ষার পথ চিরতরে বাছিয়া নিয়াছেন, সন্ন্যাস গ্রহণ তাঁহাকে করিতেই হইবে। কিন্তু পিতার নিকট যে কথা দিয়া আসিয়াছেন, তাহাও বিস্মৃত হইবার নয়। সন্ন্যাস-জীবনের যোগ্যতা তাঁহাকে আগে অর্জ্জন করিতে হইবে। শাস্ত্রোপলব্ধির মধ্য দিয়াই ধীরে ধীরে ঘটে মোহমুক্তি,—গড়িয়া উঠে সন্ন্যাসের প্রস্তুতি। এই প্রস্তুতির পথেই তিনি আজ হইতে চলিবেন।

অধ্যাত্মশাস্ত্র পাঠে মধুসূদন কৃতসঙ্কল্প হইলেন। কিন্তু ভারতভুমি কোথায় কোন্ কেন্দ্রে তাঁহার এই বিদ্যার সাধনা তিনি শুরু করিবেন ? বারাণসী, মিথিলা—না নবদ্বীপে ?

ভারতীয় শাস্ত্রমঞ্জুষার একটি বড় চাবিকাঠি রহিয়াছে ন্যায়শাস্ত্রে। এ শাস্ত্রে পারদর্শী না হইলে শাস্ত্রজ্ঞ মহলে কেহ মানিতে চায় না। নবদ্বীপ সে সময়ে নব্যন্যায়ের তুমুল চর্চ্চায় আলোড়িত। ভারতের দিক্‌বিদিক্ হইতে বহু শিক্ষার্থী এ অঞ্চলে আসিয়া ন্যায় অধ্যয়ন করিতেছে। খ্যাতনামা আচার্য্যদেরও কোন অভাব এখানে নাই। মধুসূদন স্থির করিলেন, এখানে থাকিয়া ন্যায়বিদ্যার ভিত্তিকেই সর্ব্বাগ্রে দৃঢ় করিয়া নিবেন।

পণ্ডিত মথুরানাথ এখানকার অপ্রতিদ্বন্দ্বী নৈয়ায়িক। রঘুনাথ শিরোমণির পর এমন প্রতিভাধর পণ্ডিত আর এদেশে আত্মপ্রকাশ

করেন নাই। মধুসূদন একদিন তাঁহার নিকটে গিয়া উপস্থিত। দ্বাদশবর্ষীয় এই শিক্ষার্থীর কবিত্বশক্তি, বিচারবুদ্ধি ও বিদ্যাবত্তা দেখিয়া মথুরানাথ তো চমৎকৃত। এই প্রিয়দর্শন বালককে দেখার সঙ্গে সঙ্গে আচার্য্যের মনে এক অপত্যস্নেহও জাগ্রত হইয়াছে। তাই নিজেই উৎসাহে তাঁহার শিক্ষার ভার গ্রহণ করিলেন।

কিছুদিন অধ্যাপনার পরই কিন্তু অধ্যাপকের বিস্ময়ের অবধি রহিল না। অলৌকিক প্রতিভার অধিকারী এই বালক! অবিশ্বাস্য দ্রুততার সহিত একের পর এক শাস্ত্রগ্রন্থ সে পাঠ করিয়া ফেলে, ইহার প্রত্যেকটিতে পারঙ্গম হইয়া উঠে। অচিরে নৈয়ায়িক-শ্রেষ্ঠ গঙ্গেশ উপাধ্যায়ের অবিস্মরণীয় অবদান—'তত্ত্বচিন্তামণি' গ্রন্থ তাঁহার পড়া হইয়া গেল। তারপর পক্ষধরমিশ্র, রঘুনাথ শিরোমনি ও মথুরানাথের টীকা প্রভৃতি আয়ত্তে আনিতেও বেশী দেরী হয় নাই। অল্পকাল মধ্যে ন্যায়শাস্ত্রে মধুসূদনের সহজ ও স্বাভাবিক অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া উঠে। স্তব্ধ বিস্ময়ে আচার্য্য কেবলই তাঁহার বালক শিষ্যের এই দৈবী প্রতিভার কথা ভাবিতে থাকেন।

মধুসূদন ন্যায়শাস্ত্র পড়েন বটে, কিন্তু নবদ্বীপের পরিবেশে, ভক্ত সাধকদের মধ্যে থাকিয়া অন্তর তাঁহার ক্রমে রসায়িত হইয়া উঠিতে থাকে। মর্ম্মের মধুকোষে দানা বাঁধিয়া উঠে প্রভু শ্রীশ্রীচৈতন্যের মধুময় বাণী। ব্রজেন্দ্রনন্দনের রসোজ্জ্বল মূর্ত্তির ধ্যান বৈরাগী বালককে দিনের পর দিন রসাবিষ্ট করিয়া তোলে।

শ্রীগৌরাঙ্গদেব এক অবতার পুরুষ—এই ধারণাটি বালককাল হইতে মধুসূদনের অন্তরে বদ্ধমূল হইয়া আছে। মহাপ্রভুর প্রচারিত তত্ত্ব ও রসমধুর লীলাকাহিনীও তাঁহাকে কম আলোড়িত করে নাই। ভক্তিরসের প্লাবন তিনি দিগ্বিদিকে বহাইয়া দিয়াছেন, ভক্তিপথের অনুকূল, মাধুর্য্যময় দ্বৈতবাদ তিনি প্রচার করিয়া গিয়াছেন—মধুসূদনের হৃদয়েও রহিয়াছে এই একই সুরের মধু-গুঞ্জন। আবার নব্যন্যায় পড়ার ফলে বিচারের দিক দিয়াও সম্প্রতি দ্বৈতবাদে তাঁহার

আস্থা দৃঢ়তর হইয়া উঠিয়াছে। ন্যায়শাস্ত্রমতে ঈশ্বর, জীব, জগৎ সব কিছুই পৃথক। তাই এ শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত—দ্বৈত। মধুসূদন মনে মনে এবার স্থির করিলেন, আপন প্রতিভা ও বিদ্যাবলে তিনি এমন এক অকাট্য দ্বৈতবাদী মহাগ্রন্থ রচনা করিবেন, যাহা মহাপ্রভুর প্রচারিত মতকে দার্শনিক বিচারের দিক দিয়া অপ্রতিদ্বন্দ্বী করিয়া তুলিবে।

কিন্তু এ কাজের এক প্রধান অন্তরায় শঙ্কর-মত। শঙ্করে অদ্বৈত মত খণ্ডন না করিয়া ভক্তিবাদী দ্বৈতমত তিনি সর্ব্বভারতে কি করিয়া স্থাপন করিবেন? প্রথমে তাই অদ্বৈতবাদকে সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত করা চাই। অদ্বৈতবাদের দুর্ব্বলতা জানিয়া নিয়া, তাহার দুর্গে বসিয়াই চরম আঘাত তিনি হানিবেন। মধুসূদন স্থির করিলেন, এবার তাঁহাকে যাইতে হইবে বেদান্তবিদ্যার মর্ম্মকেন্দ্রে—বারাণসীতে।

নবদ্বীপ হইতে বারাণসী দীর্ঘদিনের পথ। তখনকার দিনে হিংস্র জীবজন্তু, দস্যু ও রাষ্ট্রবিপ্লবের জন্য এ পথে বিপদের অন্ত ছিল না। কিন্তু কিশোর অভিযাত্রীর সঙ্কল্প একেবারে অটুট, তাঁহাকে বাধা দিবার উপায় কোথায়? কপর্দ্দকহীন মধুসূদন সেদিন অসীম সাহসে ভর করিয়া তাঁহার প্রিয় গ্রন্থের ঝুলিটি কাঁধে নিয়া পদব্রজে সেখানে আসিয়া পৌঁছিলেন।

কাশীধামে তখন নিরন্তর শাস্ত্রচর্চ্চা ও বিচার-দ্বন্দ্বের আলোড়ন। দিক্‌পাল পণ্ডিতদের অনেকেই সেখানে বহুতর শিষ্য পরিবৃত হইয়া বাস করেন। রামতীর্থ, উপেন্দ্র তীর্থ, নারায়ণ ভট্ট, মাধব সরস্বতী, প্রভৃতি মহাপণ্ডিতের প্রতিভার ছটায় চতুর্দ্দিক আলোকিত। ইহাদের মধ্যে বেদান্তকেশরী স্বামী রামতীর্থকেই মধুসূদনের পছন্দ হইল। তাঁহারই নিকট বেদান্তের উচ্চতর পাঠ তিনি নিতে লাগিলেন।

আচার্য্য রামতীর্থের কাছে এমন শিক্ষার্থী খুব কমই আসিয়াছে। বেদান্ত অধ্যয়নের যে কয়টি গুণ প্রধান, মধুসূদনের মধ্যে তাহা পূর্ণ মাত্রায় দেখা যায়। ত্যাগবৈরাগ্য ও ভক্তির সহিত তাঁহার মধ্যে বর্ত্তমান রহিয়াছে কুশাগ্র বিচারবুদ্ধি, তাঁহার লোকোত্তর প্রতিভার

সহিত মিলিত হইয়াছে শ্রমনিষ্ঠা ও দুশ্চর তপস্যা। কঠোরব্রতী ব্রহ্মচারীর জীবনে আন্তর সাধনা ও শাস্ত্রানুশীলন এক সঙ্গেই এবার হইতে অনুষ্ঠিত হইতে থাকে।

নিতান্ত অল্প সময়ের মধ্যে, অমানুষী প্রতিভাবলে মধুসূদন অগণিত দুরূহ শাস্ত্রগ্রন্থ আয়ত্ত করিয়া ফেলিলেন। নবদ্বীপে থাকিতেই তিনি ন্যায়শাস্ত্রে অসাধারণ পাণ্ডিত্য অর্জন করিয়াছেন। এবার বেদান্তেও তিনি পারঙ্গম হইয়া উঠিলেন।

দাক্ষিণাত্যের শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত নারায়ণ ভট্টের সহিত এই সময়ে একদিন কাশীর প্রসিদ্ধ বৈদান্তিক নৃসিংহাশ্রম ও উপেন্দ্র সরস্বতীর বিচার-দ্বন্দ্ব উপস্থিত হয়। এ বিচারে তরুণ নৈয়ায়িক মধুসূদনও বেদান্তবাদী পণ্ডিতদ্বয়কে যথেষ্ট সাহায্য করেন। কিন্তু দক্ষিণী পণ্ডিত নারায়ণ ভট্ট ছিলেন এক ধুরন্ধর মীমাংসা-শাস্ত্রবিদ্। এই বিদ্যা সহায়ে তিনি ঐ দুই প্রবীণ বেদান্তবাদীকে সভামধ্যে নিরুত্তর করিয়া দেন। এই ঘটনায় মধুসূদন সজাগ হইয়া উঠিলেন, দৃষ্টি তাঁহার প্রসারিত হইয়া গেল। মীমাংসাশাস্ত্র আয়ত্ত করিতে তিনি উদ্যোগী হইলেন।

একাধারে নৈয়ায়িক ও মীমাংসক বলিয়া তখন কাশীতে মাধব সরস্বতীর খুব খ্যাতি। মধুসূদন এবার তাঁহারই কাছে শরণ নিলেন। অল্প কিছুকাল মধ্যেই মীমাংসাশাস্ত্রে তিনি প্রগাঢ় বুৎপত্তি লাভ করিতে সক্ষম হন।

গোড়া হইতে ন্যায়ের দৃঢ় ও পরিমার্জ্জিত ভিত্তির উপর মধুসূদন দণ্ডায়মান। এবার একের পর এক সমস্ত দর্শন ও অধ্যাত্ম-শাস্ত্রের উপর তিনি স্বীয় অধিকার প্রতিষ্ঠিত করিতে লাগিলেন। একনিষ্ঠ সাধন ও শাস্ত্রানুশীলনের ফলে তাঁহার জীবনে অতঃপর এক অপরূপ তত্ত্বোজ্জ্বলা বুদ্ধি বিকশিত হইয়া উঠে, আর সেই সঙ্গে বেদান্তের নিহিতার্থও ধীরে ধীরে তাঁহার অন্তরসত্তায় উদ্ভাসিত হইয়া উঠিতে থাকে। মধুসূদনের তত্ত্ববিচার ও সাধনার সম্মুখে অদ্বৈত জ্ঞানের প্রকৃত রহস্যটি উদ্‌ঘাটিত হয় বটে, কিন্তু যে ভক্তিবাদের বীজ

তাঁহার জীবনে দীর্ঘকাল ধরিয়া অঙ্কুরিত হইয়া উঠিতেছে তাহার মর্ম্মকথাটিও এই সময়ে নূতন করিয়া ধরা দেয়।

মধুসূদন উপলব্ধি করিলেন—ভগবানকে অন্তরাত্মা বলিয়া না জানিলে জীবের প্রকৃত ভক্তি, প্রকৃত আত্মসমর্পণ তো সম্ভব হয় না! আর এই আত্মস্বরূপের বোধই যে সাধকের সমস্ত ভেদজ্ঞানকে বিলুপ্ত করিয়া দেয়—অভেদ ও অদ্বৈতজ্ঞান তাঁহার সত্ত্বায় উদ্ভাসিত হইয়া উঠে। অন্তরাত্মাই যে আমি স্বয়ং। ভক্তি ও আত্মসমর্পণে তাই সামান্য একটু ভেদজ্ঞান থাকিলেই জীবের 'নিজত্ব' থাকিয়া যায়—দ্বৈত সেখানে আসিয়া পড়ে। বৃহদারণ্যকে মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক এই পরম অদ্বৈতজ্ঞানকেই উদ্‌ঘাটিত করিয়াছেন আত্মপ্রীতির উদাহরণের মধ্যে দিয়া—"ন বা অরে পত্যুঃ কামায় পতিঃ প্রিয় ভবতি, আত্মনস্তু কামায় পতিঃ প্রিয়ঃ ভবতি"—অর্থাৎ, শ্রুতি বলিতেছেন, প্রকৃতপক্ষে পতির জন্য পতি প্রিয় হয় না, নিজের জন্যই পতি প্রিয় হইয়া উঠে। ইহার নিহিতার্থ—প্রকৃত প্রেম হয় আত্মার সাথেই এবং তাহার সহিত সম্পর্কান্বিত হইয়া ইহা অপরের উপর জন্মে। পূর্ণতম প্রেম এবং ভক্তি তাই কেবলমাত্র ভগবানকে—আত্মাকে উপলব্ধি করিলেই সম্ভবপর হইতে পারে। অর্থাৎ, পূর্ণ অভেদ জ্ঞানেই পূর্ণ ভক্তি নিহিত রহিয়াছে —অন্যত্র নহে। সাধক মধুসূদন আরও বুঝিতে পারিলেন, সর্ব্বাপেক্ষা প্রামাণ্য শাস্ত্র শ্রুতি, প্রকৃতপক্ষে অদ্বৈত ব্রহ্মেরই পরম তত্ত্ব নির্দ্দেশ করিতেছে।

অদ্বৈত সিদ্ধান্তের যৌক্তিকতা ও সত্যতা সম্বন্ধে এখন মধুসূদনের আর কোন সন্দেহ নাই। আজ এই সত্য তাঁহার জীবনের সহিত অচ্ছেদ্য সম্বন্ধে যুক্ত হইয়া গিয়াছে। তাই পরিতাপ হয়, কেন ভ্রান্ত বুদ্ধি দ্বারা পরিচালিত হইয়া এ অদ্বৈতবাদকেই তিনি খণ্ডন করিতে আসিয়াছিলেন? শুধু তাহাই নয়, এজন্য কপট আচরণ করিতেও তিনি দ্বিধা করেন নাই। শিক্ষাগুরু, মহান আচার্য্য স্বামী রামতীর্থের

নিকটে তিনি তাঁহার বেদান্তপাঠের প্রকৃত উদ্দেশ্য গোপন করিয়াছেন। এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত আজ তাঁহাকে করিতেই হইবে।

অনুতপ্ত মধুসূদন গুরুকে নিবেদন করিলেন, "ভগবান্, আমি আপনার চরণে গুরুতর অপরাধ করেছি। আপনি আমার এ পাপের জন্য উপযুক্ত দণ্ড দিন।"

স্বামী রামতীর্থ এ কথায় চমকিয়া উঠিলেন। কহিলেন, "সে কি বৎস! তোমার মত সদাচারী, গুরুভক্ত বিদ্যার্থী যে আমার এখানে কখনো আসেনি। কোন অন্যায় আচরণই তো আমি তোমায় আজ পর্য্যন্ত ক'রতে দেখিনি। তবে তোমার মুখে এসব কি কথা?"

মধুসূদন অশ্রুসজল চক্ষে অকপটে তখন সমস্ত কাহিনী বিবৃত করিলেন, "ভগবান, আমি কি উদ্দেশ্যে আপনার কাছে বেদান্ত শিক্ষা করতে এসেছিলাম তা খুলে বলবো। ভয় ছিল, আগে সে কথা বললে, আপনি আপনার শ্রেষ্ঠ বিদ্যাসম্পদ আমায় দেবেন না। সংসার ত্যাগ করে আমি চৈতন্যদেবের আশ্রয় গ্রহণের জন্য নবদ্বীপে যাই। কিন্তু তার দর্শনলাভ ভাগ্যে ঘটেনি, তিনি তখন সন্ন্যাস নিয়ে শ্রীক্ষেত্রে গিয়েছেন। তারপর পিতৃ আজ্ঞা অনুসারে নবদ্বীপে শাস্ত্র-জ্ঞান আহরণ করতে থাকি। উদ্দেশ্য ছিল, শাস্ত্রপাঠ দ্বারা মন মোহমুক্ত হ'লে আমি সন্ন্যাস নেব। নব্যন্যায়ে আমার ক্রমে অধিকার জন্মালো। তখন সঙ্কল্প ক'রলাম, শ্রীচৈতন্যের ভক্তিবাদ ও দ্বৈতবাদের অনুকূল এক শ্রেষ্ঠ দার্শনিক গ্রন্থ আমি লিখবো, অদ্বৈতবাদকে খণ্ডন ক'রবো। এই গোপন উদ্দেশ্য নিয়েই আমি এসেছিলাম। কিন্তু ক্রমে ক্রমে অদ্বৈততত্ত্বের পরম রসে আমি নিমজ্জিত না হয়ে পারিনি। আপনার কৃপা ছাড়া প্রকৃত সত্য ও সিদ্ধান্তের খোঁজ আমি পেতাম না। কপট বিদ্যার্থীরূপে এসে আমি এক মহাপাপ করেছি—আপনি এর দণ্ড আজ আমায় দিন।"

রামতীর্থের অন্তর ততক্ষণে হর্ষে বিস্ময়ে পূর্ণ হইয়াছে। মধুসূদনকে স্নেহালিঙ্গনে বদ্ধ করিয়া তিনি কহিলেন, "বৎস সে সময়ে

তুমি যে তত্ত্বকে সত্য বলে ধরেছিলে তার সমর্থনের জন্য কপটতার আশ্রয় না নিয়ে পারো নি। কিন্তু আজ তুমি প্রকৃত বস্তুকেই ধরতে সক্ষম হয়েছো। আজ তুমি হয়েছো সিদ্ধকাম, অদ্বৈত তত্ত্বের স্ফুরণে তোমার শাস্ত্রানুশীলন আজ সার্থক। তবুও তোমার অন্তর থেকে অনুতাপ যদি না-ই যায়, তবে এক কাজ কর। তুমি প্রায়শ্চিত্ত হিসাবে সন্ন্যাস নাও। সন্ন্যাসে পুনর্জ্জন্ম হবে—পাপেরও মোচন হবে। তুমি মণ্ডলেশ্বর বিশ্বেশ্বর সরস্বতীর নিকট সন্ন্যাস গ্রহণ কর।"

গুরু রামতীর্থ কিছুক্ষণ মৌন থাকিয়া আবার মধুসূদনকে কহিলেন, "বৎস, আর একটি কথা শোন। মাধ্ব সম্প্রদায়ের ব্যসরায়তীর্থ আমাদের অদ্বৈতবাদকে খণ্ডন ক'রে তাঁর সুবিস্তৃত গ্রন্থ—'ন্যায়ামৃত' লিখেছেন। এ গ্রন্থ আমাদের অপূরণীয় ক্ষতি করেছে। তুমি এর খণ্ডন করে অদ্বৈত মত সিদ্ধ কর, সুপ্রতিষ্ঠিত কর। নবদ্বীপের অসামান্য প্রতিভা-সম্পদ তোমার মধ্যে। নব্যন্যায় শাস্ত্রে তুমি প্রায় অজেয়। তাই এ মহৎ কাজ তুমিই পারবে। এই দুরূহ কাজটি সম্পন্ন ক'রে তুমি আমার সন্তোষ বিধান কর।" সানন্দে সম্মত হইয়া মধুসূদন গুরুর চরণে প্রণত হইলেন।

ইহার পর তিনি বিশ্বেশ্বর সরস্বতীর আশ্রমে গিয়া উপস্থিত হন। সরস্বতী মহারাজ কহিলেন, "মধুসূদন, তোমার মত সুযোগ্য শিষ্যই তো আমি চাই। কিন্তু বৎস, শুধু পণ্ডিত হ'লেই সন্ন্যাসের যোগ্যতা অর্জ্জন করা যায় না। এজন্য প্রধানতঃ প্রয়োজন বৈরাগ্য ও ভগবদ্-ভক্তি। আমি প্রথমে দেখতে চাই, তোমার সন্ন্যাস গ্রহণের ইচ্ছা প্রকৃতই দৃঢ়, না শুধু মনের আবেগ সঞ্জাত। আমি কিছুদিনের জন্য তীর্থ পর্য্যটনে যাচ্ছি, সেখান থেকে ফিরে এসে তোমাকে সন্ন্যাসদীক্ষা দেব। ইতিমধ্যে তুমি গীতার একটি টীকা রচনা কর। তা হতে তোমার যোগ্যতা আমি বুঝবো।"

সরস্বতী মহারাজের নির্দ্দেশ অনুযায়ী গীতার এক অপরূপ টীকা মধুসূদন প্রণয়ন করিয়াছেন। উহার ছত্রে ছত্রে রহিয়াছে তত্ত্বজ্ঞানের

সহিত ভক্তিরসের অমৃত বর্ষণ। তীর্থ হইতে ফিরিয়া আসিয়া সরস্বতীজী এই টীকা দেখিয়া সন্তুষ্ট হন, ইহার পরেই মধুসূদনকে তিনি সন্ন্যাস ধর্ম্মে দীক্ষিত করেন।

শিক্ষাগুরু রামতীর্থের নিকট মধুসূদন অদ্বৈতগ্রন্থ রচনার যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, সন্ন্যাস নিবার পরও তিনি তাহা ভুলেন নাই। দীর্ঘ দিনের পরিশ্রম, বিদ্যাবত্তা ও একনিষ্ঠ শাস্ত্রসাধনার ফলে তাঁহার মহাগ্রন্থ—'অদ্বৈতসিদ্ধিঃ' রচিত হইল। অদ্বৈতবাদ খণ্ডনের জন্য মাধ্ব সম্প্রদায়ের শাস্ত্রবিদ্‌গণ এযাবৎকাল তর্কযুক্তি উদ্ভাবন করিয়াছেন, আচার্য্য ব্যাস-তীর্থ তাহা অপূর্ব্ব নৈপুণ্য সহকারে তাঁর দ্বৈতবাদী গ্রন্থ ন্যায়মৃত-এ সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন, স্বীয় মতবাদ দ্বারা তাহাকে প্রায় অকাট্য করিয়া তুলিয়াছেন। অপ্রতিদ্বন্দ্বী নৈয়ায়িক ও বৈদান্তিক মধুসূদন প্রতি পঙ্‌ক্তি ধরিয়া এই গ্রন্থের খণ্ডন করিলেন, অদ্বৈতবাদকে দৃঢ়তর ভিত্তিতে তিনি প্রতিষ্ঠিত করিলেন।

সারা ভারতবর্ষে সেদিন মধুসূদনের এই মহাগ্রন্থের জয়ধ্বনি উঠে। সমসাময়িক কালের অধ্যাত্মপন্থীদের মধ্যে দ্বৈতবাদীদের প্রতাপ বড় বৃদ্ধি পায়। ইহার ফলে দিনে দিনে অদ্বৈতবাদী মত অনেকাংশে স্তিমিত হইয়া আসিতে থাকে। মধুসূদনের সাধনলব্ধ প্রজ্ঞা ও তাঁহার মহাগ্রন্থ 'অদ্বৈতসিদ্ধিঃ' তাই এ সময়ে এদেশে এক ঐতিহাসিক কীর্ত্তি অর্জ্জন করে।

সন্ন্যাসীগুরু বিশ্বেশ্বর সরস্বতীর নিকট এবার বৈদান্তিক মধুসূদনের সাধনভজন শুরু হইয়াছে। কৃচ্ছ্রব্রতী নবীন সন্ন্যাসী এ সময় হইতে এক সুনিয়ন্ত্রিত পদ্ধতিতে আত্মসাধনায় রত হন।

মধুসূদন একবার তাঁহার গুরু বিশ্বেশ্বর সরস্বতী ও সতীর্থগণসহ তীর্থ পরিক্রমায় বাহির হইয়াছেন। যমুনা তীরের একটি বিশেষ স্থানে পৌঁছিয়া সরস্বতীজী তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন, "বৎস, এ স্থানটি তোমার সাধন ভজনের পক্ষে বড় অনুকূল। এখানে কিছুকাল তুমি যাপন কর, তপস্যায় রত হয়ে। আমরা সবাই তীর্থ দর্শন করে ফিরবার

পথে তোমার সঙ্গে আবার মিলিত হবো।" মধুসূদন গুরুর নির্দ্দেশ মত নদীতীরে আসন পাতিয়া বসিলেন।

তাঁহার এ অবস্থানকে কেন্দ্র করিয়া শীঘ্রই এক অলৌকিক কাণ্ড ঘটিল। সম্রাট আকবরের এক প্রিয় মহিষী তখন দুশ্চিকিৎস্য শূল-রোগে আক্রান্ত হইয়াছেন। কোন ঔষধেই তাঁহার বেদনার উপশম ঘটিতেছে না। হঠাৎ এক রাত্রে সম্রাটপত্নী স্বপ্ন দেখিলেন, যমুনাতীরে এক শক্তিধর সন্ন্যাসী তপস্যানিরত আছেন এবং তাঁহার নিকট হইতে ঔষধ পাইয়াই যেন তাঁহার রোগমুক্তি ঘটিয়া গেল।

সাধু-সন্ন্যাসী ও ফকিরের উপর আকবরের ভক্তি বিশ্বাস বরাবরই বেশ কিছুটা ছিল। ব্যাপারটিকে তিনি তাই উপেক্ষা করিলেন না। স্বপ্নের কথা সত্য কিনা ইহা দেখিতে সম্রাট উৎসুক। তাই আদেশ প্রদত্ত হইল, সত্যই যমুনার তীরে কোন সাধু আছেন কিনা সন্ধান নিতে হইবে। ধ্যানপরায়ণ সন্ন্যাসী মধুসূদনের সংবাদ অচিরে সম্রাটের নিকট গিয়া পৌঁছিল।

আকবর ছদ্মবেশে মহিষীকে নিয়া নদীতীরে উপনীত হইলেন। তাঁহাদের সম্মুখে এক অপূর্ব্বদৃশ্য! এক কৃচ্ছ্রব্রতী তরুণ তাপস একান্ত-ভাবে ভগবৎ-ধ্যানে বিভোর হইয়া আছেন। উচ্চ বালুকাস্তূপ চারিদিক হইতে তাঁহাকে ঘিরিয়া ফেলিয়াছে। নিজের দেহ বা জাগতিক পরিবেশের প্রতি ধ্যানতন্ময় সাধুর দৃষ্টি নাই।

দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করিবার পর দেখা গেল, তরুণ সন্ন্যাসীর ধ্যান ভাঙ্গিতেছে।

সম্রাটপত্নী সকাতরে তাঁহার রোগ যন্ত্রণার কথা নিবেদন করিলেন। মধুসূদন কৃপাভরে কহিলেন, "মা, তুমি ঘরে যাও, ভগবৎ-কৃপায় অচিরে তুমি রোগমুক্ত হবে।"

সম্রাটমহিষী শীঘ্রই বিস্ময়করভাবে এই শূলব্যাধির কবল হইতে নিষ্কৃতি পাইয়াছিলেন। আকবর এই সময়ে স্বীয় পরিচয় প্রদান করিয়া তরুণ সন্ন্যাসীকে বহু ধনরত্ন উপহার দেন। কিন্তু মধুসূদন নিস্পৃহ।

এ সব প্রত্যাখ্যান করিয়া বলেন, "সম্রাট, আপনি হচ্ছেন প্রজা ও ধর্ম্মের রক্ষক, সেই পবিত্র কর্ত্তব্য আপনি পালন করতে থাকুন, তাই শুধু আমি চাই।"

তীর্থ প্রত্যাগত বিশ্বেশ্বর সরস্বতী সমস্ত কাহিনী শুনিয়া পরম আনন্দিত হন। উপরোক্ত ঘটনার পর শুধু জনসাধারণের মধ্যেই নয়, সাধু-সন্ন্যাসী ও শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত মহলেও মধুসূদন সরস্বতীর সাধনার খ্যাতি ছড়াইয়া পড়ে।

ইহার পর দীর্ঘকাল চলিয়া গিয়াছে। মধুসূদন সরস্বতী এখন বয়সে প্রবীণ—প্রভাব প্রতিপত্তি তাঁহার অতুলনীয়। গীতার টীকা ও অদ্বৈতসিদ্ধির পর মহামনীষীর লেখনী হইতে ক্রমান্বয়ে বহুতর অমূল্য শাস্ত্রগ্রন্থ ও টীকা নির্গত হইয়া চলিয়াছে। শুধু কাশীধামেরই নয়, সমসাময়িক ভারতের এক শীর্ষস্থানীয় বৈদান্তিক সন্ন্যাসী—একপত্রী শাস্ত্রবিদ্ তিনি। বারাণসী ভারতের সাধক ও পণ্ডিতদের মর্ম্মকেন্দ্র, আর সেদিন এই কেন্দ্রেরই এক অপ্রতিদ্বন্দী নেতা—বেদান্তকেশরী মধুসূদন সরস্বতী। ফরিদপুর কোটালিপাড়ায় সেই অখ্যাত বালকের হস্তেই সেদিন বেদান্তধর্ম্মের বিজয়-বৈজয়িন্তী রহিয়াছে উড্ডীয়মান। কন্দর্পনারায়ণের রাজসভার অবজ্ঞাত সেই তেজস্বী বালক আজ তাঁহার প্রাণের আশা পূর্ণ করিয়াছেন, রাজপ্রসাদের পরিবর্ত্তে ভগবৎপ্রসাদ লাভ করিয়া তিনি কৃতকৃতার্থ।

কাশীর গঙ্গাতীরে চৌষট্টিযোগিনী ঘাটে এই সময়ে মহাবৈদান্তিক মধুসূদন সরস্বতীর আশ্রমটি অবস্থিত। ভক্ত তুলসীদাস থাকেন ইহারই অদূরে, হরিশ্চন্দ্র ঘাটের নিকটে। তুলসীদাস ইষ্টমন্ত্র রামনামে সদা তন্ময়, পাণ্ডিত্যে, ও অলৌকিক শক্তিতেও তিনি অনন্যসাধারণ। মধুসূদন ও তুলসীদাস এই দুই প্রতিবেশী মহাত্মার মধ্যে বড় ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ সে সময়ে দেখা যাইত।

তুলসীদাস তাঁহার শিক্ষা ও ভজনের নির্দ্দেশ তখন সংস্কৃত ভাষায়

আর প্রচার করেন না—সাধারণের বোধগম্য ভাষা হিন্দিতেই সব কিছু পরিবেশিত হয়। তাঁহার রচিত রামায়ণ প্রভৃতিও তিনি লিখিয়াছেন হিন্দিতে। আচার্য্য ও লোকগুরু হইয়া একি নিম্নস্তরের রুচি? একদল পণ্ডিত বড় ক্রুদ্ধ হইলেন। তুলসীদাসকে চাপিয়া ধরা হইল, কেন তিনি এরূপ অবাঞ্ছনীয় কাজ করিতেছেন? ভক্তপ্রবর হাসিয়া উত্তর দিলেন,—

হরি হর যশ সুর নয় গিরা, বরণহি সন্ত সুজান।
হাণ্ডী হাটক চারুচীর রান্ধে স্বাদ সমান।

অর্থাৎ, হরি হরের যশ সাধুগণ দেবভাষা অথবা মানবীয় ভাষা যাহাকেই বর্ণনা করুন কেন, সব কিছুই সমান। সোনার হাঁড়ি বা মাটির হাঁড়ি, যাহাতেই রান্না করা হোক—আস্বাদ কিন্তু হয় তাহার একই রকম।

বিক্ষুব্ধ পণ্ডিতেরা এই দোঁহাটি নিয়া পণ্ডিত শিরোমণি মধুসূদনের নিকট আসিলেন। অবিলম্বে তাঁহারা সকলে জানিতে চান, তাঁহাদের অভিযোগ সম্বন্ধে সরস্বতী মহারাজের কি মত। পরমভক্ত তুলসীদাসের অমৃতনিষ্যন্দী কাব্যের সহিত মধুসূদন সরস্বতীর পরিচয় পূর্ব্ব হইতেই রহিয়াছে। তৎক্ষণাৎ এক রসমধুর শ্লোক রচনা করিয়া তিনি সেদিন জানাইয়া দিলেন—

পরমানন্দপত্রোহয়ং জঙ্গমস্তুলসীতরুঃ।
কবিতা মঞ্জরী যস্য রামভ্রমরচুম্বিতা॥

অর্থাৎ তুলসীদাসরূপ চলমান তুলসীতরুর পত্র পরম আনন্দময়, সেই তুলসীতরুর মঞ্জরী হইতেছে তুলসীদাসের কবিতা—আর সেই কবিতা মঞ্জরী রাম-ভ্রমর দ্বারা চুম্বিত। প্রবীণ বৈদান্তিকের একি অপূর্ব্ব ভক্তিভাব ও বৈদগ্ধ্য! এমন উদারতা ও গুণগ্রাহিতাও তো সহজে দেখা যায় না। রক্ষণশীল ব্রাহ্মণগণেরা বড় বিস্মিত হইয়া গেলেন। সঙ্গে সঙ্গে তুলসীদাসের প্রতি সশ্রদ্ধ না হইয়াও তাঁহাদের উপায় রহিল না।

মধুসূদনের এই উদার স্বীকৃতি বারাণসীর শাস্ত্রজ্ঞ ও পণ্ডিত-সমাজকে তুলসীদাসের গুণবত্তা সম্বন্ধে সজাগ করিয়া তোলে। তুলসীর নবউৎসারিত ভক্তিপ্রবাহকে বাধামুক্ত করিতে মধুসূদন সরস্বতীর সমর্থন সে সময়ে কম সাহায্য করে নাই।

স্পষ্টতঃই বুঝা গেল, জ্ঞান ও ভক্তির গঙ্গা-যমুনার ধারা মধুসূদনের জীবনদর্শন ও তাঁহার সাধনায় সম্মিলিত হইয়াছে। দ্বৈতবাদের সমস্ত যুক্তিতর্কাদি খণ্ডন করিয়া যিনি অদ্বৈতবাদ সিদ্ধ করিলেন, তাঁহারই লেখায় পাওয়া গেল প্রেমভক্তি-রসের রসায়িত শ্লোক—

অদ্বৈতসাম্রাজ্যপথাধিরূঢ়া স্তৃণীকৃতাখণ্ডলবৈভবাশ্চ।
শঠেন কেনাপি বয়ং হঠেন দাসীকৃতা গোপবধূবিটেন॥

অর্থাৎ, আমরা অদ্বৈত সাম্রাজ্যের পথে আরূঢ় হইলেও, ইন্দ্রের বৈভব তৃণের ন্যায় তুচ্ছ জ্ঞান করিলেও কোন এক গোপবধূ-লম্পট, শঠ কর্ত্তৃক বলপূর্ব্বক দাসরূপেই পরিণত হইয়াছি।

শ্রীকৃষ্ণের পরম মধুর রূপ ও তাঁহার উপাসনার উল্লেখ করিয়া মধুসূদন সরস্বতী বলিয়াছেন—

বংশীবিভূষিতকরান্নবনীরদাভাৎ
পীতাম্বরাদরুণবিম্বফলাধরোষ্ঠাৎ।
পূর্ণেন্দুসুন্দরমুখাদরবিন্দনেত্রাৎ
কৃষ্ণাৎ পরং কিমপি তত্ত্বমহং ন জানে॥

শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব হইতে পরমতত্ত্ব আর কি আছে, মধুসূদন সরস্বতী তাহা জানেন না—আপাত দৃষ্টিতে তাঁহার একথা অদ্বৈতবাদ বিরোধী মনে হইলেও, প্রকৃতপক্ষে তাহা কিন্তু মোটেই নয়। যে সাকার কৃষ্ণের উপাসনা করিতে মধুসূদন বলেন, তিনি হইতেছেন 'উপাস্য পরমতত্ত্ব'। উপাস্য-তত্ত্বের মধ্যে তিনি শ্রেষ্ঠতম, কিন্তু তাঁহার 'জ্ঞেয়তত্ত্ব' অবশ্যই নির্গুণ ও নির্ব্বিশেষ। মধুসূদনের মতে, তাঁহার এই কৃষ্ণতত্ত্বের কথায় অদ্বৈততত্ত্ব তাই মোটেই খণ্ডিত হয় নাই।

ভগবদ্গীতায় ভক্তির স্তর ভেদের কথা বলিতে গিয়া মধুসূদন যাহা

বলিয়াছেন তাহা তাঁহার জ্ঞান-ভক্তির এক অপরূপ সমন্বয়বাদকে চমৎকাররূপে ফুটাইয়া তোলে। তাঁহার মতে, প্রথমস্তরে জীব নিজেকে মনে করে ভগবানের দাস। দ্বিতীয় স্তরে মনে করে, ভগবান তাহার ভক্তি-প্রেমেরই অধীন। তৃতীয় স্তরে আসিয়া নিজেকে সে উপলব্ধি করে ভগবান হইতে অভিন্নরূপে। মহাবৈদান্তিক ও পরমভক্ত সন্ন্যাসী মধুসূদনের মতে কিন্তু এই অভেদ উপাসনাই ভক্তির শেষ স্তর।

মধুসূদনের বিস্ময়কর মনীষা ও তাঁহার মহাগ্রন্থ অদ্বৈতসিদ্ধির প্রচার তাঁহাকে অচিরে সারা ভারতে সুপরিচিত করিয়া দেয়। জ্ঞান ও ভক্তির অপূর্ব্ব সমন্বয়বাদও তাঁহার জনপ্রিয়তা কম বৃদ্ধি করে নাই। সর্ব্বোপরি ইহার সহিত মিলিত হয় তাঁহার অলৌকিক যোগশক্তির খ্যাতি। বলা বাহুল্য, এসব কারণে তাঁহার বারাণসী আশ্রমে বহুতর শিক্ষার্থীর ভীড় জমিতে থাকে, এক অদ্বিতীয় আচার্য্যরূপে তিনি বেদান্তজগতে কীর্ত্তিত হইয়া উঠেন। তাঁহার বহুতর কৃতী শিষ্যদের মধ্যে প্রধান হইতেছেন বলভদ্র, শেষগোবিন্দ, পুরুষোত্তম সরস্বতী প্রভৃতি। দুইজন অদ্বৈতবাদ-বিরোধী মহা প্রতিভাধর ছাত্রও মধুসূদন সরস্বতীর নিকট শিক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইঁহাদের একজন হইতেছেন মধ্ব সম্প্রদায়ের পণ্ডিত ব্যাসরাম আর অপরজন—গৌড়ীয় বৈষ্ণবদর্শনের শ্রেষ্ঠ ধারক ও বাহক শ্রীজীব গোস্বামী।

মধুসূদনের 'অদ্বৈতসিদ্ধিঃ' দ্বৈতবাদের উপর এক তীব্র আঘাতরূপে নিপতিত হয়। মধ্ব সম্প্রদায়ের পণ্ডিতশিরোমণি ব্যাসরাজের শ্রেষ্ঠ অদ্বৈতবিরোধী গ্রন্থ 'ন্যায়ামৃত' এ আঘাতে অনেকটা হীন হইয়া পড়ে। শিষ্য ব্যাসরামকে এক কূট পরামর্শ দিয়া ব্যাসরাজ বলেন, সে যেন মধুসূদনের কপট শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া তাঁহার সমস্ত তর্কযুক্তির রহস্য জানিয়া নেয় এবং অদ্বৈতসিদ্ধির প্রতিবাদী গ্রন্থ রচনা করে।

ব্যাসরামের ছলনা সম্পর্কে সমস্ত কিছু জানিয়াও পরম উদার, আচার্য্য মধুসূদন তাঁহাকে যথোপযুক্তভাবেই শিক্ষা দান করেন।

উত্তরকালে এই শিষ্যের অদ্বৈতবাদ বিরোধী টীকাখানি হাতে পাইয়া তিনি সহাস্যে তাঁহাকে কহিয়াছিলেন, "বৎস, তুমি যে দ্বৈতবাদী মধ্ব সম্প্রদায়ভুক্ত, তুমি যে ব্যাসরাজের নিয়োজিত ব্যক্তি এবং অদ্বৈতবাদ খণ্ডনের জন্য গুপ্তভাবে আমার আশ্রমে অবস্থান ক'রছো—এ সবই কিন্তু আমি জানতাম। তুমি আমার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছ, তাই আচার্য্য হয়ে তোমার এই গ্রন্থের প্রতিবাদ বা খণ্ডন আমার পক্ষে সম্ভব নয়, আমার কোন শিষ্য পরে একাজ ক'রবে।" মধুসূদনের প্রতিভাধর বাঙালী শিষ্য বলভদ্র তাঁহার 'সিদ্ধিব্যাখ্যা'তে ঐ গ্রন্থের সমুচিত উত্তর দিয়াছিলেন।

এক সময়ে বারাণসী অঞ্চলের সন্ন্যাসীদের উপর ধর্ম্মান্ধ মুসলমান মোল্লাদের বড় অত্যাচার চলিতে থাকে। এই মোল্লারা দল বাঁধিয়া সশস্ত্র হইয়া চলিত এবং সন্ন্যাসী দেখিলেই আক্রমণ করিয়া বসিত! হত্যাপরাধ অনুষ্ঠিত হইলেও ইহাদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করা বড় কঠিন ছিল। প্রচলিত আইন অনুযায়ী এই মোল্লাদের শাস্তি দেওয়া যাইত না। এই সঙ্কটে সাধু-সন্ন্যাসীরা সকলে মিলিয়া মধুসূদন সরস্বতীর শরণ নিলেন। তিনি তখন বারাণসীধামের শ্রেষ্ঠ সন্ন্যাসী—প্রবীণতম ধর্ম্মনেতা। সকলে তাই তাঁহার উপরই নির্ভর করিলেন।

অদ্বৈত চিন্তায় সদা নিমগ্ন হইলেও মধুসূদন ব্যবহারিক জীবনের কর্ত্তব্যকে সেদিন এড়াইয়া যাইতে চান নাই। সন্ন্যাসীদের রক্ষার জন্য তিনি অচিরে যত্নবান হইলেন। সম্রাট আকবর তাঁহার পূর্ব্ব-পরিচিত। বহু পূর্ব্বে একবার সম্রাটের মহিষীকে তিনি তাঁহার আলৌকিক শক্তিবলে রোগমুক্ত করিয়াছিলেন। তাছাড়া, মন্ত্রী টোডরমলের সহিতও তাঁহার ঘনিষ্ঠতা কম নয়। কিছুদিন আগে

টোডরমলের সহিত একদল শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণের বিচার-বিতর্ক উপস্থিত হয়—টোডরমলকে তাঁহারা ক্ষত্রিয় না বলিয়া কায়স্থ বলিয়া উপহাস করেন। মধুসূদনের সমর্থনেই সে সময়ে সম্রাটমন্ত্রীর মান মর্যাদা রক্ষা পায়। কাশীর শ্রেষ্ঠ শাস্ত্রবিদ্ হিসাবে এ বিতর্কে মধুসূদন সরস্বতীর মতামত প্রার্থনা করা হয় এবং আচার্য্য এ সময়ে টোডরমলকে ক্ষত্রিয়বংশীয় বলিয়াই তাঁহার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন।

সন্ন্যাসীদের রক্ষার জন্য মধুসূদন রাজা টোডরমলের সহায়তা প্রার্থনা করিলেন। মন্ত্রিপ্রবর ক্রমে সমস্ত ব্যাপার সম্রাটের কাণে তুলিতে থাকেন। কিন্তু আকবর সুচতুর ব্যক্তি, সহসা মুসলমান মোল্লাদের চটানো তিনি যুক্তিযুক্ত মনে করেন নাই। কৌশলে কার্য-সিদ্ধি করার জন্য তিনি সর্ব্বশাস্ত্রের এক বিচারসভা দিল্লীতে আহ্বান করিলেন। হিন্দু শাস্ত্রবিদ্‌দের নেতারূপে মধুসূদন এই রাজসভায় উপস্থিত হন। তাঁহার দার্শনিক বিচার পদ্ধতি, বিদ্যার গভীরতা এবং ব্যক্তিত্ব দেখিয়া পক্ষ প্রতিপক্ষ সকলেই মুগ্ধ হইয়া যান। মুসলমান শাস্ত্রবিদ্‌গণও সেদিন মনস্বী মধুসূদনের ভূয়সী প্রশংসা না করিয়া পারেন নাই। ভারতের শীর্ষস্থানীয় পণ্ডিতগণ এই সময়ে মধুসূদনের প্রতিভায় মুগ্ধ হইয়া যে প্রশস্তি-শ্লোক রচনা করেন আজিও তাহা অবিস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে।

বেত্তি পারং সরস্বত্যাঃ মধুসূদনসরস্বতী।
মধুসূদনসরস্বত্যাঃ পারং বেত্তি সরস্বতী॥

অর্থাৎ, জ্ঞানাধিষ্ঠাত্রী দেবী সরস্বতীর পার বা সীমা জানেন মধুসূদন, আর মধুসূদনের পার জানেন শুধু দেবী সরস্বতীই।

মধুসূদন এই সুযোগে বাদশাহের নিকট সেদিন সন্ন্যাসীদের রক্ষার্থ এক আবেদন জানাইলেন। মোল্লারাও ইতিমধ্যে তাঁহার প্রতিভা, অধ্যাত্মশক্তি আর গভীর বিদ্যাবত্তায় মুগ্ধ হইয়া গিয়াছেন। কৌশলী আকবর মোল্লাদের জন্য সরাসরিভাবে কোন দমন ব্যবস্থা করিলেন না। তিনি শুধু এক আদেশ জারী করিলেন, সন্ন্যাসীগণও

আত্মরক্ষা করিতে থাকুন, কিন্তু সংঘর্ষ উপস্থিত হইলে মোল্লা বা সন্ন্যাসী কোন পক্ষকেই বিচারালয়ে টানিয়া আনা চলিবে না।

অতঃপর মধুসূদনের সমর্থনক্রমে নাগা সন্ন্যাসীদের অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত করা হয়। অস্ত্র ব্যবহারে নিপুণ হইয়াও মুসলমান বাদশাহের ভয়ে এযাবৎ তাঁহারা উহা প্রয়োগ করিতে বিরত ছিলেন। এবার মধুসূদন সরস্বতীর কৃপায় তাঁদের সুবিধা হইল। তাছাড়া, অনেক হিন্দু যোদ্ধাকেও এই সময়ে আচার্য্যের নির্দ্দেশমত সন্ন্যাস মন্ত্রে দীক্ষিত করা হয়। এই প্রবীণ বৈদান্তিকের নেতৃত্বে সন্ন্যাসীদলের সংস্কার সাধিত হয়। আত্মরক্ষা ও অন্যায়ের প্রতিরোধে তাঁহারা তৎপর হইয়া উঠেন।

ইহার পর দীর্ঘকাল অতীত হইয়া গিয়াছে। মধুসূদন এসময়ে নিতান্ত বৃদ্ধ হইয়া পড়িয়াছেন। কথিত আছে, এই সময়ে একদিন মহাত্মা মধুসূদনের সহিত মহাযোগী গোরক্ষনাথের বিদেহী-সত্তার সাক্ষাৎকার ঘটে। সেদিন সবেমাত্র গঙ্গাস্নান করিয়া আচার্য্য তীরে উঠিয়াছেন। এ সময়ে জ্যোতির্ম্মণ্ডিত সূক্ষ্ম দেহে গোরক্ষনাথ তাঁহার সম্মুখে আবির্ভূত হইলেন। আত্মপরিচয় দিবার পর যোগীবর প্রসন্ন-মধুর হাস্যে মধুসূদনের সম্মুখে একটি অমূল্য রত্ন তুলিয়া ধরিলেন। কহিলেন, "বৎস, এটি হচ্ছে চিন্তামণি রত্ন। এ পরম বস্তু কা'কে দেব, সেই খোঁজই আমি ক'রছিলাম, তুমিই হচ্ছো এর প্রকৃত অধিকারী। এইটি তুমি সঙ্গে রাখো, যখনি যে বস্তু তুমি চাইবে, এর প্রসাদে তাই তখনি হবে করতলগত।"

মধুসূদন প্রণতি জানাইয়া কহিলেন, "যোগীরাজ, আমার অভাব কোন কিছুরই নেই। তাই এতে আমার কোন প্রয়োজনও দেখছিনে। আপনি যোগ্যতর পাত্র খুঁজে নিয়ে এ অমূল্য বস্তু তাকে দিন।"

গোরক্ষনাথ পীড়াপীড়ি করিতে থাকিলে মধুসূদন বলিলেন, "দেখছি আমার প্রতি আপনার কৃপা অপরিসীম, আমায় ছাড়া আর কাউকে এ রত্ন আপনি দেবেন না। কিন্তু এর অধিকারীরূপে আমি

আমার ইচ্ছেমত কাজ করবো এতে আপনি নিশ্চয়ই রাজী আছেন ?"

যোগীবর সম্মতি জ্ঞাপন করিলে মধুসূদন তাঁহার হাত হইতে রত্নটি গ্রহণ করিলেন! মুহূর্ত্তমধ্যে উহা গঙ্গাগর্ভে নিক্ষিপ্ত হইল। গোরক্ষনাথও কম নহেন। অধরে চতুর হাসি টানিয়া আনিয়া তিনি কহিলেন, "মধুসূদন, এবার ভেবে দেখ দেখি, চিন্তামণি আমি প্রকৃত অধিকারী পুরুষকেই দান করেছি কিনা!"

আনুমানিক ১৬৩২ সালের কথা। মধুসূদনের বয়স তখন ১০৭ বৎসর। শেষবারের জন্য তিনি হরিদ্বারের গঙ্গাতীরে আসিয়াছেন। সিদ্ধপুরুষ এবার যোগশক্তিবলে জানিয়াছেন, তাঁহার মহাপ্রয়াণের লগ্নটি অতি নিকটে। বহিরঙ্গ জীবনের যত কিছু কার্যকলাপ, শাস্ত্রচর্চ্চা ও উপদেশ দান—সমস্ত কিছু হইতে নিজেকে তিনি প্রত্যাহৃত করিয়া নিলেন। বিদায় লগ্নের কথা ভক্ত ও শিষ্যদের পূর্ব্ব হইতে জানাইতে বাকী রাখিলেন না। মোক্ষদায়িনী হরিদ্বারের গঙ্গাতীরে, নির্দিষ্ট পুণ্যলগ্নে আপ্তকাম মহাপুরুষ সমাধিমগ্ন হইলেন। সেই সমাধিই তাঁহার মহাসমাধি। শ্রীমধুসূদন আর তাহা হইতে ব্যুত্থিত হন নাই।

ভক্তদাদু

গ্রীষ্মের পড়ন্ত বেলা। সারা আকাশ মেঘে মেঘে ছাইয়া গিয়াছে। দমকা বাতাসের সঙ্গে সঙ্গে বৃষ্টিও প্রায় আসিয়া পড়িল। আমেদাবাদের উপকণ্ঠে চর্ম্মকার পল্লীর পাশ দিয়া সাধক কমাল খুব দ্রুতবেগে চলিয়াছেন। আজিকার এই বর্ষণকে এড়ানো বড় কঠিন হইবে। দুই এক ফোঁটা জল গায়ে পড়তেই এক অচেনা ক্ষুদ্র গৃহের সম্মুখে হঠাৎ তিনি থামিয়া পড়িলেন।

বৃষ্টি তেমন বেশী হইতেছে না, বারান্দায় না উঠিয়া ছাঁচতলাই তিনি দাঁড়াইয়া আছেন। গৃহের মধ্যে মুচি তাহার নিজের কার্য্যে মহা ব্যস্ত। একমনে জল বহনের মশক্ সে সেলাই করিতেছে।

কমাল ভাবিলেন, কুটিরের ভিতরে ঢুকিয়া কেন লোকটিকে আর ব্যতিব্যস্ত করা? তাছাড়া, গরীব মানুষটির কাজে বাধা জন্মাইতে তাঁহার মন চাহিল না।

চর্ম্মকার দেখিয়াছে, দুয়ারে তাহার এক আগন্তুক দণ্ডায়মান। ঝড় বাদলে নিশ্চয়ই লোকটি আশ্রয় চায়। ত্রস্তেব্যস্তে বাহিরে আসিয়া সেলাম জানাইয়া কহিল, "বাবা, এ ঘর এ গরীব চামারের—তাই কি ঢুকতে চাচ্ছেন না?"

উত্তর হইল, "না বাবা তা মোটেই নয়। আমি যে দীনদয়াল হরির এক দীন দাস। আমার কি কখনো অভিমান সাজে? ভাবছিলাম পাছে তোমার কাজের বাধা হয় মজুরী তোমার কমে যায়!"

চর্ম্মকার ছাড়িবার পাত্র নয়। নমস্কার জানাইয়া কমালকে বারবার অনুরোধ জানাইতে থাকে। অগত্যা তিনি গৃহের অভ্যন্তরে ঢুকিলেন। একখণ্ড মলিন চামড়া ঝাড়িয়া নিয়া গৃহস্বামী তাহার বিশিষ্ট

অভ্যাগতকে বসিতে দিল। কিন্তু একি অদ্ভুত ব্যাপার! আগন্তুক তাঁহার আসনে বসিবামাত্রই এমন আকুলভাবে কাঁদিতেছেন কেন? হাত দুইটি অঞ্জলিবদ্ধ, অর্দ্ধনিমীলিত নয়ন হইতে অশ্রুধারা কেবলই গড়াইয়া পড়িতেছে। চর্ম্মকার বড় শঙ্কিত হইয়া উঠিয়াছে। করুণ-কণ্ঠে কহিতে লাগিল, "বাবা, আমি ইচ্ছে ক'রে কিন্তু আপনার মনে আঘাত দিই নি। এ গরীবখানায় চামড়ার টুকরো ছাড়া আসন দেবার মত আর যে কিছুই নেই।"

প্রকৃতিস্থ হইয়া কমাল কহিলেন, "না ভাই, তা নয়। তুমি চামড়ার আসন দিয়েছ বলে আমার এ কান্না নয়। তোমাকে দেখে আজ আমার নিজের ভেতর চোখ পড়েছে, আর সেই জন্যই উথলে উঠছে এই অশ্রুরাশি। যা কিছু বস্তু তোমার আছে—সরলপ্রাণে একান্ত প্রেমে তাই তো তুমি আমার সম্মুখে বিছিয়ে দিয়েছ। এখানে বসে নিজের অন্তস্তলে আজ চেয়ে দেখলাম—এমন সহজ, এমন সার্থক তো আমি আজো হয়ে উঠতে পারি নি। আজকের দিনে আমি তোমার ঘরের ছাঁচতলায় যেমনটি দাঁড়িয়েছিলাম, আমার প্রাণপ্রভু যে তেমনি ক'রে রোজ এই জীবনের দ্বারদেশে অপেক্ষমান থাকেন, আর রোজই তিনি ব্যথাতুর অন্তরে ফিরে ফিরে যান। যা কিছু সামান্য বস্তু আমার আছে, তা তো আমি তোমার মতন এমন সহজ হয়ে, এমন নম্র ও নিরভিমান হয়ে তাঁর সামনে আজো বিছিয়ে দিতে পারিনে! অহঙ্কারের কত সূক্ষ্ম গ্রন্থি জড়ানো রয়েছে আমার জীবনে, আমার সাধনায়। তাইতো প্রেমভিখারী প্রভু আমার এমন করে বারবার যান ফিরে। নিজের দোষেই যে তাঁকে এমন করে আমি ফেরাচ্ছি! সেই কথা মনে করেই তো বেদনার অশ্রু এমন করে ঝরে পড়ছে।"

সরলপ্রাণ, নিরক্ষর চর্ম্মকার সাধক কমালের এ হৃদয়বেদনা ও ভাবাবেগের অনেক কিছুই হয়তো সে বুঝে নাই। কিন্তু তাহার সরল স্বচ্ছন্দ জীবনের মর্ম্মকোষে এই অশ্রুজল, আগন্তুকের এই

বিরহ-বেদনার করুণ দৃশ্য এক অস্ফুট স্পন্দন জাগাইয়া তুলিল।

সসঙ্কোচে প্রশ্ন করিল, "কিন্তু কে আপনার এই প্রভুটি?"

"বৎস, সবার যিনি প্রভু, তিনিই আমার জীবন-প্রভু।"

"তিনি কি তাহ'লে আমারো প্রভু? আমার এই জীবনের দোরগোড়ায়ও কি তিনি এমনিভাবে অপেক্ষা করে আছেন?"

"হ্যাঁ গো—হ্যাঁ, সবারই তিনি, সর্ব্বমানবেরই জীবনের দ্বারে অতুল ধৈর্য্য নিয়ে দিনের পর দিন তিনি অপেক্ষা করে থাকেন। তিনি তোমার জন্যও রয়েছেন। শুদ্ধ হয়ে প্রেমে গলে, সহজ হয়ে তবে তাঁকে আহ্বান করে নাও। এই তো মানুষের সাধনার মূলকথা—মর্ম্মকথা।

বাহিরের ঝড়-জল ততক্ষণে থামিয়া গিয়াছে। কিন্তু চর্ম্মকারের মর্ম্মতলের ঝড়-জল থামিতেছে কই? তাহার উদাস নয়ন দুইটি হইতে অবিরাম ধারে বিন্দু বিন্দু অশ্রু গড়াইয়া পড়িতেছে। সন্ধ্যার ঘনায়মান অন্ধকারে সাধক কমাল আশ্রয়দাতা মুচিকে তাঁহার আশীর্ব্বাদ জানাইয়া বিদায় নিলেন। সেদিনকার এই আশীর্ব্বাদপূত চর্ম্মকারই ভারতবিশ্রুত পরমভক্ত দাদু, মধ্যযুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মরমিয়া সাধক! আর তাঁহার গৃহে আগত এই কমাল হইতেছেন লোকগুরু কবীরের পুত্র ও সার্থকনামা শিষ্য।

এক দুর্জ্ঞেয় ঐশী বিধানে, নির্দ্দিষ্ট পরম লগ্নটিতে দাদুর গৃহে প্রবেশ করিয়া কমাল তাঁহার অন্তরটিকে সেদিন রাঙাইয়া দিয়া গেলেন। এই অনুরঞ্জনের স্পর্শ উত্তরকালে সমগ্র উত্তর ভারতের ভক্তসমাজে বিস্তারিত হইয়া পড়ে।

কমাল চলিয়া গিয়াছেন। দাদুর হাতের কাজ তখনও অসমাপ্ত। কুটিরের ক্ষীণ প্রদীপটি জ্বালাইয়া আবার তিনি চামড়ার মশক্ সেলাই করিতে বসিলেন। ইহাই যে তাঁহার জীবিকা। কিন্তু মন যেন বারবার কোথায় উধাও হইয়া যায়, হাতের সূঁচসুতা অতর্কিতে

থামিয়া পড়ে। অন্তরের অন্তস্তলে ধ্বনিত হয় অস্ফুট বিরহ গুঞ্জন, '—আমার জীবন, মরণের প্রভু! যুগ যুগ ধরে এমনি করেই কি তুমি দাঁড়িয়ে রয়েছো? সহজ হয়ে একান্ত হয়ে, কবে তোমায় আমার হৃদয়ে স্থাপন ক'রতে পারবো, তা আমায় বলে দাও।'

দয়াল কমাল সেদিন দাদূর জীবনের রুদ্ধ স্রোতকে উন্মুক্ত করিয়া দিয়া গিয়াছেন। দীন ভক্ত তাই দিনের পর দিন তাঁহার নিকট গিয়া যুক্তকরে দণ্ডায়মান হন। মিনতি করিয়া বলেন, "বাবা, প্রভুর কথা বলে সেদিন আমায় পাগল করে এসেছো, এবার তাঁকে এনে আমার হৃদয়াসনে বসাবার উপায় বলে দাও। আলোকের সন্ধান কোথায় পাবো, কৃপা করে তুমি আমায় বলো। আমার চারিদিকেই যে রয়েছে কেবল পুঞ্জ পুঞ্জ অন্ধকার।"

সাধক কমাল আশ্বাস দিয়া বলেন, "ভাই, তোমার দুর্ভাবনার প্রয়োজন নেই। তিনি প্রভু—আবার তিনিই যে গুরু। ব্যাকুলতা, প্রেম যেমন তোমার বাড়বে, তেমনি সাধনার পথও সুস্পষ্ট, সুগম না হয়ে পারবে না। আলোকোদ্ভাসিত হলে প্রভু তখন নিজেই যে দেবেন দর্শন।"

জন্মজন্মান্তরের তপস্যার আগুন সঞ্চিত হইয়া আছে এই কাঙাল চর্ম্মকারের জীবনসত্তায়। ইহারই উত্তাপে জীবন ভরিয়া তিনি চঞ্চল হইয়া ফিরিয়াছেন, অজানা বেদনার বোঝা, বুকে বহন করিয়া প্রিয়-মিলনের লগ্নটির জন্য এতদিন রহিয়াছেন প্রতীক্ষামান। মরমিয়া-সাধক কমালের স্পর্শ তাঁহার মধ্যে আজ এক নূতন রূপান্তর ঘটাইয়া দিল। প্রেমের তপস্যায় তিনি ব্রতী হইলেন, আলোকময় সাধনবর্ত্ম টি খুলিয়া গেল। দাদূর বাণীতে ইহার নিদর্শন রহিয়াছে—

গৈব মাঁহি গুরুদেও মিলা পায়া হম পরসাদ।
মস্তক মেরা কর ধরা দক্ষ্যা হম অগাধ॥

—রন্ধ্রহীন তিমির ভেদিয়া গুরু আমার প্রকাশিত হইলেন, আমি

তাঁর প্রসাদ লাভ করিলাম! আমার শিরে হাত রাখিয়া তিনি দিলেন আশীর্ব্বাদ, আর আমি প্রাপ্ত হইলাম অগাধ দীক্ষা।

১৫৪৪ খৃষ্টাব্দের ফাল্গুন মাসে, শুক্লাষ্টমী তিথিতে বৃহস্পতিবার দিন ভক্ত দাদূ আবির্ভূত হন। এক দীনহীন মুসলমান ধুনকরের পুত্ররূপে তাঁহার জন্ম। ধনবান ও ঐতিহ্যসম্পন্ন হিন্দু বা মুসলমান গৃহে যে শিক্ষা দীক্ষার সুযোগ আছে তাহা কোনদিন তাঁহার ভাগ্যে ঘটে নাই। অশিক্ষিত এই চর্ম্মকার বালকের মধ্যে দৃশ্যতঃ এমন কিছুই সেদিন দেখা যায় নাই যাহা তাঁহার উত্তর জীবনের পরিণত ও পুষ্পিত রূপটির সম্ভাবনা জানাইয়া দেয়।

অন্তরের সহজ প্রেম ও নিরভিমানতাই ছিল দাদূর জীবনের বড় বৈশিষ্ট্য। ইহার মধ্য দিয়া মরমিয়া সাধনার রসোজ্জ্বল ধারাটি ধীরে ধীরে বিস্তৃততর হইয়া উঠে।

এই পরম ভক্তের বাল্যজীবনের তথ্য খুব কমই পাওয়া যায়। শুধু জানা যায়, তাঁহার পিতার নাম ছিল লোদী, আর মাতা ছিলেন বসীবাঈ। চামার পল্লীর দারিদ্র্য ও অশিক্ষার মধ্যে নিজের সহজাত গুণাবলীর উপর নির্ভর করিয়াই দাদূ অগ্রসর হন।

বাল্য ও কৈশোরের পর যৌবনেও কোন অসাধারণত্ব তাঁহার মধ্যে স্ফুরিত হইতে দেখা যায় নাই। দুঃখদৈন্যক্লিষ্ট সাধারণ গৃহস্থ জীবনই তিনি অনুসরণ করিয়া চলেন। পত্নী 'হাওয়া' এবং চারিটি পুত্রকন্যা নিয়া তাঁহার সংসার। নশ্বর ও দুঃখময় বলিয়া এই সংসারকে দাদূ কিন্তু তাঁহার সাধন জীবনে অস্বীকার করেন নাই। নিত্য ও অনিত্য, সৎ ও অসৎ তাঁহার দৃষ্টিতে একাকার হইয়া যায়।

দাদূর জ্যেষ্ঠ পুত্র গরীবদাস উত্তরকালে এক সুবিখ্যাত মরমিয়া সাধকরূপে কীর্ত্তিত হইয়া উঠেন। কনিষ্ঠ পুত্র মস্‌কীনদাস এবং কন্যাদ্বয়—ননীবাঈ ও মাতাবাঈও আধ্যাত্মিক জীবনের পথে বহুদূর অবধি অগ্রসর হন।

জীবনের বাতায়নে এবার দেখা দেয় নূতন আলোকের অভ্যুদয়,

এ আলোকের হাতছানিতে দাদূ ঘরের বাহির হইয়া পড়েন। দেশ দেশান্তরে এ সময়ে সুরু হয় তাঁহার পর্য্যটন। কাশী, বিহার এবং বাংলার বহু স্থানে তিনি পরিব্রাজক সাধকরূপে ঘুরিয়া বেড়ান। সহজ মত, শূন্যবাদ, নিরঞ্জনবাদ, নাথপন্থের সাধনতত্ত্ব প্রভৃতি অনেক কিছুই আস্বাদন করিয়া তাঁহার দিন কাটে। কথিত আছে, নাথপন্থের যোগ সাধনায় দাদূ এক সময় অসামান্য সাফল্য অর্জ্জন করেন এবং 'কুম্ভারীপার' নামে তিনি নাথযোগীদের মধ্যে পরিচিত হইয়া উঠেন। কুম্ভারীপার কথাটি ছিল এই পন্থের এক প্রাচীন মহাযোগীর যোগবিভূতির দ্যোতক। দাদূপন্থী যোগীদের মধ্যে আজিও কোথাও কোথাও কুম্ভারীপার রচিত কয়েকটি গ্রন্থ সযতনে রক্ষিত হইতে দেখা যায়। এই সব গ্রন্থের নাম—অজপা গায়ত্রী গ্রন্থ, বিরাট পুরাণ যোগশাস্ত্র, অজপা গ্রন্থ, অওর অজপা শ্বাস।

সাধক দাদূ তাঁহার পরিব্রাজনকালে বাংলায় আসিয়া কিছুদিন অতিবাহিত করেন। এই সময় বাঙালী নাথপন্থী যোগীদের সান্নিধ্য ও শিক্ষা হইতে তিনি উপকৃত হন। দাদূ-পন্থীদের বাণী সংগ্রহের মধ্যে বাঙালী নাথযোগীদের ভাব ও ভাষার বিস্ময়কর নিদর্শন রহিয়াছে—

দাদূ হিন্দু তুরুকন হোইবা সাহেব সেতী কাম।
ষড় দর্শনকে সংগি ন জাইবা নিরপথ কহিবা রাম॥

ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে ভ্রমণের পর দাদূ রাজপুতানার অন্তর্গত সাংভরে আসিয়া থাকেন। এবার শিষ্যমণ্ডলী ও স্বীয় পরিবারবর্গসহ এক পূর্ণাঙ্গ ও সুসমঞ্জস জীবন রচনায় তিনি ব্রতী হন। স্বজনবর্গের সঙ্গে তিনি নিজেও প্রতিদিন জীবিকা অর্জ্জনের জন্য কিছুটা পরিশ্রম করিতেন। বলাবাহুল্য, এ সময়ে শিষ্যগণ সমেত তাঁহার পোষ্যদের সংখ্যা নিতান্ত কম ছিল না। তাই তাঁহার কষ্টেই দিনাতিপাত হইত। তবে, ভরণপোষণের জন্য শ্রীভগবানের শক্তিই অন্তরাল হইতে কাজ

করিতেছে—সর্ব্বসময় ইহাই ছিল ভক্ত দাদূর দৃঢ় বিশ্বাস। তাঁহার বাণীতে রহিয়াছে—

দাদূ রোজী রাম হৈ রাজিক রিজক হমার।
দাদূ উস পরসাদে সোঁ পোষ্যা সব পরিবার॥

অর্থাৎ, হে দাদূ, রামই আমার প্রতিদিনকার অন্ন, তিনিই আমার বৃত্তি। তিনিই আমার জীবিকা। তাঁহার প্রসাদ পাইয়াই তো চলে আমার সমস্ত পরিবারের পোষণ।

মন্দির মসজিদের গণ্ডী মানিবার বালাই দাদূর নাই, হিন্দু ও মুসলমানের ভেদরেখাও তাঁহার সাধনোজ্জ্বল দৃষ্টির সম্মুখে চিরতরে বিপুপ্ত হইয়া গিয়াছে। সকল মানবের কল্যাণের জন্য সত্যানুসরণের সহজ সার্ব্বজনীন পথটি তাই তিনি খুলিয়া দিলেন।

সনাতনপন্থী হিন্দু সাধক ও মুসলমান উলেমারা আসিয়া কহিতেন, "দাদূ, ধর্ম্মসাধন বা সেবাকার্য্য যা কিছুতেই মানুষ ব্রতী হয়—একটা সম্প্রদায়ে থেকেই তো সে তা ক'রে। তুমি কোন্ সম্প্রদায়ের ?"

উত্তরে তিনি বলিতেন, "ভাই—চন্দ্র, সূর্য্য, পৃথিবী, আকাশ, বাতাস, জল—এরাও তো নিরন্তর সেবাকর্ম্মে রত। এরা কোন্ দল বা প্রতিষ্ঠান বিশেষের অন্তর্ভুক্ত, বল তো ?"

প্রকাশের সহজ দীপ্তিতে, সহজ করুণায় যে জগদ্‌গুরু পরমেশ্বর চির বর্ত্তমান তাঁহার সাথেই দাদূর অন্তরঙ্গতা ও নিবিড় পরিচয়। তাঁহার পরমাশ্রয় ছাড়া যে তিনি আর কিছুই জানেন না, জানিতেও চাহেন না। তাই তিনি জিজ্ঞাসুদের জানাইয়া দেন, 'অলখ্ ইলাহী জগৎগুরু দূজা কোঈ নাঁহি।' সেই অলখ ঈশ্বরই জগৎগুরু, দাদূর চোখে আর দ্বিতীয় কেহই নাই। উদার সাধক দাদূর অনুবর্ত্তী ও অনুরাগী ভক্তদের লোকে এই সময় হইতে 'ব্রহ্ম সম্প্রদায়' বলিয়াও অভিহিত করিতে থাকে।

নৈষ্ঠিক ও সনাতন পথের বাঁধা ধরা পদ্ধতির সাধক দাদূ ছিলেন না, শুষ্ক জ্ঞানমার্গীয় পথকেও তিনি সযত্নে পরিহার করিতেন। প্রেমে

ও ভক্তিতে রসায়িত হইয়া মধুর সাধনার মধ্য দিয়া প্রতি ভক্তের জীবন শতদলকে তিনি ফুটাইয়া তুলিতেন। রঙে, রসে, ঔজ্জ্বল্যে তাঁহার এই সাধনার ঐশ্বর্য্য উপচিয়া পড়িত, গভীর আত্মিক সাধনার সঙ্গে সঙ্গে শিষ্য ও ভক্তগণ সহ তিনি ভজন ও নৃত্যগীতে, আনন্দে বিভোর হইতেন। গুজরাটের কাঠিয়াবাড় অঞ্চলে ভ্রমণ করিতে করিতে দাদূ একবার ভজনীয়া দলের মন্দিরা বাদ্য এবং নৃত্য দেখিয়া মোহিত হন। ইহার পর নিজের পরিকরদের মধ্যে উৎসাহ সহকারে তিনি নৃত্যগীতের প্রচলন করিয়াছিলেন।

এই নৃত্যগীতময় সাধন ভজনে দাদূ কিন্তু অন্তরের আকুতি ও ভাব ময়তার উপরই জোর দিতেন। একবার এক প্রসিদ্ধ সঙ্গীতশিল্পী দাদূর কীর্ত্তন সভায় বসিয়া গান গাহিতেছেন। তাঁহার সঙ্গীত-শৈলীতে তান কর্ত্তব্যের প্রাবল্য বড় বেশী। ভক্ত দাদূ এই কালোয়াৎটিকে ডাকিয়া পরিষ্কার ভাষায় বলিয়া দিলেন, "ভাই, প্রভুর স্তুতি এমন করে গাইতে হয় কি? এমনভাবে সদাই গাইবে যাতে তাঁকেই প্রধানতঃ প্রকাশ করা হয়। সতর্ক থাকবে, কখনো তোমার প্রকাশটা যেন সেখানে বড় না হয়ে ওঠে, তা'হলে যে ভজন-স্তুতির সঙ্গে সঙ্গে তোমার এ ললিতকলাও ব্যর্থ হয়ে যাবে।"

সেবার নারায়ণা গ্রামে সাড়ম্বরে হোলী উৎসব অনুষ্ঠিত হইতেছে। প্রসিদ্ধ গায়ক বখ্‌নাজী এই উপলক্ষে সোৎসাহে বসন্তের গান গাহিয়া আসর মাৎ করিতেছেন। দাদূ আবেগভরা কণ্ঠে হঠাৎ শিল্পী বখ্‌নাকে কহিলেন, "ভাই, আজ এই বসন্তকে তোমার সঙ্গীতে ফুটিয়ে তুল্‌বার যত কিছু প্রয়াস সবই যে অর্থহীন, সমস্ত উৎসবই যে ব্যর্থ—যদি স্বামীর সঙ্গে, প্রিয়তম প্রভুর সঙ্গে তোমার মিলন না ঘটে। যত কিছু শোভা, নাচ গানের আড়ম্বর একেবারেই যে বৃথা! —'ঐশী দেহ রচী রে ভাই রাম নিরঞ্জন পাবো আই।'—এমন দেহ, এমন আনন্দ, যাঁহার রচনা, তাঁহার গুণগান কর ভাই।"

কালোয়াৎ বখ্‌নার জীবনের নির্দ্দিষ্ট শুভ লগ্নটি সেদিন আসিয়া

গিয়াছে, তাই দাদুর মধুর প্রেমময় বাণী, অশ্রুসজল নয়ন দুইটি শিল্পীর সমগ্র জীবনের ভিত্তিটি টলাইয়া দিল। বখ্না ঈশ্বরের নাম-সুধায় মত্ত হইলেন। দাদুর পরমাশ্রয় প্রাপ্তির পর এক শ্রেষ্ঠ ভক্তরূপে তাঁহার রূপান্তর ঘটিল।

পরবর্ত্তীকালে দাদু চৌদ্দ বৎসর কাল রাজপুতানার আম্বেরে বাস করিয়াছিলেন। এই সময়ে তাঁহার অনুগামী সাধকদের সংখ্যা ক্রমে আরও বাড়িয়া উঠে। শিষ্য ও ভক্তদল নিজেদের গার্হস্থ্য ধর্ম্ম পালন করিতেন, কিন্তু প্রতি সন্ধ্যায় ও রাত্রিতে দাদুর নেতৃত্বে তাঁহারা মিলিত হইতেন। কখন কখন বিভিন্ন ধর্ম্মের আচার্য্য ও উলেমাদেরও এখানে দেখা যাইত। ধর্ম্মচর্চ্চা আর ভজন-কীর্ত্তনে এই মিলনসভায় অধ্যাত্ম-আনন্দের বান ডাকিত। এই মিলনকেন্দ্রটি ছিল প্রত্যেক ভক্ত ও সাধকের এক পরম আশ্রয়স্থল, তত্ত্ব ও সাধনার আদান-প্রদানের এক উদার ক্ষেত্র। দাদু পন্থীরা ইহার নাম দেন, অলখ্-দরীবা—অলখ্ নিরঞ্জনের আনন্দ-হাট।

একদিকে এই আনন্দ-হাট ও ইষ্টগোষ্ঠী, অন্যদিকে আন্তর সাধনার গভীর রসে দাদু নিমজ্জিত। প্রেমের সাধনায় তখন তিনি একেবারে সর্ব্বস্ব পণ করিয়াছেন। সকল আকর্ষণ, সকল অভিমান ত্যাগ করিয়া, দাদু আপন স্বামীর মধ্যে ডুবিয়া নিজেকে নিঃশেষ করিয়া ফেলিতে চাহেন। তাঁহার সমসাময়িক বাণীতে পাই—

দাদু হৈ কো ভয় ঘণাঁ নাঁহী কৌঁ কুছ নাহি
দাদু নাহী হোই রহু আপনে সাহিব মাঁহি

—হে দাদু, যাহার অনেক কিছু আছে তাহার যে ভয়ও আবার অনেক, যাহার কিছু নাই তাহার ভয়ও তেমনি নাই। হে দাদু, আপন স্বামীর মধ্যে তাই 'নাই' হইয়াই থাক—আপন সত্তা ও 'আমি'কে নিঃশেষিত করিয়া দাও। পরমভাগবতের দৃষ্টিতে সাধনার যে মূলতত্ত্বটি ধরা পড়িয়াছে তাহাও তিনি ভক্তদের শুনাইলেন—

জহাঁ রাম নহীঁ মৈ তহঁ মৈ তহঁ নাহী রাম।
দাদু মহল বারিক হৈ দাউ কু নাহী ঠাও ॥

—যেখানে আমার রাম (ঈশ্বর) আছেন সেখানে আমিত্বের লেশ নাই। আর যেখানে 'আমি' রহিয়াছে সেখানে রাম নাই। হে দাদু, বড় সূক্ষ্ম এবং বড় অপরিসর সে মন্দির—ঐ দুয়ের সেখানে ঠাঁই নাই। শ্রীভগবানের সহিত সাধকের শুদ্ধ সত্তার এই পরম মিলনই যে পরম প্রাপ্তি! ইহারই প্রতীক্ষায় ভক্ত দাদুর হৃদয় তখন আকুল হইয়া উঠিয়াছে। একৈকনিষ্ঠার ফলে তাঁহার সাধন-জীবনে শুদ্ধতা আসিয়াছে, প্রেম রসের অমৃতধারাও উদ্গত হইতেছে, কিন্তু প্রেমাস্পদের দর্শন মিলে কই? সাধক দাদুর সমগ্র সত্তায় তখন সকরুণ আবেদন ধ্বনিত হইতেছে—

দাদু পেয়ালা প্রেমকা সাহিব রাম পিলাই।
পরগাট পেয়ালা দেহু ভরি মিরতক লেহু জিলাঈ ॥

—হে ভগবান, হে আমার স্বামী, প্রেমের পেয়ালা তো তুমি পান করাইলে, বুঝিলাম। কিন্তু এইবার তোমার দিব্য দর্শনরূপ প্রত্যক্ষ পোলয়াটি পূর্ণ করিয়া দাও, এই মৃতকে এবার জীবন দান কর।

দাদুর এ প্রেমের সাধনা আত্ম-নিবেদনের মাধুর্য্য ও সৌরভে ভরপুর। একান্ত শরণাগতি ও একনিষ্ঠার মধ্য দিয়া ইহা সেই পরম একের মধ্যেই আপনাকে নিঃশেষে বিলুপ্ত করিয়া দিতে চাহিয়াছে। শত শত বৎসরের অন্তরালে আজিও এই মরমিয়া সাধকের আকুল আবেদন সমগ্র ভারতের ভক্তসমাজের ভজনে ও গানে অনুরণিত হইয়া ফিরে—

তুম্হ কু হমসে বহুত হৈঁ হমকু তুম্হ সা নাহিঁ।
দাহকু জিন পরহরৈ তুঁ রহু নৈনহু মাহিঁ ॥
তুম্হ থৈ তরহাঁ হোই সব দরশ পরশ দরহাল।
হম থৈ কবহুঁ না হোইগা জে বীতহিঁ জুগ কাল ॥

তুম্‌হী তেঁ তুম্‌হ কু মিলে এক পলক মৈঁ আই।
হম থৈঁ কবহুঁ ন হোইগা কোটি কল্‌প জে জাই।

—হে রাম! আমার মত তোমার অনেক আছে, কিন্তু তোমার মত আমার যে আর কেহই নাই। দাদুকে কখনো করিও না পরিত্যাগ। থাক সদাই আমার নয়নে নয়নে। তোমা হইতেই হইবে সব কিছু—দরশ, পরশ ও প্রেমবৈবশ্য। আমি জানি, আমা হইতে হইবে না কিছুই যুগ যুগান্ত কাটিলেও। প্রভু, তোমার কৃপা হইলে এক পলকের মধ্যেই তোমাকে লাভ করি, কিন্তু আমার শক্তিদ্বারা কোটি কল্পকালেও যে তাহা হইবে না!

দয়িতের সহিত দাদুর মিলনের এই সাধনা কিন্তু দুশ্চর তপস্যা ও দৈন্যময় জীবনের পথে নয়। অনাবিল প্রেমরসে রসায়িত হইয়া—শোভায়, সৌন্দর্য্যে পূর্ণ হইয়া এ এক আনন্দমধুর প্রিয়-পথ-যাত্রা। দাদুর অন্তরঙ্গ শিষ্য রজ্জবের সাধন ও আচরণে এই রসোজ্জ্বল তত্ত্বটি পরিস্ফুট হইয়া উঠিতে দেখা যাইত। তাঁহার প্রেমসাধনায় ভাবময়তার সহিত মিশ্রিত থাকিত বরবেশের অনুরূপ সাজসজ্জা। কেহ তাঁহার এই বেশভূষা সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলে দাদুর এই বিখ্যাত পরিকর কহিতেন, "ভাই, আমার প্রিয়তমের সঙ্গে কি দীন হীন, অশুচি বেশে মিলিত হওয়া শোভন হয়? প্রেম, আনন্দ আর ঐশ্বর্য্যই যে এ মহামিলনের পাথেয়।"

ভক্ত দাদুর একটি মনোরম বিরহ অঙ্গের প্রার্থনায় তাঁহার নিজের প্রেমমধুর জীবনদর্শন যেন মূর্ত্ত হইয়া উঠিয়াছিল—

আজ্ঞা অপরংপারকী, বসি অংবর ভরতার।
হরে পটংবর পহিরি করি, ধরতী করৈ সিংগার॥
বসুধা সব ফুলৈ ফুলৈ, পিরথ অনংত অপার।
গগন গরজি জল থল ভরৈ, দাদু জৈ জৈ কার॥
কালা মুঁহ করি কালকা, সাঈ সদা সুকাল।
মেঘ তুম্‌হারে ঘরি ঘণাঁ, বরসহু দীন দয়াল॥

অর্থাৎ, অনন্তের মহা নির্দ্দেশ—আকাশ পরিপূরিত করিয়া স্বামী আমার বিরাজমান! তাই তো সবুজ পট্টাম্বরে ধরিত্রী এমন শৃঙ্গারবেশ ধরিয়াছে। সমগ্র বসুধা আজ ফসে ফুলে শোভিত, পৃথিবী অনন্ত অপার গগনের গর্জনে জলস্থল উঠিতেছে ভরিয়া। হে দাদু, দেখ প্রভুর জয়জয়কার। কালের মুখে কালি লেপন করিয়া স্বামী আমার সদাই সুকালরূপে বিদ্যমান। তোমার আলয়ে রহিয়াছে অজস্র ঘন মেঘের রাশি—হে দীন দয়াল, আজ তাহা বর্ষণ কর!

বিরহের জ্বালাও সাধনের মন্থনে ভক্ত দাদুর জীবনে তাঁহার পরম প্রার্থিত অমৃত উদ্গত হইল, ভগবৎ দর্শন পাইয়া এবার তিনি কৃতার্থ হইলেন। এই সাধনা ও সিদ্ধির ইঙ্গিত দাদু তাঁহার বাণীতে রাখিয়া গিয়াছেন—

মথি করি দীপক কীজিয়ে, সবঘটি ভয়া প্রকাশ।
দাদু দীওয়া হাথি করি গয়া নিরংজন পাস।

—এই সাধনসত্তারূপ ঘটকে মন্থন করিয়া ঘৃতের প্রদীপ প্রজ্বলিত কর। সে আলোতে সব ঘটই হইয়া গেল প্রকাশিত। দাদু, সেই প্রদীপ হস্তে আমি নিরঞ্জনের পাশে গিয়া দাঁড়াইলাম।

সাধনার স্বার্থকতা এবার দাদুর জীবনকে রূপান্তরিত করিয়া দেয়, সদ্‌গুরুর কৃপায় অতীন্দ্রিয় জীবনের রুদ্ধদ্বার তাঁহার সম্মুখে উন্মুক্ত হইয়া উঠে। মহাজীবন-পদ্মটি রঙে রসে ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহার সৌরভে চারিদিক আমোদিত। অজানা আকর্ষণে দিকবিদিক হইতে পুণ্য-লোভী মুমুক্ষুদল লুব্ধ ভ্রমরের মত আসিয়া ভীড় করিতে থাকে। একের পর এক ভক্ত সাধকদল আসিয়া তাঁহার আশ্রয় গ্রহণ করেন। দাদুর এই সব প্রধান শিষ্যের সংখ্যা বাহান্নজন, আর তাঁহাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য—রজ্জবজী, সুন্দরদাস (ছোট), জাইসা, মাধোদাস, প্রয়াগদাস, গরীবদাস, বখ্‌নাজী, বনওয়ারীদাস, শঙ্কর-দাস, জন-গোপাল, জগজীবন ইত্যাদি। সমসাময়িক কালে ইহারা

প্রত্যেকেই দাদূপন্থীদের ভাষায় এক একটি 'থাম্বা' বা সাধনস্তম্ভের প্রবর্ত্তকরূপে পরিচিত হইয়া উঠেন।

সাধনার উৎকর্ষ ও সার্থকতার সঙ্গে প্রত্যেক মহাজীবনেই অতি-প্রাকৃত শক্তিলীলা স্ফুরিত হইয়া উঠে। সাধারণ মানুষের দৃষ্টিতে যাহা নিতান্ত অলৌকিক এ বিস্ময়কর, লোকোত্তর মানবদের জীবনে তাহাই হইয়া উঠে নিতান্ত সহজ ও স্বাভাবিক। পরমভাগবত দাদূর মধ্যেও এ শক্তির বিচ্ছুরণ মাঝে মাঝে দেখা যাইত। দাদূপন্থীদের গ্রন্থে গুরুর এই বিভূতি প্রকাশের নানা উল্লেখ রহিয়াছে।

একবার ভক্ত দাদূ চাতুর্ম্মাস্য অনুষ্ঠান উপলক্ষে আঁধী গ্রামে কিছুদিন বাস করেন। বহুপ্রার্থিত বৃষ্টিপাতের কোন লক্ষণই এ সময় সেখানে দেখা যাইতেছে না। অজন্মা ও শস্যহানির ভয়ে জনসাধারণ আতঙ্কিত হইয়া উঠিয়াছে। সকলে মিলিয়া তখন সাধক দাদূকে চাপিয়া ধরিল, বারি বর্ষণের একটা ব্যবস্থা তাঁহাকে করিতেই হইবে। কথিত আছে, দাদূর এক মিনতিপূর্ণ ভগবৎ-সঙ্গীতে অবিলম্বে সেখানে প্রচুর বারিপাত ঘটিয়াছিল।

টোঁক অঞ্চলে একবার বিরাট মহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। বহু ভক্ত ও সাধু-সন্তের আগমনে স্থানটি মুখরিত হইয়া উঠে। অতিরিক্ত জন-সমাগমের ফলে এই সময়ে খাদ্যদ্রব্যের টান পড়িয়া যায়। উদ্যোক্তাগণ ভীত হইয়া ভক্তপ্রবর দাদূর শরণ নিলেন, তাঁহার কৃপা ব্যতীত এ বিপদ হইতে উদ্ধারের যে কোনই আশা নাই। দাদূ-পন্থীদের মধ্যে প্রসিদ্ধি আছে যে, দাদূ তাঁহার উপাস্যের ভোগ লাগাইবার সঙ্গে সঙ্গে ভোজ্যের ভাণ্ডার সেদিন যেন অক্ষয় হইয়া উঠিল। মহোৎসবের আয়োজনের অনুপাতে অতিথি অভ্যাগতদের সংখ্যা কয়েকগুণ বেশী ছিল। কিন্তু দাদূর অলৌকিক শক্তি প্রকাশের ফলে সকলকেই পরিতোষ সহকারে ভোজন করাইতে সেদিন উদ্যোক্তাদের কোন অসুবিধা হয় নাই।

এই ধরণের বিভূতি বা সিদ্ধাই প্রদর্শনের পক্ষপাতী দাদূ নিজে

কিন্তু কখনো ছিলেন না। শুধু বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রেই কৃপা করিয়া তিনি ইহা মাঝে মাঝে ভক্ত ও শিষ্যদের মধ্যে প্রকাশ করিতেন। পতিব্রতার মত একান্ত নিষ্ঠা ও স্মরণ মননই এই পরমভাগবতের ছিল স্বভাব-ধর্ম্ম। ভক্তি-প্রেমের এই অনন্য সাধনা দাদুর কাছে ছিল জীবনের মূলে রস সিঞ্চনের মত। স্বামীর সাথে যুক্ত হইলেই তো তাঁহার সব ঐশ্বর্য্য মুহূর্ত্তে করতলগত হইয়া যায়—দাদুর বাণীতে এই সুরটিই পরিস্ফুট রহিয়াছে—

নাউ নিমিত্ত হরি ভজৈ। ভগতি নিমিত্ত ভজি সোই॥
সেবা নিমিত্ত সাঁই ভজৈ। সদা সজীবনি হোই॥
হিরদৈ রাম রহৈ জা জন কৈ॥ তা কোঁ ঊনা কৌন কহৈ।
অঠ সিধি নও নিধি তাকৈ আগৈ সম্মুখ ঠাঢ়ী সদা রহৈ॥

অর্থাৎ নামের নিমিত্তই করিতে হইবে হরির ভজন, ভক্তির নিমিত্তই করিতে হইবে ভজন, সেবার নিমিত্তই করিতে হইবে ভজন, সেবার নিমিত্তই করিতে হইবে স্বামীর পূজা। সদা সঞ্জীবনী রসরূপে যে তিনিই সর্ব্বত্র বর্ত্তমান। যাহার হৃদয়ে অধিষ্ঠিত রহিয়াছেন রাম, কে তাহাকে ঊন বা ক্ষুদ্র বলিবে? অষ্টসিদ্ধি নবনিধি সব কিছুই যে সে ভক্তের সম্মুখে সদা আজ্ঞাবহের মত থাকে দণ্ডায়মান।

দাদু কহিয়াছেন, "যোগ সমাধি সুখ সুরতি সেঁ, সহজৈঁ সহজৈ আর।" একদিকে যোগ সমাধির সাধনবর্ত্ম, আর অপরদিকে আনন্দ-সুরতি—ইহারই মধ্যে দিয়া যে সহজ পথ তাহাই দাদু প্রধানতঃ অনুসরণ করিয়া যান। কিন্তু যোগীর সাধনাকে এই মহাপ্রেমিক কি একেবারে এড়াইতে পারিয়াছিলেন? তাঁহার একটি বিশিষ্ট বাণীতে ইহার ইঙ্গিতটি রহিয়া গিয়াছে—"হে দাদু, সবদ (সঙ্গীত) হইল সূচ, প্রেমধ্যান হইল সূতা, এই কায়াকেই করিলাম আমার কন্থা, যোগী যুগের পর যুগ এই কন্থাই পরিধান করেন, ইহা কখনও হয় না ছিন্ন।"

দাদু তখন আম্বেরে বাস করিতেছেন। তাঁহার চারিদিকে মুমুক্ষু

হিন্দু-মুসলমান সাধকদের ভীড়। এক মরমিয়া সিদ্ধপুরুষরূপে তখন সারা উত্তর ভারতে তাঁহার খ্যাতি ছড়াইয়া পড়িয়াছে। এ খবর সম্রাট আকবরের কাণে পৌঁছিতেও দেরী হয় নাই। সাধু সন্ত দর্শনে উৎসাহী সম্রাট দিল্লী হইতে তাঁহার নিকট দূত প্রেরণ করিলেন।

দাদূর নিকট উপস্থিত হইয়া দূত নিবেদন করিল, "সম্রাট আপনার সাথে সাক্ষাৎ কর্‌তে অভিলাষী হয়েছেন।"

ভক্ত দাদূর কাছে এ যেন এক রহস্যময় প্রস্তাব। ধীর কণ্ঠে উত্তর দিলেন, "ভাই আমি বুঝতে পাচ্ছিনে, আমার সাথে দিল্লীর বাদশাহের সাক্ষাতের কি প্রয়োজন থাকতে পারে? আমাকে নিয়ে এমন টানাটানি কেন বলতো? আমি তো ভাই যেতে পারবো না।"

দূতের মুখে সব কথা শুনিবার পর সম্রাট কহিলেন, "শোন, এই মহাসাধকের সঙ্গে এমনভাবে কথা বলে তুমি ভাল করোনি। তুমি আবার সেখানে যাও। তাঁকে নিবেদন কর, ভগবৎপ্রসঙ্গ-লুব্ধ আক্‌বর আপনার দর্শন প্রার্থনা করেছেন। কবে কোথায় সাক্ষাৎ হবে, আপনি দয়া করে বলুন।"

দাদূ এবারও স্পষ্ট কথা বলিতে ইতঃস্তত করিলেন না। জানাইলেন ঐশ্বর্য্যময় দিল্লীতে গিয়া দেখা করিলে সম্রাট যেমন তাঁহাকে ঠিক মত চিনিতে পারিবেন না, তেমনি তাঁহার নিজেরও অসুবিধা কম হইবে না। ঐ ভীড় ও আড়ম্বরের মধ্যে নিজেকে খুঁজিয়া পাওয়া ভার হইবে।

আকবর উত্তরে জানাইলেন, "রাজধানীর রূঢ় বাস্তবতার মধ্যে আপনাকে ডেকে আনবো, এমন মূঢ় আমি নই। সাগর থেকে একপাত্র জল নিয়ে এসে সাগরের রূপ আমি কি দেখবো? উত্তরাখণ্ডের একখণ্ড শিলা এনেই বা হিমালয়ের মহিমা কি বুঝবো? আমি আপনাকে আপনার নিজস্ব পরিবেশে, ভক্তসাধকের কেন্দ্র-স্থলেই দর্শন করিতে যেতাম। কিন্তু এ আমার দুর্ভাগ্য, যে আমি এই দেশের সম্রাট। আমি আপনার ওখানে গেলে আলোড়ন হবে,

আপনার সাধনস্থলটিও কম উপদ্রুত হবে না। আপনি বা আমি কেউ-ই স্বস্তি পাবো না।" অতঃপর স্থির হইল, উভয়ের সাক্ষাৎ হইবে ফতেপুর সিক্রির নিকটস্থ এক নির্জ্জন প্রান্তরে।

কয়েকটি অন্তরঙ্গ শিষ্যসহ দাদূ সম্রাটের সহিত মিলিত হইতে চলিলেন। পথিমধ্যে তাঁহার এক ভক্ত উৎসাহভরে সেদিন কহিতেছিলেন, "আপনার এই অলখ্‌পন্থী ব্রহ্মসম্প্রদায়ের কাজে সম্রাটের সাহায্য নিলে কত সুবিধা হয়! প্রচার ও সংগঠনের কাজ দ্রুততর হয়ে উঠতে পারে।"

দাদূ গম্ভীর হইয়া উত্তর দিলেন, "ভাই, যাঁকে প্রতিষ্ঠা করার ব্রত নিয়েছি, পূর্ণ নির্ভর যে তাঁর উপরই সবচেয়ে বেশী থাকা প্রয়োজন। তাছাড়া, বল দেখি, আমিই যদি আমার প্রভুকে ত্যাগ করি, আমিই যদি তাঁর নামের ঘোষণা ও প্রতিষ্ঠায় বিরত থাকি, তবে কে তাঁর দিকে অগ্রসর হবে? পরম সত্য যুগে যুগে ধীর গতিতেই যে আত্মপ্রকাশ করে। এজন্য ব্যস্ত হয়ে রাজরাজড়ার সাহায্যের দিকে তাকাবার কোন দরকার নেই।"

দাদূর সঙ্গে সম্রাট আকবরের ধর্ম্মালাপ চলে প্রায় চল্লিশ দিন ব্যাপিয়া। বিশিষ্ট দাদূ ভক্তদের লেখায় এ তথ্য সন্নিবিষ্ট রহিয়াছে। জ্ঞানপিপাসু বাদশাহ প্রাণ ভরিয়া কেবলি প্রশ্নের পর প্রশ্ন করেন—আর সিদ্ধপুরুষ দাদূ তাহার উত্তরদান প্রসঙ্গে এক পুণ্য-পরিবেশ ও অনাবিল আনন্দধারা সৃষ্টি করতে থাকেন। আকবর জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহাত্মন, আমায় বলুন, এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টির ক্রম কি? আল্লাহ্ প্রথমে কোন্ বস্তু রচনা করলেন—আকাশ, বায়ু, জল, না ভূমি?"

দাদূ স্মিতহাস্যে উত্তর দিলেন, "সে কি সম্রাট! আমার প্রভুর শক্তিকে এমন সীমিত করা কেন? সর্ব্বশক্তির আধার যিনি, তাঁর কাছে আবার কোন্‌টি আগে কোন্‌টি পরে কর্‌বার প্রশ্ন উঠে কোথায়?"

এক সবদ সব কুছ কিয়া ঐসা সম্রথ সেই।
আগৈঁ পীছেঁ তৌ করৈ জে বলহীনা হোই।

অর্থাৎ, প্রভু আমার এমনি সমর্থ যে, একটি আনন্দধ্বনিতেই সমস্ত কিছু একযোগে তিনি সৃষ্টি করিতে পারেন। কোন কিছু আগে পিছে তৈরী করার প্রশ্ন তাঁহার সম্পর্কেই উঠে—যে বলহীন।

কথা প্রসঙ্গে আকবর কহিলেন, "সাধারণের মধ্যে একটা প্রচলিত ধারণা রয়েছে, সন্ত কবীর তাঁর সাধনার মধ্য দিয়ে যত কিছু অধ্যাত্মতত্ত্বের নবনী উঠিয়ে নিয়ে গিয়েছেন। এ কথার অর্থ কি?"

কবীরের প্রচারিত মরমিয়া সাধনাই দাদুর সাধনা।

যদিও তিনি নিজ সামর্থ্যে ইহার ধারাটিকে স্পষ্টতর ও বিস্তৃততর করিয়াছেন। এই পুরোগামী মহাসাধককে তিনি গুরুর ন্যায় জ্ঞান করেন, ইঁহার প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধা ভক্তির সীমা নাই।

আকবরের এ প্রশ্নে সত্যনিষ্ঠ সাধক উদ্দীপিত হইয়া উঠিলেন। উত্তর দিলেন, "সে কি কথা! যত বড় সাধকই হোন না কেন, এ ভগবৎরস-সাগরকে কে ফুরিয়ে ফেলতে পেরেছে? পাখী তার চঞ্চু দিয়ে সাগরের কতটা গ্রহণ করতে সক্ষম? একথা সাম্প্রদায়িক বুদ্ধির কথা, সঙ্কীর্ণ চিত্তের কথা। যদিও কবীর আমার গুরুস্বরূপ, তবু আমি গুরুর নাম ক'রে অন্যায়ের প্রশ্রয় দিতে পারিনে। আমার গুরুকে লাঠিরূপে ব্যবহার করে অপরের মাথা ভাঙতে যাবো—সে যে আমার গুরুরই চরমতম অপমান!" এই উদার অসাম্প্রদায়িক বুদ্ধি ও সত্যনিষ্ঠার প্রকৃত মূল্য নিরূপণে সেদিন আকবরের ভুল হয় নাই।

বাদশাহের সঙ্গীয় পণ্ডিতেরা এই নিরক্ষর চর্ম্মকারের জ্ঞানগর্ভ আলোচনায় বড় বিস্মিত হইয়া গিয়াছেন। অবশেষে তাঁহারা দাদুকে প্রশ্ন করিলেন, "সবই বুঝলাম, কিন্তু আপনি এবার স্পষ্ট করে বলুন—আপনার শাস্ত্র কি, সাধনার পদ্ধতি ও মন্ত্রই বা কি?"

উত্তর হইল, "আমার এই কায়া মহলেই আমি নেমাজ পড়ি—সেখানে কোন জনপ্রাণী আসতে পারে না। মনের মালায় নিরন্তর

আমার জপ চলে, তাই স্বামীর মন হয় তুষ্ট। চিত্ত-সাগরে আমার স্নান ও 'ওজূ' চলে তারপর নির্ম্মল চিত্তখানি বিছিয়ে দিই, প্রভুকে আমার বন্দনা করি তাঁর কাছে করি, আত্মসমর্পণ।"

পণ্ডিতজন পরিবৃত সম্রাট বিস্ময়বিমুগ্ধ নয়নে এই সিদ্ধপুরুষের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

দাদূ তখন ভক্ত ও পরিবারবর্গসহ আম্বেরে বাস করিতেছেন। অঞ্চলটি এ সময়ে ছিল জয়পুররাজ ভগবন্তদাসের অধিকারে। বিশিষ্ট ব্যক্তি মাত্রেই রাজাকে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন, তাঁহার সঙ্গে সৌজন্যমূলক দেখা সাক্ষাৎ করিতে আসেন। কেহ বা অনুগ্রহ ও সাহায্যের প্রত্যাশী হইয়াও রাজসভায় যাতায়াত করেন। রাজার কাণে প্রায়ই দাদূর সুখ্যাতির কথা আসে। কিন্তু কই? এই ভক্ত সাধকটি যে একবারও রাজধানীতে দেখা করতে আসেন না! আম্বেরপতির অভিষেকের দিনেও দাদূ অভিনন্দন জানাইতে যান নাই। নিজের আন্তর সাধনায় তিনি তখন একেবারে ডুবিয়া আছেন, কোন সামাজিকতা ও লৌকিকতার ধারই তিনি ধারেন না। কিন্তু তাহা হইলে কি হয়? রাজা ভগবন্তদাস তাঁহার এই উদাসীন ব্যবহারের কথা বিস্মৃত হইলেন না।

ভারত সম্রাট আকবরের সম্বর্দ্ধনার ফলে জনসাধারণের দৃষ্টি ক্রমে দাদূর উপর আরও বেশী পড়িয়াছে। সিদ্ধপুরুষ বলিয়া সর্ব্বত্র তাঁহার খ্যাতি তখন প্রচারিত।

আম্বেরপতি অতঃপর হঠাৎ একদিন তাঁহার রাজ্যের এই বিখ্যাত সাধকটিকে দেখিতে আসিলেন। রাজা প্রশ্ন করিলেন—"আপনি কতদিন আম্বেরে রয়েছেন?" দাদূ উত্তর দিলেন, "মহারাজ, বহু বৎসর যাবৎই আছি।"

ভগবন্তদাস নিজের আত্মাভিমানকে সংযত করিয়া সংক্ষেপে শুধু কহিলেন, "কই, আপনাকে তো কখনো দেখিনি!" রাজার কথার মধ্যে যে প্রচ্ছন্ন খোঁচা রহিয়াছে, তাহা বুঝিতে কাহারো

বাকী রহিল না। সাধক কিন্তু সব বুঝিয়াও চুপ করিয়া রহিলেন।

দাদূর মেয়ে দুইটি বড় হইয়াছে, বিবাহ দেওয়া হয় নাই। সামাজিক সংস্কার এবং আচারনিষ্ঠা—তাহা হিন্দু বা মুসলমান যাহারই হোক, ভগবন্তদাস মনে প্রাণে সমর্থন করিতেন। দাদূর উদার মতবাদ ও তাঁহার বচনভঙ্গী রাজার মোটেই ভাল লাগিল না। মেয়েদের দেখাইয়া দাদূকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তাহাদের বিবাহের বয়স কি পার হইয়া যাইতেছে না? দাদূ সবিনয়ে জানাইলেন, মেয়েরা অধ্যাত্মজীবনকেই একান্তভাবে আঁকড়াইয়া ধরিয়া আছে, সাধন ভজনেই তাহারা মত্ত। আর বিবাহ? তাহারও তো উপায় দেখা যাইতেছে না—'জো পতি বয়্যো কবীরজী, সো করি বয়্যে নিচাহি।'—কবীর যাঁহাকে পতিত্বে বরণ করিয়াছিলেন, মেয়েরা যে তাঁহাকেই পতিরূপে গ্রহণ করিয়াছে! সমাজবিধি সম্বন্ধে সদা সজাগ আম্বেররাজের কাণে কথাগুলি কিন্তু তেমন ভাল লাগে নাই।

সেদিনের সাক্ষাতের পর ভগবন্তদাস চলিয়া গেলেন। কিন্তু রাজার সহিত দাদূ ও দাদূপন্থীদের মতের বিরোধ যেন বাধিয়াই রহিল। ইহার কিছুকাল পরে দাদূ বিরক্ত হইয়া আম্বের ত্যাগ করিয়া যান। অতঃপর মারওয়াড়, বিকানীর, কল্যাণপুর প্রভৃতিস্থানে কিছুকাল বাস করিয়া তিনি শেষকালে নারায়ণায় উপস্থিত হন।

দাদূর সাধনার পথ হইতেছে 'সহজ-পথ'। দৈনিক জীবন এবং শাশ্বত জীবনের মধ্যে সহজ যোগাযোগ স্থাপনের মধ্য দিয়াই ইহার পরিপূর্ণতা ও সার্থকতা। তিনি তাই বলিয়াছেন, "নদীর মত একই সঙ্গে প্রতিদিনের সাধনা ও শাশ্বত সাধনার মধ্যে নিজেকে ঢেলে দাও। অনর্থক সংসারের কর্তব্যকে বাধা দিয়ে অস্বাভাবিকতার বেড়া টেনে দিও না। একই সঙ্গে তোমার সেবার দ্বারা দুই তীরের সকলকে তৃপ্ত করে তোল, আবার সহজ যোগের আনন্দে উদ্বেলিত হয়ে মহাসাগরের মিলনানন্দ উপভোগ কর। ভক্ত সাধকের জীবনে নদীর ধর্ম্ম ও দ্বৈতসাধনা বিকশিত হয়ে উঠুক।"

কিন্তু দাদুর এই মতবাদ তাঁহার বিপুল সংখ্যক শিষ্যের মধ্যে সকলেই অনুসরণ করে নাই। তাঁহাদের মধ্যে সংসারত্যাগী সাধকের সংখ্যাও খুব কম ছিল না। তা ছাড়া, দাদুপন্থী নাগা সন্ন্যাসীদের সংখ্যাও ছিল প্রচুর। তাহাদের প্রভাব উত্তরকালে ভারতের বহুস্থানে ক্রমে বিস্তৃত হইয়া পড়ে।

ভক্তদের সাধনভজনের সুবিধার জন্য দাদু ভক্তিরসাশ্রিত পদের দুইটি বিস্তৃত 'সংগ্রহ-গ্রন্থ' রচনার নির্দ্দেশ দেন। তদনুসারে তাহার হিন্দু শিষ্য জগন্নাথজী এবং মুসলমান শিষ্য রজ্জবজী যথাক্রমে 'গুণগঞ্জনামা' এবং 'সর্বাঙ্গী' নামক দুইটি ভক্তিগ্রন্থ সঙ্কলন করেন। মরমীয়া সাধনার পদ এবং সঙ্গীতের সমাবেশ যেমন এগুলিতে আছে তেমনিই নানা সম্প্রদায়ের ভক্তিসাধকদের রচনায়ও এগুলি সমৃদ্ধ।

দাদুর সাধনার মূল কথা ঈশ্বর-প্রেম, ঈশ্বর-বিরহ। তাঁহার দৃষ্টিতে এই প্রেম ও বিরহই পরম সত্য। কারণ, মানুষের 'আত্মসত্তা' যে পরম প্রভুরই সৃষ্টি সেই পরম প্রভুরই রসসিঞ্চনে তাহা জীবন্ত। প্রভুর জন্য ভক্ত যেমন কাঁদিয়া বেড়ায়—ভক্তের প্রভু জন্য আমাদের তেমনিই কি ব্যাকুল, বিরহ-বিধুর নহেন? পরমতমের প্রেমাকর্ষণই যে মানুষের সাধনার রসসাগরকে অবিরত উদ্বেলিত করিয়া তুলিতেছে। ঈশ্বরের দিক দিয়া ভক্তির জন্য এই যে চিরন্তন বিরহ-বেদনা চলিয়াছে দাদুর বাণীতে তাহার রূপায়ন বড় অপূর্ব্ব—

হাঁ মাঈ,
মহারো লাগি রাম বৈরাগী তজা নঁহী জাঈ।
প্রেম বিথা করত উর অন্তর বিসুরি সুখ নঁহী পাঈ।
জোগিনী হয়ৈ ফিরূঁগী বিদেশ জীউকি তপনী মিটাঈ।
দাদু কৌ স্বামী হৈ রে উদাসী ঘর সুখ রহা কিনি জাঈ॥

অর্থাৎ, ওগো হায়! আমারই লাগিয়া রাম আমার বৈরাগী, তাঁহাকে তো তাই আর ত্যাগ করা যায় না! অন্তর আমার প্রেমের বেদনায় আর্ত্ত, তাঁহাকে বিস্মৃত হইয়া তো কোন সুখই পাই না?

যোগিনী হইয়া আমি দেশ-বিদেশে ঘুরিয়া বেড়াইব। ওরে, দাদূর স্বামী হইয়াছেন তাঁহার জন্য উদাসী, তবে আর কেমন করিয়া ঘরে থাকা যায়?

ভক্ত দাদূর এই প্রেমের সাধনায় নাম-জপের স্থান খুবই উচ্চে। "মন পবনা গহি সুরতি সৌ দাদূ পাঠৈ স্বাদ"—মন ও পবন দ্বারা অর্থাৎ, "মন দিয়া প্রতি শ্বাসযোগে প্রেমের সহিত নাম নিলে হে দাদূ, পাইবে অমৃতের আস্বাদ।" তাঁহার এই নাম জপের ক্রম সম্বন্ধেও তিনি বলিয়া গিয়াছেন—প্রথমে হয় নাম শ্রবণ, দ্বিতিয়ে উপজিত হয় নামে রস, তৃতীয়ে হৃদয় মধ্যে ধ্বনিত হয় নাম গান, চতুর্থে মন হয় মগ্ন, প্রতি রোমকূপে উপচিয়া উঠে ভক্তি ও প্রেমরস।

দাদূর 'সহজ-পংথ' ভক্ত ও সাধকের সম্মুখে সহজ তীর্থেরই পথ খুলিয়া দিয়াছিল—'সহজ সমর্পণ সুমিরণ সেবা, তিরবেণী তট সঙ্গম সপরা।'—সহজ আত্মসমর্পণ, স্মরণ ও সেবার মধ্য দিয়াই এই পুণ্য-ত্রিবেণীতে সাধক উপনীত হইতে সমর্থ। কায়ার মধ্যে কায়াহীনের, সীমার মধ্যে পরম অসীমের যে দর্শন দাদূ লাভ করিলেন তাঁহার পরচা অঙ্গের বাণীতে সেকথা তিনি জানাইয়াছেন—'কায়ার অন্তরেই আমি পাইলাম ত্রিকূটীর তীর। সহজেই প্রভু আপনাকে প্রকাশ করিলেন, সর্ব্বশরীরে তিনি হইলেন পরিব্যাপ্ত। কায়ার অন্তরেই পাইলাম সেই নিরাধার নিরাকারকে, সহজেই সেখানে তিনি নিজেকে করিলেন প্রকাশ, স্বামী আমার এমনি সমর্থ। আমার কায়ার ভিতরেই উপলব্ধি করিলাম তাঁহার অসীম অনাহত বেণুর ধ্বনি। শূন্য মণ্ডলে বিরাজিত হইয়া তিনি আপনাকে করিলেন সুপ্রকট, কায়ার অভ্যন্তরেই দর্শন করিলাম সেই দেবগণের দেবকে, সহজেই আপনাকে তিনি করিলেন প্রকাশিত—প্রভু আমার এমনই অলখ্ ও অনির্ব্বচনীয়।'

এই অপরূপ দিব্য ধামের আভাস সিদ্ধপুরুষ দাদূ তাঁহার অন্তরের স্বতোৎসারিত এক সঙ্গীতে দিয়াছেন—

রাম তহা পরঘট রহে ভরপুর।
আতম কমল জহাঁ, পরমপুরুষ তহাঁ,
ছিল মিলি ঝিল মিলি নূর॥
কোমল কুসুম দল,
নিরাকার জ্যোতি জল।
বার নহি পার।
শূন্য সরোবর জহাঁ
দাদূ হংস রহৈ তহাঁ
বিলসি বিলসি নিজ সার॥

—ভগবান সেই আত্মকমলে প্রকট হইয়া আছেন। পরমপুরুষ যেখানে বিরাজিত, সেখানেই জ্যোতি করিতেছে নিরন্তর ঝিল্ মিল্। কোমল কুসুম দল, নিরাকার জ্যোতির সলিল—শূন্য সরোবর যেখানে, সেখানে নাই কূল কিনারা। হংস হইয়া দাদূ সেখানে রহে, বিহার ও বিলাসে আপনাকে করিয়া তোলে সার্থক।

মরমিয়া সাধক দাদূর আত্মানুভূতিতে এক অপূর্ব্ব প্রিয় মিলন, অপূর্ব্ব আত্মিক যোগের তত্ত্ব উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে—'তেজঃপুঞ্জেই রচিত এই সুন্দরী জীবাত্মা, আর তেজঃপুঞ্জেরই এই কান্ত, পরমাত্মা। তেজঃপুঞ্জেরই এই মধুর মিলনে বসন্ত উৎসারিত হইয়া উঠিয়াছে, প্রেমের পুষ্প সদাই বর্ষিত হইতেছে। শ্রীহরির ভক্তজন ফাগ খেলায় মত্ত। দাদূ তোমার পরম সৌভাগ্য, যে এমন আনন্দরঙ্গ তুমি দেখিতেছ। তাকাইয়া দেখ—পরব্রহ্ম বর্ষণ করিতেছেন অমৃতধারা, জ্যোতিঃপুঞ্জ ঝরিতেছে ঝিল্ মিল্ করিয়া। সাধকগণ তাহাই করিতেছে পান। রসের মধ্যেই হইবে রসের বর্ষণ। আর অনন্তকোটি ধারায় সেই বর্ষণই তো চলিয়াছে। দাদূ সেখানে মন নিশ্চল করিয়া রাখ, তবেই তোমার মধ্যে বসন্ত রহিবে সদা বিরাজিত।'

প্রেম-সাধনার সার্থকতা দাদূর সত্তাকে পূর্ণ করিয়া তুলিয়াছে। বহিরঙ্গ জীবনের উপর মহাসাধক ধীরে ধীরে এক যবনিকা টানিয়া

দিতেছেন। অন্তর্লোকে চলিয়াছে অবিরাম আনন্দ সম্ভোগ। কিন্তু এই দিব্য অনুভূতি কাহাকেও বুঝাইতে যাওয়ার মত মন তাঁহার কোথায় ?—'গূংগেকা গুড়কা কহূঁ মন জানত হৈ খাই, রাম রসাইন পীবতা সো সুখ কহ্যা ন জাই।' অর্থাৎ, এ যে বোবার গুড় ভোজন! কি বলিব আর, শুধু মনই জানিতেছে ইহার কথা—রামরসামৃত পান করার যে কি আনন্দ, তাহা তো যায় না বলা!

দাদু আজকাল কিছুটা মৌন হইয়া গিয়াছেন। ভক্তপ্রবর বাজিন্দ্ খাঁ একদিন তাঁহাকে অনুযোগ দিয়া কহিলেন, 'তুমি আগে ভক্ত ও মুমুক্ষু মানুষকে কত সঙ্গ দিতে, তাদের নিয়ে কত আনন্দরঙ্গ করতে। এখন কেবল ভগবান নিয়েই দিনরাত মত্ত হয়ে আছো। ভগবান-সৃষ্ট মানুষের কি কোন মূল্যই আর তোমার কাছে নেই?'

উত্তরে দাদু কহিলেন, "নিশ্চয়ই আছে ভাই। মানুষকে সত্যিকার রূপে যে পেতে চায়, তাকে ভগবানের মাধ্যমেই তা পেতে হবে। পরম প্রভুর মধ্যেই যে সকলে বিধৃত! তাই তাঁর ভেতর দিয়ে দেখাই তো যথার্থ দেখা, সেই পাওয়াই তো যথার্থ পাওয়া—

দেব নিরঞ্জন পূজিয়ে সব আয়া উস মাহিঁ
ডাল পাত ফল ফুল সব দাদূ ন্যারে নাহিঁ।

অর্থাৎ দেবনিরঞ্জনকেই কর পূজা, তবে সকলই আসিবে সেই সঙ্গে তাহার মধ্যে। ডাল পাতা ফলফুল সব কিছুই সেই মূলদ্বারা বিধৃত। হে দাদু, এই সমস্ত বস্তুসম্ভার মূল হইতে ভিন্ন কিছু নয়।

মনের গোপন মণিকোঠায় প্রেমময় স্বামীর সহিত সদাই চলে দাদুর রাস-রঙ্গ, অনির্ব্বচনীয় লীলা-বিলাস। শ্যামসুন্দর বনমালী আজ যে দাদুর মনমালীরূপে অবতীর্ণ! পরম ভক্তের অধ্যাত্মসত্তায় উপবনটি রচনা করিয়া পুষ্প-আকীর্ণ অঙ্গনে পরম প্রভু আজ কি মধুর খেলাই খেলিতেছেন।—

মোহন মালী সহজি সমানাঁ
কৈ জানৈ সাধ সুজানাঁ।
কায়া বাড়ী মাঁহৈঁ
মালী তহাঁ রাস বনায়া।
সেবগ সোঁ স্বামী পেলন কোঁ
আপ দয়া করি আয়া॥
বাহরি ভীতরি সব নিরংতরি
সব মৈঁ রহ্যা সমাই।
পরগট গুপত গুপত পুনি পরগট
অবিগত লখ্যা ন জাঈ॥

—মোহন মালী পরিপূর্ণ করিয়া আছেন আমার অন্তরের সহজ লোক, সাধু সুজনই শুধু তাহা জানে। কায়া ফুলবনের মধ্যে বিরাজিত মালী, সেখানেই তিনি রচনা করিলেন রাস। সেবকের সহিত খেলা করিতে স্বামী আমার সেখানে দয়া করিয়া আপনিই আসিয়া উপস্থিত!

অন্তরকুঞ্জে রাসের এই রসমাধুর্য্য, পরম-অমৃত ত্যাগ করিতে দাদু চাহিবেন কেন? তাই তিনি তাঁহার আকুতি জানাইলেন হৃদয়নাথকে —'জুগি জুগি তারণহার জুগি জুগি দরশন দেখিয়ে, জুগি জুগি মঙ্গলাচার জুগি জুগি দাদু গাইয়ে।' অর্থাৎ, যুগে যুগে তিনিই তারণকর্ত্তা, যুগে যুগে তাঁহাকে কর দরশন, যুগে যুগে মঙ্গল আচার, যুগে যুগে দাদু করে স্তব গান।'

অদ্বৈতজ্ঞানে পরমভাগবত দাদুর প্রয়োজন নাই—যুগে যুগে তিনি পরম প্রভুকে দয়িতরূপেই পাইতে চাহেন, তাঁহার প্রেমের রস আস্বাদন করিয়া কৃতার্থ হইতে চাহেন। চিনি হইবার প্রয়োজন তাঁহার নাই, চিনি খাইতেই তিনি চির-অভিলাষী—ভক্ত প্রাণের এই পরম আকাঙ্ক্ষা দাদুর বাণীতে ব্যক্ত হইয়াছে—

প্রেম পিয়ালা নূরকা আসিক ভরি দীয়া।
দাছ দর দিদার মৈ মতওয়ালা কীয়া॥
দাছ অমলী মিকা রস বিন রহ্যা ন জাই।
পলক এক পীবৈ নঁহী তলফি তলফি মরি জাই॥
দাছ রাতা রামকা পীবৈ প্রেম অঘাই।
মতয়ালা দীদারকা মঁাগৈ মুকুতি বলাই॥

অর্থাৎ, জ্যোতির পেয়ালায় প্রেমময় তাঁহার প্রেম ভরপুর করিয়া দিলেন। হে দাছ, প্রত্যক্ষ রূপটি দেখাইয়া আমায় তিনি করিয়া দিলেন মাতাল। দাছ হইয়া গেল রামের মাতাল, রস বিনা তাহার বাঁচা কঠিন, এক পলক যদি সেই রস পান না করিতে পায়, তবে ছটফট করিয়া তাহাকে মরিতে হয়। দাছ হইয়াছে রামে অনুরক্ত, প্রাণ ভরিয়া সে প্রেমরস পান করিতেছে। ওগো, রামের প্রত্যক্ষ রূপ-মাধুর্য্যে যে মাতাল হইয়াছে, সে কি আর মুক্তির বালাই খুঁজিয়া ফিরে?

রসোজ্জ্বল সাধনার দীর্ঘ পথটি বাহিয়া দাছ তাঁহার জীবন-পরিক্রমার শেষ প্রান্তে আসিয়া পৌঁছিলেন। রাজপুতানার ক্ষুদ্র জনপদ নারায়ণায় তখন তিনি বাস করিতেছেন। মহাসমাধির পরম লগ্নটি আসিয়া গিয়াছে, সাধকের তাহা আর অজানা নয়। এই চিহ্নিত সময়টিতে শুধু তাঁহার অনুরক্ত ভক্ত-শিষ্যগণই সেদিন উপস্থিত ছিলেন না, একদল উচ্চকোটি সাধুও কোথা হইতে যেন হঠাৎ সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ভক্ত দাছ ভক্তির মহিমা বাড়াইবার জন্য শেষ সময়ে হর্ষোৎফুল্ল কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন—

দাছ কম সির মোটে ভাগ
সাধুঁকা দর্শন কিয়া।
কহা করৈ জম কাল
রাম রসাইণ ভরি পিয়া।

—কি মহা সৌভাগ্য আমার ! এ সাধুদের দর্শন এসময়ে পাইলাম, রামরসায়ন পান করিলাম, এখন কালমৃত্যু আর আমার কি করিবে ?

১৬০৩ খৃষ্টাব্দ। জ্যৈষ্ঠ মাসের কৃষ্ণাষ্টমী, শনিবার। প্রেমিক সাধক তাঁহার মর দেহখানি এই দিন ত্যাগ করিয়া গেলেন। তখন তাঁহার বয়স প্রায় উনষাট বৎসর। নারায়ণায় আজিও দাদুর 'গাদী' পরম শ্রদ্ধাভরে পূজিত হয়, তাঁহার পবিত্র 'গ্রন্থের' সম্মুখে দেশ দেশান্তরের সাধকদের ভক্তি-আপ্লুত শির লুটাইয়া পড়ে।

শ্রীলোকনাথ ব্রহ্মচারী

রহস্যময় উন্মাদ সন্ন্যাসী! উলঙ্গ হইয়া সে পথে প্রান্তরে আর নদীর সৈকতে ঘুরিয়া বেড়ায়। নারায়ণগঞ্জের বারদী গ্রামে সে নবাগত। কিন্তু এ অঞ্চলের নিস্তরঙ্গ জনজীবনে সে যেন এক আলোড়ন আনিয়া দিয়াছে। স্নানের ঘাটের নরনারী এ অসভ্য পাগলকে দেখিলেই প্রহার করিতে আসে, ঝোপঝাড়ের আড়ালে লুকাইয়া সে খল্ খল্ করিয়া হাসিতে থাকে। ঢিল ছুঁড়িয়া বালকের দল বড় বেশী উত্যক্ত করিলে অঞ্জলিপূর্ণ মূত্র নিক্ষেপ করিয়া পাগল তাহাদের বিতাড়িত করে। গ্রামের মানুষ এই উন্মাদ পুরুষকে বোঝে না, আর সেও বুঝি ধরা দিতে সম্মত নয়। উদার স্বচ্ছ নীলাকাশ আর দিগন্ত প্রসারিত হরিৎ ক্ষেত্রের সহিত তার একান্ত মিতালী। মেঘনার কালো কালো উত্তাল ঢেউ দুরন্ত উচ্ছ্বাসে বালুকা তটে আছড়াইয়া পড়ে, তাহাদেরই সহিত এই পাগলের নিবিড় পরিচয়। পথে প্রান্তরে, নদীতীরে কেন সে উলঙ্গ হইয়া ঘুরিয়া বেড়ায় কে তাহা বলিবে?

জনসমাজে তাহার পরিচয়-লগ্নটি কিন্তু শীঘ্রই উপস্থিত হয়। বারদীগ্রামের কয়েকটি সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণ এক জায়গায় বসিয়া সেদিন যজ্ঞোপবীত তৈরী করিতেছেন। সূত্রগুলি হঠাৎ এক জটিল বন্ধনে জড়াইয়া গেল। বহু চেষ্টায়ও তাহা আর কোনমতে খোলা যাইতেছে না। এমন সময় এই উন্মাদ সন্ন্যাসী সেখানে আসিয়া উপস্থিত। আচার বিচারহীন যত্রতত্র বিচরণকারী পাগলকে অগ্রসর হইতে দেখিয়া ব্রাহ্মণেরা শঙ্কিত হইয়া উঠিলেন। প্রকৃত পরিচয় কাহারো জানা নাই। অস্পৃশ্য না অন্ত্যজ, তাহাই বা কে জানে? সতর্ক করিয়া দেওয়া হইল, সে নিকটে যেন না আসে।

পাগল স্মিতহাস্যে তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিল, "পৈতার প্যাঁচ কি করে খুলতে হয় গো ?"

"কেন ? গায়ত্রী জপ ক'রে !"

"তবে তা ক'রছোনা কেন ?"

ব্রাহ্মণদের মনে চিন্তা খেলিয়া গেল, কাহার ভিতরে কোন্ বস্তু লুকাইয়া আছে কে জানে ? কৌতূহলী হইয়া একজন তাহাকে অনুরোধ জানাইলেন, "বেশতো, তুমিই খুলে দাও না কেন ?"

উন্মাদ যজ্ঞোপবীতের উপর হস্ত রাখিয়া গায়ত্রী মন্ত্র জপ করিল। তারপর জপ শেষে একটি করতালি দিয়া সূতার দুই প্রান্ত ধরিয়া সজোরে দিল এক টান। তাইতো ! বড় অদ্ভুত কাণ্ড। জটিল গ্রন্থিগুলি অকস্মাৎ সরল হইয়া খুলিয়া গিয়াছে।

ঘটনাটি অতি ক্ষুদ্র। কিন্তু ইহার মধ্য দিয়াই এই রহস্যময় মানুষটির আবরণ সেদিন কিছুটা উন্মোচিত না হইয়া পারে নাই। এক শক্তিশালী প্রচ্ছন্ন সাধকরূপে গ্রামের জনগণ তাঁহাকে অতঃপর দেখিতে শিখে। আত্মপরিচয় উদ্‌ঘাটনে এ যেন তাঁহার অলৌকিক শক্তির এক ক্ষীণতম আলোকপাত। কিন্তু ইহারই ধারাপথ বাহিয়া উত্তরকালে এক শক্তিধর মহাপুরুষের প্রকাশ এই অখ্যাত গ্রামটিতে ঘটিয়া উঠিতে দেখা যায়। জনসমাজে ইহাই হয় মহাযোগী লোকনাথ ব্রহ্মচারীর অভ্যুদয় কাহিনীর সূচনা। উত্তরকালে সমগ্র বাংলার অন্তর্লোকে ধীরে ধীরে এই শক্তিধর মহাপুরুষের করুণাঘন লীলা রূপায়িত হইয়া উঠে।

যোগবিভূতির নানা ঐশ্বর্য্য অতঃপর এই বিরাট মহাপুরুষকে কেন্দ্র করিয়া উৎসারিত হয়। ধনী নির্ধন ও জাতি বর্ণ নির্ব্বিশেষে তিনি বহু নরনারীর আশ্রয়দাতারূপে পরিচিত হন, সর্ব্বজনবন্দ্য মহাপুরুষ বারদীর ব্রহ্মচারীরূপে দেশ দেশান্তরে তিনি কীর্ত্তিত হন।

হিমালয় শিখরের দুশ্চর তপস্যা ও দিক্‌বিদিকের পরিক্রমা তখন শেষ হইয়াছে। এবার শুরু হয় এক ঐশী নির্দ্দিষ্ট কল্যাণব্রতের

পালা। ব্রহ্মচারী লোকনাথ তাই বুঝি পূর্ব্ববাংলার সমতলভূমিটিতে অবতরণ করিলেন। এই সময়ে তাঁহার বয়স হইবে প্রায় দেড়শত বৎসর। ইহার পর একাদিক্রমে প্রায় ছাব্বিশ বৎসর কাল ব্যাপিয়া তিনি এই বারদী গ্রামেই অবস্থান করেন। ত্রিতাপক্লিষ্ট অসহায় নরনারী দলে দলে তাঁহার চরণাশ্রয়লাভে ধন্য হয়।

আনুমানিক ১১৩৮ সনের কথা। চব্বিশ পরগণার বারাসাত মহকুমার অন্তর্গত কচুয়া সেই সময়কার এক বর্দ্ধিষ্ণু এবং বিখ্যাত গ্রাম। এই গ্রামের রামকানাই ঘোষাল তৎকালে এক ধর্ম্মপরায়ণ ব্রাহ্মণরূপে প্রসিদ্ধি অর্জ্জন করেন। ঘোষাল মহাশয়ের পত্নী কমলাদেবীর চতুর্থ গর্ভের এই সন্তানই মহাপুরুষ লোকনাথ। রামকানাইর বড় ইচ্ছা, তাঁহার একটি সন্তান সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণদ্বারা ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করুক—তাঁহার কুল পবিত্র হইয়া উঠুক। কিন্তু পত্নী কমলাদেবীর নিরন্তর বাধা দানের ফলে তাঁহার এ আশা এযাবৎ পূর্ণ হইতে পারে নাই। লোকনাথের বেলায় কিন্তু কি জানি কেন অবিলম্বে তাঁহার মাতার সম্মতি মিলিল। কনিষ্ঠ পুত্র লোকনাথের ভাবী জীবনের পথ-পরিক্রমা এইরূপে তাঁহার জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই সেদিন চিহ্নিত হইয়া গিয়াছিল।

পুত্র বড় হইতেছে। প্রাথমিক শিক্ষার কি হইবে? কাছেই সুপণ্ডিত ভগবান গাঙ্গুলীর বাস। সর্ব্বশাস্ত্রবেত্তা আচার্য্য ও এক বিশিষ্ট সাধকরূপে তাঁহার খ্যাতি প্রতিপত্তির অন্ত নাই। রামকানাই ঘোষাল এই সর্ব্বজনশ্রদ্ধেয় আচার্য্যের হস্তেই পুত্রের অধ্যাত্ম-জীবন গঠনের ভার দিয়া নিশ্চিন্ত হইলেন।

লোকনাথের উপবীত গ্রহণের সময় কিন্তু এক বিচিত্র ব্যাপার ঘটিতে দেখা গেল। ভগবান গাঙ্গুলী হঠাৎ স্থির করিলেন, আচার্য্যরূপে তিনি বালকের সংস্কার সম্পন্ন করাইবেন, আর তাহার অব্যবহিত পরেই এই দণ্ডী ব্রহ্মচারী বালককে সঙ্গে নিয়া তিনি চিরতরে

প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিবেন! বড় চাঞ্চল্যকর কথা! ভগবান গাঙ্গুলীর গৃহত্যাগের সঙ্কল্পটি তখনই কিন্তু রাষ্ট্র হইয়া গেল। চারিদিকেই তখন এ প্রসঙ্গ নিয়া মহা তোলপাড় চলিতেছে। এ সময়ে লোকনাথের বাল্যসখা বেণীমাধব বন্দ্যোপাধ্যায়ও আর এক আলোড়ন তুলিয়া বসে। ইঁহাদের সঙ্গে গৃহত্যাগে সেও সেদিন কৃতসঙ্কল্প হইয়াছে। বহু চেষ্টায়ও এ বালককে নিরস্ত করা সম্ভবপর হইল না। আচার্য্য ভগবান গাঙ্গুলী উভয় বালকেরই গুরুরূপে তাহাদের সংস্কার ও দীক্ষাকার্য্য সম্পন্ন করিলেন। উপনয়ন বাসরে সেদিন বহু কৌতূহলী জনতার ভীড় জমিয়া গিয়াছে। আচার্য্য ভগবান গাঙ্গুলী দুই বালক ব্রহ্মচারীসহ ধীরে ধীরে গৃহ হইতে চিরতরে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। তাঁহার বয়স তখন ষাট উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে, আর শিষ্যদ্বয়ের বয়স হইবে প্রায় দশ বৎসর।

পরিব্রাজনের পথে শিষ্যদ্বয়সহ আচার্য্য কালীঘাটে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এ নূতন জীবনের অর্থ বোধ হওয়া দূরের কথা, লোকনাথ ও বেণীমাধবের তখন উদ্দাম বালচাপল্যই দূর হয় নাই। বৃদ্ধ বয়সে জ্ঞানপন্থী সাধক ভগবান গাঙ্গুলী একান্ত দুঃসাহসের সহিতই এই দুই বালক শিষ্যসহ আরণ্য-জীবন যাপনের উদ্যোগ করিতেছেন। এ সময়কার ব্রহ্মচারী-জীবনের নানা কাহিনী লোকনাথ উত্তরকালে বিবৃত করিতে ভালবাসিতেন।

কালীঘাট তখন ছিল জঙ্গলে বেষ্টিত। জটাজুটধারী সন্ন্যাসীরা দূর দূরান্ত হইতে মহাজাগ্রত শক্তিপীঠে আসিয়া জড় হইত। ব্রহ্মচারী লোকনাথ ও বেণীমাধব তাঁহাদের প্রায়ই বড় উত্যক্ত করিতেন।

লোকনাথ বলিয়াছিলেন, আগন্তুক সাধুরা যখন ধ্যানে বসিতেন আমি ও বেণী চপলতা বশতঃ এই অভিনব জীবদের জটায় হস্তার্পণ করিতাম। কাহারও বা লেংটি আমরা স্পর্শ করিতাম। তাঁহারা কিছুই বলিতেন না, তাই প্রশ্রয় পাইয়া জটা ও লেংটি

ধরিয়া টান দিয়া আমরা দৌড়িয়া পলাইতাম। উপদ্রবে অতিষ্ঠ হইয়া সাধুরা শেষটায় গুরুদেবকে ইহা জানাইলেন। তিনি কিন্তু বড় সুন্দর উত্তর দিয়াছিলেন, '—আমার কাছে আবার এ অভিযোগ কেন? আমি তো একজন গৃহী। এরা আপনাদেরই লোক। ইচ্ছেমত আপনারাই এদের প্রস্তুত করে নিন। আমি তো আপনাদেরই লোককে ঘর থেকে বার করে এখানে এনেছি মাত্র, দায়িত্ব তো আপনাদের।'

"সাধুরা এ-কথার উত্তরে আর কি বলিবেন? গুরুদেব আমাদের তখন বলিতেন, 'তোমরা বড় হলে তোমাদেরও জটা আর লেংটি থাকবে, তখন কেউ যদি তা ধরে টানাটানি করে তবে তখন কি উপায় হবে?" বিস্মিত বালকদের দৃষ্টির সম্মুখে ভাবী জীবনেয় যে রহস্যঘনচিত্র উদিত হইত, তাহার তাৎপর্য্য বুঝার মত বয়স তখনও তাহাদের হয় নাই।

ইহার পরে অরণ্যবাসের পালা। আচার্য্য ভগবান গাঙ্গুলী মহাশয় এবার বালকদের জীবনে ব্রহ্মচর্য্যের সুদৃঢ় ভিত্তি গঠনে উদ্যোগী হইলেন। শাস্ত্রীয় বিধিসম্মত নিয়মনিষ্ঠা, কৃচ্ছ্রব্রতের মধ্য দিয়া গুরু এ সময়ে তাহাদের কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রিত না করিয়া ছাড়েন নাই। অপ্রাপ্তবয়স্ক শিষ্য দু'টির শিক্ষাদানে ও সেবায় আচার্য্য নিজেই তৎপর থাকিতেন। গুরুর পদে লোকনাথ ও বেণীমাধবের আত্মসমর্পণ তাই এমন সহজ এমন পরিপূর্ণ হইয়া উঠিতে পারিয়াছিল।

উত্তরকালে লোকনাথ এই সম্বন্ধে বলিতেন, "এই ব্রহ্মচর্য্য ব্রত উদ্‌যাপনকালে গুরুদেব স্বয়ং তাঁহার প্রিয় শিষ্যদ্বয়ের এবং নিজের জন্য ভিক্ষান্ন সংগ্রহ করিতেন। নানা কঠিন ব্রতানুষ্ঠান করিলেও আমাদের কায়িক পরিশ্রম বেশী করিতে দিতেন না। এমন কি মাসাহ ব্রতের দীর্ঘ উপবাসাদির কালে আমাদের অঙ্গসঞ্চালন করিতেও দিতেন না। মলমূত্র ত্যাগকালেও নড়াচড়া করার উপায়

ছিল না। এমন কি অঙ্গসঞ্চালনের ফলে উপবাস ব্রতের ব্যাঘাত ঘটে, এজন্য স্বয়ং আমাদের শৌচকর্ম্মও তিনিই করাইয়া দিতেন। মলের ভাণ্ড নিজেই অপসারণ করিতেন।”

এমনই ছিল ব্রহ্মচারী শিষ্যদের প্রতি গুরু ভগবান গাঙ্গুলীর মমত্ববোধ ও দায়িত্ববোধ পালনের অপূর্ব্ব নিষ্ঠা!

অরণ্যবাস ও কঠোর ব্রহ্মচর্য্যের মধ্য দিয়া প্রায় বিশ পঁচিশ বৎসর অতিবাহিত হইল। শিষ্যদ্বয় এখন পূর্ণ যুবক। বৃদ্ধ গুরুর এই পরিশ্রম কিন্তু শিষ্য লোকনাথের প্রায়ই অসহ্য বোধ হয়। একদিন তিনি মুখ ফুটিয়া বলিয়া ফেলিলেন, “আমরা যুবক শিষ্য দু'জন জঙ্গলে বসে থেকে খাই, আর তুমি বৃদ্ধ গুরু লোকালয়ে ঘুরে ঘুরে আমাদের ভিক্ষান্নের যোগাড় কর। এটা কিন্তু মোটেই আর ভাল বোধ হচ্ছেনা। তুমি আমাদের এ কাজে লাগাচ্ছো না কেন?

গুরুদেব উত্তর দিলেন, “না বাবা, তা ক'রলে তোদের একনিষ্ঠা একাগ্রতা এখন ঠিক থাকবে না। গৃহস্থদেয় নানা ভাব দেখলে তোদের মনেও ঐ সব চিন্তা উঠবে, এজন্যে যোগসাধনার ব্যাঘাত না ঘটে পারবে না।”

হিমালয় অঞ্চলে দীর্ঘকাল সাধনা করার পর লোকনাথ ও তাঁহার সঙ্গীদের সহিত এক মহাযোগীর সাক্ষাৎ হয়। ইহার নাম হিতলাল মিশ্র। অতি বৃদ্ধ ভগবান গাঙ্গুলী এই মহাসাধকের হাতেই লোকনাথ ও বেণীমাধবকে অর্পণ করিয়া যান। লোকান্তর প্রাপ্তির পূর্ব্বে সাশ্রুনয়নে আচার্য্য যোগীবরকে বলিয়াছিলেন, “বাবা” এর পর থেকে আমার এই বালক দুটির ভার তোমার ওপরই ন্যস্ত রইল।” বলা বাহুল্য, আচার্য্য ভগবান গাঙ্গুলীর এই 'বালকদ্বয়ের' বয়স তখন প্রায় নব্বুই বৎসর।

যোগী হিতলালের আশ্রয় ও সাধনোপদেশ গ্রহণ করিয়া ইহারা অপূর্ব্ব যোগসামর্থ্য অর্জ্জন করেন। তারপর সুদীর্ঘ সাধনার মধ্য

দিয়া লোকনাথ তাঁহার পরম প্রাপ্তি লাভ করেন, অপরিমেয় শক্তি-বিভূতির অধিকারী হন। তাঁহার অধ্যাত্মজীবনের এই নিগূঢ় কাহিনী জনমানসের সম্মুখে উদ্ঘাটিত হইবার উপায় নাই। উত্তরকালে নানা কথার বর্ণনা প্রসঙ্গে তিনি যৎসামান্য তথ্যের ইঙ্গিত মাত্র দিতেন। মহাযোগী হিতলালের করুণাই যে তাঁহার উত্তরজীবনকে রূপান্তরিত করিয়াছিল এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

হিতলালকে লোকনাথের কোন কোন জীবনীকার কাশীধামের শক্তিধর যোগী ত্রৈলঙ্গ স্বামীরূপে বর্ণনা করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। এই মহাসাধকের প্রকৃত পরিচয় যাহাই হোক, তাঁহার সান্নিধ্য ও তত্ত্বাবধানে আসিয়া লোকনাথ ও বেণীমাধব হিমালয় এবং তিব্বতের নানা অঞ্চলে পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন। তাছাড়া, আত্ম-সমর্পণ ও দীর্ঘ সান্নিধ্যের ফলে স্বভাবতঃই এই যোগীর অধ্যাত্মশক্তি ইঁহাদের উভয়ের সাধন জীবনে অপরিমেয় প্রভাব বিস্তার না করিয়া পারে নাই।

তুষারাবৃত অঞ্চলে বহুকাল ভ্রমণের পর হিতলাল তাঁহার এই দুই অনুগামীর নিকট বিদায় গ্রহণ করেন। এবার ইঁহাদের তিনি জানাইয়া দেন, "দ্যাখো তোমাদের নিম্নভুমিতে কর্ম্ম রয়েছে, আমার সাথে তোমাদের এ অঞ্চলে থাকবার আর প্রয়োজন নেই।"

যোগীবরের সঙ্গচ্যুত লোকনাথ ও বেণীমাধব হিমালয়ের পূর্ব্বাঞ্চল দিয়া বাংলা দেশে অবতরণ করেন। পরে দুই সতীর্থকে পরস্পর হইতে চিরতরে বিচ্ছিন্ন হইতে হয়। বেণীমাধব কামাখ্যা অভিমুখে যাত্রা করেন, আর লোকনাথ অগ্রসর হন পূর্ব্ববঙ্গের মহাপীঠ চন্দ্রনাথের পথে। তুষারে আবৃত পর্ব্বতশিখরে দীর্ঘকাল পরিক্রমার ফলে তাঁহার দেহের ত্বকে তখন এক অদ্ভুত ধরণের শুভ্র আবরণ পড়িয়া গিয়াছে। পূর্ব্বাঞ্চলের বনাকীর্ণ পাহাড় পর্ব্বতে কিছুকাল বাস করার পর মেঘনার কাছে বারদীতে এই মহাপুরুষের পদার্পণ ঘটে।

বারদীতে তাঁহার আগমন বড় বিচিত্র। পূর্ব্বপরিকল্পিত ঐশী ব্যবস্থা যেন এজন্য বহুপূর্ব্ব হইতেই ঠিক হইয়া রহিয়াছে। উলঙ্গ সন্ন্যাসী

লোকনাথ নানাস্থানে বিচরণ করিয়া সেদিন ত্রিপুরার দাউদকান্দি গ্রামে আসিয়াছেন। এক বটবৃক্ষতলে তিনি নীরবে ধ্যানাবিষ্ট। এই সময়ে ভেঙ্গু কর্ম্মকার নামে এক ব্যক্তি তাঁহার চরণ ধরিয়া কাঁদিয়া পড়ে—ফৌজদারী মামলার আসামী হইয়া সে বড় বিপদে পড়িয়াছে। সন্ন্যাসী কৃপাভরে তাঁহাকে আশ্বাস দিলেন। বিপদমুক্ত হইয়াই সে লোকনাথের পা জড়াইয়া ধরিল। বারদীতে তাহার বাস, সেখানেই সে বাবাকে নিয়া যাইতে চায়। দয়ার্দ্র লোকনাথ বারদীতে আসিয়া তাহারই গৃহে বাস করিতে লাগিলেন। কয়েক বৎসরের মধ্যে আত্মগোপনের পালাটি শেষ হইয়া যায়। এবার আসে মহাপুরুষ লোকনাথের প্রকাশের লগ্ন। তাঁহার অলৌকিক শক্তি ও যোগ-বিভূতির কাহিনী ধীরে ধীরে জনসমাজে প্রচারিত হইতে থাকে।

লোকনাথের আবাহনকারী প্রথম ভক্ত ভেঙ্গু কর্ম্মকার ইতিমধ্যে মারা গিয়াছে। এবার তাই তাঁহাকে এস্থান ছাড়িতে হইবে। স্থানীয় জমিদার নাগবাবুদের মধ্যে কেহ কেহ তাঁহাকে ইতিমধ্যে ভক্তি-শ্রদ্ধা করিতেছেন। ইঁহাদের উদ্যোগে 'গোঁসাইর' নিজস্ব কুটির নির্ম্মাণের ব্যবস্থা হইল। অবশেষে লোকনাথ সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ এড়াইতে না পারিয়া কহিলেন, "যদি এমন একটা জায়গা আমায় দাও যার জন্য কখনও কর দিতে হয় না, তাহলে আশ্রম করে থাকতে পারি।" গ্রামের উপান্তে এক পরিত্যক্ত পুরাতন শ্মশান রহিয়াছে, উহার জন্য কোন কর ধার্য্য করা নাই। মালিকদের সম্মতিক্রমে এখানেই আশ্রম নির্ম্মিত হইল, লোকনাথ ব্রহ্মচারী এখানে তাঁহার আসন পাতিয়া বসিলেন।

শক্তিধর সাধক লোকনাথের যোগ-বিভূতির খ্যাতি শীঘ্রই নানা অঞ্চলে ছড়াইয়া পড়িতে থাকে। মুমুক্ষু ভক্তবৃন্দ ও রোগ-শোক-ক্লিষ্ট নর-নারী তাঁহার চারিদিকে ভীড় জমাইতে আরম্ভ করে।

কিন্তু লোকনাথের লোকাতীত সত্তার সহিত পরিচয় ঘটে কয়-জনের? এই মহাজীবনের বহিরঙ্গ স্তর ভেদ করিয়া খুব কম সংখ্যক

লোকই সেদিন যোগসূত্র রচনা করিতে পারিয়াছে, তাঁহার স্বরূপ নির্ণয় করিতে সমর্থ হইয়াছে। নিজের বাহ্য ও আন্তর রূপের এই পার্থক্যটির উল্লেখ করিয়া ব্রহ্মচারী ভক্তদের বলিতেন, "ওরে আমায় চিনতে পারে কে? আমি ইচ্ছে করে ধরা দিই, তবেই না তোরা আমায় বুঝতে পারিস?" লৌকিক এবং ব্যবহারিক জীবনে এই দুর্ব্বোধ্য সন্ন্যাসীকে নিয়া তাই গোলোযোগ ও বিভ্রান্তির সৃষ্টি কম হইত না।

একবার বারদীর নাগ জমিদারদের কোন উচ্ছৃঙ্খল পুত্রের সহিত ব্রহ্মচারীর এক পশ্চিম দেশীয় শিষ্যের দাঙ্গা বাধে। তারপর ইহা লইয়া এক জটিল ফৌজদারী মামলার উদ্ভব হয়। ইহাতে সাক্ষ্য দিবার জন্য ব্রহ্মচারীকে আহবান করা হইল। কৌতূহলী জনতার ভীড়ে সেদিন আদালতে তিল ধারণের স্থান নাই।

ব্রহ্মচারী বাবাকে প্রশ্ন করা হইল, তাঁহার বয়স কত? তিনি উত্তর দিলেন, "দেড় শত বৎসর।" অপর পক্ষের মোক্তার সরোষে চেঁচাইয়া উঠিলেন, "দেখুন সাধুবাবা, এটা কিন্তু সরকারী আদালত, এখানে ওরূপ ধরণের অসম্ভব কথাবার্ত্তা বলা চলে না।" ব্রহ্মচারী উত্তর দিলেন, "তবে তোমাদের যা ইচ্ছে হয় লিখে নাও।"

স্বচক্ষে ঘটনাটি দেখা এই অতিবৃদ্ধ সাক্ষীর পক্ষে মোটেই সম্ভব নয়, বিপক্ষের মোক্তার ইহাই জেরার মধ্য দিয়া প্রতিপন্ন করিতে চান। তাই তিনি আবার প্রশ্ন করিলেন, "আপনার বয়স তো দেড়শত বৎসর হয়েছে? এ বয়সে দৃষ্টিশক্তি অবশ্যই বেশী দূর যায় না। অথচ আপনি ঘরের মধ্যে বসে কি ক'রে স্বচক্ষে দেখলেন?"

ব্রহ্মচারী হাসিলেন। দূরস্থিত একটী বৃক্ষের দিকে আঙুল নির্দ্দেশ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আচ্ছা দেখ তো, ঐ গাছে কোন প্রাণী আরোহণ করেছে কি না?"

সেদিকে দৃষ্টিপাত করিয়া সকলে স্বীকার করিলেন, তাঁহারা এমন কিছুই সেখানে দেখিতে পাইতেছেন না। ব্রহ্মচারী কৌতূকভরা

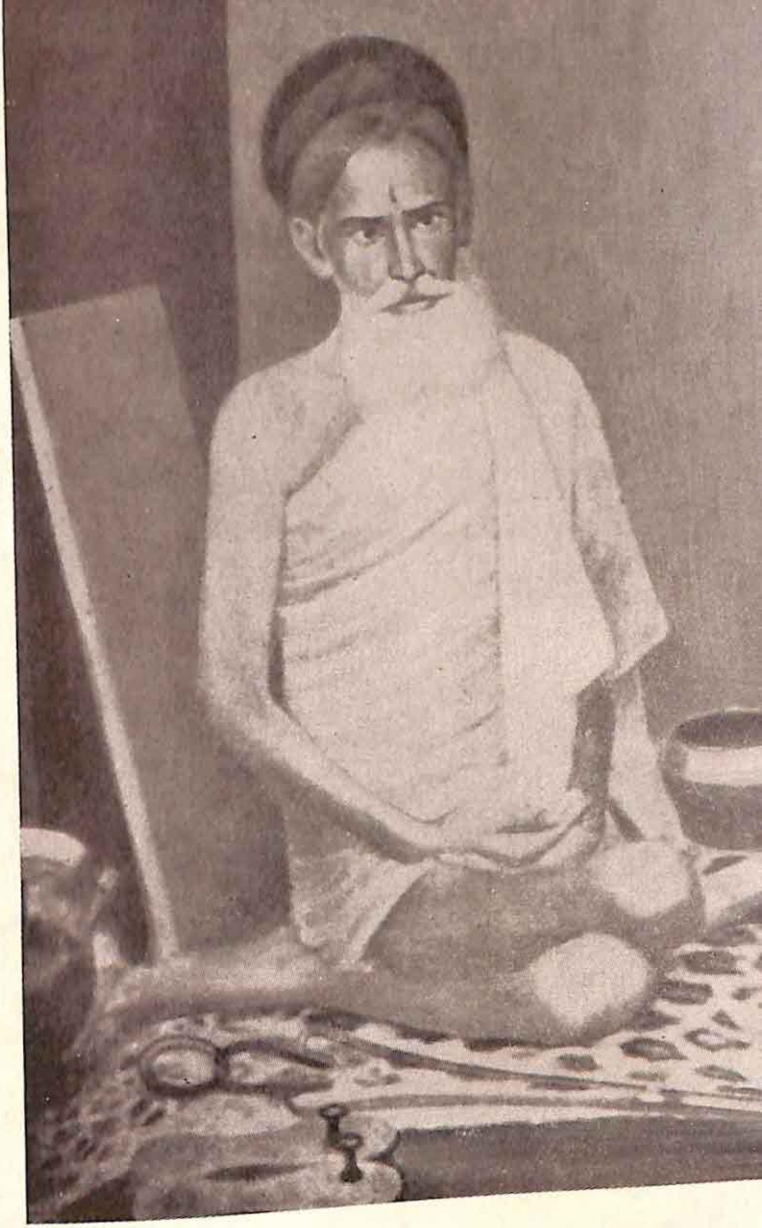
হাসি হাসিয়া কহিলেন, "তোমাদের বয়স কম, দৃষ্টিশক্তি বেশী। অথচ কিছুই নজরে পড়ছে না? আমি কিন্তু বেশ দেখছি, সারি সারি লাল পিঁপড়ে গাছটার গা বেয়ে উঠে যাচ্ছে।" আদালতের লোকেরা বৃক্ষের নিকটে গিয়া এ দৃশ্য প্রত্যক্ষ করিয়া আসিল। সকলের বিস্ময়ের সীমা রহিল না।

বারদী গ্রামটি পরম পবিত্র ব্রহ্মপুত্র নদের খুব নিকটে। পুণ্যলোভী নরনারী ব্রহ্মপুত্রে স্নান করিতে গেলেই এই সন্ন্যাসীর চরণধূলি নিবার জন্য বারদীতে আসিয়া উপস্থিত হয়, জীবন্ত ব্রহ্মপুত্র দর্শনে নিজেরা কৃতার্থ বোধ করে। শত বর্ষব্যাপী যোগ-সাধনায় সিদ্ধ-মহাপুরুষ এবার গহন অরণ্য, গিরিচূড়া ত্যাগ করিয়া লোকালয়ে অবতীর্ণ।

লোক-কল্যাণের ব্রত আজ তাঁহাকে উদার আকাশের তল হইতে এই আশ্রম ও সদাব্রতের ভীড়ে টানিয়া আনিয়াছে, উলঙ্গ সন্ন্যাসীর কটিতে তুলিয়া দিয়াছে কৌপীন, দেহে জড়াইয়াছে উত্তরীয়ের আবরণ। মহামুক্ত জীবনের স্রোতধারা এবার জনসমাজের স্তরে স্তরে প্রাণরস ঢালিয়া চলিয়াছে।

মহাপুরুষের সুঠাম দেহ, দিব্যোজ্জ্বল কান্তির দিকে চাহিয়া দর্শনার্থীরা মুগ্ধ হইয়া যায়। সুদীর্ঘ দেহে আজানুলম্বিত বাহুদ্বয় বিলম্বিত, সর্ব্ব অঙ্গে মেদ মাংসের বাহুল্য মাত্র নাই। প্রদীপ্ত, সুতীক্ষ্ণ নয়ন-যুগল যেন অগ্নিবর্ষী—দৃষ্টি পড়িবামাত্র মানুষকে এক অপার্থিব লোকে টানিয়া লইতে চায়। সর্ব্বভেদী এই দৃষ্টিতে লোকনাথের অলৌকিকত্ব সদাই বিচ্ছুরিত হইতে থাকে।

লোকে দেখিয়া অবাক হয়—মহাপুরুষের দৃষ্টি প্রায় নিষ্পলক হইয়া থাকে। সামান্য একটু অন্তর্ম্মুখীন হইলেই তাঁহার অক্ষিতারকা দুইটি নাসিকার কোণে আসিয়া স্থিরনিবদ্ধ হইয়া যায়। লৌকিক দৃষ্টির কোন চিহ্নই আর তাহাতে বর্ত্তমান থাকে না। লোকনাথের একনিষ্ঠ ভক্ত বারদীর দুর্গাচরণ কর্ম্মকার মহাশয় একবার কুম্ভমেলায়



লোকনাথ ব্রহ্মচারীজী

গিয়াছেন। সে সময়ে মেলায় এক শ্রেষ্ঠ মহাপুরুষ তাঁহার হস্তে লোকনাথ ব্রহ্মচারীর একটি ছবি দেখিতে পান। ইহা হাতে নিয়া এ সময় তিনি বলিয়াছিলেন, এ অলৌকিক দৃষ্টি যাঁর, তিনি কেমন ক'রে নিম্নভূমিতে বাস কর্‌ছিলেন? এমন মহাপুরুষ তো কখনো লোকসমাজে বড় একটা থাকতে পারেন না! তোমরা ধন্য, এমন লোকের সান্নিধ্য জীবনে পেয়েছিলে!"

লোক-মঙ্গলের জন্যই জনসমাজে লোকনাথের আবির্ভাব। করুণার্দ্র হইয়া তিনি তাঁহার এক প্রিয় শিষ্যকে ইহারই ইঙ্গিত স্বয়ং দিয়া গিয়াছিলেন—"আমি পাহাড় পর্ব্বতে ঘুরে ঘুরে বড় একটা ধন অর্জ্জন করে এনেছি—কত বরফ এ শরীরের উপর দিয়ে জল হয়ে গিয়েছে। তোরা সে ধন বসে বসে খাবি।"

ব্রহ্মচারীর প্রিয় শিষ্য শ্রীরজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী একবার তাঁহাকে বলিতেছিলেন, "বাবা আপনার ঋণ আমার পক্ষে শোধ্‌বার নয়।" লোকনাথের প্রদীপ্ত নয়নদ্বয় মুহূর্ত্তে পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। অশ্রু-সজল চক্ষে বলিলেন, "তুই আবার কিসের ঋণী রে? বরং আমিই তোর খাতক হয়েছি। তোকে আমি গাঁটেরটা খাওয়াচ্ছি, তোর পায়ে ধরছি, উদ্দেশ্য—তবু তোকে কিছু দিয়ে যেতে পারি কিনা!"

অধ্যাত্মসম্পদের ভাণ্ডারী মহাপুরুষ লোকনাথের এ এক অপরূপ করুণাঘন রূপ।

বারদীর ক্ষুদ্র রঙ্গমঞ্চে এবার বৃহত্তর প্রকাশের পালা উপস্থিত। ব্রহ্মচারী ও প্রভুপাদ বিজয়কৃষ্ণের মিলনের মধ্য দিয়াই ইহার কল্পনাটি দেখা দেয়। ব্রহ্মচারী সেদিন বারদী আশ্রমে বিল্ববৃক্ষতলে উপবিষ্ট। সম্মুখে ভক্ত কামিনী নাগ মহাশয় দণ্ডায়মান রহিয়াছেন। সহসা শ্রীযুক্ত নাগকে ডাকিয়া তিনি কহিলেন, "কামিনী বিজয় আসছে।" নৌকায় কোন্ পথ ধরিয়া তিনি বারদীতে আসিতেছেন তাহাও তাঁহার অজানা নাই। বিজয়কৃষ্ণ অচিরেই সদলবলে সেখানে উপনীত হইলেন।

গোস্বামী বিজয়কৃষ্ণ তখন ঢাকা ব্রাহ্ম সমাজের বিখ্যাত আচার্য্য। সমগ্র পূর্ব্ববাংলার এক অদ্বিতীয় ধর্ম্মবক্তারূপে তখন তাঁহার বিরাট প্রতিষ্ঠা। অধ্যাত্মসাধনার গভীরতর স্তরে প্রবেশের জন্য সাধক গোস্বামীজীর অন্তরে এ সময়ে ব্যগ্রতার অন্ত নাই। লোকনাথের বিস্ময়কর যোগশক্তি ও কৃপা বিতরণের কথা শুনিয়া তাই আজ বারদীতে ছুটিয়া আসিয়াছেন। পরম শ্রদ্ধাভরে তিনি আশ্রম ভবনে প্রবেশ করিলেন। ইহার পরই এক অলৌকিক ব্যাপার সেখানে সঙ্ঘটিত হইল।

ব্রহ্মচারীর ভক্ত ও জীবনীকার শ্রীকেদারেশ্বর সেন এই মিলন দৃশ্যের এক মনোরম বর্ণনা দিয়াছেন—"লোকনাথের প্রদীপ্ত নয়নযুগল হইতে অপূর্ব্ব তেজোরাশি বহির্গত হইয়া সে সময়ে গোস্বামী মহাশয়ের শরীরে প্রবেশ করিল। অমনই লোকনাথ হস্ত প্রসারণ করিলেন—গোস্বামী মহাশয় তৎক্ষণাৎ তাঁহার চরণতলে পতিত হইলেন। লোকনাথ পুত্রবৎসল পিতার ন্যায় গোস্বামী মহাশয়কে তখনই নিজ বক্ষে টানিয়া লইলেন। সেই সময় লোক-পাবন লোকনাথের কৃশ তনু হইতে এ অদ্ভুত তড়িৎ-প্রবাহ বহির্গত হইয়া গোস্বামী মহাশয়ের বিরাট দেহখানিকে বেতসলতার ন্যায় কম্পিত করিতে লাগিল, এবং সেই প্রবাহসম্ভূত হুহুধ্বনিতে গৃহভিত্তি যেন বিদীর্ণ হইতে লাগিল। লোকনাথ তখন গোস্বামী মহাশয়কে ছাড়িয়া দিলেন। গোস্বামী মহাশয় মহাপুরুষের শক্তি সঞ্চালনে নিতান্ত ক্লান্ত হইয়া কাঁপিতে কাঁপিতে পড়িয়া যাইবার উপক্রম হইলে আশ্রমের জনৈক ভক্ত তাঁহাকে বসিবার জন্য একখানি আসন প্রদান করিলেন। গোস্বামী মহাশয় তাহাতে উপবেশন করিলেন।"

প্রভুপাদ কিছুক্ষণ পরে সুস্থ হইলে উভয়ের মধ্যে আদর ও স্নেহপূর্ণ কথাবার্ত্তা চলিতে লাগিল। গোস্বামীজী অনুযোগের সুরে কহিতে লাগিলেন, "বাবা, এত দিন আমার প্রতি কৃপা হয়নি কেন?"

করুণা-বিগলিত কণ্ঠে ব্রহ্মচারী উত্তর দিলেন, "ওরে, তুইও তো পাষাণ!"

উভয়ের এই মিলন সময়ে আশ্রমে অনাবিল আনন্দের তরঙ্গ উঠিল। বিজয়কৃষ্ণ তখন ভাবাবেগে একেবারে আত্মহারা হইয়া গিয়াছেন। লোকনাথবাবার অন্তরও সেদিন বাৎসল্যরসে রসায়িত হইয়া উঠিয়াছে। মহাপুরুষ স্মিতহাস্যে এ সময়ে পূর্ব্বেকার এক অলৌকিক ঘটনার উল্লেখ করিলেন। কহিলেন, "ওরে বিজয়কৃষ্ণ, তোর চন্দ্রনাথের দাবানলের কথা মনে আছে?"

বিজয়কৃষ্ণ সচকিত হইয়া উঠিলেন। একি পরম বিস্ময়! চন্দ্রনাথ পাহাড়ের বনের ভিতর একবার তিনি দাবানলের কবলে পতিত হন, প্রাণরক্ষার কোন আশাই ছিল না। অকস্মাৎ কোথা হইতে এক মহাপুরুষ বিদ্যুৎবেগে অগ্নিব্যূহ ভেদ করিয়া আবির্ভূত হন এবং তাঁহাকে ক্রোড়ে করিয়া নিরাপদ স্থানে রাখিয়া যান। গহন বনের সেই ঈশ্বর-প্রেরিত যোগীই যে এই লোকনাথ, বিজয়কৃষ্ণ আজ তাহা উপলব্ধি করিলেন। মহাপুরুষ কিন্তু এতক্ষণ তাঁহার দিকে চাহিয়া সুস্মিত হাসি হাসিতেছিলেন।

ঘটনাটি বিশদভাবে উল্লেখ করিয়া বিজয়কৃষ্ণের অন্যতম জীবনী-লেখক শ্রীঅমৃতলাল সেনগুপ্ত লিখিয়াছিলেন,—"অপর এক সময় চন্দ্রনাথ তীর্থের কোন একটি জঙ্গলের মধ্যে গোস্বামী মহাশয় অনেকক্ষণ পর্যন্ত ভগবৎসত্তায় নিমজ্জিত হইয়া গভীর ধ্যানে নিমগ্ন ছিলেন। অকস্মাৎ হস্তী, মহিষ প্রভৃতি বন্য জন্তুর ভীষণ চীৎকার ধ্বনিতে তাঁহার সমাধি ভঙ্গ হইল। তিনি চক্ষুরুন্মীলন করিয়া দেখিতে পাইলেন যে, চারিদিকে ভয়ঙ্কর দাবানল জ্বলিয়া উঠিয়াছে, এখন একমাত্র ভগবৎকৃপা ছাড়া পরিত্রাণের আর কোন উপায় নাই। ইহা দেখিয়া তিনি সর্ব্ববিঘ্ন-বিনাশন মধুসূদনে আত্মসমর্পণপূর্ব্বক পুনরায় চক্ষু মুদ্রিত করিলেন। এমন সময় হঠাৎ কোথা হইতে একজন অপরিচিত সাধু আগমন করতঃ গোস্বামী মহাশয়কে বক্ষে

ধারণপূর্ব্বক নিবিড় ধূমসংযুক্ত দাবানলের মধ্য দিয়া তীরবেগে নিরাপদ স্থানে উপনীত হইলেন। গোস্বামী মহাশয় এই অযাচিত কৃপা স্মরণ করিয়া ভাব বিহ্বল হইয়া পড়িয়াছিলেন। ইত্যবসরে এই ভগবৎ-প্রেরিত সাধু অন্তর্হিত হইলেন। শুনিয়াছি, গোস্বামী মহাশয়ের সঙ্গে ঢাকা বারদীর লোকনাথ ব্রহ্মচারী মহাশয়ের প্রথম সাক্ষাৎ-কালে নিজেকে তিনি উক্ত সাধু বলিয়া পরিচয় দিয়াছিলেন।"

ব্রহ্মচারী বাবার সহিত সাক্ষাতের সময় পরমভাগবত বিজয়কৃষ্ণের এক অলৌকিক দর্শন হইতেছিল। তিনি সবিস্ময়ে দেখিতেছিলেন,—মহাপুরুষ লোকনাথের সর্বাঙ্গ দেবদেবীময়, গাত্রবস্ত্র ও বাসগৃহও দেবদেবীতে ওতপ্রোত! সেদিন আশ্রম হইতে বহির্গত হইবার পর প্রভুপাদ তাঁহার অন্যতম গুণগ্রাহী ভক্ত, বারদী গ্রামের কামিনী নাগ মহাশয়কে বলিয়াছিলেন, "এ স্থানের মাহাত্ম্য সম্বন্ধে যা শুনে এসেছিলাম তার চেয়ে অনেক বেশী দেখতে পাচ্ছি। ব্রহ্মচারী বাবা নিবৃত্ত্যাত্মক পুরুষ, ইচ্ছে হ'লে সব ফেলে দিয়ে এখনই চলে যেতে পারেন। আমায় এক সেকেণ্ডে যে কৃপা করেছেন, তাতেই আমি ধর্ম্মজীবনে উন্নতি লাভ করতে পারবো। বারদী আমার ধর্ম্মজীবনের জন্মস্থান। তোমরা আমার ভাই!"

আচার্য্য বিজয়কৃষ্ণ বারদীগ্রাম হইতে ঢাকায় ফিরিয়া আসিয়া লোকনাথের মাহাত্ম্য ও যোগশক্তির প্রভাব বর্ণনা করিতে থাকেন। হিমালয়ের নীচে এমন মহাপুরুষ দুর্লভ—গোস্বামীজীর এ ঘোষণা দিকে দিকে লোকনাথ সম্বন্ধে কৌতূহল জাগ্রত করিয়া দেয়, এই শক্তিধর মহাপুরুষের চরণপ্রান্তে বহু নরনারীকে আকর্ষণ করিয়া আনে। সমাগত ভক্তদের জীবনে এই মহাপুরুষের বিভূতিলীলা বিচিত্ররূপে রূপায়িত হইতে থাকে।

সেবার ঢাকা হইতে কয়েকজন ব্রহ্মচারী বাবাকে দর্শন করিতে আসেন। ফিরিবার সময় তাঁহারা পদব্রজেই চলিয়া যাইবেন স্থির করিয়াছিলেন। তখন গ্রীষ্মকাল। প্রচণ্ড মধ্যাহ্নসূর্য্য চারিদিকে

অগ্নি বর্ষণ করিতেছে, তাই তাঁহারা রওনা হইবার প্রাক্কালে কিছুটা ইতস্ততঃ করিতে থাকেন। লোকনাথ সস্নেহে বলিলেন, "বাবা, তোমরা রওনা হয়ে যাও। রোদের জন্যে ভুগতে হবে না।"

নবাগতেরা যাত্রা সুরু করিলেন। আশ্রমের সীমানা ছাড়াইয়া তাঁহারা আসিয়াছেন, এমন সময় দেখা গেল, একখণ্ড মেঘ কোথা হইতে উড়িয়া আসিয়া সূর্য্যকে আচ্ছাদন করিয়া দিল। ইহাতে তাঁহাদের কৌতূহল জাগিয়া উঠে, শক্তিধর যোগী বারদীর গোঁসাইর যোগশক্তির আরও পরিচয় তাঁহারা পাইতে চান। এই উদ্দেশ্যে তাঁহারা তখনই আবার আশ্রমে ফিরিয়া আসিলেন। ব্রহ্মচারীকে সকলে প্রশ্ন করিলেন, "বাবা, আমাদের বলে দিন, ঠিক কোথায় এই মেঘের আচ্ছাদন অপসৃত হবে?"

ব্রহ্মচারী হাসিয়া উত্তর দিলেন, "তোমরা ঢাকার উপকণ্ঠে দয়াগঞ্জ অবধি পৌঁছলে তবে এ মেঘের আবরণ সরে যাবে, কড়া রৌদ্র উঠবে।" ঠিক নির্দ্দিষ্ট স্থানটিতে পৌঁছামাত্রই মেঘের স্নিগ্ধাঞ্চলের আবারণ টুটিয়া গেল। খরতাপ জর্জ্জরিত গ্রীষ্মের মধ্যাহ্নে আবার এই ভদ্রলোক কয়টি তৎক্ষণাৎ বারদীতে প্রত্যাবর্ত্তন করেন ও লোকনাথের চরণে নিপতিত হন। করুণাময় ব্রহ্মচারীকে অন্তরের শ্রদ্ধা জানাইয়া যাইতে তখনি তাঁহারা বড় ব্যাকুল হইয়াছিলেন—তাই বিন্দুমাত্র বিলম্ব সহে নাই।

শ্রীমৎ ভোলানন্দ গিরিজীর এক শিষ্য, গৌরগোপাল রায় একবার বারদীতে উপস্থিত হন। ইনি পুলিশের একজন কর্ম্মচারী। কোন কার্য্যোপলক্ষে ঐ অঞ্চলে আসিয়াছেন। বারদী আশ্রমে উপস্থিত হইয়া বাবার পদবন্দনার পর তিনি সম্মুখে উপবেশন করিলেন। এমন সময় একটি স্ত্রীলোক একবাটি ঘন দুগ্ধ নিয়া সেখানে উপস্থিত। লোকনাথ অমনি ব্যাকুল হইয়া উচ্চস্বরে 'আয় আয়' বলিয়া কাহাকে যেন ডাকিতে লাগিলেন।

গৌরবাবু প্রথমটায় বুঝিতে পারেন নাই, কাহাকে এমন আদর

করিয়া ডাকা হইতেছে। পরে সবিস্ময়ে দেখিলেন, একটি প্রকাণ্ড বিষধর সর্প কোথা হইতে ছুটিতে ছুটিতে ব্রহ্মচারীর কোলের কাছে উপনীত হইল। তিনিও পরম আদরে উহার ফণাটি এক হাত দিয়া ধরিয়া দুধের বাটিতে চুমুক দেওয়াইতে লাগিলেন। পান শেষ হইবার পর তিনি বলিয়া উঠিলেন—"এবার তুমি যাও।"

সর্পটি পোষমানা জীবের মত তখনি প্রস্থান করিল। গৌরবাবু এতক্ষণ বিস্মিত হইলেও ভয় পান নাই, কারণ মহাপুরুষের অসামান্য যোগ-শক্তির কথা তিনি শুনিয়াছেন। কিন্তু তিনি যখন ঐ পাত্র হইতে কিঞ্চিৎ দুগ্ধ-সর তাঁহাকে প্রসাদ গ্রহণ করিতে বলিলেন তখন তিনি বড় ভীত হইলেন। "ওরে, নে নে, কোন ভয় নেই" বলিয়া মহাপুরুষ কেবলি তাঁহাকে আশ্বাস দিতেছেন। গৌরবাবু তাই এ প্রসাদ না নিয়া পারেন নাই।

বারদীর উষাপ্রসন্ননাগ মহাশয়ের স্ত্রী একটি শিশুপুত্র রাখিয়া হঠাৎ মারা যান। এই শিশুর জীবনরক্ষা কি করিয়া হইবে উহা ভাবিয়া সকলের উৎকণ্ঠার অবধি নাই। শিশুর পিসীমা সিন্ধুবাসিনী একদিন তাহাকে কোলে নিয়া লোকনাথের চরণতলে আসিয়া বসিলেন। তাঁহার একান্ত মিনতি, ব্রহ্মচারী বাবাকে এ বিষয়ে একটা ব্যবস্থা করিতেই হইবে। অসহায় শিশুটির জীবনরক্ষার জন্য মহিলাটি বড়ই কান্নাকাটি করিতে লাগিলেন।

লোকনাথ বলিয়া উঠিলেন, "এত গোল কিসের? তুমিই তোমার স্তন-দুগ্ধ দিয়ে শিশুটিকে বাঁচাও না গো!"

সিন্ধুবাসিনী চমকিয়া উঠিলেন। তিনি সধবা বটে, কিন্তু তিনি যে চিরবন্ধ্যা! সকাতরে নিবেদন করিলেন, তাঁহার স্তনে দুগ্ধ থাকিলে দুশ্চিন্তার আর কারণ কি ছিল? কিন্তু তাহা তো হইবার নয়।

বাবার হৃদয়ে করুণার সঞ্চার হইল। সিন্ধুবাসিনীকে কহিলেন, "তোমাকে বন্ধ্যা কে বলে গো? জানতো? আমি হচ্ছি শিশু, আর

তুমি যে আমারই মা। একবার কাছে এসে বোস, আমি তোমার স্তন-দুগ্ধ পান ক'রবো।"

মহাযোগী লোকনাথ তখন যেন সত্যই সরল শিশুটি। মাতৃজ্ঞানে তিনি সেদিন এই বন্ধ্যা নারীর স্তন্যধারা পান করেন। আর ইহার পর হইতে সন্তানবতী নারীর মতই সিন্ধুবাসিনীর বক্ষে স্বাভাবিক দুগ্ধের সঞ্চার হইতে থাকে। এই স্তন্যধারা পান করিয়াই শিশুটির প্রাণ রক্ষা পায়। ব্রহ্মচারীবাবার কৃপায় বাঁচিয়া উঠে, তাই তাহার নাম রাখা হয়—ব্রহ্মপ্রসন্ন।

সেদিন লোকনাথ তাঁহার আশ্রম কুটিরে ভক্তদল পরিবেষ্টিত হইয়া বসিয়া আছেন। হঠাৎ এক সময়ে নিজের দীর্ঘ হস্তটি প্রসারিত করিয়া পরম করুণাভরে তিনি বলিয়া উঠিলেন, "আহা হা, রাখ, রাখ।" তারপরই একেবারে নীরব নিশ্চল। ভক্তদল চুপচাপ বসিয়া এ উহার মুখের দিকে চাহিতেছেন। কেহই বাবার এ আচরণের রহস্য ভেদ করিতে সক্ষম নন।

ইহার কিছুদিন পর ঢাকার উকিল বিহারীলাল মুখোপাধ্যায় মহশয় ব্রহ্মচারীর চরণ দর্শন করিতে আসিয়াছেন। ইনি বাবার বিশেষ ভক্ত ও অনুগৃহীত। লোকনাথ তাহাকে দেখিবামাত্র প্রশ্ন করিয়া বসিলেন, "কি হে বিহারী, এর ভেতর কি তুমি আমায় খুব বেশী স্মরণ করেছিলে?"

"আজ্ঞে, কিছুদিনের জন্য বাইরে গিয়েছিলাম। বাড়ী ফিরে এসে আপনার চরণ দর্শনের ইচ্ছা খুবই হয়েছিলে।"

"সে কথা নয় হে। জলপথে জাহাজ থেকে আমায় ব্যাকুল হয়ে ডাকাডাকি করার কথাই বল্‌ছি।"

বিহারীবাবুর তখন সব কথা মনে পড়িল। কিছুদিন পূর্ব্বে মেঘনার উপর দিয়া ষ্টীমারযোগে তিনি আসামে যাইতেছিলেন। পথে ঝড়ের প্রবল আক্রমণ হয় এবং প্রাণভয়ে ভীত হইয়া বিহারীবাবু বাবা লোকনাথকে আকুলকণ্ঠে ডাকিতেছিলেন। ঐ সময়ে

কয়েকজন আর্ত্ত যাত্রী নাকি ষ্টীমারের মধ্যে একখানি অলৌকিক অভয়হস্তও দর্শন করেন। ইহার ক্ষণ পরই ঝঞ্চার বেগ কমিয়া যায়, নদী শান্ত হয়। সেদিনকার সমস্ত ঘটনা বিহারীবাবুর স্মৃতিপটে জাগিয়া উঠিল। লোকনাথের করুণা ও বিভূতি-লীলার কথা ভাবিয়া ভক্তিভরে তাঁহার চরণে পতিত হইলেন।

ঢাকা কলেজের কয়েকটি ছাত্র লোকনাথের সহিত একবার সাক্ষাৎ করিতে আসে। তাহারা বলিতে থাকে, "বাবা, আমরা আপনার কাছে ব্রহ্ম সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করিতে এসেছি। আপনি দয়া ক'রে আমাদের কিছু তত্ত্বোপদেশ দিন।"

ব্রহ্মচারী মনের আনন্দে এই তরুণদের নিয়া নানা রহস্যালাপ করিতে বসিলেন। তাহাদিগকে কহিলেন, "জানতো বাবা, অখণ্ড মণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরম, তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ। অর্থাৎ, যা অখণ্ড মণ্ডলাকার, যার দ্বারা সর্ব্ব চরাচর ব্যাপ্ত —এ হেন ব্রহ্মকে যিনি দেখিয়ে দেন সেই গুরুকে নমস্কার করি। তোমাদের ব্রহ্মবস্তু কি জানো? তা হচ্ছে—টাকা। লক্ষ্য করনি? টাকাগুলো অখণ্ড, মণ্ডলাকার? জগৎ শুদ্ধু এই টাকার প্রভাবই ব্যাপ্ত রয়েছে—এরই প্রতিপত্তি চলেছে! তোমরা এই টাকা-ব্রহ্মের সাক্ষাতের জন্যই দীক্ষা নিয়েছ। আর কলেজের অধ্যাপকেরাই হচ্ছেন সেই গুরু, যাঁরা ঐ ব্রহ্মের দর্শনলাভে সাহায্য করে থাকেন। অতএব বাবাজীরা, আপাততঃ ঐ অধ্যাপক গুরুরই অনুসরণ করে যাও। তারপর টাকাকড়ি পেয়েও তা ত্যাগ ক'রে এসে যদি অন্য ব্রহ্ম দেখবার ইচ্ছে হয়, তা হলে আমার কাছে আসবে। তখন আমি আমার উপদেশ দেব।"

লোকনাথের কঠোর ব্রহ্মচর্য্য ও তপশ্চর্য্যার মত তাঁহার পরিব্রাজনের কাহিনীও অনন্যসাধারণ। অন্তরঙ্গ ভক্তদের কাছে তিনি তাঁহার দূরদূরান্তের পথ-পরিক্রমার নানা মনোজ্ঞ কাহিনী বলিতেন। তাঁহার কথা শুনিয়া বুঝা যাইত, হিমাচল ও মেরুপ্রদেশের দুর্গম

তুষারাবৃত অঞ্চল হইতে শুরু করিয়া চীন, আরব, ইয়োরোপের নানা দেশ পর্য্যটন তিনি বাদ রাখেন নাই।

মেরু প্রদেশ পরিক্রমণের সময় লোকনাথের সহিত তাঁহার যোগ-শিক্ষাগুরু হিতলাল ও সতীর্থ বেণীমাধবও ছিলেন। উলঙ্গ, জটাজুট সমন্বিত সন্ন্যাসীদের গাত্রচর্ম্ম বিবর্ণ, কৃচ্ছ্রব্রতের কঠোরতায় দেহ বিশীর্ণ। স্বাভাবিক মনুষ্য বলিয়া তাঁহাদিগকে চেনাই দুষ্কর। তাই চীন দেশের মধ্যে দিয়া প্রত্যাবর্তনের কালে সরকারী রক্ষীদল ইঁহাদের গতিরোধ করে। কিছুকাল বন্দী অবস্থায় রাখিবার পর চীন সরকার বুঝিতে পারেন, ইঁহারা কঠোর তপশ্চার্য্যায় নিরত ভারতীয় যোগী। তাই ইঁহাদিগকে মুক্ত করিয়া দেওয়া হয়।

বহু মুসলমান ভক্ত লোকনাথ ব্রহ্মচারীকে দর্শন করিবার জন্য বারদীতে আসিতেন। ইঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ মক্কা হইতে প্রত্যাগত। ইঁহাদের সহিত আলোচনায় লোকনাথের মক্কা মদিনার প্রত্যক্ষ দর্শন ও পর্য্যটনের কথা অনেক সময় প্রকাশ পাইত। কোন কোন ইংরেজ রাজপুরুষও এই যোগীর সঙ্গে দেখা করিতে আসিতেন। তখন কথা-প্রসঙ্গে লোকনাথ রহস্যভরে কখনও কখনও দেখাইতেন ফরাসীগণ কোন্ কোন্ ইংরেজী শব্দ কিভাবে বিকৃত করিয়া উচ্চারণ করে। স্পষ্টই বুঝা যাইত, আটলান্টিকের তীর অবধি সিদ্ধাবস্থায় পরিভ্রমণ করিতে ছাড়েন নাই।

মক্কা মদিনায় যাওয়া সম্বন্ধে ব্রহ্মচারী বাবা বলিয়াছিলেন, "আমি হেঁটে হেঁটে মক্কায় উপস্থিত হয়েছিলাম। ওখানকার মুসলমানরা আমায় খুব আদর যত্ন দেখায়, অতিথি সৎকার করে। তারা আমায় বলেছিল,—'আপনি স্বয়ং রসুই করে খেতে চান তো সিধা গ্রহণ করুন, আর আদেশ পেলে আমরাও রসুই করে দিতে পারি। ওদের হাতে রান্না খেতে আমার আপত্তি না থাকায় ওরা পবিত্রভাবে, কাপড় দিয়ে নিজেদের মুখ বেঁধে, আমায় রেঁধে খাওয়ায়।"

লোকনাথ ব্রহ্মচারী মদিনায়ও গিয়াছিলেন। সে সময়ে তাঁহার

সাধন-আসনের সম্মুখে প্রত্যহই স্থানীয় ভক্ত মুসলমানগণ প্রচুর লাড্ডু রাখিয়া যাইত। উহা হইতে তিনি যৎসামান্য কিছু গ্রহণ করিলে তখন তাহারা প্রসাদ গ্রহণ করিত।

মরুভূমির মধ্য দিয়া কয়েকদিনের পথ অগ্রসর হইয়া লোকনাথ একবার এক শক্তিমান মুসলমান ফকীরের সাক্ষাৎ লাভ করেন। ইঁহার নাম আবদুল গফুর—তৎকালে ইঁহার বয়স ছিল প্রায় চারিশত বৎসর। এই ফকীরের অলৌকিক ক্ষমতা সম্বন্ধে লোকনাথ বরাবরই অত্যন্ত উচ্চ ধারণা পোষণ করিতেন। তাঁহাকে মাঝে মাঝে বলিতে শুনা যাইত, "দেশ বিদেশের বহু স্থানে ঘুরে বেড়িয়েছি, কিন্তু ত্রৈলঙ্গ স্বামী ও আবদুল গফুরের মত 'ব্রহ্মণ' দেখিনি।" তত্ত্ববিদ্ লোকনাথের দিব্যদৃষ্টিতে সার্থক-সাধক আবদুল গফুর এক ব্রাহ্মণ তপস্বীরূপেই প্রতিভাত হইলেন।

সমদর্শী লোকনাথের দৃষ্টিতে শুধু জাতিবর্ণের ভেদযুক্ত মানুষ কেন, কোন জীবজন্তুর পার্থক্যও বুঝি ধরা পড়িত না। তিনি নিজেই এ বিষয়ে নানা বিস্ময়কর কাহিনী ভক্তদের শুনাইতেন।

সমতলভূমিতে অবতরণের পূর্ব্বে লোকনাথ ও তাঁহার সঙ্গী বেণীমাধব চন্দ্রনাথ পাহাড়ে অবস্থান করিতেছিলেন। জনমানবহীন দুর্গম পার্ব্বত্য অরণ্যে সিদ্ধ সাধকদ্বয় তাঁহাদের নিভৃত আশ্রয় তখন বাছিয়া নিয়েছেন। সেদিন এই গহন বনে দুইজনেই ধ্যানাবিষ্ট। সহসা তাঁহারা শুনিলেন, অদূরে এক হিংস্র বাঘিনী ক্রুদ্ধ গর্জ্জনে চারিদিক কাঁপাইয়া তুলিতেছে—তাহার সম্মুখে সদ্যোজাত কয়েকটি শাবক। বাঘিনীর ভয় হইয়াছে, আসনে উপবিষ্ট সাধুরা পাছে তাহার শাবকগুলি অপহরণ করিয়া নেয়।

লোকনাথের ধ্যান ভাঙ্গিল। তিনি বাঘিনীর সম্মুখে গিয়া নিজের ভাষাতেই কহিলেন, "ওগো, তোমার কোন ভয় নেই। তুমি তোমার সন্তানদের নিয়ে এখানে ঘুমিয়ে পড়ো। আমরা সাধু, আমাদের দ্বারা তোমার কোন অনিষ্টের আশঙ্কা নেই।"

সিদ্ধ যোগীর প্রেমপূর্ণ বচনের তাৎপর্য্য বুঝিতে হিংস্র পশুর ভুল হয় নাই। ধীরে ধীরে তাহার চীৎকার ও শান্ত হইয়া আসিল।

পরদিনও আবার সেই ভীম নিনাদ। লোকনাথ ধ্যানস্থ হইয়া ব্যাপারটি হৃদয়ঙ্গম করিলেন। বাঘিনীটি এক নব প্রসূতি। শাবকদের জন্য তাহার আহার সংগ্রহ করা দরকার। অথচ উহাদের সে কোথায় রাখিয়া যাইবে, কি করিয়া উহারা রক্ষা পাইবে, সে দুশ্চিন্তাও তাহার কম নয়। উচ্চনাদের তাৎপর্য্য বোঝা গেল। লোকনাথ বলিলেন, "ওগো, তুমি শিকারে যাও! এদের জন্য তোমার কোন ভয় নেই, আমরাই দেখাশুনা ক'রবো।"

বাচ্চাদের সাধুদ্বয়ের কাছে রাখিয়া বাঘিনী নিজ কাজে বাহির হইয়া গেল। ফিরিয়া আসিয়াই আবার গর্জ্জনের পর্ব্ব—অর্থাৎ, 'আমি এসে পড়েছি। এখনকার মত দায়িত্বভার আমার। সাধুরা এবার অবসর নিতে পারে।'

এমনি করিয়া কয়েকদিন ব্যাঘ্রী ও মানবের পারস্পরিক সহযোগিতার পালা চলিতে থাকে। ইহার পর লোকনাথ ও বেণীমাধব সেই বন হইতে একদিন আসন উঠাইলেন। তাঁহাদিগকে এবার অন্যত্র যাইতে হইবে। কিন্তু বিপদ কম নয়! কিছুদূর যাইবার পরই তাঁহারা শুনিলেন, বাঘিনী বনভূমি কাঁপাইয়া বার বার তাঁহাদের উদ্দেশে গর্জ্জন করিতেছে।

লোকনাথের হৃদয় বিগলিত হইল। বেণীমাধবকে কহিলেন, "বেণী আজ তো আর যাওয়া হ'লো না।" ফিরিবার পর বাঘিনীকে ডাকিয়া কহিলেন, "ওগো, তবে থেকেই গেলাম। যতদিন তোমার বাচ্চরা তোমার সঙ্গে শিকারে যাবার মত উপযুক্ত না হয়, আমরা থাকবো।"

প্রস্তাব শুনিয়া বাঘিনী তৎক্ষণাৎ চুপ। তাহার আনন্দের আর সীমা নাই।

প্রতিজ্ঞাবদ্ধ লোকনাথ ও তাঁহার সঙ্গী একমাস অরণ্যের ঐ

নির্দ্দিষ্ট অঞ্চলে অবস্থান করেন। অতঃপর একদিন দেখা গেল, শাবকদল ব্যাঘ্রী মাতাকে অনুসরণ করিয়া কোথায় যেন অন্তর্হিত হইয়াছে। আর তাহারা সেদিকে প্রত্যাবর্ত্তন করে নাই। অঙ্গীকার রক্ষা হইয়াছে জানিয়া লোকনাথ এবার ঐ অঞ্চল ত্যাগ করেন।

মানুষ ও সর্ব্বজীবজন্তুর উপর যোগীবর লোকনাথের কৃপার ধারা সমান আন্তরিকতার সহিত বর্ষিত হইত। তাঁহার বারদী আশ্রমের জীবনে ইহার বহু নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া যায়।

খেয়ালী লোকনাথের সেবার সখ হইল, তিনি আশ্রমের জন্য কিছু কৃষিকাজ করাইবেন। জমিদার নাগ মহাশয়দের অনেকে তাঁহার অনুগত ভক্ত, কাজেই কাজ আরম্ভ হইতে বেশী দেরী হয় নাই। কিন্তু শস্য আহরণ করা বড় কঠিন ব্যাপার। প্রায়ই দেখা যাইত, বন্য শূকরের দল ক্ষেতে ঢুকিয়া সব কিছু নষ্ট করিয়া যাইতেছে।

এই অত্যাচার দমন না করিলে চলে না। তাই আশ্রমবাসীরা মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্র নিয়া নিঃশব্দে রাত্রিতে ক্ষেতে উপস্থিত হইতেন। কিন্তু রোজই শূকরগুলি পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে স্থান ত্যাগ করিয়া যায়। কেহ কি তাহাদিগকে সতর্ক করিয়া দেয়? বারবারই এ ঘটনা ঘটিতে থাকিলে সকলে বড় সন্দিগ্ধ হইয়া উঠেন।

অতঃপর লোকনাথ ব্রহ্মচারীর এক অন্তরঙ্গ ভক্ত এই রহস্য ভেদ করিলেন। তিনি সেদিন স্বকর্ণে শুনিলেন, আশ্রম কুটিরে একান্তে বসিয়া লোকনাথ ক্ষেতের শূকরদের উদ্দেশ করিয়া বলিতেছেন, "ওরে শিগ্‌গীর কাজ শেষ করে সরে পড়, ঐ গ্যাখ লাঠি-সোটা নিয়ে তোদের মারতে আসছে। সব পালা—পালা!"

আশ্রমের কাক, শালিখ্ প্রভৃতি পাখী—কুটির মধ্যস্থ কীট ও পিঁপড়ার দল সকলেই যেন এই পরম কারুণিক মহাপুরুষের সহিত এক নিবিড় আত্মীয়তার বন্ধনে আবদ্ধ। শক্তিধর সাধকের কঠোর আবরণটি ভেদ করিয়া তাঁহার অন্তস্তলে কোন্ মধুর রসের সন্ধান তাহারা পাইয়াছিল কে বলিবে?

আশ্রমের বেলগাছের শাখায় নানা রকমের পাখী উড়িয়া আসিত। লোকনাথবাবার আহ্বানে ইহারা সানন্দে ছুটিয়া আসিত, পিঙ্গল জটাজালে, স্কন্ধে ও ক্রোড়ে উপবেশন করিত। সারিবদ্ধ পিপীলিকার সম্মুখে চিনি, মিছরী ছড়াইয়া দিয়া মহাপুরুষ একান্ত আগ্রহে বসিয়া থাকিতেন, চোখে মুখে ফুটিয়া উঠিত এক ক্ষুদ্র বালকের ক্রীড়াচঞ্চলতা। দেখিয়া কে বুঝিবে, এই মহাত্মার ইঙ্গিতে কত বিস্ময়কর অপ্রাকৃত ঘটনা অবলীলায় ঘটিতেছে ?

লোকনাথের জীবনরক্ষার জন্য বারদীর আশ্রম প্রাঙ্গণে একবার একটি হিংস্র ব্যাঘ্রের আবির্ভাব হয়। অলৌকিক যোগবিভূতির সহিত মহাপুরুষের অন্তস্তলে যে গূঢ়সঞ্চারী প্রেম-প্রবাহ সদা বর্ত্তমান ছিল, এ অলৌলিক ঘটনার মধ্যে তাহার নিদর্শন মিলে।

সেবার ছুইটি উচ্ছৃঙ্খল যুবক লোকনাথ ও আশ্রমের অধিবাসী-দের উপর মারপিট করিতে আসে। গভীর রাতে মারাত্মক অস্ত্রাদি হাতে নিয়া তাহারা সেদিন আশ্রম প্রাঙ্গণে প্রবেশ করে। এই আততায়ীরা অগ্রসর হইবামাত্র সেখানে কিন্তু এক অদ্ভুত কাণ্ড ঘটে। হঠাৎ দেখা যায়, একটি প্রকাণ্ড হিংস্র ব্যাঘ্র গর্জ্জন করিতে করিতে আশ্রমের দিকে ছুটিয়া আসিতেছে। বাঘের গর্জ্জন শুনিয়া লোকনাথ ব্রহ্মচারী তাড়াতাড়ি আশ্রম প্রাঙ্গণে আসিয়া দাঁড়াইলেন। ছুষ্টেরা বাঘের আগমনে মহা ভীত। একঘরের মধ্যে ঢুকিয়া আত্মরক্ষার জন্য তাঁহারা ব্যগ্র। ব্রহ্মচারীর জীবনীকার শ্রীকেদারেশ্বর সেন ইহার বর্ণনা দিয়াছেন—

"ভীতত্রস্ত বালক ছুইটি এই সময়ে বেড়ার ফাঁক দিয়া বিস্ফারিত নয়নে দেখিতেছে, ব্যাঘ্রটি কোনরূপ অনিষ্ট না করিয়া লোকনাথের পদতলে লুটাইয়া পড়িল। লোকনাথ তখন ব্যাঘ্রটির গলায় ও মাথায় হাত বুলাইয়া তাহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, 'না গো, তোমার এ আশ্রমে আসা সঙ্গত হয়নি। এখানে সর্ব্বদাই লোকের সমাগম, অতএব তুমি অবিলম্বে জঙ্গলে চলে যাও, সেখানে তোমার আহার্য্য মিলবে।"

কথা কয়টির তাৎপর্য্য বুঝিতে বাঘটির দেরী হয় নাই। তখনি এক লম্ফে সে প্রস্থান করিল।

যুবক দুইটি এই অলৌকিক দৃশ্য দেখিয়া ততক্ষণে স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছে। বহ্মচারী বাবা যে কত বড় শক্তিধর সাধক ইহা বুঝিতেও তখন তাহাদের বাকি নাই। অনুতপ্ত হৃদয়ে এই মহাপুরুষের চরণে তাহারা বারবার ক্ষমা চাহিতে লাগিল। দয়ার্দ্র লোকনাথ দুর্ব্বৃত্তদের মার্জ্জনা করিলেন।

বারদীর আশ্রমে ভক্তজনের সমাগম ক্রমেই বৃদ্ধি পায়। গ্রামাঞ্চল হইতে দলে দলে ভক্ত, দুঃস্থ ও আর্ত্ত রোগীরা আসিতে থাকে। এই আগন্তুকদের জন্যে ক্রমে এই স্থানে একটি সদাব্রতও স্থাপিত হয়। কমলা নামে এক গোপকন্যার আশ্রমের নিকটেই বাস। লোকনাথ ব্রহ্মচারীকে সে রোজ দুগ্ধ যোগায়। তিনি ইহাকে 'গোয়ালিনী মা' বলিয়া ডাকিতেন, তাঁহার কৃপা দৃষ্টিপাতে এই নারীর অপরূপ রূপান্তর সাধিত হয়। বারদী আশ্রমের নানা কর্ম্ম— অতিথিসেবা, প্রসাদ বিতরণ, রোগীদের পরিচর্য্যা, সবকিছু বাবার এই গোয়ালিনী মায়ের তত্ত্বাবধানেই পরিচালিত হইত। এই সেবিকা নারীটি ছিলেন অতিবৃদ্ধা। বয়স তাঁহার প্রায় আশী বৎসর। এ বয়সেও বৃহৎকর্ম্মের দায়িত্বভার তিনি অপূর্ব্ব শক্তিবলে বহন করিয়া চলিতেন। আশ্রমে সমাগত শত শত ব্যক্তির রান্নার কার্য্য ইহাকে অবলীলায় সম্পন্ন করিতে দেখা যাইত।

ভক্তদের উপর লোকনাথ অজস্র কৃপা বর্ষণ করিতেন, আর সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের উপর তাঁহার সতর্ক দৃষ্টিপাতেরও অভাব কিন্তু ছিল না। পূর্ণানন্দ নামে একটি পশ্চিম দেশীয় ভক্ত বারদীর আশ্রমে বাস করিতেন। একদিন এক উৎসব উপলক্ষে বহু নরনারীর সম্মেলন হইয়াছে। পূর্ণানন্দ এ সময়ে একটি রন্ধনরতা তরুণী বিধবার সহিত রহস্যালাপের চেষ্টা করিতে থাকে। নিজ কুটিরের অভ্যন্তরে লোকনাথ উপবিষ্ট। সর্ব্বজ্ঞ যোগীর দৃষ্টিতে এ দৃশ্যটি

এড়াই নাই। ভক্ত পূর্ণানন্দকে তিনি নিকটে ডাকাইলেন, সস্নেহে তাহার শরীরে কিছুক্ষণ নিজের হাতটি বুলাইয়া প্রশ্ন করিলেন, "পূর্ণানন্দ, বল দেখি, স্ত্রীলোক ও পুরুষ নির্জ্জনে একত্র হ'লে কে আগে টলে ?"

ভক্তটি একেবারে নিরুত্তর। ব্রহ্মচারী এবার দৃঢ়স্বরে কহিলেন, "স্ত্রীলোক আধার বলে প্রথমে টলে না। পুরুষই কিন্তু প্রথমে টলে। এখন থেকে খুব সতর্ক হয়ে চল্‌বে।" পূর্ণানন্দ কিন্তু সতর্ক হইতে পারে নাই, তাই উত্তরকালে এই আশ্রম হইতে তাহাকে বিদায় লইতে হইয়াছিল।

ঢাকার প্রসিদ্ধ ধনী জগদ্বন্ধু পোদ্দারের পুত্র কালীচরণ সেদিন ভক্তিভরে ব্রহ্মচারী বাবাকে দর্শন করিতে আসিয়াছেন! এক দুরারোগ্য রোগে তিনি ভুগিতেছেন, বাবার কাছে এ উদ্দেশ্যেই তাঁহার আগমন। সঙ্গে রহিয়াছে উর্দ্দিপরা দারোয়ান ও পরিচারকের দল। কালীচরণ পোদ্দার একটি বৃহৎ মাটির ভাঁড়ে দুধ কিনিয়া আনিয়া বাবার কুটিরের বারান্দায় তুলিয়া রাখিয়াছেন। ব্রহ্মচারী কিন্তু হঠাৎ বড় ক্রুদ্ধ স্বরে তাঁহাকে বলিয়া উঠিলেন, "না না, তোমার ও দুধ রাখা যাবে না, ওখান থেকে এখনি সরিয়ে ফেল।"

আর্ত্তভক্ত কালীচয়ণ গলবস্ত্র হইয়া বারবার মিনতি করিতেছেন। কিন্তু ব্রহ্মচারীবাবা সরোষে বলিয়া উঠিলেন—"ছাখ্, তুই ধনী লোকের ছেলে। একটা নূতন ভাল পাত্রসহ যদি দুধ দিতে পারিস, তবে তা রাখা যাবে।" বাজার হইতে তখনই এক নূতন ভাঁড় আনিয়া এই দুগ্ধ রাখা হইল। তবুও বাবার ক্রোধ যায় না। উত্তেজিত স্বরে বকিতে লাগিলেন, "না না, ও দুধ কখ্‌খনো রাখা যাবে না।"

নির্দ্দেশমত দুগ্ধভাণ্ড নীচে আঙিনায় নামাইয়া রাখা হইল। ঠিক এমন সময়ে আশ্রমের একটি পালিত কুকুর সেখানে আসিয়া উপস্থিত। ভাঁড়ে মুখ লাগাইয়া কুকুরটি পরমানন্দে চুমুক লাগাইয়া দিল। কালীচরণ পোদ্দার তো একেবার মারমুখী! 'দুর দুর'

বলিয়া তখনি কুকুরটির পশ্চাদ্‌ধাবন করিয়া আশ্রম সীমানার বাহিরে তিনি উহাকে তাড়াইয়া দিলেন।

লোকনাথ নিকটেই উপবিষ্ট। উত্তেজিত কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, "ন্যাখ্, এই জন্যই তোর দেওয়া দুধ আমি এতক্ষণ গ্রহণ করি নি। যে দুধ তুই আমাকে দিয়েছিস, নিবেদনের সঙ্গে সঙ্গেই কি তাতে তোর সত্ব লোপ পায় নি? তবে আশ্রমের কুকুরটাকে তাড়াবার তোর কি অধিকার আছে, বল্‌তো?"

ধনী ভক্তের আত্মাভিমান দমনের সঙ্গে সঙ্গে লোকনাথ তাঁহাকে বুঝাইয়া দিলেন, তাঁহার আশ্রমকুটির সর্ব্বজনীন ধর্ম্মপীঠ—মানুষ ও পশু, আশ্রমের সমস্ত জীবেরই আশ্রমে প্রদত্ত দ্রব্যের উপর সমান অধিকার। ইহার পর কালীচরণ পোদ্দারের দুধের ভাঁড় আঙিনায় পড়িয়া রহিল। কিন্তু বিস্ময়ের বিষয়, ঐ অঞ্চলের কোন কুকুর বা বিড়াল আর তাহা স্পর্শও করে নাই। অবশেষে সবটা দুধই মাটিতে ঢালিয়া দেওয়া হইল।

দিকে দিকে তখন 'বারদীর গোঁসাইর' মহিমা ও তাহার নানা সিদ্ধাইর কাহিনী প্রচারিত। চারিদিক হইতে ভক্ত, আর্ত্তের দল এখানে ভীড় করিতেছে। এই সময়ে একদিন ভাওয়ালের প্রতাপান্বিত জমিদার রাজা রাজেন্দ্রনারায়ণ ব্রহ্মচারী বাবাকে দর্শন করিতে আসেন। পথমধ্যে হাতীর পিঠে বসিয়া তিনি পারিষদদের সঙ্গে আলোচনা করিতেছিলেন, লোকনাথকে তাঁহারা সকলে প্রণাম করিবেন কিনা। শক্তিধর মহাপুরুষ হইলে কি হয়, জাতের তো কোন ঠিক নাই! তাই বহু পরামর্শের পর স্থির হইল, সষ্টাঙ্গে প্রণাম করা অথবা চরণধূলি নেওয়া ঠিক হইবে না। সম্মুখে দাঁড়াইয়া শুধু নমস্কার ও সম্মান প্রদর্শনই তাঁহারা করিবেন।

কার্য্যক্ষেত্রে কিন্তু অন্যরূপ ঘটিল। লোকনাথের সম্মুখে উপস্থিত হইবামাত্র রাজা রাজেন্দ্রনারায়ণ ভূমিষ্ঠ হইয়া সশ্রদ্ধভাবে তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। চরণধূলি নিয়া দাঁড়াইতেই ব্রহ্মচারী সকলকে

বিস্মিত করিয়া কহিলেন, "কেনরে বাবা? প্রণাম করবে না ব'লেই তো সকলে স্থির করেছিলে!" ঐ ভক্ত ভূম্যাধিকারীর চেষ্টায়ই মহাত্মার বহু প্রচারিত আলোকচিত্রটি নেওয়া সম্ভবপর হয়।

সামাজিক সম্বন্ধ ও কর্ত্তব্য সম্বন্ধে ব্রহ্মচারীর মতামত বড় সুস্পষ্ট ছিল। লোকশিক্ষার দিকে দৃষ্টি রাখিয়া নির্দ্দেশাদি দিতে তাঁহার কখনো ভুল হইত না। পিতামাতার প্রতি কর্ত্তব্য সম্বন্ধে একবার তিনি তাঁহার অন্যতম ভক্ত শ্রীমদন চক্রবর্ত্তীকে বলিয়াছিলেন, "ত্যাখ্, পিতা মাতার ভরণপোষণ ও আনন্দবিধান যে করে সেই তো প্রকৃত পুত্র।"

তারপর রহস্যভরে সহাস্যে বলিতে লাগিলেন, "গয়ায়াং পিণ্ডদানঞ্চ, এর তাৎপর্য্য শুনেছিস্ তো? গয়াসুরকে পিণ্ডদান না করলে সে একেবারে ক্ষেপে যায়। তখন এই ক্ষিপ্ত অসুরকে থামানো তোদের বিষ্ণুপাদপদ্মের কর্ম্ম নয়—সে শক্তি পিণ্ডেরই রয়েছে! আচ্ছা, তোর মধ্যে যে একটা গয়াসুর রয়েছে, তাকে পিণ্ড বা আহার্য্য না দিলে ওটা ক্ষেপে যায় কিনা বল্ দেখি? তাই যদি হয়—তবে এই গয়াসুরধৃত বাপ-মাকে যে খাওয়ায় পরায় সে-ই কি প্রকৃত পুত্র নয়?"

উপরোক্ত ভক্তটির মাতার পায়ে একবার পচনশীল দুষ্ট ব্রণ হইয়াছিল। লোকনাথের আশ্রম-অঙ্গনে কিছুদিন থাকার পর তাঁহার কৃপায় চক্রবর্ত্তীর বৃদ্ধা মাতা আরোগ্যলাভ করেন। রোগীকে বিদায় দিবার সময় লোকনাথবাবা তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ ভাষায় কহিলেন, "মদন, তোর মা ভাল হয়ে গিয়েছে, এইবার তাকে বাড়ী নিয়ে যা। আর ত্যাখ্, তুই যেমন আমাকে ভক্তি করে বাবা ডাকিস্, তোর মা, কি সেই ভাবে আমাকে ভাতার ভাবতে পারে না?" হেঁয়ালিপূর্ণ ও রুচিবিগর্হিত ও উক্তির নিহিতার্থ—সত্যকার যে কোন আপন ভাবের মধ্য দিয়া ভক্তের আত্মনিবেদনটি সম্পন্ন হইলেই লোকনাথ তাঁহার পরমাশ্রয় দান করিবেন।

সাধন পথে অগ্রসর হইতে গিয়া রাজমোহন চক্রবর্ত্তী নামক এক

ব্যক্তির নানা বিভ্রান্তি জন্মে। উগ্র ও জ্ঞানাভিমানী ভঙ্গিতে প্রায়ই তিনি বলিতেন, "শালগ্রাম শিলাকে আমি কেন পূজো ক'রবো? ওটা পাথরের টুক্‌রো ছাড়া আর কিছু নয়!" পবিত্র শিলায় তিনি একদিন পা দিয়াও দাঁড়ান।

চক্রবর্ত্তী মহাশয়কে লোকনাথের সম্মুখে আনিয়া উপস্থিত করা হয়। মহাপুরুষের নিকট তাঁহার সম্পর্কে কিছুই বলা হয় নাই, কিন্তু তিনি তাঁহাকে দেখিবামাত্রই সেদিন গর্জ্জিয়া উঠিলেন। তারপর কহিলেন, "আমার কাছে কত দিগ্‌দেশের লোক আসা যাওয়া করে, কত লোক কত রকমের ফল পাচ্ছে, কিন্তু আমি তো কখনো তোর মত নিজেই নিজেকে ঈশ্বর বলে প্রকাশ করি নে—আর শালগ্রামের ওপর পা দিয়েও লোকের মনঃপীড়ার কারণ হই নে।"

লোকনাথের জীবন-লীলাটি এ সময়ে শুধু মানব কল্যাণকে কেন্দ্র করিয়াই যেন আবর্ত্তিত হইতে থাকে। শত শত দুঃখ দৈন্য প্রপীড়িত নর-নারীর আর্ত্ত আবেদন এই মহাযোগীর অন্তরে তরঙ্গ তুলিয়া দিত—ঐশী শক্তির করুণাঘন প্রকাশ তাঁহার মধ্যে সম্ভব করিয়া তুলিত।

শক্তিধর ব্রহ্মচারীজীর মধ্যে দুইটী রূপ এই সময়ে ফুটিয়া উঠিতে দেখি। একটিতে তিনি সামাজিক আদর্শ, লোকাচারের বন্ধন মানিয়া নিতেছেন—আর অপরটির মধ্য দিয়া এই সর্ব্ববন্ধনমুক্ত মহাপুরুষ অবলীলায় তাঁহার যোগসিদ্ধির কল্যাণধারাকে দিগ্বিদিকে বিস্তারিত করিতেছেন।

ব্রহ্মচারী লোকনাথ কিন্তু লোকাচার মানিয়াই চলিতেন। তাই দেখি, শত বৎসরকাল উন্মুক্ত তুষারাঞ্চলে বাস করিয়া আসিয়াও বারদীতে তিনি শীতবস্ত্র ও বালাপোষ ব্যবহার করিতেছেন! দীর্ঘকাল উলঙ্গভাবে বিচরণ করার পরও সামাজিক পরিবেশের উপযোগী পরিচ্ছদ ব্যবহারে, এমন কি উপবীত ধারণে তাঁহার আপত্তি হইতেছে না। ফল ও কন্দমূল আহারের অভ্যাসের স্থলে অন্ন ভোজনে

তিনি পশ্চাদ্‌পদ নহেন। সর্ব্বপ্রকার মায়া ও বিকারের উর্দ্ধে অবস্থিত মহাপুরুষের নয়নে ভক্তের আর্ত্তি করুণার অশ্রুও বহাইতেছে।

গ্রামের সমাজকে কেন্দ্র করিয়াই মুখ্যতঃ ব্রহ্মচারীর এই লীলানাট্য অভিনীত হইত। সাধারণ মনুষ্যজীবনের পাপ তাপ, দুঃখদৈন্য শক্তিধর মহাপুরুষ তাঁহার অপরিমেয় সামর্থ্য দ্বারা ধারণ করিতেন। তাঁহার কৃপাবৈভব সকলের জন্যই উন্মুক্ত—স্থান কাল ও পাত্রের হিসাব সেখানে নাই। হৃদয়ের প্রার্থনা একবার আর্ত্তস্বরে নিবেদন করার সুযোগ পাইলে তাঁহার করুণা লাভে কেহ বঞ্চিত হইত না।

যে পাপী ও পাষণ্ডগণ তাঁহার অহৈতুকী কৃপা লাভে সমর্থ হইয়াছে তাঁহাদের সংখ্যা নিতান্ত কম নয়। মহাত্মার এই কৃপা কিন্তু তাঁহার যোগবিভূতির মাধ্যমেই আত্মপ্রকাশ করিত, স্থানে অস্থানে সর্ব্বত্র তাহা ঝরিয়া পড়িত। ইহা যেন ছিল তাঁহার শ্বাস প্রশ্বাসের মতই নিতান্ত স্বাভাবিক।

লোকনাথের যোগ সামর্থ্যের এক বিশেষ প্রকাশ—সূক্ষ্মদেহে যত্রতত্র বিচরণ। ভক্ত ও আশ্রিতদের কল্যাণের জন্য, তাহাদের প্রাণদানের জন্য ব্রহ্মচারীকে বহুবারই লোকোত্তর শক্তির আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইয়াছে। লোকনাথের শিষ্য ও অন্যতম চরিতকার ব্রহ্মানন্দ ভারতী ইহা বর্ণনা করিতে গিয়া লিখিয়াছেন, "বাবা যখন দেহ ছাড়িয়া চলিয়া যাইতেন, তখনও তিনি আসনে উপবিষ্ট থাকিতেন। দেহ দেয়ালটিতে ঠেস দিয়া নিদ্রিতের ন্যায় পড়িয়া থাকিত। পার্শ্বস্থ পরিচারকেরা তখন বলিত—গোঁসাই মরিয়াছেন, কিছু পরেই বাঁচিয়া উঠিবেন। এইরূপ দেহ হইতে বাহির হইয়া যাওয়ার বিষয় স্বয়ং তিনিই স্বীকার করিয়াছেন।"

একবার দ্বারভাঙ্গায় অবস্থানকালে বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় মরণাপন্ন হইয়া পড়েন। দুঃসাধ্য উদরী রোগে তিনি তখন আক্রান্ত। ডাক্তারগণ রোগীর প্রাণরক্ষা সম্বন্ধে একেবারে হতাশ হইয়া গিয়াছেন। আর আত্মীয়স্বজনগণও অন্তিম সময়ের প্রতিক্ষায় শুধু

ভগবানের নাম স্মরণে রত। এই সময়ে এই সঙ্কটকালে হঠাৎ সেদিন গোস্বামী মহাশয়ের প্রিয় শিষ্য শ্যামাচরণ বক্সী মহাশয় দ্রুতপদে বারদী গ্রামে আসিয়া উপস্থিত। ব্রহ্মচারীকে তিনি ধরিয়া পড়িলেন—তাঁহার গুরু, গোস্বামীজীর প্রাণরক্ষা এবার করিতেই হইবে। কাঁদিতে কাঁদিতে অনুনয় করিয়া কহিতে লাগিলেন, "বাবা, আমার আয়ু দিয়ে আপনি গোঁসাইজীকে বাঁচিয়ে দিন!"

লোকনাথবাবা বিজয়কৃষ্ণকে বড় ভালবাসেন। তাহার উপর শ্যামাচরণের ক্রন্দন ও করুণ মিনতিতে তাঁহার হৃদয় গলিয়া গেল। কহিলেন, "বাবা, তুমি ঢাকায় ফিরে যাও, ভেবো না! আমি গোঁসাইর কাছে যাবো! আগামী পরশু তোমরা সংবাদ পাবে।" ব্রহ্মচারী কিন্তু বরাবরের মত বারদীতেই বাস করিতেছিলেন। অথচ এই সময়ে দ্বারভাঙ্গায় মরণাপন্ন বিজয়কৃষ্ণের শয্যার পাশে শুশ্রূষাকারীরা তাঁহাকে একদিন দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া বিস্ময়ে হতবাক হইয়া যায়। গোস্বামীজীর জীবনীকার অমৃতলাল সেনগুপ্ত এই অলৌকিক ঘটনাটির উল্লেখ করিয়াছেন।

ভক্তদল পরিবেষ্টিত হইয়া লোকনাথ একদিন আশ্রমে উপবিষ্ট আছেন। ডাকহরকরা এসময় একগাদা চিঠি নিয়া উপস্থিত। উপরের চিঠিখানা দূর হইতে লক্ষ্য করিয়া ব্রহ্মচারী বলিলেন, "ত্যাখ্ তো, পার্ব্বতীর চিঠি নাকি? কি লিখেছে?" পার্ব্বতীচরণ রায় বাবার এক ভক্ত—তখন তিনি দার্জ্জিলিং-এর ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট। শিক্ষায় এবং আচরণে সাহেবী ভাবাপন্ন রায় মহাশয় ব্রহ্মচারীবাবার মধ্যে কি বস্তু দর্শন করিয়াছিলেন, তাহা তিনিই জানেন। নানা সময়ে এই মহাপুরুষের অহৈতুকী কৃপাও তাঁহার উপর কম বর্ষিত হয় নাই। পার্ব্বতীবাবু তাঁহার ঐ চিঠিতে লিখিয়াছেন—তিনি সম্প্রতি দুরারোগ্য ব্যাধিতে শয্যাশায়ী। তিনি কিন্তু এই চিঠি লেখার পূর্ব্বদিন হঠাৎ শয্যাপার্শ্বে ব্রহ্মচারী বাবাকে সশরীরে দর্শন করেন

এবং ইহার অব্যবহিত পরেই তাঁহার রোগ সারিয়া যায়। বাবার কৃপাদৃষ্টি যেন এমনি অব্যাহত থাকে, ইহাই তাঁহার প্রার্থনা।

ইহার কয়েকদিন পরে পার্ব্বতীবাবু ছুটি নিয়া লোকনাথের চরণ দর্শনের জন্য বারদী গ্রামে আসিলেন। পৌঁছিয়াই মহাপুরুষকে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাবা, সত্য ক'রে বলুন তো, আপনি কি এর ভেতর দার্জ্জিলিং-এ গিয়েছিলেন ?" তিনি কৌতুকভরে হাসিয়া উত্তর দিলেন, "আমি কি কখনো বারদী গ্রাম ছেড়ে কোথাও যাই রে ?"

পার্ব্বতীবাবু অবাক হইয়া পড়িয়াছেন। কিন্তু তিনিও ছাড়িবার পাত্র নহেন। বারবার বলিতে লাগিলেন, "কিন্তু বাবা আমি তো আপনাকে স্বপ্নে দেখি নি। জাগ্রত অবস্থায়—শয়ন ঘরে আপনাকে স্থূলদেহে, জীবন্তরূপেই যে দেখেছি। আর তার পরেই আমার ব্যাধি থেকে মুক্তি পেলাম।"

বাবা শুধু সংক্ষেপে উত্তর দিলেন, "আমি যে তোর কথা তখন চিন্তা করছিলাম।"

লোকনাথের সূক্ষ্মদেহে বিচরণের আরও একটি চমকপ্রদ কাহিনী রহিয়াছে। ঘটনাটি ঘটে আমেরিকায়। ডাঃ নিশিকান্ত বসু কিছুকাল আমেরিকায় চিকিৎসা ব্যবসায়ে ব্রতী ছিলেন। একদিন এক সম্ভ্রান্ত মার্কিন মহিলা তাঁহার নিকট আসিয়া উপস্থিত। ইনি দুশ্চিকিৎস্য কলিকের ব্যথায় এ সময়ে বড় ভুগিতেছেন। পাশ্চাত্যের আধুনিকতম চিকিৎসার অনেক কিছু ব্যবস্থাই একে একে ব্যর্থ হইয়াছে। রোগিনী এবার ভারতের প্রাচীন প্রথায় চিকিৎসা করাইয়া দেখিতে চাহেন। ভারতের প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধা ও আকর্ষণ অপরিসীম। তাই তিনি নিতান্তই শেষ চেষ্টা হিসাবে অলৌকিক যোগশক্তির দেশ ভারতীয় চিকিৎসা পদ্ধতির শরণ নিবেন।

কিন্তু ডাক্তার বসু আমেরিকান মহিলাটিকে বারবার বলিতে লাগিলেন—ভারতীয় চিকিৎসাবিজ্ঞান তাঁহার মোটেই জানা নাই। আর এই বিষয়ে অভিজ্ঞতাও তাঁহার নিতান্ত কম। কাজেই কি

করিয়া তিনি এই চিকিৎসা করিবেন ? অনুরোধ উপরোধ চলিতেছে, মহিলাটি এমন সময় হঠাৎ সবিস্ময়ে চীৎকার করিয়া উঠিলেন, "একি অদ্ভুত ব্যাপার ! ডাক্তার, আপনার পেছনে দাঁড়িয়ে উনি কে ?"

আমেরিকান মহিলাটি সে সময়ে ডাক্তারের পশ্চাতে দণ্ডায়মান এক দীর্ঘকায়, জটাজুটমণ্ডিত ভারতীয় মহাপুরুষের অলৌকিক মূর্ত্তি দর্শন করিতেছিলেন। পিছনের দিকে আবির্ভূত বলিয়া ডাক্তার বসু এ মূর্ত্তি দেখিতে পান নাই।

রোগিনী পর মূহূর্ত্তেই বলিয়া উঠিলেন, "ডাক্তার ! আমি কিন্তু আমার রোগের ঔষধ পেয়ে গিয়েছি।"

এ এক অলৌকিক কাণ্ড ! ডাক্তার বসু প্রত্যক্ষ দেখিলেন, তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মান রোগীনীর হাতের মুঠাতে একটি ভারতীয় ঔষধ কে যেন চকিতে গুজিয়া দিয়া গিয়াছে।

মার্কিন মহিলাটি তাঁহার অপ্রাকৃত দর্শনের যে বিবরণ দিলেন, তাহাতে ডাক্তার বসুর বিস্ময় চরমে উঠিল। দৃষ্ট মহাপুরুষের বর্ণনা হুবহু লোকনাথ ব্রহ্মচারীর সহিতই মিলিয়া যায়। চিকিৎসাবিদ্ নিশিকান্ত বসু লোকনাথের পরম ভক্ত বারদী গ্রামের নাগদের আত্মীয়। কিছুদিন পরে ভারতে ফিরিয়া তিনি বারদীতে আসেন ও সর্ব্বসমক্ষে এই চাঞ্চল্যকর তথ্য প্রকাশ করেন।

লোকনাথের এ যোগবিভূতির নানা বিস্ময়কর প্রকাশ ঘটিত। অসামান্য যোগী হিসাবে ইহাই ছিল তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম্ম। কাতর প্রার্থনা ও আর্ত্তি মুহূর্ত্তমধ্যে তাঁহার করুণা জাগাইয়া তুলিত, আর এই করুণা যে কত আর্ত্ত ও রোগগ্রস্তকে বারদীর আশ্রম প্রাঙ্গণে টানিয়া আনিয়াছিল তাহার সংখ্যা কে করিবে ?

পূর্ণচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের ব্যাধি নিরাময়ের ঘটনাটি এই শ্রেণীর কৃপারই এক নিদর্শন মিলে। উৎকট কুষ্ঠরোগে ভুগিয়া ভুগিয়া এক সময়ে তাঁহার প্রাণসংশয় হয়। অবশেষে বারদীতে গিয়া বাবার চরণাশ্রয় লাভের পর তিনি সম্পূর্ণরূপে রোগমুক্ত হন।

পরবর্ত্তীকালে পূর্ণবাবু কিছুদিন অবধি প্রকাশ্যে ঢাকার বুড়িগঙ্গার তীরে গায়ে মৃত্তিকা মাখিয়া বসিয়া থাকিতেন। তাঁহার এক ঘনিষ্ঠ বন্ধু একদিন সেখান দিয়া কোথায় যাইতেছেন। সমস্ত গায়ে মাটি লেপন করিয়া এই ভাবে কিম্ভূতকিমাকার সাজিয়া ঘোষমহাশয়কে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া তিনি রহস্যভরে বলিলেন, "কিগো ডেপুটীবাবু, তোমার এমন দুর্দ্দশা কেন ?"

পূর্ণবাবু অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে উত্তর দিলেন, "ভাই, মহাব্যাধির কবলে আমি পড়েছিলাম। লোকনাথ বাবার কৃপায় একেবারে তা দূর হয়েছে। আমি প্রাণ ফিরে পেয়েছি। তারপর বাবা আমায় নির্দ্দেশ দিয়েছেন, কয়েকদিন বুড়িগঙ্গার মাটি মেখে থাকতে হবে। তাহ'লে এই রোগের পুনরাক্রমণের আশঙ্কা থাকবে না। তাই আমি মাটি মাখছি। আর এ বস্তু গায়ে মেখে যে প্রকাশ্য স্থানে বসে আছি তার উদ্দেশ্য—অবিশ্বাসী ও শ্রদ্ধাহীন পাষণ্ডদের কাছে বাবার মাহাত্ম্য ঘোষণা হোক্। হতভাগারা জানুক্, এখনও ভারতে এমন শক্তিধর মহাপুরুষ বর্ত্তমান রয়েছেন—আর তাঁরা শুধু শ্রদ্ধাবান লোকের সামনেই প্রকট হন।"

জীবের প্রতি লোকনাথের এ করুণা ও ব্যাধি মোচনের প্রসঙ্গে একবার শিষ্য ব্রহ্মানন্দ ভারতী মহাশয় তাঁহাকে কতকগুলি প্রশ্ন করেন। বাবা যে উত্তর দেন তা বড় তাৎপর্য্যপূর্ণ। তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করা হয়—"বাবা, তুমি রোগীর রোগ নিজে নাও না দেখি, অথচ এই রোগীরা আরোগ্যলাভ কি ক'রে করে ?"

"ব্যাধিগ্রস্তের ওপর আমার দয়া হ'লেই আমার শক্তি ব'লে রোগ দূর হয়।"

"তোমার দয়া হয় কিরূপে ?"

"আমাকে তুষ্ট করে—আমার ইচ্ছে ও ভালবাসা জাগিয়ে তুলে ?"

"তুমি প্রকৃতপক্ষে তুষ্ট হও কিসে ? তোমার ভালবাসাই বা জাগানো যায় কি করে।"

গূঢ়ার্থটি প্রকাশ না করিয়া লোকনাথ সংক্ষেপে শুধু কহিলেন, 'তা তো জানি নে!'

লোকনাথের করুণাঘন রূপটি থাকিত এক বিভ্রান্তিকর আবরণে আবৃত। তাঁহার নীরস তপঃক্লিষ্ট ব্যবধান ও মর্ম্মভেদী বাক্যবাণ এড়াইয়া একবার ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে যাইতে পারিলে আর কোন কথা ছিল না, অন্তরের স্নেহরসে অবগাহন করিয়া ভক্তেরা ধন্য হইত। কিন্তু বহিরঙ্গ জীবনের উষর বালুকারাশি অপসৃত করিয়া খুব কম লোকই তাঁহার ফল্গুধারার সন্ধান পাইয়াছে। লোকনাথের মহাজীবনে কঠোর ও কোমলের এ বৈপরীত্য সত্যই বিস্ময়কর।

বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর এক বিশিষ্ট শিষ্য সেবার বারদীতে উপস্থিত হইয়াছেন। ব্রহ্মচারীবাবা এই ভদ্রলোকের নিকট তাঁহার গুরুদেবের বহুতর নিন্দাবাদ করিতে লাগিলেন। গোস্বামীজীর প্রিয় শিষ্যটি ইহা শুনিয়া তো ক্ষিপ্তপ্রায়। প্রত্যুত্তরে মহাপুরুষকে নানা কটূক্তি করিয়া উত্তেজিতভাবে তিনি আশ্রম ত্যাগ করিলেন।

লোকনাথ কিন্তু তখন এক পরিহাসপূর্ণ অভিনয়ই করিতেছিলেন। কিছুক্ষণ পরেই আবার গোস্বামীজীর সেই শিষ্যটিকে ডাকাইয়া আনিয়া নানাভাবে তাঁহাকে তুষ্ট করিলেন।

ইহার কিছুদিন পরে প্রভুপাদ বিজয়কৃষ্ণ বারদী গ্রামে আসিয়া উপস্থিত হন। উপরোক্ত ঘটনার উল্লেখ করিয়া লোকনাথ তখন তাঁহাকে সহাস্যে বলিয়াছিলেন, "জীবনকৃষ্ণ, দেখলাম তোর বেশীর ভাগ শিষ্যই তোকে অন্তরের সহিত ভালবাসে।" বিজয়কৃষ্ণকে তিনি আদর করিয়া ডাকিতেন 'জীবনকৃষ্ণ'। বহুবার দেখা গিয়াছে, এই মহাপুরুষের কল্যাণদৃষ্টি গোস্বামীজীর প্রতি সতত প্রসারিত থাকিত অথচ সেদিন ঐ শিষ্যটির নিকট তাঁহার নিন্দা ও বিদ্রূপ করিয়া কি গোলযোগেরই না সৃষ্টি করিয়াছিলেন!

অপর ঘটনাটি শ্রীরামকৃষ্ণের শিষ্য দুর্গাচরণ নাগ মহাশয়কে কেন্দ্র করিয়া ঘটে। সাধু নাগমহাশয় দেওভোগের অধিবাসী ও

বারদী গ্রামের অনতিদূরেই তিনি অবস্থান করেন। একদিন এই বহুখ্যাত মহাপুরুষকে দর্শন করিতে তিনি তাঁহার আশ্রমে আসিয়াছেন। নাগ মহাশয় দৈন্য ও নিরভিমানের প্রতিমূর্ত্তি—নিতান্ত কাঙালের বেশেই সর্ব্বদা তিনি চলাফেরা করেন। শরীরখানি এক জীর্ণ চাদরে আবৃত। পরিধেয় বস্ত্রটি অত্যন্ত মলিন, চুল অবিন্যস্ত ও অপরিচ্ছন্ন। এই বেশে নাগমহাশয় বারদীর আশ্রমে উপস্থিত। তাঁহাকে দেখিয়াই লোকনাথ ঠাট্টা করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কিরে, তোর এমন বেশ কেন? চুলগুলো, কাপড়-চোপড় পরিষ্কার থাকলে কি ধর্ম্ম হয় না রে?"

সাধু নাগ মহাশয় একেবারে চুপ করিয়াই আছেন। কিন্তু বাবা সহজে ছাড়িবার পাত্র নহেন, আবার প্রশ্ন করিলেন, "তোর গুরু কে?"

নাগ মহাশয় সবিনয়ে উত্তর দিলেন, "আজ্ঞে, 'শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস-দেব।" কিন্তু একথা বলিয়াই বা রক্ষা কোথায়? লোকনাথ আবার শ্লেষাত্মক স্বরে বলিতে লাগিলেন, "তোর গুরু কি তোকে এরূপভাবে থাকতে বলেছে?" নাগ মহাশয় নীরবেই দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন। ব্রহ্মচারীবাবার পরিহাস কিন্তু এখানেই সেদিন শেষ হইল না। নিতান্ত তাচ্ছিল্যভরেই যেন বলিতে লাগিলেন, "তাহলে তো দেখছি যেমন গুরু তেমনি হয়েছে তাঁর শিষ্য!"

কথাগুলি গুরু-সর্ব্বস্ব নাগ মহাশয়ের সহের সীমা অতিক্রম করিয়া গেল। উত্তরে একটি কথাও উচ্চারণ না করিয়া তিনি অবিলম্বে আশ্রম ত্যাগ করিয়া গেলেন। বলা বাহুল্য, লোকনাথবাবার মত মহাসিদ্ধ যোগীর নিকট ঠাকুর রামকৃষ্ণের পরিচয় অবিদিত ছিল না, সাধু নাগমহাশয়ের সাধনোৎকর্ষও তাঁহার অজানা নয়। অথচ মনে ও মুখে এই বৈপরীত্য দেখাইয়া তিনি কি বিভ্রান্তিকর এক ধূম্রজালেরই না সৃষ্টি সেদিন করিলেন। ইহাই কিন্তু ছিল কঠোর-দর্শন, অথচ পরমকারুণিক লোকনাথ ব্রহ্মচারীর মানবীয় লীলার এক বিচিত্র ভঙ্গী।

বহিরঙ্গ কথাবার্ত্তা ও বাহ্যিক আচরণের মধ্য দিয়া লোকনাথকে ধরা বড়ই কঠিন ছিল। তাঁহার দ্ব্যর্থবোধক কথার প্রকৃত তাৎপর্য্য না বুঝিতে পারায় প্রায়ই গোলযোগের সীমা থাকিত না।

লোকনাথকে বলিতে শুনা যাইত, "ছাখ্ বিভূতি আমি প্রস্রাব ব'লে গণ্য করি।" অথচ এই যোগবিভূতির কত লীলাই না দিনের পর দিন তাঁহার জীবনের স্তরে স্তরে অপরূপ মহিমায় বিকশিত হইয়াছে! মানব কল্যাণের জন্য করুণাঘন মহাপুরুষের অন্তরে যখনই আলোড়ন উঠিয়াছে—যোগবিভূতি যেন আজ্ঞাবহা কিঙ্করীর মতই তাঁহার আদেশ পালন না করিয়া পারে নাই।

একবার লোকনাথ ব্রহ্মচারীর এইরূপ এক রহস্যপূর্ণ বাক্য বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে, বারদীগ্রামে প্রবল উত্তেজনারও সৃষ্টি হয়। বাবার এই আশ্রমে শত শত লোক আসা যাওয়া করে। রোগী, প্রার্থী এবং মুমুক্ষু জনতার ভীড়ের অন্ত নাই। একদিন স্থানীয় কর্ম্মকারগণ খোল করতাল এবং ভাঁড়ভর্ত্তি বাতাসা ইত্যাদি নিয়ে সেখানে উপস্থিত। সোৎসাহে লোকনাথের কুটিরের কাছে আনিয়া তাহারা জানাইল, আজ গোঁসাইর আশ্রমে তাহারা হরির লুট দিবে। একথা শুনিয়াই লোকনাথ রুক্ষস্বরে বলিয়া উঠিলেন, "ওরে যা যা, এখান থেকে চট্‌পট্ সরে পড়। এখানে তোদের হরিটরি নেই। যেখানে হরি থাকে সেখানে গিয়ে হুল্লোড় কর্ আর লুট দে।"

কীর্ত্তনীয়া দল তো মহা রুষ্ট। উঠানে দাঁড়াইয়া নানা বিরুদ্ধ মন্তব্য তাহারা করিতেছে। বাবা ইহাতে আরো ক্রুদ্ধ হইয়া কহিতে লাগিলেন, "ওরে, শোন্ তা'হলে, তোদের হরির মুখে আমি প্রস্রাব করি!"

'গোঁসাইর' এরূপ কটূক্তি শুনিয়া সকলে খুব উত্তেজিত হইয়া আশ্রম ত্যাগ করিল।

তাঁহাদের মোড়ল নবীন কর্ম্মকার ব্রহ্মচারীবাবার এক পরম ভক্ত! সেদিন সেখানে সে উপস্থিত ছিল না, এই ঘটনাটি পরদিন

তাহার কাণে গেল। বন্ধুবান্ধবদিগকে নানাভাবে বুঝাইয়া রাখিয়া নবীন লোকনাথের আশ্রমে আসিয়া উপস্থিত। গোঁসাইর নিকটে সে ঘটনার প্রকৃত বিবরণটি শুনিতে চায়। তাঁহার মত মহাসিদ্ধ যোগীপুরুষ এমন দায়িত্বজ্ঞানহীন উক্তি কেনই বা করিবেন? প্রকৃত রহস্য জানিবার জন্য নবীন বাবাকে চাপিয়া ধরিল।

লোকনাথ নির্ব্বিকার ভাবে বলিলেন, "ছ্যাখ, সব শালা ভণ্ডের দল সেদিন শুধু শুধু এখানে হৈ-চৈ করতে এসেছিল। এই কপট আচরণ এখানে আমি ওদের করতে দিইনি। তাছাড়া, বেটাদের সাহস ছ্যাখ। ওরা আমার কথা অমান্য করে তর্ক করতে লাগলো। এই জন্যই তো আমি বললাম—তোদের হরির মুখে প্রস্রাব করি।"

তারপর স্মিতহাস্যে তিনি কহিলেন, "একথা শুনে কিন্তু ওরা সব রাগ ক'রে আশ্রম থেকে চলে যায়। কিন্তু সত্যই রাগ করবার কিছু ছিল কি? তুই ভেবে ছ্যাখ, আমি অশাস্ত্রীয় কিছু তো বলিনি। পুরাণশাস্ত্রে আছে, হরি যশোদাকে হাঁ করে নিজের মুখে ব্রহ্মাণ্ড দেখান। আমি যখন ব্রহ্মাণ্ডের একজন, আর প্রস্রাবও এই ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যেই করি, তবে 'হরির মুখে প্রস্রাব করি' এ কথাটা বলতে দোষটা কি হ'ল বলতো?"

বাবার এই কথার ভাবে ও ভঙ্গীতে নবীন কর্ম্মকার ও তাহার অনুবর্ত্তীদের মনের খেদ দূর হইল। সকলে বুঝিল, অধ্যাত্মরাজ্যের উচ্চতর স্তর হইতে, অনন্যসাধারণ দৃষ্টিভঙ্গী নিয়াই মহাপুরুষ তাঁহার দ্ব্যর্থবোধক মন্তব্য উচ্চারণ করেন। কিন্তু সাধারণের কাছে এসব কথা সহজে বোধগম্য হইবে কেন?

আর একদিন অনুরূপ এক ঘটনা নিয়া বাবার আশ্রম কুটিরে কম আলোড়নের সৃষ্টি হয় নাই। লোকনাথ সেদিন তাঁহার আশ্রমে বহুজন পরিবৃত হইয়া বসিয়া আছেন। এমন সময় পুরীর জগন্নাথ-দেবের এক পাণ্ডা সেখানে আসিয়া উপস্থিত হয়। হাতে তাহার নীলাচলনাথের মহাপ্রসাদ।

ব্রহ্মচারীবাবাকে উহা খাওয়ানোর জন্য পাণ্ডাটি তাঁহার নিকটে আগাইয়া আসে। ইহা দেখিয়া মহাপুরুষ হঠাৎ উচ্চরবে বলিয়া উঠিলেন, "থামো—থামো আমি যে মুসলমান।" পাণ্ডা তখনি থামিয়া গেল। কথাটা শুনিয়া উপস্থিত সকলেই হতবাক্ হইয়া গিয়াছে,—তাহাদের সপ্রশ্ন দৃষ্টি লোকনাথের মুখের উপর নিবদ্ধ।

পাণ্ডাটিকে কিছু পয়সা দিয়া তাড়াতাড়ি বিদায় করা হইল। লোকনাথ চতুর হাসি হাসিয়া ভক্তদের কহিতে লাগিলেন, "তোরা বড় অবাক হয়ে গিয়েছিস্ না? আরে, আমি যে 'মুছল্লুম ইমান—মুছলমান'। অর্থাৎ আমার ষোল আনা 'ইমান' বা ধর্ম্ম বজায় রয়েছে। কাজেই আর বেশী 'ইমান' পাবার জন্য প্রসাদ ভক্ষণের প্রয়োজন নেই।"

ব্রহ্মচারী বাবার আরবী ভাষায় ব্যুৎপত্তি দেখিয়া কয়েকজন এ বিষয়ে তাঁহাকে প্রশ্ন করেন। তিনি উত্তর দেন, "আমি আর আমার গুরু (আচার্য্য ভগবান গাঙ্গুলী মহাশয়) উভয়ে মিলে পরিব্রাজন-কালে কাবুলে উপস্থিত হই। সেখানে মোল্লাসাদীর বাড়িতে থেকে কিছুকাল কোরাণ পাঠ করেছিলাম।" মহম্মদীয় ধর্ম্মে সিদ্ধিলাভের কোন্ কোন্ পন্থা আছে, সাধক লোকনাথ তাহা জানিবার জন্যও এই সময়ে অগ্রসর হইয়াছিলেন। তাই সর্ব্ব ধর্ম্মের সমন্বয় ও আধ্যাত্মিক অনুসন্ধানের উদারতার দিক দিয়া তিনি ছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণেরই এক পূর্ব্বসাধক।

নিজের সাধন-সাফল্য ও আত্মসাক্ষাৎকারের বর্ণনা লোকনাথ স্বকীয় বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ভঙ্গীতে বারবার দিয়া গিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, "ওরে, আমি শতবৎসরেরও বেশী পাহাড় পর্ব্বতে পরিব্রাজন করেছি। এই শরীরের ওপর কত বরফ জল হয়ে গিয়েছে, কিন্তু তোদের ঈশ্বরের সঙ্গে আমার দেখা সাক্ষাৎ হয়নি—আমি দেখেছি আমাকে।" আত্মজ্ঞানীর পরম অনুভূতিরই এক নিদর্শন তাঁহার এ উক্তি।

অধ্যাত্মচেতনার তুঙ্গ শিখরটি হইতে অবতরণ করিয়া লোকনাথ আপনাকে জনারণ্যে মিশাইয়া দিয়াছিলেন। এই কঠোরদর্শন শুষ্ক, আত্মজ্ঞানীর হৃদয়ে তাই প্রেম ও সহানুভূতির যে অন্তঃসঞ্চারী ধারা গুপ্তভাবে প্রবাহিত হইত, তাঁহার সংবাদ কিন্তু অনেকেই রাখিত না। শুধু লোকমঙ্গলের জন্য দয়ার্দ্র হইয়া উঠিলেই তাঁহার করুণাঘনরূপটি উন্মোচিত হইয়া পড়িত। কেবল মানব নয়, মানবেতর জীবের জন্যও তাঁহার বিরাট হৃদয়ে করুণার অভাব ছিল না। আর এই করুণার স্রোতটিকে তিনি আশ্রিতদের হৃদয়েও বহাইয়া দিতে পারিতেন।

একবার এক মুমুক্ষু, সাধন লাভেচ্ছু ব্যক্তি বারদীতে আসিয়া লোকনাথের চরণে পতিত হয়। মহাপুরুষের আশ্রয় লাভ করিয়া সে কৃতকৃতার্থ হইতে চায়। তাহার সেদিনকার তীব্র আর্ত্তি ও অনুনয় বিনয় কিন্তু কোন কাজেই আসিল না। বাবা বজ্রগম্ভীর কণ্ঠে তাহাকে বলিয়া উঠিলেন, "ওরে, তুই তোর স্ত্রীকেই ভালবাসতে পারিস্ নি—আর আমাকে ভালবাসবি কি ক'রে? যা, যা এখনি এখান থেকে উঠে চলে যা।" পরে প্রকাশ পায়, আগন্তুক লোকটি অধ্যাত্মপথে চলিতে চাহিলেও, গৃহে সে তাহার স্ত্রীর সহিত বড় অসদ্ব্যবহার করে। এজন্যই লোকনাথের পদতলে আশ্রয় তাহার সেদিন মিলে নাই।

আশ্রমে বহুশ্রেণীর লোক আসা যাওয়া করে। ইহাদের মধ্যে কোন কোন ব্যক্তির সাধারণ মানবতাবোধ ও মমত্ববোধটুকুও নাই। এই সব বিষয়াসক্ত লোককে অপ্রিয়-সত্যভাষী লোকনাথের বাক্যবাণ সহ্য করিতে হইত। বাবা একদিন স্বীয় কুটিরে ভক্তদল পরিবৃত হইয়া বসিয়া আছেন। হঠাৎ দেখা গেল, তিনি নেপথ্যস্থিত কোন্ এক অনির্দ্দেশ ব্যক্তিকে লক্ষ্য করিয়া আপন মনে ভৎর্সনা করিয়া চলিয়াছেন। সকলে ইহার অর্থ বুঝিতে না পারিয়া শুধু একে অন্যের মুখের দিকে চাহিতেছেন! কিছুক্ষণ মধ্যেই এক অপরিচিত ব্রাহ্মণ আশ্রমে আসিয়া উপস্থিত। বারদীতে সে জীবনে কখনো

আসে নাই। এ আগন্তুককে দেখিয়াই লোকনাথ হঠাৎ ক্রোধোদ্দীপ্ত হইয়া উঠিলেন। মহাপুরুষের কটূক্তি ও তিরস্কার ইহার উপর অনর্গল ধারায় বর্ষিত হইতে লাগিল।

যে কোনো অভ্যাগতের পক্ষে এ ধরণের রোষ ও গালাগালি সহ্য করা কঠিন। আগন্তুক তাই কিছুক্ষণ পর গোঁসাইর আশ্রম হইতে নিতান্ত ক্ষুণ্ণ মনে বিদায় গ্রহণ করিলেন। ততক্ষণে আশ্রমে উপস্থিত অন্যান্য লোকজন এই ব্যাপারে বড় চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে। সত্যই তো, গোঁসাইর কি বিচিত্র খেয়াল ও হৃদয়হীন ব্যবহার! আসামাত্র লোকটির প্রতি এমন নিষ্ঠুর ব্যবহার না করলেই কি চলিত না?

কিছুকাল পরেই কিন্তু ইহাদের মনের ভার কাটিয়া যায়। ব্রহ্মচারী বাবা নিজেই তাঁহার দুর্জ্ঞেয় ব্যবহারের রহস্য উদ্ঘাটন করিলেন। কহিলেন, "কি রে, তোরা সব মনে দুঃখ পেয়েছিস্ নাকি? জানিস্, এই বামুনের এক বিবাহযোগ্যা মেয়ে আছে। বরপক্ষ থেকে পণ নিয়ে সে মেয়ের বিয়ে দিতে চাচ্ছে। কিন্তু ব্যাটা শুধু টাকার অঙ্কই বাড়াচ্ছে, মেয়ে সুপাত্রে কি অপাত্রে পড়লো তার জন্য কোন মাথা ব্যথা নেই। ব্যাটা যেন নরমাংস বিক্রেতা কসাই! তাই তো ওকে আমি আশ্রম থেকে তাড়ালাম।"

ইতিমধ্যেই কয়েকজন লোক কৌতূহলী হইয়া উঠিয়াছেন। তাহারা দৌড়িয়া গিয়া ব্রাহ্মণকে ধরিলেন। অনুসন্ধানের ফলে জানা গেল, বাবার উক্তি সর্ব্বাংশে সত্য। লোকটির কন্যার মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী হইয়াই তিনি এমন নিষ্ঠুরভাবে ভর্ৎসনা করিয়াছেন। সে তাহার কন্যার বিবাহে একাধিক বরপক্ষের কাছে পণের দাবী আটশত টাকায় উঠাইয়াছে। টাকার অঙ্ক আরও বাড়িবে কিনা, ইহা জানিতেই এই অতিবিষয়ী ব্যক্তি আজ বারদীতে আসিয়াছিল। লোকনাথের তিরস্কারের ফলে আজ কন্যার কল্যাণের দিকে তাহার দৃষ্টি না ফিরিয়া পারে নাই। অনুতপ্ত হইয়া সাশ্রুনয়নে একথা সকলের কাছে সে স্বীকার করিল।

মানবেতর জাতির জন্যও লোকনাথের সহানুভূতি ও কৃপার ধারা এমনই ভাবে সর্ব্ব সময়ে উদ্বেলিত হইয়া উঠিত। ঢাকা মীরপুর স্কুলের এক পণ্ডিত মহাশয় সেদিন বাবার চরণ দর্শনে আশ্রমে আসিয়াছেন। সাক্ষাৎকারের কালে দেখা গেল লোকনাথ এই আগন্তুকের প্রতি বড় বিরূপ ও কুপিত হইয়া বসিয়া রহিলেন। পণ্ডিত অনুনয় বিনয় করিলে তিনি হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন, "ওরে, কাকগুলো তোর বাড়িতে ফেলে দেওয়া দুটো ভাত খেতে এসেছিল। ওদের তাচ্ছিল্য করে তাড়িয়ে দিয়ে তুই আমার কাছে এসেছিস্ কেন বল্‌তো? কাকের শব্দ তোর কাণে বিকৃত, আর কর্কশ মনে হয়—না? কিন্তু তোদের মত বিষয়ী লোকের কথাবার্ত্তাও তো আমার কাছে ঐ রকমই অসহ্য লাগে। কিন্তু আমি কি তোদের কখনো ওরকম ক'রে তাড়িয়ে দিই?"

একবার কোন এক ভক্ত তাঁহার পিতৃশ্রাদ্ধে লোকনাথকে নিমন্ত্রণ করেন। তাঁহার বড় ইচ্ছা, এই উপলক্ষে মহাপুরুষের পবিত্র পদরজ তাঁহার বাড়িতে পড়ে। লোকনাথবাবা কিন্তু বৈষয়িক ও সামাজিক অনুষ্ঠানাদিতে কোথাও বড় একটা যান না। কিন্তু সেদিন এই ভক্তটির অনুরোধ এড়ানো দায় হইল। বাধ্য হইয়া তিনি তাঁহাকে বলিলেন, "আচ্ছা, আচ্ছা আমি যাবো।"

এদিকে শ্রাদ্ধবাসরে লোকনাথকে অনুপস্থিত দেখিয়া তিনি মনে বড় আঘাত পাইয়াছেন। পরদিন আশ্রমে উপস্থিত হইয়া বারবার সখেদে কহিতে লাগিলেন, "বাবা আমি বড় আশা করেছিলাম কিন্তু আপনি গেলেন না, নিজের কথাটাও রাখলেন না।"

লোকনাথ গম্ভীরস্বরে বলিলেন, "আমি তো গিয়েছিলাম রে। তুই-ই তো আমায় তাড়িয়ে দিলি।"

"আমি আপনাকে তাড়িয়ে দিয়েছি? একি অদ্ভুত, অবিশ্বাস্য কথা বাবা।"

"তুই আমায় ঠিকই তাড়িয়েছিস্। তোর দই-ক্ষীরের ঘরে একটা

কুকুর তুই তুইবার আহারের জন্য ঢুকেছিল, মনে আছে? তুই তুইবারই আমায় লাঠি দিয়ে তাড়া করেছিস্। আমি ঠিকই গিয়েছিলাম, কিন্তু তুই থাকতে না দিলে কি করবো বল্?"

১২৯৭ সালের কথা। প্রায় সাতাইশ বৎসর পূর্ব্বে ১২৭০ সালে লোকনাথ ব্রহ্মপুত্রের নিকটে এই বারদী গ্রামে উপনীত হন। গ্রাম্য জনজীবনের মধ্যে আসনটি পাতিয়া এই মহাশক্তিধর যোগী একাদিক্রমে বহুবর্ষ কাটাইয়া দিয়াছেন। এইবার তাঁহার লীলা সম্বরণের পালাটি উপস্থিত।

আশ্রম কুটিরে ব্রহ্মচারী এ সময়ে একদিন নিজেই ইহার ইঙ্গিত দিলেন। অন্তরঙ্গ ভক্তদের সাথে তিনি বাক্যালাপ করিতেছিলেন। অকস্মাৎ কি জানি কি ভাবিয়া মহাপুরুষ বলিতে লাগিলেন, "দেহটি যেন একটি পাখীর খাঁচা···আমাকে ওরা সব মানুষ ভাবে।··· ভবরোগী মোটে দেখলাম না।" একটি ভক্ত মহিলা সবিস্ময়ে বলিয়া উঠিলেন, "কি বল্‌লে বাবা, তোমাকে সকলে মানুষ ভাবে? কোন্ বিস্মৃত মুহূর্ত্তে মহাপুরুষের মনের তুয়ারখানি একটু বুঝি খুলিয়া গিয়াছিল। সঙ্গে সঙ্গেই আত্ম-সম্বিৎ পাইয়া চমকিয়া উঠিয়া তিনি কহিলেন, "ঐ দেখেছিস্? যাঃ, আমার ভুল হয়ে গিয়েছিল। দেহটা যে আছে, তা স্মরণই ছিল না।" এই আত্মবিস্মৃতির মধ্য দিয়াই লোকনাথ তাঁহার মহাপ্রয়াণের আভাসটি সেদিন দিয়াছিলেন।

দেহ ত্যাগ করিবার পথটিও কি ব্রহ্মচারী বাবা নিজেই প্রস্তুত করিয়া নিলেন? বারদীর একটি তুঃস্থ লোক যক্ষ্মা রোগে ভুগিয়া মৃতকল্প হয়। লোকনাথ তাহার তুঃসহ রোগভার নিজ দেহে উঠাইয়া নিলেন। অতঃপর এ রোগ তাঁহাকে আর ত্যাগ করিতে দেখা যায় নাই। ধীরে ধীরে শেষের দিনটির দিকে তিনি আগাইয়া যান।

মরলীলা সমাপ্তির দিনটি নিজেই তিনি চিহ্নিত করিয়া দিলেন। ১২৯৭ সালের ১৮ই জ্যৈষ্ঠ তারিখে দেহত্যাগের পর কোন্ প্রথায় তাঁহার সৎকার হইবে, সেই প্রশ্নটির মীমাংসা করিয়া দিতেও

ভুলিলেন না। লোকনাথের এক অন্তরঙ্গ শিষ্য শ্রীরজনী চক্রবর্তী লিখিয়াছেন, "লীলা সম্বরণের আট দিবস পূর্ব্বে উপস্থিত ভক্তদের গোঁসাই জিজ্ঞাসা করিলেন, 'বল্ দেখি, চার রকমের সৎকার ব্যবস্থার মধ্যে কোন উপায়ে মর দেহ শীঘ্র লয় পায়?' ভক্তগণ উত্তর দিলেন, আগুন দিলেই দেহ সত্বর লয় প্রাপ্ত হয়। একথার উত্তরে গোঁসাই বলিয়াছিলেন, "ছ্যাখ্ আমার দেহপাত হলে তোরা কিন্তু এটাকে আগুন দিয়ে দগ্ধ করে ফেলিস।"

১৮ই জ্যৈষ্ঠের প্রভাত। লোকনাথ বাবা আশ্রমস্থ ব্যক্তিদের ভোজনপর্ব্ব শীঘ্র শেষ করার জন্য বারবার তাড়া দিতে থাকেন। ভক্তদের সকলেরই আহার শেষ হইয়াছে কিনা জানিয়া নিবার পর, মধ্যাহ্নের কিছু পূর্ব্বে মহাযোগী তাঁহার ধ্যানাসনে গিয়া উপবিষ্ঠ হন। ধীরে ধীরে ব্রহ্মরন্ধ্রপথে তাঁহার প্রাণবায়ুর উৎক্রমণ ঘটে।

সহস্র সহস্র ভক্ত আশ্রিত জনগণ সাশ্রুনয়নে সেদিন তাহাদের প্রিয় 'গোঁসাই'র শেষকৃত্য সম্পাদনের জন্য আসিয়া জুটে। আশ্রমের দক্ষিণ পার্শ্বে, ঘৃত ও চন্দনকাষ্ঠ সহযোগে মহাপুরুষের পবিত্র দেহটি ভস্মীভূত করা হয়।

বারদীতে দেহ রক্ষা করিবার পরও কিন্তু ব্রহ্মচারী তাঁহার পরম প্রিয় 'জীবনকৃষ্ণ'কে বিস্মৃত হন নাই। ঠিক এই বিশেষ ক্ষণটিতে বৃন্দাবনে প্রভুপাদ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী ধ্যানমগ্ন ছিলেন। লোকনাথ এই সময়ে সূক্ষ্মদেহে তাঁহাকে দর্শন দিয়া নিজের মরলীলা সমাপ্তির কথা জানাইয়া আসিয়াছেন। ধ্যানাসন হইতে উঠিয়াই বিজয়কৃষ্ণ ভক্তদিগকে বাবার এই মহাপ্রয়াণের সংবাদ দেন।

কিছুকাল পরের কথা। কুমিল্লার বিচারালয় হইতে চাঞ্চল্যকর এক খুনের মামলার রায় বাহির হইয়াছে। আসামী নিবারণচন্দ্র রায় নিম্ন আদালতে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইয়া কারাগারে আছেন। হাইকোর্টে তাঁহার মামলা তখন বিচারাধীন। আপীলের শুনানীর দিনটি খুবই নিকটবর্ত্তী—আসামীর অন্তরে উদ্বেগের অবধি নাই।

আসন্ন মৃত্যুদণ্ডের বিভীষিকায় তিনি ছট্‌ফট্ করিতেছেন। কিন্তু ইহারই মাঝে মাঝে বিপদতারণ বারদীর গোঁসাইর পবিত্র নাম স্মরণ করিতে তাঁর ভুল হইতেছে না।

এই সময়ে নিবারণবাবু একদিন দেখিলেন, এক জটাজুট সমন্বিত দীর্ঘকায় মহাপুরুষ অর্গলবদ্ধ কারাগারে লৌহদ্বার ভেদ করিয়া তাঁহার দিকে অগ্রসর হইতেছেন। প্রহরীরা মূর্ত্তিকে মোটেই লক্ষ্য করে নাই, নিতান্ত নিশ্চিত মনে অদূরে তাঁহারা পদচারণা করিয়া বেড়াইতেছেন।

অলৌকিক পুরুষটি নিকটে আসিয়া দাঁড়াইলে নিবারণবাবু ভীত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন, "প্রভু, আপনি কে ?" সে প্রশ্নের উত্তর না দিয়া আগন্তুক গম্ভীর কণ্ঠে কহিলেন, "ওরে আমি যে আজ তোর মকদ্দমার রায় লিখিয়ে দিয়ে এসেছি, তুই খালাস হয়েছিস্।"

নিবারণবাবুর তখন বাক্‌স্ফূর্ত্তি হইতেছে না। কোনমতে আবার প্রশ্ন করিলেন, "কিন্তু—আপনি কে ?"

"আমায় চিন্‌লি নে ? আমি বারদীর ব্রহ্মচারী ?"

কারাগারের বন্দীকে এবার উন্মত্তের মত চীৎকার করিতে শুনা গেল, "ধর্ ধর্, ঐ যে গেল !" প্রহরীগণ সকলে তখন তড়িৎবেগে দৌড়াইয়া আসিয়াছে। সন্ধান করিয়া দেখা গেল, কেহই কোথাও নাই—অলৌকিক মূর্ত্তি ততক্ষণে কোথায় অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে।

নিবারণবাবুর নিকট পরদিনই এক টেলিগ্রাম পৌঁছিল,—তাঁহার প্রাণদণ্ড রদ হইয়াছে, অভিযোগ হইতে তিনি অব্যাহতি পাইয়াছেন। এই ভদ্রলোক কিছুদিন পর বারদীতে আসেন। ব্রহ্মচারী বাবার আশ্রমস্থ তৈলচিত্রখানি দেখিয়াই তিনি আবেগভরে বলিয়াছিলেন, "এই তো সেই মহাপুরুষ, সেদিন যিনি হাজতে ঢুকে আমায় কৃপা করে এসেছিলেন।"

লোকনাথের নরদেহের লীলা পূর্ব্বেই সমাপ্ত হইয়া গিয়াছে। কিন্তু সূক্ষ্মলোকচারী বিদেহী লোকনাথের অলৌকিক জীবনের উপর, তাঁহার করুণালীলার উপর, যবনিকা সেদিনও নিপতিত হয় নাই !

শ্রীভগবানদাস বাবাজী

ঊনবিংশ শতাব্দীর তৃতীয় পাদে অম্বিকা-কাল্‌নার শ্রীশ্রীনামব্রহ্ম বিগ্রহের মাহাত্ম্যটি দিকে দিকে প্রচারিত হইয়া উঠিয়াছে। প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব সাধক ভগবানদাস বাবাজী এই শ্রীমূর্ত্তির সেবা প্রবর্ত্তন করিয়াছেন, তাঁহার ভক্তিবলে ইহা হইয়া উঠিয়াছে পরম জাগ্রত। কাল্‌নার এ শ্রীপাটে তাই ভক্ত ও বৈষ্ণবজনের ভীড়ের অন্ত নাই।

ঠাকুরের উপলভোগ সেদিন সবেমাত্র সমাপ্ত হইয়া গেল। কাঁসর ঘণ্টার রব স্তিমিত হইয়া আসিতেছে। বাবাজী মহারাজ তাঁহার ঝুলি ও মালাটি নিয়া নিকটস্থ ভজনকুটিরে প্রবেশ করিলেন। কিছুক্ষণ জপ ও শ্রীনামব্রহ্মের অনুধ্যানের পর গভীর ভজনাবেশ হইল। মহাসাধকের নয়ন দুইটি অর্দ্ধনিমীলিত হাতের মালাগাছটি স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রের মত ঘুরিয়া ঘুরিয়া কখন থামিয়া গিয়াছে।

এমন সময় বাবাজী মহারাজের ভজনকুটিরে এক বিশিষ্ট দর্শনার্থী প্রবেশ করিলেন। তিনি ঐ অঞ্চলের প্রতাপান্বিত ভূম্যাধিকারী বর্দ্ধমানের মহারাজা। কোথা হইতে কি ঘটিল—বাবাজী মহারাজ হাতের মালাটি আসনের উপর রাখিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন, "ওরে মার্ মার্, তাড়িয়ে দে, তাড়িয়ে দে!" দর্শনার্থী মহারাজ হতাশায় মুষড়িয়া পড়িলেন। সিদ্ধ সাধুর ভজনকুটিরে প্রণাম করিতে আসিয়া এ কোন বিপত্তি! ভাবিলেন, হয়তো বিষয়ী লোকের সংস্পর্শ এড়াইতে চাহেন বলিয়াই বাবাজী মহারাজের এই কোপ। কিন্তু ইহার পরই সিদ্ধ ভগবানদাস হঠাৎ একেবারে নীরব হইয়া পড়িলেন। নয়ন দুইটি তাঁহার পূর্ব্বের মতই মুদিত, দেহটি একেবারে নিস্পন্দ। বাহ্যজ্ঞান বিরহিত বৈষ্ণব মহাপুরুষের দিকে তাকাইয়া বর্দ্ধমানরাজ ভাবিতেছেন, বাবাজীর সম্বিৎ ফিরিয়া আসুক—তাহার

পর এই আকস্মিক ক্রোধ প্রকাশের হেতুটি কি, তাহা জানিয়া তিনি এস্থান হইতে উঠিবেন।

কিছুক্ষণ পরে ভগবানদাস বাবাজীর বাহ্যজ্ঞান ফিরিয়া আসিল, মালাগাছটি কুড়াইয়া নিয়া সম্মুখে তিনি দৃক্‌পাত করিলেন। বিশিষ্ট অতিথিটিকে দেখিয়া ব্যগ্র হইয়া জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, "বাবা, কখন আপনার আসা হয়েছে? ঠাকুর আনন্দে রেখেছেন তো? শ্রীশ্রীনামব্রহ্মের প্রসাদ কি এখানে পেয়েছেন?"

মহারাজের বিস্ময়ের অবধি নাই। যে বাবাজী মহারাজ কিছুক্ষণ আগেই তীব্র চীৎকার করিয়া তাঁহাকে তাড়াইতে উদ্যত হইয়াছিলেন, অল্পক্ষণের মধ্যেই তাঁহার একি অদ্ভুত রূপান্তর? এত কটুকাটব্যের পর কেনই বা আবার এত সমাদর?

এবার সাহস সঞ্চয় করিয়া বাবাজীকে তিনি প্রশ্ন করিলেন, "বাবা, আমি ভজন কুটিরে ঢুকবার সঙ্গে সঙ্গে আপনি এমন মারমুখী হয়ে আমায় তাড়িয়ে দিচ্ছিলেন কেন? আমি বিষয়ী হতে পারি, কিন্তু নামব্রহ্মের দর্শনার্থী তো বটে, তবে এমনতর কটুকথা আমায় কেন বল্‌লেন?"

"সে কি গো! সর্ব্বত্রাভ্যাগতো গুরু।—অভ্যাগত ব্যক্তিমাত্রেই যে বৈষ্ণবের কাছে পরম আরাধ্য। তাঁকে কোন কটুকথা বল্‌লে যে শ্রীভগবানকেই অসম্মান করা হয়। আপনাকে আবার কখন আমি ওসব বললাম?"

"আজ্ঞে, আমি আপনার চরণ দর্শন করতে আসামাত্রই তাড়িয়ে দে, তাড়িয়ে দে ব'লে আমার প্রতি রোষ প্রকাশ করছিলেন!"

বাবাজী মহারাজ বড় লজ্জিত হইয়া পড়িলেন। এবার তিনি কোমল, সহানুভূতিপূর্ণ কণ্ঠে বলিতে লাগিলেন, "না বাবা, আপনি মনে দুঃখ করবেন না। আমি আপনাকে উদ্দেশ করে ওসব কিছু বলিনি। আপনি কখন এসেছেন তা এই স্থূল চোখে দেখিওনি। সে সময়ে শ্রীবৃন্দাবনধামে গোবিন্দ মন্দিরের তুলসীমঞ্চের ওপর উঠে

একটা ছাগল তুলসীপাতাগুলো খেয়ে ফেলেছিল। প্রভুর সেবায় বিঘ্ন হবে ভেবে আমি তখন ওটাকে তাড়িয়ে দিচ্ছিলাম। ঐ ছাগলটাকে লক্ষ্য করেই আমার এই গালিগালাজ।”

রাজাবাহাদুরের বিস্ময় এবার চরমে উঠিয়াছে। বর্দ্ধমান-কাল্‌নার ভজন কুটিরে উপবিষ্ট এই বৈষ্ণব মহাপুরুষ কি করিয়া বৃন্দাবন ধামে স্থূলদেহে উপস্থিত হইলেন, ছাগল বিতাড়িত করিলেন ইহা কিছুতেই তাঁহার বোধগম্য হইতেছে না। সঙ্গে সঙ্গে তখনি পকেট ঘড়িটা বাহির করিয়া ঠিক সময়টি দেখিয়া নিতেও তাঁহার ভুল হইল না। অতঃপর বাবাজী মহারাজের সহিত কিছুক্ষণ আলাপের পর তাঁহাকে প্রণাম করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন।

বর্দ্ধমানরাজ ভাবিলেন, গোবিন্দ মন্দিরে এই সময়ে এরূপ ঘটনা ঘটিয়াছে কিনা ইহা জানা দরকার। সেইদিনই তিনি বৃন্দাবনের এক ঘনিষ্ঠ বন্ধুর নিকট তার প্রেরণ করিলেন। উত্তরে সংবাদ জানা গেল যে, তাঁহার উল্লেখিত সময়ে গোবিন্দজীর তুলসী মঞ্চস্থিত চারাগাছটি, ছাগল কর্ত্তৃক ঠিকই ভক্ষিত হইতেছিল। কাল্‌না নিবাসী ভগবানদাস বাবাজী অকস্মাৎ সেই সময়ে মন্দির প্রাঙ্গণে উপস্থিত হন এবং লাঠি হস্তে চীৎকার করিতে করিতে উহাকে তাড়াইয়া দেন।

এই অলৌকিক ঘটনার কথা জানিয়া রাজাবাহাদুর ও স্থানীয় জনগণের বিস্ময়ের অন্ত রহিল না। ভজনাবেশের মধ্য দিয়াই যে শক্তিধর বাবাজী স্থূলদেহে সে সময়ে বৃন্দাবনে উপস্থিত হন— ইহাতে কাহারো সন্দেহের অবকাশ রহিল না।

যে মহাবৈষ্ণবের জীবনে এই অপূর্ব্ব ভজনসিদ্ধি সম্ভবপর হয়, প্রথম জীবনে তিনি ছিলেন উড়িষ্যার কোন অখ্যাত গ্রামের এক নগণ্য বালক। শ্রীচৈতন্যদেবের প্রেমভক্তির প্রবাহ উড়িষ্যার জন জীবনকে শত শত বৎসর ধরিয়া অভিসিঞ্চিত করিয়াছে, সার্থকনামা বৈষ্ণব সাধকদের সেখানে আবির্ভাব ঘটাইয়াছে। উত্তরকালে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদে, ইহারই একটি ধারা অবলম্বন করিয়া মুমুক্ষু

বালক ভগবানদাসের অধ্যাত্মজীবন অঙ্কুরিত হইয়া উঠে অতঃপর এক কাঙাল বৈষ্ণবের বেশে তিনি শ্রীবৃন্দাবনধামে চলিয়া যান।

বিখ্যাত বৈষ্ণব আচার্য্য, সিদ্ধ কৃষ্ণদাস বাবাজী তখন গোবর্দ্ধনে ভজন নিরত। উৎকল দেশীয় এই মহাবৈষ্ণবের চরণপ্রান্তে তৎকালে নানা দিগ্‌দেশের গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ আশ্রয় নিতে আসিতেছেন। উড়িষ্যাবাসী তরুণ বৈষ্ণব ভগবানদাসও সেদিন এ মহাপুরুষের পদেই আত্মসমর্পণ করিলেন, তাঁহার নিকট ভেক গ্রহণ করিলেন।

অতঃপর গুরুর আশ্রয়ে গোবর্দ্ধনে থাকিয়া দীর্ঘদিন তিনি রাগানুগা সাধনের নিগূঢ় নির্দ্দেশ প্রাপ্ত হন, বিবিধ ভক্তিশাস্ত্রে তাঁহার প্রচুর অধিকার জন্মে। গুরু কৃষ্ণদাস বাবাজীর আদেশমত তরুণ সাধক পরবর্ত্তীকালে বর্দ্ধমানের অম্বিকা-কাল্‌নায় আসিয়া বসবাস করিতে থাকেন। এই শক্তিমান বৈষ্ণবের সাধনার মধ্য দিয়া প্রসিদ্ধ শ্রীনামব্রহ্ম বিগ্রহের সেবা প্রকট হয়।

এই উৎকলীয় বৈষ্ণব ক্রমে গৌড়ীয় ভক্ত ও সাধক সমাজের এই মহাসমর্থ আচার্য্যরূপে পরিচিত হইয়া উঠেন। উড়িষ্যার ভক্তি-তরুটি বাংলার বুকে, পবিত্র বৈষ্ণবভূমি কাল্‌নায় ধীরে ধীরে তাহার দীর্ঘায়ত স্নিগ্ধ ছায়াটি বিস্তারিত করিয়া দেয়।

রাগানুগা সাধনের যে নিগূঢ় তত্ত্ব ভগবানদাস বাবাজীর জানা ছিল, দীর্ঘ পরীক্ষা ব্যতীত সহজে তিনি ইহা ভজনকারী শিষ্যদিগকে প্রদান করিতেন না। তাছাড়া, এই সাধনের যে সিদ্ধি তিনি করায়ত্ত করেন আপন সত্তার গভীর স্তরে অবলীলায় তিনি তাহা সঙ্গোপিত রাখিতে পারিতেন—এমনই ছিল তাঁহার ভজন সামর্থ্য। উচ্ছ্বাস ও ভাবাবেগ বর্জ্জিত, সদা গম্ভীর-মূর্ত্তি এই মহাবৈষ্ণব সমসাময়িক কালের ভক্তসমাজে এক পরম শ্রদ্ধার স্থান অধিকার করিয়াছিলেন।

শ্রীমন্দিরের ভোগারতি শেষ হইলে সিদ্ধবাবার জন্য মহাপ্রসাদ আনীত হইত। প্রথমেই কিন্তু তিনি ইহা স্পর্শ করিতেন না। একটি বিষধর প্রাচীন সর্পের প্রতীক্ষায় তাঁহাকে অপেক্ষা করিতে দেখা যাইত।

কোথা হইতে এই সর্প তাঁহার ভজন কুটিরে ধীরে ধীরে উপনীত হইত, কেহ জানিত না। আশ্চর্য্যের বিষয়, সাপটি প্রসাদের কিছুটা অংশ গ্রহণ না করা পর্য্যন্ত বাবাজী মহারাজ ইহার এক কণাও গলাধঃকরণ করিতেন না।

একদিন সিদ্ধ ভগবানদাসের একজন ভক্ত এই সর্পটিকে যষ্ঠি সাহায্যে তুলিয়া আঙিনার বাহিরে দূরে নিক্ষেপ করেন। এই কথা শুনিয়া বাবাজী মহারাজের দুঃখের পরিসীমা রহিল না। বিষাদখিন্ন হৃদয়ে তিনি তাঁহার ঐ ভক্তটিকে বলিতে লাগিলেন, "উনি হচ্ছেন আমার নামব্রহ্মের বড় ভাই—অনন্তদেব। আর তুমি কিনা আজ তাঁরই সঙ্গে এমন নিষ্ঠুর ব্যবহার করলে ? যাও ! কখনো তুমি আমার এ আশ্রমে আর প্রবেশ ক'রো না।' দীর্ঘকাল ব্যাপিয়া বাবাজী মহারাজের অন্তরে সেদিনকার এই ঘটনাটির করুণ স্মৃতি বর্ত্তমান ছিল, এই দুষ্কৃতিকারীর প্রতি তাঁহার অসন্তোষও সহজে দূরীভূত হয় নাই।

ভজনসিদ্ধি মহাসাধক একান্ত নিষ্ঠা সহকারে সতত তাঁহার ইষ্টের আরাধনায় ব্যাপৃত থাকেন—গভীর রাত্রি পর্যন্ত তাহার জপ তপ অব্যাহত গতিতে চলিতে থাকে। কোন কোন দিন ভজনের সম্যক স্ফুরণ না হইলে ভগবানদাস বাবাজী কোন আহার্য্য বস্তুই গ্রহণ করেন না। কখনো কখনো একাদিক্রমে এইরূপে দুই চারিদিনও কাটিয়া যায়। আবার জপ ও ভজনের ফলে দিব্য আনন্দ ও রসাবেশ সঞ্চারিত হয়। এবার তিনি বালকের মত আহার্য্যের অন্বেষণে হঠাৎ বড় ব্যস্ত ও চঞ্চল হইয়া পড়েন।

গভীর রাত্রে একদিন তিনি ক্ষুধার্ত্ত হইয়া পড়েন। খাবার তখনি কিছু চাই-ই, দ্রুতবেগে তখনই বাজার হইতে নানা প্রকার মিষ্ট দ্রব্যাদি কিনিয়া আনা হয়, তবে তাঁহাকে কোনক্রমে শান্ত করা যায়। আনন্দে উৎফুল্ল সিদ্ধবাবা বিগ্রহের চরণামৃতের ছিটা দিয়া বাজার হইতে সংগৃহীত এই আহার্য্যকে শুদ্ধ করিয়া নেন্, তারপর পরমানন্দে ভোজন করেন।

বাবাজীর জীবপ্রেমের নানা অদ্ভুত দৃশ্য দর্শন করিয়া শিষ্যেরা প্রায়ই বিস্মিত হইয়া যান। কাল্‌নার এই আশ্রমে তাঁহার একটি পোষা প্রিয় বিড়াল আছে। রোজই সে প্রসাদান্নের অংশ গ্রহণ না করিয়া ছাড়ে না। ভজনাবিষ্ট সিদ্ধবাবা যেদিন প্রসাদান্ন ভোজনে দেরী করেন, রোজকার অভ্যাসমত এই বিড়াল তাঁহার চারিদিকে ডাকিয়া ডাকিয়া ঘোরাফেরা করে। বাবাজী থালার ঢাক্‌নাটি খুলিয়া দিলে মার্জ্জারীর পরমানন্দ। মনের সুখে তাহার নিজস্ব অংশটি উদরস্থ করিয়া সে সরিয়া পড়ে। অবশিষ্ট আহার্য্য সিদ্ধবাবা মহারাজ তাঁহার সুবিধামত পরে গ্রহণ করেন।

বাবাজী মহারাজের শুদ্ধাভক্তি ও নিরভিমানতা ছিল অতুলনীয়। একবার প্রভুপাদ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী সিদ্ধ ভগবানদাস বাবাজীকে দর্শন করিতে কাল্‌নায় আসেন। গোস্বামীজী তখন ব্রাহ্মসমাজের এক বিশিষ্ট আচার্য্য। বিজয়কৃষ্ণের পরিচয় পাওয়ামাত্র সিদ্ধবাবা মহারাজ সাষ্টাঙ্গে তাহার চরণে প্রণত হইলেন—গোস্বামী মহাশয় যে তাঁহার পরমারাধ্য শ্রীঅদ্বৈতের বংশোদ্ভব। বিজয়কৃষ্ণ সেদিন শত চেষ্টা সত্ত্বেও প্রণামরত বাবাজীকে নিরস্ত করিতে পারেন নাই।

গোস্বামীজী পথশ্রান্ত, পিপাসার্ত্ত হইয়া আসিয়াছেন। আশ্রমের এক সেবকের নিকট তিনি তাই পানীয় জল চাহিলেন। ভগবানদাস বাবাজী তৎক্ষণাৎ কুটির হইতে ছুটিয়া বাহির হইলেন। নিজের ব্যবহারের করঙ্গখানি সযত্নে মাজিয়া ঘষিয়া উহাতে প্রভুপাদের জন্য জল নিয়া আসিলেন। সঙ্গে সঙ্গে সযত্নে গোস্বামীপাদের জন্য নানাবিধ মিষ্টান্ন প্রসাদেরও ব্যবস্থা করা হইল।

সিদ্ধবাবার এ আচরণ দেখিয়া বিজয়কৃষ্ণ তো অবাক! স্বভাব-সিদ্ধ সরল ভাষায় তিনি বলিয়া বসিলেন, "বাবা, আমি কিন্তু ব্রাহ্ম, আমাকে আপনার করঙ্গ থেকে জল পান করতে দেবেন না। তাছাড়া, আমি জাতি-ভেদও মানি নে—যত্রতত্র যার-তার ছোঁয়া ভাত খেয়ে ঘুরে বেড়াই।"

দৈন্য ও বৈষ্ণবতার প্রতিমূর্ত্তি ভগবানদাস বাবাজী করযোড়ে গোঁসাইজীর সম্মুখে দণ্ডায়মান। স্মিতহাস্যে তিনি কহিতে লাগিলেন, "প্রভু, জাতিবুদ্ধি ও ভেদবোধ থাকতে কি ভক্তিদেবীর কৃপা কখনো হয় ? আপনি এ অধমকে আর পরীক্ষা করবেন না। কৃপা ক'রে জল পান করুন।" সিদ্ধবাবাজী মহারাজ এইখানেই কিন্তু থামিবার পাত্র নহেন। প্রভুপাদ জল পান করিয়া করঙ্গটি নীচে রাখামাত্র ভক্তি-ভরে তিনি শিরে ঠেকাইলেন, তারপর উহার অবশিষ্ট জল পরমানন্দে গলাধঃকরণ করিয়া ফেলিলেন।

উভয়ের এই মিলন সময়ে আশ্রম কুটিরে সেদিন আরও কয়েক-জন অভ্যাগত উপস্থিত ছিলেন। ইহাদের মধ্যে একজন হঠাৎ সেখানে বসিয়া মন্তব্য করেন, "গোস্বামী মশাই দেখছি ব্রাহ্মণ হয়েও পৈতেটি ত্যাগ করছেন!"

বাবাজী তাঁহাকে বাধা দিয়া কোমল কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, "বাবা, ও কথা কখনো বলতে নেই। জানতো আমার অদ্বৈত সন্তানের কি মহিমা! ব্রাহ্ম সমাজে প্রবেশ করেছেন বটে, কিন্তু সেখানেও ঠিক আচার্য্যটি হয়েই বসে আছেন।"

মন্তব্যকারী ব্যক্তিটি এবার আরো বিদ্রূপাত্মক স্বরে বলিয়া উঠিলেন, "কেমন আচার্য্য, তা তো দেখাই যাচ্ছে, জামা-জুতা পরা আধুনিক আচার্য্য!" ভক্তিসিদ্ধ ভগবানদাস বাবাজীর চোখে এইবার অশ্রুরাশি উদ্গত হইল। সখেদে ঐ ভদ্রলোকটিকে কহিতে লাগিলেন, "একথা বলা যে মহা অপরাধ, বাবা! আমাদের প্রভুকে সুন্দর করে সাজানো সে যে আমাদেরই কর্ত্তব্য। অথচ আমরা এমনই দুর্ভাগা যে—তাঁর জন্য কিছুই করতে পারিনি। আর যদিবা তিনি নিজে প্রয়োজনমত কিছুটা সংগ্রহ করে নিয়েছেন, তা দেখে যে আমরা একটু আনন্দ ক'রবো, সে সৌভাগ্যও আমাদের নেই!" সমালোচকের উদ্ধত শির তখন লজ্জায় অবনত হইয়া পড়িয়াছে।

ভগবানদাস বাবাজী মহারাজের ভজননিষ্ঠার খ্যাতি শুধু

কালনায় নয় সমগ্র দেশের দিক্‌দিগন্তে সে সময়ে প্রচারিত। উৎকল দেশ হইতে আগত এই বৈষ্ণব মহাপুরুষ বাংলার জনজীবনের সহিত সেদিন নিতান্ত ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত হইয়া পড়িয়াছেন। শুধু তাহাই নয়, ভজনসিদ্ধি ও নেতৃত্ব শক্তির বলে গৌড়ীয় সমাজের অন্যতম শ্রেষ্ঠ আচার্য্যরূপেও তিনি তৎকালে এদেশে পরিচিত হইয়া উঠিয়াছেন।

রাগানুগা ভজনের নিগূঢ় ধারাপথটি বাহিয়াই সিদ্ধবাবাজীর সাধনা গোপনে অগ্রসর হইয়া চলিত। তাই এই নিষ্কিঞ্চণ ভাবগম্ভীর বৈষ্ণবের বাহ্যাবরণ ভেদ করিয়া সত্যকার রসমধুর স্বরূপটি দর্শনের সৌভাগ্য খুব কম লোকেরই হইত। মধুর ভজনের ভাবোচ্ছ্বাসকে সুসংহত করিয়া রাখিবার শক্তি বাবাজী মহারাজ যেন অতি স্বচ্ছন্দে ধারণ করিতেন —আর ইহাই ছিল তাঁহার সাধন-জীবনের এক পরম বৈশিষ্ট্য।

নিজে কাঙাল বৈষ্ণব হইলে কি হয়, ভগবানদাস বাবাজীর প্রতিষ্ঠা তাঁহার শ্রীবিগ্রহের মাহাত্ম্য দূর-দূরান্ত হইতে শত শত ভক্তকে নিয়ত আকর্ষণ করিয়া আনিত। তাঁহার স্থাপিত শ্রীনামব্রহ্ম ছিলেন এক মহাজাগ্রত বিগ্রহ, বহু ভক্তের আনন্দোৎসব ও ভজনাবেশ এই শ্রীমুর্তিকে কেন্দ্র করিয়া উৎসারিত হইত। পরিপাটি রূপে ইঁহার সেবা অনুঠান করিতে ভক্তদের উৎসাহের অবধি থাকিত না।

একবার আশ্রম হইতে শ্রীনামব্রহ্মের কতকগুলি মূল্যবান আভরণ অপহৃত হয়। বিগ্রহের পূজারী ব্রাহ্মণই গোপনে এই দুষ্কার্য্যটি করিয়া হঠাৎ পলায়ন করে। ইহা নিয়া কালনা শহরে সেদিন আলোড়নের অন্ত নাই। ভক্তেরা সবাই মহা উত্তেজিত। পুলিশের সাহায্যেই অপহৃত স্বর্ণ অলঙ্কারগুলি তাঁহারা উদ্ধার করিতে চাহিতেছেন। কিন্তু বাবাজী তাহাতে একেবারেই সম্মত নহেন। সকলকে প্রবোধ দিয়া তিনি স্মিতহাস্যে কহিতে লাগিলেন, "আহা! তোমরা ব্যস্ত হচ্ছো কেন? শ্রীনামব্রহ্মের অলঙ্কার পরবার হয়তো এখন ইচ্ছে নেই। তাইতো পূজারীকে এগুলো নিয়ে যেতে দিয়েছেন। বেশ তো, এখন কিছুকাল এমনিই থাকুন না!"

ইহার পর কয়েকমাস গত হইয়াছে। হঠাৎ একদিন প্রভাতে দেখা গেল, সেই পলাতক পূজারী ব্রাহ্মণটি আশ্রমে আসিয়া উপস্থিত। একটি পুঁটুলিতে বাঁধিয়া বিগ্রহের সমস্ত অলঙ্কারই সে ফিরাইয়া আনিয়াছে। বাবাজী মহারাজের সম্মুখে ইহা রাখিয়া ভয়ার্ত্ত লোকটি উচ্চস্বরে কাঁদিতে লাগিল। সে স্বীকার করিল, "বাবা লোভে পড়েই শ্রীনামব্রহ্মের এই সমস্ত গহনা নিয়ে আমি পালিয়েছিলাম। কিন্তু শেষকালে এগুলোকে ভেঙে ফেলতে মন চায়নি। অনুতাপে ও প্রাণের অশান্তিতে আমি এতদিন কষ্ট পেয়েছি। এগুলো তাই ফিরিয়ে দিলাম। বাবা, আপনি আমায় ক্ষমা করুন।"

এই অনুতপ্ত, ক্রন্দনরত ব্রাহ্মণকেসিদ্ধ বাবা আশ্বস্ত করিলেন। তারপর জগদীশ বাবা প্রভৃতি অন্তরঙ্গ ভক্ত-সেবকদের ডাকিয়া কহিলেন, "এই দেখ আর এক কাণ্ড। শ্রীনামব্রহ্মের আবার অলঙ্কার পরবার ইচ্ছে হয়েছে। তাই তো আবার ওসব আনিয়ে নিলেন। ফচ্‌কে ফচ্‌কে। চিরকালেয় ফচ্‌কে। কখন তাঁর কি ইচ্ছে হয় কিছুই ঠিক নেই। যাও, এখনি ওসব নিয়ে যাও; আবার সব গয়না পরিয়ে দাও!" বলা বাহুল্য, দুষ্কৃতিকারী মন্দিরপূজারী আবার তাহার পুরাতন পদে নিযুক্ত হইল।

অলৌকিক শক্তিসমূহের প্রকাশ সিদ্ধবাবাজীর মহাজীবনে দিনের পর দিন দেখা গিয়াছে। কিন্তু সাধারণতঃ নিজে তিনি ইহা সতর্কভাবে গোপন করিয়া রাখিতেই চাহিতেন। ভক্ত ও শিষ্যদের জীবনে অকপট ভজননিষ্ঠা ও শুদ্ধাচারী জীবনের আদর্শকে রূপায়িত করার উপরই তিনি জোর দিতেন বেশী। শিষ্যদের পক্ষে কোন লৌকিক কর্ত্তব্য ও আচরণের ব্যতিক্রম জন্মাইবার উপায় ছিল না। ভাবের ঘরে চুরি করিতে গেলে দুর্ব্বল সাধককে সিদ্ধবাবার উদ্যত নির্ম্মম আঘাত অনিবার্য্যরূপে সহ্য করিতে হইত।

একবার বিষ্ণুদাস নামে আশ্রমের এক শিষ্য জ্বরে আক্রান্ত হয়। অসুখ সারিবার কোন চিহ্ন তো নাই-ই, বরং কেবলই তাহা বৃদ্ধির

দিকে যাইতেছে। ভগবানদাস বাবাজী ব্যস্ত সমস্ত হইয়া রোগীকে ডাকিয়া কহিলেন, "ওরে বিষ্ণুদাস, তোর জ্বর তো সারছে না; ডাক্তারকে দেখিয়ে কিছু ওষুধ-পত্র খা না ?"

বিষ্ণুদাস এক স্বভাবভক্ত সাধক। সবিনয়ে উত্তর দিলেন, "আজ্ঞে ওষুধ-টষুধ কি আর খাবো, ওতে কি-ইবা হবে ? নামব্রহ্মের কৃপায়ই ভাল হয়ে যাবো।"

বাবাজী মহারাজ রোষে জ্বলিয়া উঠিলেন। কহিলেন, "হ্যাঁ, যেন আজই তুই এক মস্ত সিদ্ধ পুরুষ হয়ে গিয়েছিস্, আর শ্রীনামব্রহ্মকে আজ তোর জন্য ডাক্তার হতে হবে। রোগ হয়েছে— ঔষধপত্র খা, তবে তো ? এসব প্রায়শ্চিত্তের অন্তর্গত—এটা জেনে রাখবি। যা কিছু কর্ত্তব্য তোর করবার, তার জন্য শ্রীনামব্রহ্মের উপর ভার দিবি কেন বল্ দেখি ?" বিষ্ণুদাসজীকে গুরুদেবের নির্দ্দেশ অনুসারে চিকিৎসকের ঔষধ পত্র খাইতেই হইল। ইহার পর অতি সত্বর তিনি সুস্থ হইয়াও উঠিলেন।

এক এক সময়ে সিদ্ধ বাবাজীর বড় বিচিত্র এবং বালকোচিত ঝোঁক চাপিত। একবার তাঁহার অদ্ভুত খেয়াল হয়, তিনি শ্রীনামব্রহ্মের আঙিনার সম্মুখে এক পুষ্করিণী খনন করাইবেন, তারপর তাহাতে এক 'টুঙ্গি' বা মঞ্চ বাঁধিয়া শ্রীবিগ্রহের সম্মুখে ধ্যান জপে নিবিষ্ট হইবেন।

আদেশ হইল, "কাল ভোরবেলা থেকেই লোকজন লাগিয়ে অবিলম্বে এক পুকুর খোঁড়াও।" ভক্ত ও শিষ্যগণ তখনি কর্ম্মতৎপর হইলেন। বহু মজুর নিযুক্ত করিয়া চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে আশ্রমে একটি পুকুর খনন করা হইয়া গেল। বাঁশের এক উঁচু টুঙ্গি বাঁধিতেও দেরী হইল না।

সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া বাবাজী মহারাজের আনন্দের সীমা নাই। পরম উৎসাহের সহিত তিনি এই নবরচিত বংশমঞ্চে উঠিয়া ভজন আরম্ভ করিলেন। কিন্তু এক আকস্মিক ঘটনায় তাঁহার পরিকল্পনাটি

বিপর্যস্ত হইয়া গেল। সিদ্ধবাবাজী মহারাজ কয়েকদিন এখানে বসিয়া ভজনরত রহিয়াছেন। হঠাৎ সেদিন লক্ষ্য করিলেন, একটি গোবৎস তীর হইতে পা ফস্‌কাইয়া পুকুরের জলে পড়িয়া গেল। সে কি? শেষে কি এখানে গোবধ হইবে? বাবাজী মহারাজ তখনই উচ্চ সোরগোল আরম্ভ করিয়া দিলেন। তাঁহার চীৎকারে ভক্তদের ভীড় জমিয়া গেল, সকলে মিলিয়া ঐ বাছুরটিকে জল হইতে উত্তোলন করিলেন। কোনক্রমে সেদিন জীবটির প্রাণ রক্ষা হইল।

যে বিচিত্র খেয়াল বাবাজীর মনে উদ্গত হইয়াছিল, এবার তাহা তিরোহিত হইয়াছে! মৃতকল্প গোবৎসটির এই দুর্দ্দশা সমস্ত ব্যবস্থাকে উল্টাইয়া দিয়াছে। জগদীশ, প্রাণকৃষ্ণ বাবা প্রভৃতি ভক্তদের ডাকিয়া সিদ্ধবাবাজী তৎক্ষণাৎ আদেশ দিলেন, "ওরে, আর আমার পুকুরে বসে ভজন ক'রে কাজ নেই। এবার এখনি এটাকে তোরা বুঁজিয়ে ফেল। শেষকালে কি গোবধের পাপে লিপ্ত হবো?" যেমন ক্ষিপ্রগতিতে পুষ্করিণী খনন করা হইয়াছিল, তেমনিভাবে আবার উহা ভরাট হইয়া গেল!

আশ্রমের সেবকরা রান্নার জন্য কাষ্ঠ ক্রয় করেন। ইহার বাজারে মূল্য, প্রতি বোঝায় তিন আনা। কিন্তু স্থানীয় এক বৃদ্ধা কাষ্ঠ-বিক্রেত্রীকে নিয়া সকলকে বড় বিব্রত হইতে হয়। ভগবানদাস বাবাজী সেদিন কাঠের বোঝার জন্য তাহাকে তিন আনা দিতে দেখিয়া থমকিয়া দাঁড়াইলেন। নানা প্রশ্ন করিয়া জানিলেন, এই বৃদ্ধার ঘরে কয়েকটি পোষ্য রহিয়াছে, অথচ অন্নের কোন সংস্থান নাই। বাবাজী মহারাজ অমনি অগ্নিশর্ম্মা হইয়া উঠিলেন, "এ তোমাদের কেমন কথা? তিন আনায় এর সংসার কি করে চলবে? এর এতগুলো পোষ্য—একে দ্বিগুণ করে দাম দিতে হবে।" আদেশ পালিত হয় বটে, কিন্তু আশ্রমের সেবকগণ পারতপক্ষে এই কাষ্ঠবিক্রেত্রীকে আর বাবাজী মহারাজের সামনে পড়িতে দিতে চাহিতেন না।

সিদ্ধ ভগবানদাসের সমসাময়িক কালের নবদ্বীপ ধামের

চৈতন্যদাস বাবাজীরও খুব প্রসিদ্ধি ছিল। দুই মহাপুরুষের মিলনে অপরূপ আনন্দরস উদ্বেলিত হইয়া উঠিত। প্রেমলীলা ও কৃত্রিম কোপ প্রকাশের মধ্য দিয়া উভয়ে এ মিলনকে এক মনোজ্ঞ প্রেম-নাট্যে রূপায়িত করিয়া তুলিতেন।

ভাব-গাম্ভীর্য্যের প্রতিমূর্ত্তি, সিদ্ধ ভগবানদাস কিন্তু বহিরঙ্গ জীবনে এই চৈতন্যদাস বাবাজী হইতে এক ভিন্নতর ভঙ্গিমায়ই চলাফেরা করিতেন। চৈতন্যদাস বাবাজীর সখীবেশ, রসানুভূতির উচ্ছৃঙ্খলতা ও উন্মাদনার প্রতি কৃত্রিম কটাক্ষ করিয়া ভগবানদাস বাবাজীকে প্রায়ই সকৌতুকে বলিতে শুনা যাইত, "ফচ্‌কে ফচ্‌কে —একেবারে নির্লজ্জ, ফচ্‌কে।" অথচ চৈতন্যদাস বাবাজীর সহিত সিদ্ধবাবার সখ্য ও অন্তরঙ্গতার সীমা ছিল না।

সেবার ভগবানদাস বাবাজী মহারাজ কাল্‌না হইতে নবদ্বীপে আসিয়াছেন। প্রধান উদ্দেশ্য, শ্রীমান্ মহাপ্রভুর মন্দিরে গৌরসুন্দরের সদাজাগ্রত মোহনমূর্ত্তিটি দর্শন করা। এই উপলক্ষে চৈতন্যদাস বাবাজীর সহিত সাক্ষাৎ হইবে, ইহাও তিনি জানেন। কারণ, চৈতন্যদাস বাবাজী তৎকালে মহাপ্রভুর মন্দিরের একটি নির্জ্জন কুটিরে তাঁহার রাগানুগাসাধনে একান্তভাবে মগ্ন থাকেন।

ভগবানদাস বাবাজী মন্দিরে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, গৌর-প্রেমিক, সদা ভাবোন্মত্ত চৈতন্যদাস আঙিনাটি ঝাঁট দিতেছেন। বহু ভক্তজন পরিবৃত ভগবানদাস বাবাজীকে দেখিয়াই চৈতন্যদাস সেদিন এক অদ্ভুত আচরণ দেখাইলেন। হস্তস্থিত সম্মার্জ্জনীটি উঠাইয়া তিনি ছুটিয়া আসিলেন। তারপর ভগবানদাসজীকে উদ্দেশ্য করিয়া কোপভরে কহিতে লাগিলেন, "তুই বুঝি আমার প্রাণবল্লভকে ভুলিয়ে নিয়ে যেতে এসেছিস। এই মুহূর্ত্তে বের হয়ে যা—নইলে তোকে ঝাঁটাপেটা করে ছাড়বো।" উপস্থিত বৈষ্ণবমণ্ডলী তো বিস্ময়ে হতবাক্। নবদ্বীপে আগত সম্মানীয় অতিথি, সিদ্ধ ভগবানদাস বাবাজীর প্রতি একি অদ্ভুত অপমানকর ব্যবহার? সকলে ক্ষুব্ধও হইলেন।

বাবাজী মহারাজ কিন্তু অচঞ্চলভাবে আঙ্গিনায় দাঁড়াইয়া তখন মৃদু মধুর হাসি হাসিতেছেন। অতঃপর চৈতন্যদাসজীর ভাবে বিভাবিত হইয়া তিনিও কহিতে লাগিলেন, "ওগো, তুমি আমার ওপর শুধু শুধু এত রাগ করছো কেন? আমি তো তোমার প্রাণবল্লভকে নদীয়া ত্যাগ করাতে চাইনে। কিন্তু তিনি যে লুকিয়ে লুকিয়ে তোমার অগোচরে নিজে প্রায়ই কালনায় চলে যান। তুমি বরং তাঁর দিকেই আরো একটু বেশী দৃষ্টি রেখো।"

চৈতন্যদাস এবার অভিমানহত হইয়া মন্দিরে ঢুকিলেন ও সশব্দে দ্বারটি রুদ্ধ করিয়া দিলেন। বাহিরের জনতার কাণে তখন শোকে মুহ্যমান মহাপ্রেমিক চৈতন্যদাসের মর্ম্মভেদী আর্ত্তি কেবলি ভাসিয়া আসিতেছে। কিছুক্ষণ পর সুস্থ হইয়া চৈতন্যদাস বাবাজী মন্দির হইতে বাহির হইয়া আসিলেন। এইবার তিনি পরম সুহৃদ ভগবানদাসের হস্তটি ধারণ করিয়া তাঁহাকে মন্দিরের অভ্যন্তরে নিয়া গেলেন। দুই প্রেমিকের আনন্দনর্ত্তনে সেখানে প্রেমের বন্যা প্রবাহিত হইল।

সিদ্ধবাবা ভগবানদাসের আচার-আচরণে রসাবেশের চাঞ্চল্য বড় কম দেখা যাইত। রাগানুগা ভজনের তিনি ছিলেন এক বিশিষ্ট সাধক, কিন্তু প্রেমোচ্ছল রসধারাকে তাঁহার বহিরঙ্গ জীবনে যখন তখন উপচিয়া পড়িতে খুব কম লোকেই দেখিয়াছে। কিন্তু এই অন্তর্ম্মুখীন প্রেমের প্রবাহকে ভগবানদাস তাঁহার ভাগ্যবান শিষ্যদের সাধনজীবনে অবলীলায় সঞ্চালিত করিয়া দিতে পারিতেন। নিগূঢ় প্রেমরসের এই ধারাকে ধারণ করা অনেকের পক্ষেই হয়তো সহজ ছিল না, তাই অল্প-সংখ্যক অন্তরঙ্গ শিষ্যই তাঁহার নিকট হইতে এ পরম বস্তু প্রাপ্ত হন। বৈষ্ণব সাধনার বহিরঙ্গ স্তরেও সিদ্ধ বাবাজীর অবদান কম ছিল না। ভজন ও সেবার আদর্শটি এই সমর্থ আচার্য এক অপরূপ মহিমায় বিস্তারিত করিয়া দিয়া যান। নিত্যলীলায় প্রবিষ্ট না হওয়া অবধি এ ব্রত উদ্‌যাপনে তাঁহার কোনদিন ত্রুটি হয় নাই!

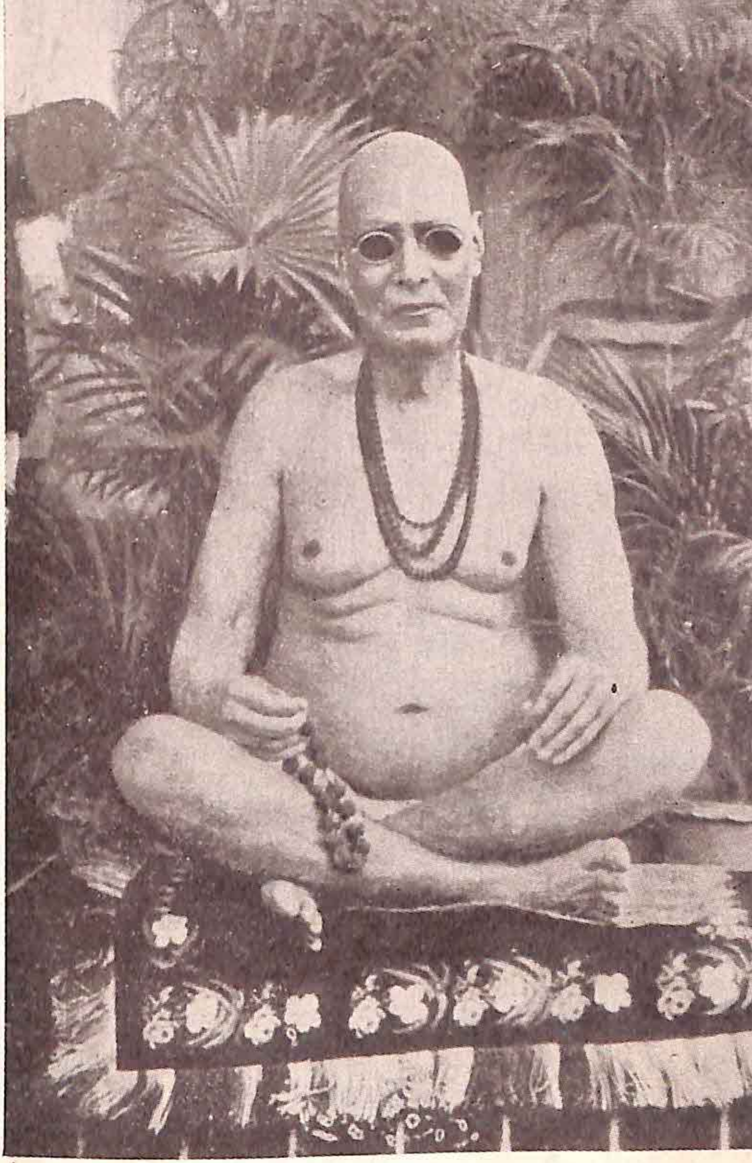
শ্রীভোলানন্দ গিরি

কুরুক্ষেত্রের প্রান্তর ঘিরিয়া সন্ধ্যার অন্ধকার ধীরে ধীরে আসিতেছে নামিয়া। দিক্‌চক্রবালে অস্তমান সূর্য্যের শেষ রেখাটুকুও বিলীন প্রায়। পথচারী সংসারবিরাগী যুবক ভোলাদাস এ সময়ে দ্রুতপদে ছুটিয়া চলিয়াছেন। অন্ধকার আরো গাঢ় হইবার আগেই যে তাঁহাকে পস্তানা গ্রামে পৌঁছিতে হইবে। যোগীবর গোলাপগিরিজীর প্রসিদ্ধ আশ্রম ও মহাপুরুষের চরাণাশ্রই আজ তাঁহার লক্ষ্য। সেই দিকেই ব্যগ্রভাবে তিনি ছুটিয়া চলিয়াছেন।

সর্ব্বময়কে লাভ করার আশায় যুবক ভোলাদাস আজ সর্ব্বস্বত্যাগী। জীবনের প্রথম কাল হইতেই বৈরাগ্যের যে হাতছানি তাঁহাকে নিরন্তর চঞ্চল করিয়া তুলিত তাহারই অমোঘ আহ্বান আজ আসিয়া গিয়াছে। এ আহ্বান এড়াইবার আর উপায় কই ?

পাঞ্জাবের মালের কোট্‌লাস্থিত খুরদা গ্রামে ভোলাদাসের বাস। পদব্রজেই সমস্তটা পথ তিনি অতিক্রম করিয়া আসিয়াছেন। পস্তানা এখান হইতে আরো আড়াই ক্রোশ দূরে। সেখানে পৌঁছিয়া যোগীগুরুর চরণে চিরতরে আত্মসমর্পণ না করিতে পারিলে তাঁহার শান্তি নাই।

প্রাসাদোপম এক অট্টালিকায় গিরি মহারাজের বাস। চৌদ্দশত গাভী ও পাঁচশত মহিষ সহ বিস্তীর্ণ ভূমির তিনি মালিক। ভক্ত ও সাধক শিষ্যের সংখ্যাও তাঁহার এখানে কম নয়। শিবকল্প মহাতপস্বীরূপে সারা কুরুক্ষেত্র অঞ্চলে গোলাপগিরিজীর খ্যাতির অন্ত নাই। যোগ ও ভোগের যুগ্ম-রশ্মিকে এই অধ্যাত্ম-মহারথী নিতান্ত অবলীলায় যেন ধারণ করিয়া রহিয়াছেন। আগ্রহ-অধীর ভোলাদাস সে রাত্রিতে এই রাজসন্ন্যাসীর দরবারে কম্পিত হৃদয়ে প্রবেশ করিলেন।



ভোলাগিরি মহারাজ

গোলাপগিরি মহারাজের বয়স আশী পার হইয়া গিয়াছে, কিন্তু যোগীদেহে বার্দ্ধক্যের ক্ষীণতম চিহ্নও নাই। দীর্ঘায়ত সুন্দর সুঠাম দেহখানিতে লাবণ্যশ্রী টলমল করিতেছে। পরম প্রাপ্তির মহিমায় আননখানি সদা হাস্যোজ্জ্বল। নয়ন হইতে দিব্য আনন্দের জ্যোতি সতত বিচ্ছুরিত হইতেছে। সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া ভোলাদাস উঠিয়া দাঁড়াইলেন। যুক্ত করে যোগীবরের পরমাশ্রয় প্রার্থনা করিয়া তিনি হৃদয়ের আকুতি জানাইলেন। মহাপুরুষের প্রসন্ন-উজ্জ্বল দৃষ্টি তখন এই অনিন্দ্যসুন্দর তরুণের সারা দেহে মনে সান্ত্বনার এক অমৃত প্রলেপ বুলাইয়া ফিরিতেছিল।

মুমুক্ষু ভোলাদাসকে গোলাপগিরি মহারাজ গ্রহণ করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে ইহা উপলব্ধি করিতেও তাঁহার বিলম্ব হইল না, সাধন-গ্রহণেচ্ছু বিংশতি বর্ষীয় এই তরুণ এক ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নি—উত্তরজীবনে ইহারই আলোক-উদ্ভাসন অগণিত অধ্যাত্ম-সাধককে দেখাইবে পরম পথের সন্ধান।

ভোলাদাস এই যোগীগুরুর নিকট সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেন—তাঁহার নব নামকরণ হইল নারায়ণ গিরি। উত্তরকালে সর্ব্বসাধারণ্যে শ্রীমৎ ভোলানন্দ গিরি নামেই কিন্তু তিনি সুপরিচিত হইয়া উঠেন। অতুলনীয় ঋদ্ধি ও সিদ্ধির অধিকারী হইয়া বিরাট ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষরূপে সমগ্র ভারতের শ্রদ্ধা অর্জ্জনে তিনি সমর্থ হন।

আশ্রমে প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গেই গুরুজী আজ্ঞা দিলেন, নব দীক্ষিত শিষ্যকে প্রতিদিন গোচারণে বাহির হইতে হইবে। আশ্রমের শত শত গাভী ও মহিষগুলির রক্ষণাবেক্ষণ করে যুবক শিষ্যের দল। আর এই কর্ত্তব্য সাধনের মধ্য দিয়াই গোলাপগিরিজী তাঁহার শিষ্যদের নিষ্ঠা ও ত্যাগ-তিতিক্ষার মূল্য নিরূপণ করেন। কঠোর পরিশ্রমী ভোলানন্দকে বেশী দিন কিন্তু এই পরীক্ষা দিতে হয় নাই।

গুরুদেব তাহার সাধনার জন্যও এক নির্দ্দিষ্ট কর্ম্মসূচী প্রস্তুত

করিয়া দিলেন। রাত্রি তিনটায় শয্যাত্যাগ করিয়া তরুণ শিষ্য সাধনায় প্রবৃত্ত হইতেন। আশ্রমের শিব পূজার ভার তাঁহার উপরই ন্যস্ত হইল। ইহার উপর গুরুজী এবং আশ্রমের শিষ্য ও অতিথি অভ্যাগতদের আহার্য্য তাঁহাকে প্রস্তুত করিতে হইত। এক মণ দুগ্ধ মন্থন করিয়া মাখন তোলা ছিল তাঁহার নিত্যকার এক বড় কাজ। তদুপরি রাত্রিতে আবার পূজা, আরতি ও সাধন ভজন নির্দ্দিষ্ট ছিল। শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠা সহকারে ভোলানন্দ তাঁহার এই কর্ত্তব্যগুলি রোজ সম্পন্ন করিতেন। ইহা সত্ত্বেও গুরুদেবের শাসনের কঠোরতা কমিতে দেখা যাইত না। বিন্দুমাত্র শৈথিল্যের কোনরূপ ক্ষমা তো ছিলই না অযথা ভৎর্সনা ও নির্য্যাতনে তিনি শিষ্যদের সদাই ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিতেন। গোলাপগিরিজীর এই আপাতকঠোর ব্যবহারের আড়ালে সঙ্গোপিত ছিল এক কল্যাণময় শুভেচ্ছার ধারা।

শিষ্যদের পরিশুদ্ধির জন্যই যে তাঁহার এ শাসন ও তিরস্কার ইহা উপলব্ধি করিতে কিন্তু সাধক ভোলানন্দের বিলম্ব হয় নাই। তাই এই নিগ্রহকে তিনি গুরুর অনুগ্রহ রূপেই মনে করিতেন, অম্লানবদনে সর্ব্বদা সব কিছু সহ্য করিতেন।

উত্তরকালে গুরুর শাসন কাহিনীর প্রসঙ্গে ভোলাগিরিকে বলিতে শুনা যাইত, "আমি আর শিষ্যদের তেমন শাসন করি কই? এরা তো দুর্ব্বল! সামান্য কটু বাক্যের আঘাতে সহজে এলিয়ে পড়ে। আমার গুরুজী বিনা কারণে সর্ব্বদা আমায় কি কঠোর ভৎর্সনাই না করতেন! গোড়ার দিকে মনে বড় দুঃখ হ'ত। পরে কিন্তু বুঝে ফেল্‌লাম—আমার ভক্তির দৃঢ়তা ও গুরুনিষ্ঠা পরীক্ষার জন্যই তাঁর যে এ রূঢ় আচরণ। কঠোর শাসনের ভেতর দিয়ে এ ছিল এক প্রচ্ছন্ন কৃপা। তাছাড়া, ভাবতাম, কটু কথা বা শব্দও তো মিথ্যা—মায়া, এর ফলে কেন আমার হৃদয়ের শান্তি নষ্ট হ'তে দেব? তখন থেকে গুরুমহারাজের কঠোর কথা শুনে আমি বরং গোপনে হাস্‌তাম! কিন্তু বড় আশ্চর্য্যের কথা, এভাবে আমাকে

হাসতে দেখে গুরুজী অতঃপর আর কটুবাক্য সহসা বলতেন না।"

একবার এক তীব্র শীতের রাতে গোলাপগিরিজী অকস্মাৎ ভোলানন্দের উপর কেন যেন কূপিত হইয়া উঠিলেন। ক্রুদ্ধ কণ্ঠে তরুণশিষ্যকে কহিলেন, "ভোলা, তুই এই মুহূর্ত্তে শুধু এক কৌপীন প'রে আশ্রম থেকে দূর হয়ে যা, তোর মত অপদার্থ শিষ্যকে দিয়ে আমার কোন কাজ নেই, আজ থেকে আমার বা আমার আশ্রমের সাথে তোর কোন সম্পর্ক নেই।"

এ আদেশ যে বিনা মেঘে বজ্রপাত! জ্ঞাতসারে ভোলানন্দ গুরুর চরণে কোন অপরাধ করিয়াছেন বলিয়া তো স্মরণে আসিতেছে না। যাই হোক, আদেশ লঙ্ঘন করিবার দুঃসাহসও তাঁহার নাই। 'জয় গুরুজী' ধ্বনি উচ্চারণ করিয়া ভোলানন্দ আশ্রম সীমানা ত্যাগ করিলেন রাস্তায় আসিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন।

মাঘের প্রচণ্ড শীত। অথচ সন্ন্যাসী ভোলানন্দের পরিধানে রহিয়াছে শুধু একখানি সরু কৌপীন। সমগ্র দেহটি অনাবৃত, আশ্রমপ্রদত্ত কোন আচ্ছাদনই তিনি সঙ্গে নিতে পারেন নাই। উদ্গত অশ্রু চাপিয়া ভোলাগিরিজী ভাবিতে বসিলেন, যাঁহার জন্য তিনি সর্ব্বস্ব ছাড়িয়া আসিয়াছেন, আজ তাঁহার চরণাশ্রয় হইতে বিচ্যুত হইয়া কোথায় গিয়া দাঁড়াইবেন? জাগতিক যে বন্ধনসমূহ নিজ হাতে কাটিয়া ঘরের বাহির হইয়াছেন আজ তো তাহা নিঃশেষিত প্রায়। তাঁহার জীবন মরণের প্রভু এই গুরুদেব। তিনি ছাড়া এই বিশাল জগতে আপনার বলিবার আর কে আছে?

আশ্রমের বাহিরে গিয়াই চরণ কিন্তু থামিয়া গেল। শীতে কাঁপিতে কাঁপিতে সেইখানেই তিনি সারা রাত্রি অপেক্ষমান রহিলেন। অন্তরে চিন্তার ধারা বহিতে লাগিল,—এই দেহ শ্রীগুরুতে সমর্পিত, তাঁহারই আদেশে এই প্রাণান্তর শীতে তিনি কৌপীনবস্ত হইয়া বাহির হইয়াছেন। এ দেহ রক্ষা করিবার হইলে গুরুদেবই তাহা করিবেন। তাছাড়া, এ ভঙ্গুর বস্তু বিনষ্ট হইলেই

বা ক্ষতি কি ? এ রক্তমাংসের খাঁচাটার জন্য অনর্থক মমত্ববোধই বা কেন ?

দুঃসহ শীতের রাত্রি কোনমতে প্রভাত হইল। তখন ভোলানন্দের দেহ ঠাণ্ডায় জমিয়া যাইবার মত হইয়াছে। সকাল বেলায় আশ্রম সীমানার বাহিরে আসিয়া গোলাপগিরিজী শিষ্যকে যুক্তকরে দণ্ডায়মান দেখিলেন। গম্ভীর কণ্ঠে কহিলেন, 'যা, এবার আশ্রমে গিয়ে কাপড়-চোপড় পরে শিবপূজো সমাপন কর।'

বহু সংখ্যক ভক্ত ও শিষ্যের মধ্যে সাধক ভোলানন্দ গুরুদেবের বিশেষ স্নেহ এবং কৃপালাভে সমর্থ হন। শক্তিমান যোগী গোলাপ-গিরিজীর অসামান্য ধারা এই কৃপার কৃচ্ছ্রব্রতী তরুণ শিষ্যের শিরে অজস্র ধারে বর্ষিত হইতে থাকে। সাধনা, শাস্ত্র অধ্যয়ন ও গুরুজীর সেবায় পস্তানা আশ্রমে ভোলানন্দ দীর্ঘ দ্বাদশ বৎসর অতিবাহিত করেন ইহার পর গুরু একদিন তাঁহাকে ডাকিয়া কহিলেন, 'ভোলা একবার তোর জন্মভূমিতে গিয়ে জননীকে প্রণাম করে আয়—কিন্তু দেখিস—মায়ের কাছে পরিচয়টি যেন প্রকাশ না পায়।'

ভোলানন্দের অন্তরপটে বিস্মৃতপ্রায় পুরাতন স্মৃতি ভাসিয়া উঠিতে থাকে। দীর্ঘদিন পূর্ব্বে তাঁহার প্রপিতামহ ভক্তপ্রবর ভাইসাওন এই খুরদা গ্রামে আসিয়া বাস স্থাপন করেন। ইঁহারা ছিলেন সারস্বত শ্রেণীর ব্রাহ্মণ। এই বংশেই এক পরম নিষ্ঠাবান সন্তান, ব্রহ্মদাসের দ্বিতীয় পুত্ররূপে শিবপ্রতিম মহাসাধক ভোলাগিরি আবির্ভূত হন।

ব্রহ্মদাসজী এবং তাঁহার পত্নী নন্দা দেবীর শিবারাধনায় বড় নিষ্ঠা ছিল। সংসারে কোনদিনই তেমন অর্থস্বাচ্ছল্য নাই তবুও সাধু সন্ন্যাসীর সেবায় ভক্ত দম্পতির উৎসাহের অবধি ছিল না।

এই শুদ্ধসত্ত্ব পরিবারের পুত্র কন্যাদের বৈশিষ্ট্যও বড় চমৎকার। প্রথম সন্তানের নাম রতনদাস, পিতা মাতার সে পরম আদরের ধন। কিন্তু শৈশব হইতে এক বৈরাগ্য-সংস্কার নিয়াই যেন সে জন্মিয়াছে।

কৈশোর অতিক্রান্ত হইবার সঙ্গে সঙ্গে বিষয়-বিরক্ত রতনদাস এক রাত্রিতে ঘর ছাড়িয়া কোথায় চলিয়া গেল—অতঃপর আর তাহার সন্ধান মিলে না। দ্বিতীয় পুত্র ভারত বিখ্যাত মহাপুরুষ ভোলাগিরি মহারাজ। তৃতীয়ের নাম শঙ্করদাসজী—অল্প বয়সে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া স্বামী শঙ্করানন্দ নামে তিনি পরিচিত হন। তাছাড়া, এক বিশিষ্ট মঠাধীশরূপেও তিনি কম খ্যাতি অর্জ্জন করেন নাই। বৈরাগ্যপ্রবণ মানসিকতাই ছিল খুরদার এই ব্রাহ্মণ পরিবারের বিশেষত্ব। ভোলানন্দের সহজাত বৈরাগ্য ও মুমুক্ষা বীজাকারে তাঁহার বংশধারার মধ্যেই নিহিত দেখা যায়।

প্রথম পুত্র রতনদাস কিছুদিন পূর্ব্বে সংসার ত্যাগ করিয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছেন। ব্রহ্মদাস এবং নন্দা দেবীর হৃদয়ে তাই সদাই জ্বলে অশান্তির দহন-জ্বালা।

শিব পূজায় বসিয়া সন্তানবিচ্ছেদবিধুরা জননী অন্তরে শান্তি খুঁজিয়া পান না—ইষ্টের চরণে শুধু মাথা খুঁড়িয়া মরেন।

এক নিশীথে নন্দাদেবী বিচিত্র স্বপ্ন দেখিলেন। দেবাদিদেব শঙ্কর তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া কহিতেছেন, 'আমি তোমার ও তোমার স্বামীর ভক্তি ও নিষ্ঠায় পরম প্রীত হইয়াছি। পুত্র রতনদাস সন্ন্যাসী হইয়াছে, কিন্তু সেজন্য তোমার শোক কেন? সে তো গৌরবেরই কথা। আমি প্রসন্ন হয়ে বর দিচ্ছি—তোমরা আরো তিনটি পুত্র লাভ করবে। এদের প্রথমটি হবে এক বৈরাগ্যবান মহাপুরুষ, দ্বিতীয়টি তাঁরই পদাঙ্ক অনুসরণ করবে। তৃতীয়টিকেই শুধু তোমরা সংসারে পাবে।'

শিবজীর জ্যোতির্ম্মণ্ডিত মূর্ত্তিটি অকস্মাৎ অন্তর্হিত হইয়া গেল। নন্দা দেবী ত্রস্তেব্যস্তে শয্যায় উঠিয়া বসিলেন! স্বামীকে জাগাইয়া তুলিয়া স্বপ্নকথাটি তখনই বলিতে দেরী হইল না।

এ অলৌকিক স্বপ্ন শীঘ্রই সফল হয়—১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দে ব্রহ্মদাস ও নন্দা দেবীর এক পরম সুন্দর শিশু ভূমিষ্ঠ হয়। এই নবজাতকই

আমাদের ভোলাগিরি মহারাজ। দেবাদিদেবের বর পুরাপুরিই ফলিয়া গিয়াছিল। ভোলানন্দের পরবর্তী ভ্রাতা তাঁহার জ্যেষ্ঠদের মতই সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। শুধু কনিষ্ঠ ভ্রাতা সুন্দরদাসজীই গৃহীরূপে বাস করিয়া পিতামাতার সেবা করিয়া যান।

গুরুর আদেশ—গর্ভধারিণী জননীর চরণবন্দন ও জন্মভূমি দর্শন করিয়া আসিতে হইবে। সন্ন্যাসী ভোলানন্দ অবিলম্বে তাই খুরদা গ্রামে আসিয়া উপস্থিত হন। বাল্য, কৈশোর ও যৌবনের নানা স্মৃতি বিজড়িত এই তাঁহার চির-প্রিয় গ্রাম। ধীরে ধীরে তিনি ব্রহ্মদাসের গৃহাঙ্গনে উপনীত হন। 'শিবশঙ্কর' বলিয়া উচ্চরবে ভিক্ষা মাগিতেই সম্মুখে আসিয়া দাঁড়ান তাঁহার জননী।

ভিক্ষা গ্রহণের পরেই দণ্ডকমণ্ডলুধারী সন্ন্যাসীর একি অদ্ভুতকাণ্ড! নন্দা দেবীর চরণে তিনি সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিয়া বসিলেন। ভীত সন্ত্রস্ত হইয়া তিনি অনুযোগ দিতে লাগিলেন, 'ছি-ছি বাবা, আপনি সন্ন্যাসী সর্ব্বজনের প্রণম্য। এভাবে প্রণাম ক'রে কেন আপনি পাপের মাত্রা বাড়ালেন!'

'ভয় নেই। মাতৃবুদ্ধিতেই এ প্রণাম করেছি, এতে আপনার কোন পাপ হবে না।' কথা কয়টি বলিয়াই তিনি দ্রুতপদে স্থানত্যাগ করিলেন। দীর্ঘদিন পরে জননীর সান্নিধ্যে আসিয়াও আত্মপরিচয় উদ্‌ঘাটন করিলেন না। অন্তরে উদ্‌গত ভাবরাশি চাপিয়া গুরুজীর আজ্ঞাই তিনি পালন করিয়া গেলেন।

সৌম্য, প্রিয়দর্শন তরুণ সাধুটিকে দেখিয়া নন্দা দেবীর বড় ভাল লাগিতেছিল। অপূর্ব্ব মমত্ববোধ, আনন্দময় অনুভূতিতে তাঁহার মাতৃহৃদয় একেবারে ভরিয়া উঠিয়াছে। সন্ন্যাসীর উপস্থিতি যেন এতক্ষণ তাঁহাকে মোহগ্রস্ত করিয়া রাখিয়াছে। এইবার তাঁহার অদর্শনের সঙ্গে সঙ্গে কি এক অজ্ঞাত কারণে তাঁহার সমস্ত অন্তর আলোড়িত হইয়া উঠিল। প্রিয়তম পুত্র ভোলাদাসের মুখখানিই আজ কেন স্মৃতিমন্থনের মধ্যে দিয়া মানসপটে বারবার ভাসিয়া

উঠিতে চায় ? নন্দা দেবী চমকিয়া উঠিলেন। তাইতো! কে এই যুবক সন্ন্যাসী যে আজ তাঁহার সর্ব্বসত্তায় এমন প্রচণ্ড সাড়া দিয়া চলিয়া গেল? তাঁহার পরাণপুতলী ভোলাদাস নয় তো? মনে হইতে লাগিল, এই সন্ন্যাসীর সহিত যে তাঁহার ভোলাদাসের চেহারার অনেকটা সাদৃশ্য রহিয়াছে। পুত্রের বিয়োগব্যাথা মাতৃহৃদয়ে আজ দ্বিগুণভাবে জাগিয়া উঠিল। শোকাভিভূতা জননী এবার অঙ্গনে মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িলেন।

পস্তানা আশ্রমে গুরুর আশ্রয়ে ভোলানন্দকে একাদিক্রমে বার বৎসর কৃচ্ছ্রব্রত ও সাধনায় নিযুক্ত থাকিতে হয়। অতঃপর গোলাপ-গিরিজী একদিন তাঁহাকে ডাকিয়া কহিলেন, "ভোলা, এখন তুই অন্যত্র গিয়ে আপন আসন স্থাপন কর, একাগ্র সাধনায় ব্রতী হ। তোর গুরুভক্তির আন্তরিকতা ও একনিষ্ঠা দেখে আমি সত্যিই বড় প্রসন্ন হইয়াছি। আমার আশীর্ব্বাদ রইলো—তোর যোগ ও ভোগ তুই-ই লাভ হবে।"

পরম প্রাপ্তির সহিত ঋদ্ধি সিদ্ধি প্রভৃতি শিষ্যের করতলগত হইবে, এই বরই গুরুদেব সেদিন তাঁহাকে প্রদান করিলেন।

দীর্ঘদিন গুরু-সান্নিধ্যে থাকিবার পর এবার বিচ্ছেদের পালা উপস্থিত। বিষাদ-খিন্ন হৃদয়ে তরুণ সাধক গুরুদেবের চরণে প্রণাম করিয়া পস্তানা আশ্রম ত্যাগ করিলেন। তাঁহার গন্তব্যস্থল —মুক্তিকামী সাধকদের পরম আকাঙ্ক্ষিত ক্ষেত্র, দেবতাত্মা হিমাচল। কয়েকজন গুরুভ্রাতার সহিত ভোলাগিরিজী গুরু-নির্দ্দেশে নূতনতর তপস্যার পথে বাহির হইয়া পড়িলেন।

হিমালয়ে উপনীত হইয়াই গিরিজী সঙ্গীয় সাধকদল হইতে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করিয়া নিলেন। নিভৃত পর্ব্বতকন্দরে বসিয়া কঠোর তপস্যায় ব্রতী হইতে এবার তিনি দৃঢ়সঙ্কল্প। উত্তরখণ্ডে

তখন তীব্র শীত নামিয়াছে। উত্তুঙ্গ পর্ব্বতমালা জমাট তুষারের স্তূপে দুরধিগম্য। নিম্নাঞ্চলে প্রচণ্ড শীতের প্রকোপে মানুষের গতিবিধি একেবারে নাই বলিলেই চলে। জাগতিক কর্ম্মকোলাহলের উর্দ্ধে এই নির্জ্জন শান্ত পার্ব্বত্য পরিবেশ স্বভাবতঃই মানুষকে বড় অন্তর্ম্মুখীন করিয়া তুলে—উর্দ্ধায়িত মৌনী গিরিমালার সহিত সাধককে একাত্মকতায় উদ্বুদ্ধ করে। নবীন যোগী ভোলানন্দ এক পর্ব্বত গুহায় তাঁহার ধ্যানাসনটি পাতিয়া বসিলেন। কঠোর তপস্যার মধ্য দিয়া ধীরে ধীরে তাঁহার সাধনা অগ্রসর হইয়া চলিল।

চারিদিকে বরফ পড়িতেছে। এই মরণহিম তুষার ও পার্ব্বত্য বাতাসের আক্রমণ সহ্য করা নিতান্ত কঠিন। এ সময়ে কঠোরতপা ভোলানন্দের শরীরে কোন আচ্ছাদনই প্রায় নাই, পরিধানে রহিয়াছে শুধুমাত্র একটি কৌপীন। শীতের প্রচণ্ড প্রকোপের ফলে একদিন তিনি নিউমোনিয়া রোগে আক্রান্ত হইলেন। নিকটে পরিচর্য্যাকারী কেহ কোথাও নাই, ব্যাধির যন্ত্রণায় ভোলানন্দ সেদিন একেবারে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। জ্ঞান যখন ফিরিয়া আসিল তখন তিনি বড় তৃষ্ণার্ত্ত—জলের জন্য প্রাণ ওষ্ঠাগত হইয়াছে। নিকটস্থ কমণ্ডলুটি উঠাইয়া দেখিলেন, এক বিন্দু জলও তাহাতে নাই। গুহার অনতিদূরেই একটি পার্ব্বত্য নদী। কোনমতে গড়াইয়া গড়াইয়া ভোলানন্দ উহার নিকটে উপস্থিত হইলেন। অঞ্জলি পুরিয়া জল পান করিতে যাইবেন এমন সময় দুর্ব্বল দেহ এক বিপত্তি ঘটাইয়া বসিল। পদস্খলিত হইয়া তিনি জলস্রোতে পড়িয়া গেলেন।

বাহ্যজ্ঞান ফিরিয়া আসিলে ভোলাগিরিমহারাজ দেখিলেন, একটি পাহাড়িয়া তাঁহার সেবা-শুশ্রূষায় রত। পার্ব্বত্য নদীর খরস্রোতে ভাসিয়া তিনি ইতিমধ্যে অনেক দূরে চলিয়া আসিয়াছেন। গিরিজীর সেবার জন্য পাহাড়িয়া আশ্রয়দাতার চেষ্টার অবধি নাই। অপূর্ব্ব তাহার নিষ্ঠা ও আন্তরিকতা। পরম যত্নে সে তাঁহার জন্য

বনৌষধি সংগ্রহ করিতেছে, পথ্যাদি দিতেছে। এই পার্ব্বত্য পরিবারের সেবা-শুশ্রূষায় ভোলানন্দ ক্রমে আরোগ্যলাভ করিলেন।

পাহাড়ী মানুষটি কিন্তু ইতিমধ্যে গিরিজীর সঙ্গে এক অচ্ছেদ্য মমতা ও প্রীতির বন্ধনে বাঁধা পড়িয়া গিয়াছে। দৈবানুগ্রহে এই নবীন সন্ন্যাসীর সহিত তাহার মিলন ঘটিয়াছে, তাই তাঁহার নিকটেই সে দীক্ষা গ্রহণ করিতে অভিলাষী। সরল, শ্রদ্ধাবান এই আশ্রয়দাতার অনুরোধ ভোলানন্দ এড়াইতে সক্ষম হন নাই, ইহাকে তিনি দীক্ষাদান করেন। এই ব্যক্তিই তাঁহার প্রথম শিষ্য।

শরীর কিছুটা সুস্থ হইলে ভোলানন্দ পস্তানায় ফিরিয়া আসিলেন, নব দীক্ষিত সেই পাহাড়িয়া শিষ্যটিও তাঁহার সঙ্গে রহিল। পস্তানা আশ্রমে ফিরিয়া আসিবার উদ্দেশ্য—গুরুদেবের চরণ দর্শন। তাহার পর হৃত স্বাস্থ্যের পুনরুদ্ধার করিয়া তপস্যার জন্য আবার হিমালয়ে যাইবেন এ অভিপ্রায়ও রহিয়াছে।

গুরু গোলাপগিরিজী তাঁহার প্রিয় শিষ্যের দুর্ঘটনার কথা শুনিলেন। পাহাড়িয়াটির আন্তরিক সেবা ও যত্নে পুত্রপ্রতিম ভোলানন্দের জীবন রক্ষা হইয়াছে, ইহা জানিয়া তাঁহার বড় আনন্দ। তৎক্ষণাৎ ঐ ব্যক্তিকে তিনি পাঁচশত টাকা পারিতোষিক প্রদান করিলেন। পাহাড়ী ভক্তটিকে প্রথমটায় এই অর্থ গ্রহণে কিছুতেই সম্মত করানো যায় নাই। ভোলানন্দ নানাভাবে তাহাকে বুঝানোর পর পরমগুরু গোলাপগিরিজীর প্রসাদ জ্ঞানে সে ইহা গ্রহণ করে।

কিছুদিন পর ভোলানন্দ আবার তাঁহার তপস্যার পথে বহির্গত হন। কখনও কন্‌খল হরিদ্বারের নিকটে বিল্বকেশ্বর পর্ব্বতে, কখনও বা হিমালয়ের গুহা-গহ্বরে নবীন তপস্বী তাঁহার যোগ সাধনায় ব্যাপৃত থাকেন। অনাহারে অনিদ্রায় দিন রাত্রি কোথা দিয়া কাটিয়া যায়, সেদিকে কোনই হুঁস নাই। যোগক্রিয়া ও ধ্যান-তন্ময়তার মধ্যে নিরন্তর ডুবিয়া থাকেন।

নিজের অনুষ্ঠিত দুশ্চর তপস্যার কথা বলিতে গিয়া ভোলাগিরিজী উত্তরকালে ভক্তদের বলিতেন, "ওরে, শিষ্যের পুরুষকার বা তপস্যাই সর্ব্বদা গুরুকৃপাকে আকর্ষণ করে, আর কঠোরভাবে তপস্যা না করলে তা কখনো লাভ হয় না। এই দ্যাখ না, আমাকেও কত কঠোর তপস্যা করতে হয়েছে, তবেই তো গুরুজীর কৃপা আমি পেয়েছি। চাই তীব্র বৈরাগ্য, আর গুরু উপদিষ্ট প্রণালী ধরে একনিষ্ঠ তপস্যা। এ নইলে পরম বস্তু কখনো লাভ করা যায় না। সংসারে দেখিস তো, বাপ-মা ছেলেকে লালন পালন করেন, শিক্ষা দীক্ষা দেবার পর বিয়ে দিয়ে দেন। ব্যাস, ঐ পর্যন্ত। এর পরে বংশরক্ষা করার দায়িত্ব তাঁদের ঐ সংসারী পুত্রের। অধ্যাত্মজীবনে গুরুর কাজও অনেকটা এমনি। শিষ্যকে দীক্ষা দান করবার পর তিনি সাধন দান করেন। এই সাধনরূপ পত্নীর সঙ্গ না করলে—কঠোর তপস্যায় ব্রতী না হলে মোক্ষরূপ পুত্রলাভে সে তো বঞ্চিতই থাকবে। এ জন্য প্রকৃতপক্ষে দায়ী হবে শিষ্য নিজে—তার গুরু নয়!

"জানিস তো, আমার গুরুদেব আমায় কত ভালবাসতেন। শুধু গুরু কৃপায় ঈশ্বরপ্রাপ্তি সম্ভব হলে কি তিনি আমায় এরকম কৃচ্ছ্র ও কঠোর সাধনা করতে দুর্গম পাহাড়ে পাঠাতেন? কত দুঃখ কষ্টের মধ্য দিয়ে আমার সাধন জীবন কেটেছে, তার খোঁজ কয়জন রাখে? আজ তোরা দেখছিস—ভোলাগিরি মহারাজ কেমন বাবু, হাতে সোনার আংটি, পায়ে জুতো, পকেটে সোনার ঘড়ি, মাথায় সিল্কের পাগড়ী, আরও কত কি? ঝুড়ি ঝুড়ি কত উপাদেয় ফল খাবার সব দূর দেশ থেকে আসছে। কত টাকা, কত জিনিস। আমি শুধু জানি, এসব আমার গুরুজীরই ইচ্ছায় ঘটছে—যোগ ও ভোগ এ দুয়েরই আশীর্ব্বাদ যে তিনি আমায় দিয়ে ফেলিয়াছিলেন।

"সাধক-জীবন কি কঠোর ছিল, আজ তা খুব মনে পড়ে। এই বিল্বকেশ্বর পর্ব্বতের গুহায়ই আমার কত বৎসর তপশ্চর্য্যায় কাটিয়া গিয়াছে।"

"তখন হরিদ্বারে রেলগাড়ী হয়নি—পাহাড় ও বনে কত বড় বড় বাঘ, হাতী আর ভালুক দেখা যেত। এই সব গুহায় যখন তপোমগ্ন ছিলাম তখন কত বিনিদ্র রজনী যাপন করতে হয়েছে। সাধনাবস্থায় নিদ্রাকে কোনদিনই আমি প্রশ্রয় দিইনি—দিবারাত্রি জপ, ধ্যানে ডুবে থাকিয়াছি।"

একবার ভোলাগিরি মহারাজ এবং তিনজন গুরুভ্রাতা সহ হিমালয়ে বসিয়া যোগ সাধনায় রত রহিয়াছেন। ধুনীর অদূরে সেদিন হঠাৎ একটি বৃহদাকার ব্যাঘ্রের আবির্ভাব হইল। ভোলানন্দ তাঁহার সঙ্গীয় সাধুদের সাহস দিয়া কহিলেন, "এসো ভাই, আমরা এ হিংস্র বাঘকে উপেক্ষা করে প্রত্যেকেরই নিজস্ব বীজমন্ত্র জপ করতে থাকি। জপের শক্তি অমোঘ, এতে অসাধ্য সাধন হয়।"

সকলে ব্যাঘ্রের উপস্থিতি গ্রাহ্য না করিয়া জপে নিবিষ্ট হইলেন। একটি সাধু কিন্তু আতঙ্কিত হইয়া বড় বিভ্রাট বাধাইয়া বসিলেন। নিজের আসন ছাড়িয়া উঠিয়া যেই তিনি ত্রস্তেব্যস্তে পলায়ন করিতে যাইতেছেন, অমনি বাঘটি আচম্বিতে তাঁহার উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল, সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহার গলদেশ কামড়াইয়া ধরিয়া অরণ্যমধ্যে টানিয়া নিয়া গেল।

গুরুভ্রাতাটির শোচনীয় মৃত্যুতে সবাই বড় শোকাকুল ও চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছেন। বীর সাধক ভোলানন্দ এই সময়ে তাহাদিগকে ডাকিয়া কহিলেন, "ভাই সব, মন্ত্রজপের ওপর আমাদের বন্ধুটির বিশ্বাস ছিল না, তাই আজ তার এই দুর্দ্দৈব। আমরা সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসী—মৃত বন্ধু বা আত্মজনের জন্য মায়া থাকা আমাদের উচিত নয়। কাজেই তার জন্য শোক না ক'রে, এসো, আমরা আবার সাধনা শুরু করি।" তাঁহার এই বাক্যে অনুপ্রাণিত হইয়া সকলে আবার ধ্যানরত হইলেন।

ভোলাগিরিজী নিঃসঙ্গভাবে সেবার হিমালয়ের দুরধিগম্য অঞ্চলে যোগ সাধনা করিতেছেন। এ সময়ে একদিন তাঁহার এক

বিচিত্র অভিজ্ঞতা ঘটে। অরণ্যবেষ্টিতে এক পাহাড়ের গুহায় বসিয়া তিনি ধ্যানাবিষ্ট রহিয়াছেন। হঠাৎ একটি ভালুক সেখানে প্রবেশ করিয়া সবলে তাঁহাকে জড়াইয়া ধরে। অতর্কিত আক্রমণের ফলে ভোলাগিরি মহারাজের ধ্যান সহসা টুটিয়া যায়।

এ বিপদে তাঁহাকে সেদিন কিন্তু ঘাবড়াইয়া পড়িতে দেখা গেল না। সাহস এবং উপস্থিত বুদ্ধি নিয়া তিনি ভল্লুকটির নাক ও মুখ জোরে চাপিয়া ধরিলেন। তারপর আলিঙ্গনাবদ্ধ অবস্থায় উহাকে বহন করিয়া পাহাড় হইতে নামিতে লাগিলেন। নিকটেই একস্থানে পাহাড়টি সোজাসুজি অনেক নীচে নামিয়া গিয়াছে। ভোলাগিরিজী সেখানে উপস্থিত হইয়া ভালুকটিকে কহিলেন, "ভাইয়া, অব তুম্ আপনা রাস্তা লেও, মঁয়ভি আপনা রাস্তা লেতা হুঁ!" সঙ্গে সঙ্গে আক্রমণকারী ভল্লুকটিকে সবলে নীচে নিক্ষেপ করিয়া আবার ফিরিয়া আসিলেন নিজের ধ্যান-গুহায়।

কঠোর তপস্যা ও গুরুকৃপার বলে ভোলানন্দ নানা আধ্যাত্মিক অনুভূতি যেমন লাভ করিতে থাকেন, পরমপ্রাপ্তির সঙ্কল্পও তেমনি তাঁহার মনে দুর্জ্জয় হইয়া উঠিতে থাকে। কৃচ্ছ্র সাধনের জন্য শরীর তখন একেবারে শীর্ণ ও শুষ্ক হইয়া উঠিয়াছে। ধ্যানতন্ময়তার ফলে দেহবুদ্ধি তাঁহার বিলুপ্তপ্রায়। এই কঠোর তপস্যার ফল কিন্তু অবশেষে একদিন ফলিয়া উঠিল। অন্ধকারাচ্ছন্ন পর্ব্বতগুহা উদ্ভাসিত করিয়া দেবাদিদেব শঙ্কর সেদিন তরুণ সাধকের সম্মুখে আবির্ভূত হইলেন। ইষ্ট-দর্শন ও তত্ত্বজ্ঞানের স্ফুরণে ভোলাগিরিজীর সাধন-সত্তায় সেদিন এক অপরূপ রূপান্তর সাধিত হইয়া গেল।

গিরি মহারাজের তীর্থ পরিক্রমা ও দেশ পর্য্যটনের নানা বিচিত্র কাহিনী উত্তরকালে তাঁহার নিকট হইতে শুনা যাইত। ভারতবর্ষের দূর দূরান্তের তীর্থস্থলগুলিই শুধু নয়, বহির্ভারতের দুর্গম তীর্থগুলিও তিনি একসময় ভ্রমণ করিয়া আসিয়াছিলেন। ভারত, তিব্বত ও সাইবেরিয়ার নানা অঞ্চলে পরিব্রাজনকালে এক একবার কম

বিপদের সম্মুখীন হন নাই এই সব কাহিনী মাঝে মাঝে তাঁহার অন্তরঙ্গ শিষ্যদিগকে শুনাইতেন।

সামাজিক জীবনের মুখোমুখী দাঁড়াইয়া স্বামীজী মাঝে মাঝে যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিতেন তাহা কম কৌতূহলোদ্দীপক নয়। একবার ঘুরিতে ঘুরিতে বোম্বাই সহরে তিনি আসিয়াছেন। মাধুকরী করিয়া প্রতিদিন তাঁহাকে আহার সংগ্রহ করিতে হয়। সেদিন ভিক্ষা নিবার জন্য তিনি সেখানে এক ধনীর প্রাসাদে ঢুকিয়া পড়িলেন। কি জানি কেন স্বামীজীকে দেখিয়াই এই ধনী ব্যক্তি ও তাঁহার স্ত্রীর বড় মমতা জাগিয়া উঠে। উভয়ে ভাবিতে থাকেন—গৌরতনু, দিব্যকান্তি এই তরুণ সন্ন্যাসীকে স্নেহের বাঁধনে চিরতরে বাঁধিয়া রাখিতে পারিলে মন্দ কি, তাঁহাদের পুত্র নাই, আছে শুধু এক বিবাহযোগ্যা সুন্দরী কন্যা। সন্ন্যাসীর সহিত তাহার বিবাহ দিবার জন্য উভয়ে ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। সে গৃহে গিরিজীর সমাদরের অবধি রহিল না।

বিবাহের প্রস্তাব করিয়া ভদ্রলোকটি কহিলেন, ভোলানন্দ ইহাতে সম্মত হইলে স্বামী স্ত্রী উভয়ে নিশ্চিন্তে তীর্থবাসী হইবেন। এই বিপুল সম্পদ ভোগ করার পথে গিরিজীর কোন বাধা থাকিবে না।

ভোলাগিরি মহারাজ নীরবে সমস্ত কিছু শুনিলেন। তারপর সহাস্যে বলিতে লাগিলেন, "আপনাদের প্রস্তাবে আন্তরিকতা রয়েছে ঠিকই। কিন্তু আমায় বলুন তো, এ বিপুল ঐশ্বর্য্য ত্যাগ করে আপনারা তীর্থবাসী হতে চান? দীর্ঘকাল সংসারে কাটিয়ে কি শান্তি ও আনন্দ আপনারা লাভ করেন নি?

উত্তর হইল, "বাবা, সত্যিই এই বিষয়-সুখের মধ্যে আমরা প্রকৃত আনন্দ এ যাবৎ খুঁজে পাইনি। তাইতো শেষ বয়সে এর সন্ধানে বেরিয়ে পড়তে চাই।"

"তবেই দেখুন, যে পার্থিব সম্পদ আপনাদের সুখী করতে পারেনি, তা যে আমাকে আনন্দ দেবে এমন নিশ্চয়তা কোথায়? আমাকে আপনারা ক্ষমা করিবেন, আমার জীবনের পথ চিরতরে

চিহ্নিত হয়ে গিয়েছে, আর তা থেকে ফেরবার উপায় নেই।”

বিস্মিত ধনী দম্পতির প্রাসাদ হইতে ধীরে ধীরে তিনি নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেলেন।

আর একদিন ভোলাগিরিজী শহরে ভিক্ষার জন্য বাহির হইয়াছেন, এক সম্পন্ন গৃহস্থের অঙ্গনে প্রবেশ করামাত্র স্বামীজীকে সে তীব্র ভাষায় গালিগালাজ করিতে লাগিল—“ব্যাটা ভণ্ড সাধু কোথাকার! লোক ঠকাবার আর জায়গা পাওনি? লেখাপড়ার ধার ধারোনি, কাজ কর্ম্মেও ফাঁকি দিয়ে বেড়াইয়াছো, তাই সাধুর বেশ ধরে এখন লোক ঠকাবার চেষ্টা? পরের বাড়ীতে ভালো খেয়ে দেয়ে চেহারাটি তো বাবা বেশ হৃষ্ট পুষ্ট করিয়াছ। এই জোচ্চুরি ব্যবসায় ছেড়ে সৎ উপায়ে পরিশ্রম করে নিজের জীবিকা অর্জ্জন করিতে পারো না? যাও এখনি দূর হয়ে যাও।”

স্বামীজী কিন্তু এই কটুবাক্যগুলি দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া উপভোগ করিতেছেন! গৃহস্বামীর কথা শেষ হইলে সহাস্যে কহিলেন, “কি নিরস্ত হইলেন যে! আপনার গালিগালাজের ভাণ্ডার কি এরই ভেতর শেষ হয়ে গেল?”

হঠাৎ গৃহস্বামীর আচরণে দেখা গেল বিস্ময়কর পরিবর্ত্তন। আগন্তুক সন্ন্যাসীর চরণে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিয়া এবার তিনি স্বকৃত অপরাধের জন্য ক্ষমা চাহিতে লাগিলেন। গিরিজী তাঁহার এই বিপরীত আচরণ সম্পর্কে প্রশ্ন করিলে তিনি উত্তর দিলেন, “মহারাজ, আমি এভাবে তিরস্কার করে সাধুদের পরীক্ষা করি। কঠোর বাক্য শুনে কেউ যদি উত্তেজিত ও ক্রুদ্ধ হয় তবে বুঝতে পারি—সে নিম্নস্তরের সন্ন্যাসী, রাগদ্বেষ সে জয় করতে পারে নাই। আপনার আচরণে বেশ বুঝতে পারিয়াছি, আপনি সমদর্শী—যাথার্থ্য সন্ন্যাসী। তাই ভূলুণ্ঠিত হয়ে আপনার ক্ষমা চেয়ে নিলাম।”

গিরিমহারাজ শান্ত দৃঢ় কণ্ঠে কহিলেন, “দেখুন, প্রকৃত সাধক বা সন্ন্যাসী চিনে নেবার ক্ষমতা কি আপনার হয়েছে? তবে এ মিথ্যা

আত্ম অভিমান কেন? ছদ্মবেশে বহুউচ্চস্তরের সন্ন্যাসী জনসমাজে বিচরণ করে থাকেন তাঁহাদের কাছে আপনার কি পরিমাণ অপরাধ হয় একবার ভাবুন তো? তাছাড়া, কটু কথা দিয়ে মানুষের হৃদয়ে আঘাত করা যে এক মহাপাপ। এ যে এক প্রকার কসাইগিরি! আপনি একাজ থেকে নিরস্ত হোন, তাতে আপনার কল্যাণই হবে। অনুতপ্ত গৃহস্বামী অতঃপর সশ্রদ্ধভাবে স্বামীজীর নিকট তত্ত্বোপদেশ প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। গিরিজী ইঁহাকে কৃপা করিয়াছিলেন।

ভোলানন্দ সেবার গুজরাট অঞ্চলে ভ্রমণ করিতেছেন! এই সময় স্থানীয় এক বিখ্যাত ধনীর গৃহে তিনি অতিথি হন। সানন্দে তাঁহার আদর আপ্যায়ন চলিতে থাকে। এ সময়ে একদিন এ গৃহের এক রূপসী তরুণী তাঁহার দিব্যকান্তি দেখিয়া মোহিত হইলেন, তাঁহার প্রণয় যাচ্ঞা করিতে থাকেন। তিনি তাঁহাকে ধীরকণ্ঠে বলেন, "দেখুন, আপনি কিন্তু আমার দেহটিকেই ভালোবেসেছেন, এর সঙ্গ-লিপ্সাই আপনার জন্মেছে। কিন্তু আমিও যে আমার এ দেহটিকে ভালোবাসি, এর ব্রহ্মচর্য্য ও শুদ্ধতা রক্ষায় আমিও যে বদ্ধপরিকর। তাহলে দেখা যাচ্ছে, এই দেহের জন্য আমরা দুইজনেই প্রতিদ্বন্দ্বী। এ অবস্থায় আমাদের মিলন কি করে সম্ভব হতে পারে?" রমণী লজ্জায় অধোবদন হইয়া গিরি মহারাজের সান্নিধ্য ত্যাগ করিয়া যান।

তীর্থপরিক্রমা ও নানা অঞ্চলের পর্য্যটন শেষ হইল। ভোলানন্দের সাধনলব্ধ অনুভূতি ও সিদ্ধিসমূহ বহির্জ্জীবনের কষ্টিপাথরে যেন বারবার পরীক্ষিত হইয়া গেল। এবার গুরুদেবের চরণ দর্শনের জন্য তিনি আবার পস্তানা গ্রামে উপস্থিত হইলেন। দীর্ঘকাল পরে গুরু শিষ্যের পুনর্মিলন! আশ্রমে আনন্দের তরঙ্গ উত্থিত হইল। আত্মকাম, সিদ্ধসাধক ভোলানন্দকে গোলাপগিরিজী তাঁহার প্রাণভরা আশীর্বাদ জানাইতে লাগিলেন।

বৃদ্ধ গোলাপগিরিজী এই সময় কিছুদিনের জন্য আশ্রম ত্যাগ

করিয়া নিভৃত বাসের জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন। শ্রীগুরুর সেবায় অভিলাষী ভোলানন্দও এবার তাঁহার সঙ্গে চলিলেন। অমৃতসরের কাছে গহন অরণ্যে এক পর্ণকুটির বাঁধিয়া গুরু শিষ্য উভয়ে বাস করিতে লাগিলেন। মহাযোগী গোলাপগিরিজী এই সময়ে অধ্যাত্ম-অনুভূতির শিখরে সদা অধিষ্ঠিত রহিয়াছেন। ধ্যানতন্ময়তা ও সমাধির মধ্য দিয়া দিবারাত্র তিনি বেহুঁস হইয়া পড়িয়া থাকেন। কোন কোন সময় গুরুদেবের সমাধি-ভঙ্গের জন্যে ভোলানন্দকে দশ বার দিনও প্রতীক্ষমান থাকিতে হয়।

ভিক্ষার জন্য ভোলাগিরিজী একদিন অরণ্য সন্নিহিত গ্রামাঞ্চলে গিয়াছেন। বৃদ্ধ গোলাপগিরি মহারাজ তাঁহার পর্ণকুটিরের সম্মুখে ধুনী জ্বালাইয়া ধ্যানাবিষ্ট। এমন সময় কয়েকজন দুর্ব্বৃত্তের দৃষ্টি তাঁহার দিকে পড়ে। ইহারা ভাবে, এ বৃদ্ধ সাধু সত্য সত্যই কোন শক্তিধর যোগী, না ভণ্ড তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখিতে হইবে। ধুনী হইতে একখণ্ড জ্বলন্ত কাঠ উঠাইয়া নিয়া দুষ্টের দল বৃদ্ধ স্বামীজীর উরুদেশে তাহা স্থাপন করে ও কৌতুক দেখিতে থাকে। ধ্যানমগ্ন আত্মসমাহিত যোগীর সেদিকে কোন ভ্রূক্ষেপ নাই। নিস্পন্দভাবে তিনি আসনে উপবিষ্ট রহিয়াছেন, আর পায়ের মাংস আগুনের উত্তাপে ধীরে ধীরে দগ্ধ হইয়া যাইতেছে।

এদিকে ভিক্ষারত শিষ্য ভোলানন্দের হৃদয় কি এক অজ্ঞাত কারণে হঠাৎ চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে। সামান্য যাহা কিছু আহার্য্য সংগৃহীত হইয়াছে তাহা নিয়াই তিনি দ্রুতপদে গুরুদেবের পর্ণকুটির অভিমুখে ছুটিয়া আসিলেন। সাধুর শিষ্যকে উপস্থিত হইতে দেখিয়াই দুষ্কৃতিকারীর দল অবিলম্বে স্থান ত্যাগ করিল।

ধুনীর সম্মুখে গিয়াই ভোলানন্দের বিস্ময় ও ক্রোধের সীমা রহিল না। গুরুদেবের পায়ের উপর জ্বলন্ত কাষ্ঠখণ্ড তখনও জ্বলিতেছে—আর তিনি নির্ব্বিকার হইয়া বসিয়া আছেন।

তৎক্ষণাৎ আগুন সরাইয়া ফেলিয়া গিরিজী গুরুর শুশ্রূষায় ব্রতী

হইলেন। দুর্ব্বৃত্তদল কিন্তু পরের দিনই ফিরিয়া আসে এবং সাশ্রুনয়নে নিজের দুর্দ্দৈবের কথা নিবেদন করে। দুষ্কার্য্য করার অব্যবহিত পর হইতেই নাকি তাহাদের উপর দৈবের চরম আঘাত নিপতিত হইতে থাকে। কাহারো প্রিয়জন বিয়োগ হইয়াছে, কেহ বা নিজেই আকস্মিক ব্যাধির ফলে মৃতকল্প। ভীত সন্ত্রস্ত হইয়া ইহারা বারবার ক্ষমা প্রার্থনা করিতে লাগিল।

গোলাপগিরিজী মধুর বচনে দুর্ব্বৃত্তদের আশ্বাস দিয়া জানাইলেন,—নিজের দিক হইতে ইহাদের উপর বিন্দুমাত্র ক্রোধও তাঁহার হয় নাই। যাহা ঘটিবার দৈবরোষে তাহা হইয়া গিয়াছে—আর তাহাদের কোন ক্ষতি হইবে না। এবার সকলে নির্ভয়ে নিজ নিজ গৃহে ফিরিয়া যাইতে পারে।

যোগীবর আরো বলিয়া দিলেন, "ত্যাখো, সর্ব্বদা স্মরণ রেখো, তোমাদের যে কোন অন্যায় আচরণ বিকাররহিত, সমদর্শী যোগীর অন্তরে রেখাপাত করে না, কিন্তু যে চৈতন্যময় মহাশক্তিতে যোগীর সত্তা বিধৃত তার ভেতর প্রতিক্রিয়া হয় অনিবার্য্যরূপে। তাকে তো এড়াবার যো নেই। তবে আমি অভয় দিচ্ছি, এ অপরাধের জন্য আর কোন বিপদে তোমরা পড়বে না।

গহন অরণ্যের নিভৃত বাসে প্রায় ছয় মাস অতিবাহিত হইয়া যায়। ভোলানন্দ তাঁহায় প্রাণের আশা মিটাইয়া শিবকল্প মহাযোগীর সেবায় নিরন্তর ব্যাপৃত রহিয়াছেন। গুরুদেবের সাধন-সত্তাটি তখন আধ্যাত্মলোকের উচ্চস্তরে অধিষ্ঠিত। গিরিজীর জীবনে তাই তখনকার এ সান্নিধ্য ও অরণ্যবাস এক অপূর্ব্ব কল্যাণ বহন করিয়া আনে। একান্ত সেবার ফলে তিনি গুরুময় হইয়া যান, গুরুদেবের আত্মিক মহিমায় অপরূপভাবে মণ্ডিত হইয়া উঠেন।

গুরুদেব সেদিন প্রিয় শিষ্যকে ডাকিয়া কহিলেন, "ভোলা, প্রায় ছয়মাস হ'ল আমরা আশ্রম ছেড়ে এসেছি। এবার আমাকে

পস্তানায় ফিরতে হবে। এ শরীরের ভোগ শেষ হয়ে এসেছে, শীগ্‌গীর আমি এটা ত্যাগ করবো।"

উভয়ে তাড়াতাড়ি পস্তানার দিকে ফিরিয়া আসিলেন। তারপর শিষ্যমণ্ডলীকে শোকসাগরে ভাসাইয়া এই বিরাট যোগীপুরুষ মরজগতের সর্ব্ব বন্ধন ছিন্ন করিলেন। গোলাপগিরিজীর শেষ নির্দ্দেশ অনুষায়ী তাঁহার গুরুদেব দ্বাদশীগিরি মহারাজের সমাধিস্থানে তাঁহাকে সেদিন সমাহিত করা হইল।

ইহার পর পস্তানার আশ্রম ত্যাগ করিয়া ভোলানন্দ পুণ্যভূমি হরিদ্বারে উপনীত হইলেন। পবিত্র গঙ্গাবারি বিধৌত লালতারাবাগে স্বামীজী তাঁহার সাধন আসনখানি বিছাইয়া বসিলেন। এই পরিবেশে এবং এই আসনেই ভারত বিখ্যাত মহাযোগী মহারাজের আচার্য্য জীবনের ভূমিকাটি পূর্ণতর হইয়া উঠিতে থাকে। অতুলনীয় জ্ঞান, যোগশক্তি ও শুদ্ধাভক্তির এক জীবন্ত বিগ্রহরূপে অগণিত ভক্তের অন্তরে তিনি প্রতিষ্ঠা লাভ করেন।

লালতারাবাগে ভোলাগিরি মহারাজ আসন পাতিয়া বসিয়াছেন। শুধু উত্তরাখণ্ড অঞ্চলের জনগণই নয়, দিক্‌দিগন্তের তীর্থযাত্রী ভক্তগণ এই দিব্যকান্তি, শক্তিধর মহাপুরুষকে দর্শনের জন্য আসিতে থাকে। শ্রদ্ধাভাবে স্বামীজীকে যে সমস্ত ভেট দর্শনার্থীরা নিবেদন করে, তাহার কোন কিছুই তিনি কিন্তু সঞ্চয় করেন না। অর্থ ও খাদ্যাদি বেশী পরিমাণে মিলিলে তখনি সোৎসাহে তাহা দিয়া সাধুদের ভাণ্ডারা লাগান। হরিদ্বার, কনখল, হৃষিকেশ, ভীমগোড়া প্রভৃতি অঞ্চলের বহু সাধু এ সময়ে লালতারাবাগে আসিয়া ভিক্ষা গ্রহণ করিতেন। দরিদ্রদের মধ্যে আহার্য্য ও অর্থ বিতরণেও স্বামীজীর উৎসাহের অন্ত ছিল না।

গিরিজীর বৈশিষ্ট্য তাঁহার অপরিমেয় যোগশক্তি ও তত্ত্বোজ্জ্বলা বুদ্ধি ইহাই তাঁহাকে হরিদ্বারের সাধুসমাজে অসামান্য প্রতিষ্ঠা দান করে, ধীরে ধীরে তাঁহার ভক্ত ও দর্শনার্থীর সংখ্যাও

বিপুলভাবে বাড়াইয়া তোলে। এই সময়ে কৈলাসাশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা মহাত্মা ধনরাজগিরি ও হরিদ্বারের সর্ব্বজনশ্রদ্ধেয় সাধু, স্বামী এলাচিগিরিজীর সহিত ভোলাগিরি মহারাজের খুব ঘনিষ্ঠতা জন্মে। ইঁহাদেরই একান্ত অনুরোধে তিনি নিজস্ব আশ্রম স্থাপন না করিয়া পারেন নাই। কিছু সংখ্যক সন্ন্যাসী ও সাধক এখানে থাকিয়া শাস্ত্র পাঠ ও সাধন ভজনে রত হন। ক্রমে ক্রমে লালাতারাবাগের এই আশ্রমই জনসাধারণের নিকট 'ভোলাগিরি আশ্রম' রূপে পরিচিত হইয়া উঠে।

১৮৯৩ সালের কথা। প্রয়াগ ক্ষেত্রে তখন পূর্ণকুম্ভ মেলা অনুষ্ঠিত হইতেছে। ভারতের দিক দিগন্ত হইতে লক্ষ লক্ষ তীর্থকামী নরনারী ও সাধু সন্ন্যাসী এ উপলক্ষে সমবেত হইয়াছেন। বিরাট ধর্ম্মমেলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ আকর্ষণরূপে সেদিন ভোলাগিরি মহারাজ জনমণ্ডলীর সম্মুখে আত্মপ্রকাশ করেন। সাধুসন্তের দল, বিভিন্ন আখড়ার মণ্ডলীশ্বর ও মোহান্তদের মধ্যেও স্বামীজীর প্রভাব সর্ব্বদা অনুভূত না হইয়া পারে নাই। সন্ন্যাসীদল পরিবৃত গিরিমহারাজকে সাড়ম্বরে বাদ্যভাণ্ড সহকারে স্নানের শোভাযাত্রায় নিয়া যাওয়া হয়। সে এক অপূর্ব্ব দৃশ্য! সুগৌর কান্তি সৌম্য দর্শন এই মহাযোগীকে সেদিন সাধুমণ্ডলীতে দেখাইতেছিল এক উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কের মত।

এই কুম্ভমেলায় প্রভুপাদ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীকে নিয়া সন্ন্যাসীদের মধ্যে এক বাদানুবাদের সৃষ্টি হয়। গোস্বামীজী ইঁহাদের নির্দ্দিষ্ট স্থানে তাঁবু ফেলিতে গেল অনেকে আপত্তি করিতে থাকেন। সামাজিক দিক দিয়া দেখিতে গেলে তিনি গৃহী—মেলায় একদল সন্ন্যাসী তাই নিজেদের মধ্যে তাঁহাকে স্থান দিতে অসম্মত হন। দিব্য দৃষ্টিসম্পন্ন মহাপুরুষ ভোলাগিরিজী তখন অগ্রসর হইয়া সকলের ভ্রম অপনোদন করেন। গোস্বামীজী যে এক সমর্থ মহাপুরুষ, এ কথাটি সেদিন গিরি মহারাজের মুখে শুনিয়া সাধুরা শান্ত হন এবং গোস্বামীজীকে সানন্দে তাঁহাদের স্বীকৃতি প্রদান করেন।

বিজয়কৃষ্ণের দৃষ্টিতে বহুবরেণ্য যোগী ভোলানন্দের পরিচয়টি অজ্ঞাত ছিল না। ইহার প্রকৃত স্বরূপ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসিত হইয়া একবার তিনি তাঁহার নিজের শিষ্যদের বলিয়াছিলেন, "ভোলাগিরি বাবার মত মহাপুরুষ আজকাল ভারতবর্ষে দুর্লভ। এই শক্তিধর মহাযোগী সমগ্র জগৎকে ধ্বংস ক'রে আবার নূতনভাবে তা সৃষ্টি করতে পারেন। কিন্তু আশ্চর্য্যের কথা, এমন অপরিমেয় যোগশক্তির অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও এঁর ব্যবহার নিতান্ত নম্র। ইনি হচ্ছেন অসীম করুণার আধার—সাক্ষাৎ শিব।"

ভোলাগিরি মহারাজ বিজয়কৃষ্ণকে সস্নেহে 'মেরে আশুতোষ' বলিয়া ডাকিতেন। প্রয়াগ-কুম্ভমেলার পরে, বিশেষতঃ গোস্বামী প্রভু বিজয়কৃষ্ণের প্রশস্তি শুনিয়া বাংলার বহু লোক গিরি মহারাজের শিষ্যত্ব গ্রহণে উদ্‌গ্রীব হয়। তাঁহাদের মিনতিপূর্ণ আমন্ত্রণের উত্তরে ভোলাগিরিজী কহিতেন, "ছাখো, আশুতোষ থাকতে তোমাদের বাংলা দেশে এখন আমার কিছু করবার নেই। আশুতোষ সাক্ষাৎ শিবস্বরূপ, তিনিই তোমাদের আধ্যাত্মিক উন্নতির পথে নিয়ে যাবেন! তার নিকট থেকে তোমরা সাধন ও উপদেশ গ্রহণ কর।" প্রকৃতপক্ষে দেখা গিয়াছে, প্রভুপাদের জীবিতাবস্থায় ভোলানন্দজী বাংলায় খুব কম লোকেরই দীক্ষা প্রদান করিয়াছেন।

গোরখপুরে বিখ্যাত যোগী গম্ভীরনাথজীর সহিতও ভোলানন্দ এক মধুর সৌহার্দ্য-বন্ধনে আবদ্ধ ছিলেন। গিরিজীর নিকট বিজয়কৃষ্ণের শিষ্যদের মত ইহার শিষ্যবর্গও বড় আদরের বস্তু ছিল। হরিদ্বারে কুম্ভমেলার সময়ে আশ্রমিকদের ডাকিয়া তাই তিনি বলিতেন, "তোরা শুনে রাখিস্, আমার এ আশ্রমে আশুতোষ ও গম্ভীরনাথজীর শিষ্যদের স্থান প্রথমে। তার পরে যদি সম্ভব হয়, তবে আমার শিষ্যদের জায়গার বন্দোবস্ত করা হবে।"

উত্তরাখণ্ডের সাধু, যোগী ও বৈদান্তিক সমাজে ভোলাগিরিজীর বিরাট মর্য্যাদা ও প্রতিষ্ঠা ছিল। সেবার হৃষীকেশের বহুবিশ্রুত

কৈলাসাশ্রমের মোহান্ত ও নিরঞ্জনী আখড়ার মণ্ডলীশ্বর মহাসমাধি লাভ করিয়াছেন। নূতন মণ্ডলীশ্বর নির্ব্বাচিত হইবেন, তাই বিশিষ্ট ধর্ম্ম-নেতাদের আমন্ত্রণ করা হইল। বিভিন্ন মঠ, আখড়া ও মণ্ডলীর বিশিষ্ট সাধু ও আচার্য্যগণ কর্তৃক পরিবৃত হইয়া ভোলাগিরি মহারাজ সভার কেন্দ্রস্থলে উপবিষ্ট হইলেন। স্বামীজীর জ্যোতির্ম্মণ্ডিত আনন ও দিব্যকান্তি দর্শনে সকলেই অভিভূত হইয়া গিয়াছেন।

অভিষেকের লগ্ন উপস্থিত। কিন্তু সভাস্থ সকলে এক মহা সঙ্কটে পড়িলেন। নব নির্ব্বাচিত মণ্ডলীশ্বর ও মোহান্ত, স্বামী গোবিন্দানন্দ এই দায়িত্বপূর্ণ পদ গ্রহণে কিছুতেই সম্মত হইতেছেন না! বরং আশ্রমের অন্যতম আচার্য্যরূপে অধিষ্ঠিত থাকিয়া একান্তভাবে নিজস্ব জ্ঞানসাধনায় ব্রতী থাকিতেই ইচ্ছুক।

অনন্যোপায় হইয়া সভাস্থ সকলে ভোলাগিরিজীর শরণাপন্ন হইলেন, এ ব্যাপারে তিনি হস্তক্ষেপ না করিলে বড় বিপদ। কৈলাস আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা, ব্রহ্মবিদ্ আচার্য্য ধনগিরি মহারাজ ছিলেন গিরি মহারাজের অকৃত্রিম সুহৃদ ও সহাধ্যায়ী। এ আশ্রমের শিষ্যগণ তাই গিরিজীকে অপরিসীম শ্রদ্ধার চোখে দেখিয়া থাকেন।

গোবিন্দানন্দকে ডাকিয়া একবার তিনি শুধু কহিলেন, "দেখুন, আমার একান্ত ইচ্ছে যে, এ আশ্রমের মোহান্ত নিরঞ্জনী আখড়ার মণ্ডলীশ্বরের পদ আপনিই গ্রহণ করুন।"

এ যেন তাঁহার অনুরোধ নহে—আদেশ। নত শিরে কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া গোবিন্দানন্দজী শান্ত স্বরে গিরিজীকে কহিলেন, "মহারাজ, আপনি আমার গুরু স্থানীয়। আপনার আদেশ পালন না ক'রে আমার উপায় নেই।" উত্তরাখণ্ডের আশ্রমসমূহে ও সাধুসমাজে এমনি ছিল গিরি মহারাজের প্রতিপত্তি।

লালতারাবাগের ভোলাগিরিজীর নিজস্ব আশ্রমটি নিতান্ত আড়ম্বরহীন। যখনি যৎসামান্য কিছু আহার্য্য ও অর্থাদি সেখানে

সঞ্চিত হইয়া উঠিত বৈরাগ্যবান মহাপুরুষ তখনি তাহা সাধুসন্তদের ভোজনের জন্য ব্যয় করিয়া পরম নিশ্চিন্তে বসিয়া থাকিতেন।

প্রসিদ্ধ দানব্রতী, ঝুন্‌ঝুন্‌ওয়ালা ভক্তিপূর্ণ হৃদয়ে স্বামীজীকে সেবার নিবেদন করেন, তাঁহার লালতারাবাগ আশ্রমের অট্টালিকা নির্ম্মাণের জন্য দুই লক্ষ টাকা দান করিতে শেঠজীর বড় অভিলাষ হইয়াছে। গিরি মহারাজ তখনি উহার উত্তরে বলিয়া উঠেন, "আপনি আপনার নিজ ইচ্ছে পূর্ণ করতে পারেন, আমি তাতে বাধা দেব না। কিন্তু আমি কমণ্ডলু ও কৌপীন সম্বল করে আশ্রমের বাইরে ঐ বট-বৃক্ষমূলেই বাস করতে থাকবো।" মহাপুরুষের এ মন্তব্য শুনিয়া শেঠজী সাহস করিয়া আর অধিক দূর অগ্রসর হন নাই।

গিরি মহারাজ লালতারাবাগে এক রাত্রিতে শয়ন করিয়া আছেন। নিদ্রিতাবস্থায় তিনি এক বিচিত্র স্বপ্ন দেখিলেন। দেবাদ্দিদেব মহাদেব জ্যোতির্ম্ময় রূপে চতুর্দ্দিক উদ্ভাসিত করিয়া তাঁহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন। তাঁহাকে সস্নেহে ডাকিয়া ঠাকুর কহিলেন, "ভোলানন্দ, আমার এক বিগ্রহ তোমার এ আশ্রমের প্রান্তে মাটির নীচে অবস্থান করছে। অগৌণে তুমি আমাকে ওখান থেকে উঠিয়ে এনে এ আশ্রমে প্রতিষ্ঠিত কর। তোমার মত প্রিয় ভক্তের নিত্যকার পূজোর জন্য আমি অভিলাষী হয়েছি।"

গিরি মহারাজের নিদ্রা ভাঙ্গিয়া গেল। ব্যস্তসমস্ত হইয়া সেই রাত্রেই তিনি নির্দ্দিষ্ট স্থানটির দিকে ছুটিয়া গেলেন। সেখানকার মৃত্তিকা কিছুটা খনন করিতেই স্বপ্নকথিত শিবলিঙ্গ দৃষ্টিগোচর হইল। সকলে সবিস্ময়ে দেখিলেন, এই পবিত্র শিলা প্রতীককে বেষ্টন করিয়া আছে এক বৃহদাকার বিষধর সর্প। আপনা হইতেই কিন্তু এই সর্পটি ধীরে ধীরে সেই স্থান ত্যাগ করিয়া গেল। আশ্রমিকগণসহ স্বামীজী তাঁহার নবলব্ধ শিবলিঙ্গকে বার বার ভক্তিপ্লুত হৃদয়ে প্রণাম করিতে লাগিলেন। অতঃপর সাড়ম্বরে বিগ্রহের পূজা সম্পন্ন হয় ও আশ্রমগৃহে ইঁহাকে স্থাপন করা হয়।

গিরি মহারাজ ইহার নামকরণ করেন—গৌরীশঙ্করজী। নিজেই তিনি রোজ এই শিবলিঙ্গের পূজা করিতেন। তাছাড়া, শিষ্যদের ডাকিয়া বলিতেন, "ছাখ্, স্মরণ রাখ্‌বি এই শিবলিঙ্গ বড় জাগ্রত। ভক্তি সহকারে এঁর পূজো করলে মানবের সর্ব্ব কামনা সিদ্ধ হয়।"

১৯০২ সালের কথা। ভোলানন্দ মহারাজের চক্ষুতে কিছুদিন যাবৎ এক দুরারোগ্য ব্যধি জন্মিতে থাকে। ফলে তাঁহার দুইটি চক্ষুই একেবারে অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে। কলিকাতায় আনিয়া ভক্তেরা তাঁহার বহু চিকিৎসা করাইলেন, কিন্তু কোন ফল হইল না। গিরিজী তাঁহার দুই নয়নেরই দৃষ্টিশক্তি হারাইয়া ফেলিলেন।

হরিদ্বারে ফিরিয়া গিয়া লালতারাবাগ আশ্রমের শান্ত পরিবেশে ভোলানন্দ মহারাজ তখন বাস করিতেছেন। এই সময়ে এক তরুণ মাড়োয়ারী সন্ন্যাসী একনিষ্ঠভাবে তাঁহার সেবায় ব্রতী হন। ইহার নামও ভোলাগিরি। এ শিষ্যটি প্রাণপাত করিয়া তাঁহার সেবা শুশ্রূষা করিতেন, সঙ্গে সঙ্গে গুরুদেবের দৃষ্টিহীনতার জন্য তাঁহার মর্ম্মদাহের সীমা থাকিত না।

ভোলানন্দজীর অন্তরে কিন্তু এ জন্য বিন্দুমাত্র খেদ নাই। সর্ব্ব অন্তর ও সর্ব্ব সত্ত্বা তখন তাঁহার অন্তর্ম্মুখীন। আত্মানন্দে নিমজ্জিত হইয়া দিবারাত্র তিনি থাকেন আত্মবিস্মৃত।

আশ্রমের ভক্তদের ডাকিয়া প্রায়ই এই সময় কহিতেন, "তোমরা আমার জন্য কেন মর্ম্মপীড়া ভোগ করছো তা আমি বুঝতে পারিনে। আমি নিজে কিন্তু পরম আনন্দেই আছি। অন্ন গ্রহণে বা যে কোন সেবা গ্রহণে আমার অসুবিধা নেই। আমার প্রিয় সেবাব্রতী ভক্ত ভোলা সর্ব্বদা এজন্য তৎপর হয়েই রয়েছে। পুত্রাধিক মমতা নিয়ে আমার সেবা ক'রে যাচ্ছে।" জীবন মৃত্যু, লাভ ক্ষতি সমস্ত কিছু এই পরম নির্লিপ্ত মহাযোগীর কাছে তখন একাকার হইয়া গিয়াছে। কিন্তু আশ্রমের শিষ্যদের অন্তরে গুরুদেবের এই দৃষ্টিহীনতার জন্য ক্ষোভের অন্ত নাই।

পূর্ব্বোক্ত সেবক-শিষ্য ভোলাগিরির অন্তরে গুরুজীর পীড়ার এই দুঃখ এক শেলের মত বাজিয়াছে। দিবারাত্রই তিনি গিরি মহারাজের দৃষ্টিহীনতার জন্য শোকাকুল হইয়া থাকেন। ইহার কিছুদিন পরে এই শিষ্য নিজে এক দুশ্চিকিৎস্য রোগে আক্রান্ত হইয়া পড়েন। তাঁহার প্রাণরক্ষার জন্য আশ্রমিকদের সমস্ত কিছু সেবা যত্ন ও চিকিৎসা হয়। অন্তিমশয্যায় শায়িত অবস্থায়ও গুরুর জন্য তাঁহার দুশ্চিন্তার যেন অবধি নাই। বারবার সখেদে তিনি কহিতে লাগিলেন, "আমার সব চাইতে দুঃখ, বৃদ্ধ গুরুজীর অন্ধত্ব মোচন হওয়াটা আর দেখতে পেলাম না। হে শিব, তোমার কাছে আমার প্রাণের আকুল নিবেদন—তুমি কৃপা ক'রে তাঁকে দৃষ্টিশক্তি দাও আমার চোখ দুটির বদলে তাঁর চোখের আলো ফিরিয়ে দাও। এই কামনা দিয়েই শেষ নিঃশ্বাস আমি ত্যাগ করতে চাই।"

এই ভরমভক্ত সেবক-শিষ্য ইহার অব্যবহিত পরেই দেহত্যাগ করিলেন। কিন্তু গুরুদেবের রোগমুক্তির জন্য তাঁহার আকুতির মূর্চ্ছনা যেন ইহার পরও বারবার আশ্রমের আকাশ বাতাসকে আলোড়িত করিয়া তুলিতে থাকে।

কয়েকদিন পরের কথা। ভোলাগিরিজী লালতারাবাগে সেদিন স্বীয় আসনে বসিয়া ধ্যানমগ্ন রহিয়াছেন। হঠাৎ শুনিতে পাইলেন, মধুর কণ্ঠে কাহারা তাঁহাকে যেন বলিতেছেন, "ভোলা, চেয়ে ছ্যাখ্, আমরা কে!"

চোখ তুলিয়াই গিরিজীর আনন্দ ও বিস্ময়ের অবধি রইল না। দেখিলেন, চারিদিক আলোয় আলোময় করিয়া হরপার্ব্বতী তাঁহার সম্মুখে আবির্ভূত হইয়াছেন! আশুতোষ তাঁহার বরাভয়দানকারী হস্তটি উত্তোলন করিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন, "ভোলা, আজ থেকে তুই তোর একটি চক্ষু লাভ কর্‌লি।

ভোলানন্দ মহারাজ পুলকিত দেহে আরাধ্য দেব দেবীর সম্মুখে

সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিলেন। ধীরে ধীরে এই দিব্য যুগলমূর্ত্তি অদৃশ্য হইয়া গেল। ইহার পরেই কিন্তু মহারাজ তাঁহার একটি চক্ষুর দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়া পান।

সন্ন্যাসী শিষ্যদের জীবন গঠনে কোনদিনই স্বামীজী মহারাজের তীক্ষ্ণ দৃষ্টির অভাব ছিল না। তাহাদের বাহ্য সন্ন্যাস অপেক্ষা তিনি সত্যকার বৈরাগ্যকেই গুরুত্ব দিতেন বেশী। সন্ন্যাস ব্যতীত ঈশ্বর প্রাপ্তি কি করিয়া হইবে—গৃহীদের এ প্রশ্নের উত্তরে তাঁহাকে প্রায়ই বশিষ্ঠের শত পুত্রের উল্লেখ করিতে শুনা যাইত। সংসারাশ্রমীদের তিনি ভক্তি-পথে থাকিতে ও দানকর্ম্মে আত্মনিয়োগ করিতে নির্দ্দেশ দিতেন। সন্ন্যাসী শিষ্যদের লোকদেখানো বৈরাগ্য দেখিলে তাঁহার বিরক্তি চরমে উঠিত।

একবার আশ্রমের এক নবীন সন্ন্যাসীর মাতা স্বামীজীর নিকট অভিযোগ করিয়াছেন, পুত্র তাঁহার নিকট দীর্ঘদিন পত্র দেয় নাই। শিষ্যকে ডাকাইয়া তখনি তিনি প্রশ্ন করিলেন।

শিষ্য কহিলেন, তিনি সন্ন্যাসী ; পিতামাতার মায়িক সম্বন্ধ তো কাটাইয়া দিয়াই আসিয়াছেন। পত্র লেখার পর্ব্ব আর কেন ?

ভোলানন্দ ক্রুদ্ধ ও উত্তেজিত হইয়া বলিতে লাগিলেন, "ওরে, নূতন সন্ন্যাসী হবার সঙ্গে সঙ্গে দেখছি আচার্য্য শঙ্করের চেয়েও তুই জ্ঞানী হয়ে পড়েছিস। শঙ্কর নিজের হাতে তাঁর মায়ের পারলৌকিক কাজ সম্পন্ন করেছিলেন, আর তুই কিনা তোর মাকে একখানা চিঠিও দিতে পারিসনে ? সাবধান, এরকম আর কখনো করবিনে। নকল জ্ঞানী না হয়ে, প্রকৃত জ্ঞানী হতে চেষ্টা করবি। কঠোর বৈরাগ্য ও তপস্যার সঙ্গে সঙ্গে মন ইষ্টদেবে যুক্তি রাখবি। বাহ্য ব্যবহারটি ঠিক রাখবি, কিন্তু অন্তরে সজাগ থেকে লক্ষ্য রাখবি, মনে যেন কোন রকম আসক্তি না আসতে পারে।"

আশ্রম-কার্য্যের উপর স্বামীজী অত্যধিক গুরুত্ব প্রদান

করিতেন। নূতন যুবক শিষ্যদের কাছে ডাকিয়া প্রায়ই বলিতেন, "তোদের বয়স অল্প, খুব নিষ্ঠা নিয়ে আশ্রমের জন্য পরিশ্রম করবি আর তপস্যা করবি। কি রে, আশ্রমের কাজ করতে তোদের বুঝি তেমন ভাল লাগে না? মাটি কাটা, ঘাস কাটা, কূয়ো থেকে জল তোলা, বাজার থেকে মাথায় ক'রে জিনিসপত্র নিয়ে আসা—এগুলো করতে তোদের বুঝি খুব সঙ্কোচ বোধ হয়? তা হতেও পারে। তোরা সব বাবু ছিলি, এখন এই চাষী গুরুর কাছে এসে তোদের চাষীগিরি করতে হচ্ছে। তা কি আর করবি বল? হয়তো আর কোনো পণ্ডিত আচার্য্যের কাছে দীক্ষা নিলে তোদের এত কষ্ট সহ্য করতে হতো না। দিন-রাত শাস্ত্র পাঠ ক'রে কাটিয়ে দিতে পারতিস।"

কোন কোন শিষ্য হাসিয়া বলিতেন, "গুরুজী, চাষী আপনি ঠিকই—বরং উত্তম চাষী। অনেক পতিত জমিতে চাষ-আবাদ ক'রে আপনি সত্যই সোনার ফসল ফলিয়েছেন।"

নিত্যকার কর্ম্মের মধ্য দিয়া অধ্যাত্মসাধন অনুষ্ঠান করা ও প্রতিটি অনুভূতিকে যাচাই করিয়া চলা—শিষ্যদের কল্যাণের জন্য ইহাই ছিল গিরিমহারাজের নির্দ্ধারিত ব্যবস্থা। ইহাই তাঁহার আশ্রমিক কর্ম্মসূচীর প্রধান অঙ্গ। বিশেষ করিয়া নবদীক্ষিত সন্ন্যাসীদের পক্ষে এ কাজ তিনি কল্যাণকর মনে করিতেন। কিন্তু মূল কথাটিকে আড়ালে রাখিয়া শিষ্যদের বুঝাইতেন, "না বেটা, কর্ম্মে আলস্য করতে নেই। কর্ম্ম না ক'রে বসে বসে অন্ন খেলে পাপ হয়! দ্যাখ্, গৃহস্থেরা কষ্ট ক'রে নিজেদের অন্ন থেকে কিছুটা বাঁচিয়ে সাধুদের দান করে। কাজ না করে খেলে তপস্যার ফল যে কমে যায়! এই দ্যাখ্, আমি নিজেও কত মেহনৎ করে খাই—আমার কি অভাব বল্‌তো? তবু এই বৃদ্ধ শরীর নিয়ে তোদের সঙ্গে এত কাজ করি কেন?"

আশ্রমের বাগানে বড় বড় ঘাস জন্মে। গাভীদের জন্য এগুলি কাটিয়া বাছিয়া শুকাইয়া রাখিতে হয়। ভোলানন্দজী একদিন

অঙ্গনে বসিয়া ঘাস বাছিতেছেন। হঠাৎ তিনি বলিয়া উঠিলেন, "হ্যাঁ ভাই, তোদের সত্যকার দৃষ্টি কোথায় বলতো? ঘাস বাছাই-এর কাজ ক'রতে ক'রতে ঘাসকে বুঝি তোরা সকলে ঘাসরূপেই দেখ্‌ছিস্? না ভাই, ওভাবে কখনো দেখতে নেই। কর্ম্মে ব্রহ্মদর্শন ক'রতে হয়। মনে করবি যে ঘাস হ'লো ব্রহ্ম বা পরমাত্মা আর আগাছা হ'লো যেন শরীর, ইন্দ্রিয়, এই সব। আগাছারূপ শরীর ও পঞ্চেন্দ্রিয় প্রভৃতি থেকে পৃথক করে তোরা ঘাসরূপী ব্রহ্মকে জান্‌বি। এভাবে সব সময় বিচার করবি—এরই নাম কর্ম্মে ব্রহ্মদর্শন। হাতে কাজ করবি, আর সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেক কাজ হতেই তত্ত্বোপদেশ গ্রহণ কর্‌বি।"

শিষ্য ধ্রুবানন্দজীর সহিত গিরি মহারাজ সেদিন আশ্রমে গোশালার নর্দ্দমা পরিষ্কার করিতেছেন। কিছুক্ষণ কাজ করার পর দুর্গন্ধের জন্য শিষ্য অস্থির হইয়া উঠিলেন, কাপড় দিয়া নাক না বাঁধিয়া কোন উপায় রহিল না। ভোলাগিরি মহারাজ ইহা লক্ষ্য করিয়া কহিতে লাগিলেন, "বেটা! আমি এই বৃদ্ধ বয়সে দুই হাতে নর্দ্দমা ঠেলে এ দুর্গন্ধ সহ্য করছি, আর তুই পারছিস না?"

শিষ্য তখনই বলিয়া উঠিলেন, "বাবা, আপনার কথা আলাদা। আপনি ব্রহ্মজ্ঞপুরুষ, সমদর্শী—সুগন্ধ দুর্গন্ধ সবই আপনার নিকট একাকার হয়ে গিয়েছে। আমরা তো এখনো তেমন হতে পারিনি!"

গিরি মহারাজ স্মিতহাস্যে উত্তর দিলেন, "না বেটা! এসব কাজে কোনরূপ ঘৃণাবোধ থাকতে নেই। গরু যে আমাদের মাতৃস্থানীয়া, দুধ খাইয়ে আমাদের বাঁচায়। মায়ের সেবায় কি ঘৃণা করতে আছে রে? এই দেখছিস্ না, আমি বুড়ো মানুষ বলে বড় বড় সাধুরা কখনো আমার সেবা গ্রহণ করেন না। তাই তো আমি নিজেকে এমন ক'রে গোমাতার সেবায় নিয়োজিত করেছি।

উত্তরাখণ্ডের সাধুদিগকে ভোলাগিরিজী মাঝে মাঝে তাঁহার

লালতারাবাগ আশ্রমে নিমন্ত্রণ করিয়া খাওয়াইতেন। সেবার হরিদ্বার, কন্‌খল ভীমগোড়া প্রভৃতি স্থানের বহুতর বিশিষ্ট সাধু সন্ন্যাসীদের নিমন্ত্রণ করা হইয়াছে। লাড্ডু, পুরী, কচুরী প্রভৃতি তৈরীর জন্য আশ্রমে খুব ব্যস্ততা। রাত্রিতে আহারান্তে স্বামীজী স্বয়ং তাঁহার শিষ্যগণসহ দুই মণ আলুর খোসা ছাড়াইতে বসিলেন। রাত্রি গভীরতর হইলে নিজে শয্যায় শুইতে গেলেন, কিন্তু নির্দ্দেশ রহিল—কেহ যেন কাজে কোন অবহেলা না করে। পরদিন প্রায় চার-শত সাধু এ আশ্রমে ভিক্ষা গ্রহণ করিবেন।

গিরিমহারাজ চলিয়া যাইবার পরই কিন্তু পরিশ্রান্ত আশ্রমিকেরা ধীরে ধীরে নিজ নিজ শয্যায় গিয়া শুইয়া পড়িলেন। শেষ রাত্রিতে স্বামীজী হঠাৎ আবার উঠিয়া আসিয়াছেন। শিষ্যদের এ কর্ম্ম-শৈথিল্য দেখিয়া তিনি ক্রোধে ক্ষিপ্ত প্রায় হইয়া উঠিলেন। তীব্র ভৎ´সনা ও উচ্চ চীৎকারে শিষ্যগণ প্রমাদ গণিলেন। ইতিমধ্যে শয্যা ত্যাগ করিয়া ভয়ে কেহ খাটের নীচে কেহ বা গৃহের বাহিরে লুকাইয়াছেন।

একটি মাদ্রাজী সন্ন্যাসী এই আশ্রমে নবাগত। গিরি মহারাজের এত হৈচৈ শুনিয়া ভীতত্রস্ত অবস্থায় তিনি নিজের শয্যার উপরে উঠিয়া বসিয়াছেন। ক্রোধোদ্দীপ্ত ভোলানন্দজী এই নবাগত সাধুর পিঠেই সহসা এক লাথি মারিয়া বসিলেন। উত্তেজিত কণ্ঠে তিনি বলিতে লাগিলেন, "তোমাদের কারুর কোন আক্কেল নেই? এতগুলো সাধু মহাত্মা কাল আশ্রমে ভিক্ষা গ্রহণ করবেন—আর তোমরা সব নিশ্চিন্তে নিদ্রা দিচ্ছো!"

ধীরে ধীরে সব আশ্রমিকই পুনরায় কাজে আসিয়া বসিলেন। মাদ্রাজী সন্ন্যাসীটিকে লক্ষ্য করিয়া এক আশ্রমবাসী এই সময় কহিতেছিলেন, "কি দুঃখের কথা। আপনি শিষ্য নন, আশ্রমে নবাগত অতিথি! অথচ স্বামীজী আপনাকেই পদাঘাত করে বসলেন!"

সন্ন্যাসীটি হাসিয়া বলিলেন, "ভাই, এ মহাপুরুষের কি আর আত্মপর ভেদজ্ঞান আছে? শিষ্য ও অশিষ্যের ভেদরেখা এঁর কাছে তো কিছু নেই! এঁর পদাঘাত পাবার সৌভাগ্যে আমি সত্যই আজ ধন্য হয়েছি। তাছাড়া, আপন মনে না করলে কি ইনি আমায় মারতে পারতেন? এঁরা কখনো বা বজ্রের মত কঠোর, কখনো বা একেবারে ফুলের মত কোমল—কখনো রুদ্র, কখনো বালক স্বভাব। আজ মহাত্মার রুদ্ররূপ দেখে আমার বড় আনন্দ হয়েছে।"

শিষ্যদের উপর কখন কিভাবে যে এই মহাপুরুষের রোষ নিপতিত হইত তাহা বুঝিবার যো ছিল না। একদিন সন্ধ্যারতির সময় ভোলাগিরি মহারাজ মন্দির বিগ্রহের সম্মুখে দাঁড়াইয়া বাদ্য বাজাইতে উদ্যত হইয়াছেন। বৃদ্ধ গুরুমহারাজের কষ্ট হইবে মনে করিয়া তরুণ সন্ন্যাসী ধ্রুবানন্দ তাঁহার হাত হইতে এটি নিতে গেলেন। গিরি মহারাজ এই সামান্য ব্যাপারে ক্রুদ্ধ হইয়া সেদিন যে কাণ্ড করিয়া বসিলেন তাহাতে সকলের বিস্ময়ের অন্ত রহিল না। একটি বৃহৎ বংশদণ্ড দিয়া সজোরে ধ্রুবানন্দজীর মস্তকে তিনি আঘাত করিতে লাগিলেন। বলা বাহুল্য, সেদিন শিষ্যের পক্ষে গুরুজীর এই কঠোর ও অপ্রত্যাশিত আচরণের মর্ম্ম বুঝিয়া উঠা সম্ভব হয় নাই।

পরদিন প্রভাতে উভয়ের দেখা। স্বামীজী সস্নেহে ধ্রুবানন্দজীকে নিকটে ডাকিয়া আনিয়া বসাইলেন। তারপর বলিতে লাগিলেন, "বেটা, কাল তোর মাথায় লাঠি দিয়ে জোরে প্রহার করেছিলাম। তোর নিশ্চয়ই খুব লেগেছিল, না?"

শিষ্য উত্তরে সবিনয়ে কহিলেন—হয়তো তাঁহার কোন অন্যায় সত্যই হইয়াছিল, নতুবা কৃপালু গুরুজী এমন কঠোর হইয়া উঠিবেন কেন? এ কথাটি ভাবিয়াই, এ প্রহারে তাঁহার ক্রোধের উদ্রেক হয় নাই, ইহাও তিনি জানাইলেন। ভোলাগিরি মহারাজ তখন স্নেহভরা কণ্ঠে বলিলেন, "বেশ বেটা, বেশ! গুরু শাসন করলে

কখনো ক্রোধ করতে নেই। গুরু যা কিছু করেন, তা শিষ্যের মঙ্গলের জন্যই! সর্ব্বদা একথা মনে রাখ্‌বি কর্ম্মকার যেমন লোহাকে পুড়িয়ে পুড়িয়ে উত্তম যন্ত্রপাতিতে পরিণত করে, সাধনপথে সদ্‌গুরু তেমন শাসন ও কঠোর নিয়ন্ত্রণের ভেতর দিয়ে শিষ্যকে সার্থক করে তোলেন।"

সেদিন সবেমাত্র ভোর হইয়াছে। ভোলাগিরিজী আশ্রমের এক ব্রহ্মচারীর কক্ষে হঠাৎ উপস্থিত হইয়াই তাঁহাকে পদাঘাত করিয়া বসিলেন। ব্রহ্মচারীটি তো অবাক। প্রহারের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে স্বামীজী মহারাজ খুব উত্তেজিত কণ্ঠে বলিলেন, "তোকে লাথি মারবো না তো পূজো করতে হবে নাকি? বেলা সাতটা বেজে গিয়েছে, এখনো তোর গাত্রোত্থান করার সময় হয় নি। বাঃ রে আমার ব্রহ্মচারী। ঘরে বুঝি খাবার ছিল না, তাই আশ্রমে এসে মজা করে ভোলাগিরির পাৎলা রুটি বসে বসে খাচ্ছিস্। এই মুহূর্ত্তে বাগানে যা, সেখানে গিয়ে কাজ কর।"

অভিমানে ব্রহ্মচারীর দুই গণ্ড বহিয়া অশ্রু ঝরিতেছে। করুণ কণ্ঠে বলিতে লাগিলেন, "বাবা, আপনি এমন কঠোর কথাটি আজ আমায় বলে বসলেন? আপনি তো নিজে ভাল করেই জানেন, কোনদিন আমার খাওয়ার অভাব ছিল না।"

গিরি মহারাজ তাঁহাকে আরও নানা মর্ম্মভেদী বাক্যবাণে বিদ্ধ করিতে ছাড়িলেন না—"ওরে তোর ঘরে খাবার নেই, আবার পেটে বিদ্যাও নেই, তাইতো আশ্রমের রুটি খাবার জন্য এখানে এসে জুটেছিস।" তিনি যতই শ্লেষ প্রয়োগ করেন ব্রহ্মচারী ততই অভিমানে ফুলিতে থাকেন। গুরুদেবকে তিনি বলেন—কাজ কর্ম্মের শেষে আজ রাত্রেই হৃষীকেশের যে কোন ছত্রে চলিয়া যাইবেন, ইহাই তাঁহার দৃঢ় পণ। বাগানের কাজে তিনি যোগ দিলেন সত্য, কিন্তু চোখ বহিয়া কেবলই তাঁহার অশ্রুধারা ঝরিতেছে।

পদাঘাত ও কটুবাক্যে অভিমানী ব্রহ্মচারী শিষ্যটি থাকিয়া থাকিয়া কেবলই কাঁদিতেছেন। এইবার কিন্তু ভোলাগিরি মহারাজের নরম হইবার পালা। বারবার আশ্রমিকদের শুনাইয়া তিনি ব্রহ্মচারীর কত প্রশংসা করিতে লাগিলেন—এমন বিদ্বান ধীর স্থির ও গুরুভক্ত ছেলে তিনি তাঁহার জীবনে কখনও দেখেন নাই—এ আশ্রমের সে তো এক রত্ন বিশেষ, ইত্যাদি ইত্যাদি।

তরুণ ব্রহ্মচারীর অভিমান তখনও যায় নাই। তিনি উত্তেজিত হইয়া কহিতে লাগিলেন, "বাবা আপনি আমাকে যতই খোসামোদ করুন না কেন, আমি কিন্তু এরূপ দুর্ব্বাক্য শোনার পর এখানে কিছুতেই আর থাকবো না। হৃষিকেশের ছত্রে সাধুদের দৈনিক আহার বেশ জুটে যায়। আমি নিশ্চয়ই আজ চলে যাবো, কোন কথাতেই আর আমি ভুলছি নে।" স্বামীজী মহারাজও ঘুরিয়া ফিরিয়া এই একই তোষামোদের লীলা অভিনয় করিতেছেন। কিন্তু ব্রহ্মচারী একেবারে স্থিরকল্প, লালতারাবাগ আশ্রম ত্যাগ করিয়া আজ নিশ্চয়ই কোথাও চলিয়া যাইবেন।

এইবার ভোলাগিরি মহারাজের অপার প্রেমৈশ্বর্য্য সর্ব্বসমক্ষে প্রকাশিত হইয়া পড়িল। অপলক দৃষ্টিতে তিনি প্রস্থানোদ্যত ব্রহ্মচারী শিষ্যের মুখের দিকে চাহিয়া আছেন, আর অনর্গল ধারায় দুই নয়ন হইতে প্রেমাশ্রু নির্গত হইতেছে। পরম শান্ত মহাযোগী এবার করুণায় বিগলিত—উত্তুঙ্গ হিমবন্তের জমাট তুষার মৃত্তিকার মমতায় যেন গলিয়া ঝরিয়া পড়িতেছে। আশ্রমস্থ সাধু সন্ন্যাসীর দল স্বামীজী মহারাজের এ অপরূপ প্রেমঘন মূর্ত্তি ও করুণালীলা দর্শনে অভিভূত হইয়া পড়িলেন। ব্রহ্মচারীর হৃদয়ের সমস্ত অশান্তি ও বিক্ষোভ ততক্ষণে একেবারে নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়াছে কাঁদিতে কাঁদিতে ছুটিয়া আসিয়া তিনি স্বামীজীর পদপ্রান্তে নিপতিত হইলেন।

ভোলানন্দ স্নেহার্দ্র স্বরে তাঁহাকে শুধু কহিলেন, "বেটা! স্নান

শেষ করে এবার আহার করে আয়। তোরা জানিস্ নে, তোদের প্রস্তুতি আর পরীক্ষার জন্য আমায় হৃদয়হীনের মত কত দুর্ব্বাক্য বলতে হয়।”

সেবক-শিষ্যগণ গিরিমহারাজের শয্যা রচনা করিতেন। এই কাজ নিয়া রোজই কিন্তু হাঙ্গামার অন্ত ছিল না। একটুখানি উঁচু নীচু থাকিলেই স্বামীজী উহা নিয়া রীতিমত হুলুস্থুলু বাধাইয়া দিতেন। বলা বাহুল্য, প্রকৃত উদ্দেশ্য—এই কার্য্য উপলক্ষ করিয়া শিষ্যদের হৃদয়ে গুরুসেবা এবং একনিষ্ঠাকে গ্রথিত করিয়া দেওয়া।

সেদিন ব্রহ্মচারী ললিত গুরুদেবের বিছানা প্রস্তুত করিয়াছেন। ভোলাগিরি মহারাজ ইহা দেখিয়াই উত্তেজিতভাবে বলিতে লাগিলেন, “কোন কাজেই কারুর নিষ্ঠা নেই—ত্যাখ্ দেখি, বিছানার মধ্যে কতটা জায়গা উঁচু হয়ে আছে।” শিষ্যটি সবিনয়ে প্রতিবাদ জানাইলেন। আর যায় কোথায়? মহারাজ সঙ্গে সঙ্গে তীব্র ক্রোধে গর্জ্জিয়া উঠিলেন,—“গাধা কোথাকার! দেখতে পাচ্ছিসনে, কোথায় কাজের ত্রুটি হয়েছে? সামান্য একটু মনোযোগ দিয়েও গুরুসেবা করতে পারিস নে? কি করেই বা করবি? বাপ মায়েরই সেবা জীবনে কখনো ক্‌রিস্ নি, গুরুর সেবা তোর দ্বারা কি ক’রে হবে?”

কথা কয়টি বলিবার সঙ্গে সঙ্গেই স্বামীজী উত্তেজিতভাবে সেবক ব্রহ্মচারীটির হাতের অঙ্গুলি লোহার পালঙ্কে রগড়াইতে লাগিলেন। বেদনায় অধীর হইয়া শিষ্য চীৎকার করিয়া উঠিলেন।

মুহূর্ত্তমধ্যে গিরিমহারাজের রোষাভিনয়ে এক পট পরিবর্ত্তন ঘটিয়া গেল। তিনি তখন একেবারে নূতন মানুষটি। শান্ত ও দৃঢ়কণ্ঠে এ শিষ্যকে বুঝাইয়া কহিতে লাগিলেন, “ওরে, বেদনা কার শরীরে লাগে? তুই কি এই শরীর? রক্ত মাংস মেদ মজ্জায় গঠিত এই শরীর। এতে আঘাত লাগলে কি তোর লাগলো? ধ্যান জ্ঞান তোদের প্রকৃতপক্ষে কোন দিকে বল্‌তো? শুধু মুখে

'আমি শরীর নই' বলে ঘোষণা করলেই কি জ্ঞানী হওয়া যায়? এজন্য চাই—শরীরের নশ্বরতা উপলব্ধি করে দেহবুদ্ধি একেবারে ত্যাগ করা। সর্ব্বস্ব ছেড়ে তোরা সন্ন্যাসী হয়েছিস—দেহের কষ্টে চঞ্চল হবি কেন? আমি শরীর বা ইন্দ্রিয় নই, এসব থেকে এক পৃথক পরম বস্তু—আত্মা; এই ভাব সর্ব্বদা ধরে রাখতে হবে। তবেই তো সাধনার সার্থকতা!"

স্বামীজীর শিষ্য মহেশানন্দগিরিজী অবধূতবৃত্তি অবলম্বন করিয়াছেন। শুধুমাত্র এক কৌপীন সম্বল করিয়া নানাস্থানে ঘুরিয়া বেড়ান। সেবার তিনি লালতারাবাগ আশ্রমে আসিয়াছেন। এই সময় প্রবল জ্বরের আক্রমণে তিনি মুহ্যমান হইয়া পড়েন! আশ্রমের এক সন্ন্যাসী পীড়াপীড়ি করায় মহেশানন্দজী একটি কম্বল জড়াইয়া চাটাইর উপর শয়ন করিয়া রহিলেন।

স্বামীজী হঠাৎ তাঁহার কক্ষে আসিয়া উপস্থিত। রোগক্লিষ্ট শিষ্যের জ্বরের অবস্থা জিজ্ঞাসা করিতে গিয়াই ঐ কম্বলটির উপর তাঁহার দৃষ্টি পতিত হইল। অমনি রোষে গর্জ্জিয়া উঠিলেন, "অবধূতবৃত্তি নিয়ে আবার কম্বল ব্যবহারের প্রয়োজন বোধ হয় কেন রে? রাস্তায় বা জঙ্গলে যখন জ্বর হবে তখন কি তোর মা অথবা মাসী কম্বল নিয়ে তোর জন্য বসে থাকবে? কম্বল ব্যবহারের ইচ্ছেই যদি থাকে, তবে অবধূতগিরির ভান না করে তোর এসব সন্ন্যাসী গুরুভাইদের মতন তুই জামা পরে থাকিস্ নে কেন? আমার তাতে কোন আপত্তি নেই। হয় অবধূতবৃত্তি ত্যাগ কর্, নয় কম্বল বর্জ্জন কর্।"

ভোলাগিরি মহারাজের তাৎপর্য্যপূর্ণ কথাটি শিষ্যের অন্তরে তত্ক্ষণে দাগ কাটিয়া বসিয়া গিয়াছে। গুরুদেবকে ভক্তিভরে প্রণাম করিয়া তিনি কম্বলটি দূরে নিক্ষেপ করিলেন। স্বামীজী এই কক্ষ হইতে সেদিন নিষ্ক্রান্ত হইবার অব্যবহিত পরেই কিন্তু মহেশানন্দের রোগমুক্তি ঘটিয়াছিল।

আশ্রমে গিরিজীর এক তরুণ পাঞ্জাবী সন্ন্যাসী একদিন এক শাদা রং-এর বহির্ব্বাস পরিয়া অঙ্গনে ঘোরাঘুরি করিতেছেন। তাঁহার দিকে দৃষ্টি পড়িতেই অমনি গিরি মহারাজের রোষবহ্নি প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। ক্রুদ্ধ কণ্ঠে কহিলেন, "ওরে, আবার যে তুই শাদা কাপড় প'রে ঘুরে বেড়াচ্ছিস? যা ত্যাগ করেছিলি, তা আবার রাখতে চাস্! কেন! বমি করে আবার তা খাচ্ছিস, তোর কি লজ্জা সরম কিছুই নেই? যা এখনি এসব ছেড়ে ফেল। আরো একটা কথা। আমি লক্ষ্য করেছি, তুই মাঝে মাঝে বহির্ব্বাস ছেড়ে শুধু কৌপীন প'রে এখানে পদচারণা করিস্। আর যেন এটা কখনো না হয়। শুধু কৌপীন পরে থাকবার ইচ্ছে হ'লে এ আশ্রমে কিন্তু তা হবে না। এমন জায়গায় চলে যা, যেখানে মেয়েছেলের গতায়াত একেবারে নেই।" সন্ন্যাসী শিষ্যদের আচার আচরণ ও সাধনজীবনকে ভোলানন্দ মহারাজের সজাগ দৃষ্টি এমনি সতর্ক প্রহরায় সতত ঘিরিয়া রাখিত।

একবার এক শিষ্য সকাতরে স্বামীজীকে নিবেদন করিলেন, "বাবা, আপনার নিকট দীক্ষা গ্রহণ ক'রেছি। কয়েক বৎসর ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যেও রয়েছি। কিন্তু বাবা, আমার সাধনজীবনে কোন সুস্পষ্ট উন্নতি আজো কিছুই দেখা গেল না। আমার সমস্ত জীবন একেবারে বৃথা হয়ে গেল।" কথা কয়টি বলিবার সঙ্গে সঙ্গে শিষ্যটি তীব্র ভাবাবেগে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন।

সহসা সেখানে এক বিচিত্র করুণ দৃশ্যের অবতারণা হইল। গিরি মহারাজও শিষ্যের দুঃখে বিগলিত হইয়া কম কাঁদিলেন না। নয়ন হইতে অঝোরে অশ্রু ঝরিয়া পড়িতেছে, আর একখণ্ড বস্ত্রদ্বারা তিনি তাহা বারবার মুছিয়া ফেলিতেছেন।

অতঃপর কিছুটা শান্ত হইয়া শিষ্যটিকে তিনি বুঝাইলেন, "বেটা তোর প্রাণের দুঃখ আজ আমার বুকে বেজেছে, আমায় কাঁদিয়েছে। কিন্তু কি ক'রবো বল্? সাধনরূপ পত্নী আমি তোকে এনে দিয়েছি,

তার সঙ্গে যুক্ত হয়ে জ্ঞানরূপ পুত্র তোকে লাভ করতে হবে। এ কর্ত্তব্য যে তোরই। এর জন্য চাই তীব্র তপস্যার অনুষ্ঠান। আর এই তপস্যার ভিত্তি হচ্ছে বৈরাগ্য। শুধু জাগতিক বস্তুনিচয়ের প্রতি বৈরাগ্য থাকলেই হবে না, চাই এই দেহের প্রতি প্রকৃত আশক্তিহীনতা। আমিত্বভরা এ দেহের প্রতি আকর্ষণ যতদিন থাকবে, জাগতিক বস্তুর প্রতি বিতৃষ্ণা ততদিন আসবে না, এটা জানবি। দেহের প্রতি অনাসক্তি যখন ঠিক আসবে, তখনই বুঝবি প্রকৃত বৈরাগ্য এসেছে—তপস্যাও তখন ঠিক ঠিক হবে। তীব্র তপস্যা না হলে জ্ঞান প্রাপ্তি কখনো হয় না, বেটা! হতাশ না হয়ে তপস্যায় লেগে যা—অচিরে শান্তি মিলবে। ভয় কি রে? আমি তো রয়েছি। গুরুতে নিষ্ঠা রেখে সাধন করে যা।"

আত্মারাম মহাজ্ঞানী ভোলানন্দের দৃষ্টিতে সংসারের শোক তাপ, জন্ম মৃত্যু সমস্ত কিছুই একাকার না হইয়া পারে নাই! অথচ ব্যবহারিক জীবনের ক্ষেত্রে দাঁড়াইয়া মানুষের দুঃখ দৈন্যকে তিনি অপার করুণাভরেই গ্রহণ করিতেন। পরম কারুণিক ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষের প্রেম ও সমবেদনার মধ্য দিয়া সংসারক্লিষ্ট মানুষ তাহার প্রার্থিত শান্তি ও আশ্রয় খুঁজিয়া পাইত।

গিরি মহারাজ সেদিন শিষ্যগণসহ আশ্রমের বাগানে কর্ম্মরত। বাগানের দ্বার দিয়া একটি লোক তখন ভিতরে প্রবেশ করিতেছে। দূর হইতে তাহাকে দেখিয়াই সখেদে নিম্নস্বরে তিনি কহিয়া উঠিলেন, "হায় বেটা! কি দুঃখই তুমি পেয়েছো!" ব্যাপার কি, তাহা জিজ্ঞাসা করা হইলে কহিলেন, "যে লোকটি আমার কাছে আস্‌ছে, তার প্রিয় ভাইটির মৃত্যু হওয়ায় সে একেবারে ভেঙ্গে পড়েছে।"

ভদ্রলোকটি স্বামীজীর চরণতলে লুটাইয়া পড়িয়া কাঁদিতে কাঁদিতে কহিলেন, "বাবা, আমার সর্ব্বনাশ হয়ে গিয়েছে।"

গিরিজী দুঃখে একেবারে বিগলিত হইয়া তাঁহাকে বুকে জড়াইয়া

ধরিলেন। তাঁহার নিজের নয়ন হইতেও তখন অজস্র ধারায় শোকাশ্রু নির্গত হইতেছে। মহাপুরুষের এই সমবেদনার স্পর্শ ও নয়নজলের ধারা আগন্তুকের শোকসন্তপ্ত হৃদয়কে ধীরে ধীরে শান্ত করিয়া আনিল।

ইহার পর স্বামীজী প্রেমপূর্ণ ভাষায় লোকটিকে কিছু উপদেশ দিলেন। কহিলেন, "শোক করিবেন না, আপনার ভাই অন্য লোকে গমন করেছেন। তাঁর প্রতি আপনার যে আকর্ষণ, সেরূপ আকর্ষণ কিন্তু আপনার প্রতি তাঁর আর নেই।" এই প্রসঙ্গে তিনি পুরাণ শাস্ত্রাদি হইতে সময়োপযোগী নানা কাহিনী ও পরলোকতত্ত্ব বিবৃত করিলেন। ভ্রাতৃ-বিয়োগবিধুর ব্যক্তিটির শোক বিদূরিত হইয়া গেল।

অখণ্ড বোধের পরম সত্তায় অবস্থিত গিরিজীর পক্ষে খণ্ড বুদ্ধির রাজ্যে এই গতায়াত ছিল নিতান্ত সহজ স্বাভাবিক।

বেদান্তোক্ত প্রকৃত অদ্বৈতজ্ঞান সম্বন্ধে ভোলানন্দজী নিজ জীবনের একটি কাহিনী বিবৃত করিলেন। তাঁহার নিজস্ব আদর্শের স্বরূপ ইহার মধ্য দিয়া বুঝিতে পারা যায়। গিরি মহারাজ তখন নবীন সন্ন্যাসীরূপে ভারতের বিভিন্ন তীর্থ পর্য্যটন করিতেছেন। এই সময়ে একদিন প্রত্যুষে এক প্রবীণ আত্মজ্ঞানী সাধুর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। সাধুটি নদীতীরে তর্পণ শেষ করিয়া উচ্চ স্বরে বারবার কেবলি আবৃত্তি করিয়া চলিয়াছেন, "গর্দ্দভোঽহম, বিড়ালোঽহম, কুক্কুটোঽহম" ইত্যাদি।

ভোলানন্দজী বিস্মিত হইয়া প্রাচীন তপস্বীর দিকে আগাইয়া গেলেন। চরণ বন্দনা করিয়া সবিনয়ে প্রশ্ন করিলেন, "মহারাজ, আপনার এরূপ বাক্য উচ্চারণের তাৎপর্য্য কি, তা আমায় কৃপা ক'রে বলুন। 'শিবোঽহম' না ব'লে আপনি এসব আবার কি বলছেন?"

মহাত্মা কহিলেন, "বেটা! অদ্বৈতভাবে উপাসনা করতে গিয়ে তোমরা সর্ব্বদা দ্বৈতভাবকেই টেনে আনো, শিবোঽহম বলতে গিয়ে

নিজেকে জীব থেকে পৃথক মনে করো। এতে ধারণা হয়, প্রকৃত পক্ষে তুমি শুধু শিব,—কিন্তু তুমি কি জীবও নও? এভাবে অখণ্ড জ্ঞান কি ক'রে হবে? এ জ্ঞান তো সত্যকার জ্ঞান নয়, এও এক প্রকার অজ্ঞান। প্রকৃত জ্ঞানী সর্ব্বভূতেই নিজের আত্মাকে দেখতে পান, তিনি জানেন, 'সবই আমি'—শিব, জীব পশু সব কিছু। স্মরণে রাখবে, সর্ব্বভূতে সর্ব্বলোকে এই আত্মা বিস্তারিত, সর্ব্বস্থানেই ওতপ্রোত আছে তোমার স্বরূপ, তোমার আত্মা। এই জ্ঞানই চরম অদ্বৈত জ্ঞান।" গিরি মহারাজের পরিব্রাজন কালের নানা পুরাতন কাহিনীর মধ্য দিয়া এইরূপে সাধনার্থীর দল সাধনা ও পরমতত্ত্বের ইঙ্গিত প্রাপ্ত হইতেন।

এই মহাজ্ঞানী ও মহাযোগীর জীবনসত্তায় প্রেমভক্তির একটি রসস্নিগ্ধ ধারাও সুন্দরভাবে মিলিত হইয়াছিল। দর্শনার্থী ভক্ত ও শিষ্য, যে কেহ স্বামীজীর সহিত সাক্ষাৎ করিতেন তিনিই তাঁহার হৃদয়ের মাধুর্য্য-রসে অবগাহন না করিয়া ফিরিতেন না। আশ্রমের বিগ্রহপূজা ও লীলা কীর্ত্তনের পরিবেশে স্বামীজীর আনন্দঘন রূপটি ফুটিয়া উঠিত, প্রেমাবেশে তিনি মাতোয়ারা হইয়া উঠিতেন। যোগসামর্থ্যের তুঙ্গ শীর্ষে অধিষ্ঠিত মহাযোগীর এই পুলকোজ্জ্বল রূপ দেখিয়া সকলের আনন্দ ও বিস্ময়ের সীমা থাকিত না।

একটি বাঙ্গালী ভক্ত সেদিন গিরি মহারাজের চরণতলে বসিয়া তাঁহাকে রামপ্রসাদী সঙ্গীত শুনাইতেছে—

ডুব দেরে মন কালী বলে,
হৃদি রত্নাকরের অগাধ জলে—

ভক্তিমধুর শ্যামা সঙ্গীতের আকর্ষণ যোগীহৃদয়ের মহা পারাবারকে এক মুহূর্ত্তে তরঙ্গায়িত করিয়া তুলিল। মহারাজের নয়নদ্বয় হইতে তখন অবিরল ধারায় প্রেমাশ্রু নির্গত হইতেছে, আর বার বার তিনি তাহা বস্ত্রখণ্ডদ্বারা মুছিয়া ফেলিতেছেন। এ অপরূপ প্রেমবিহ্বলতা দেখিয়া উপস্থিত ব্যক্তিবর্গ হতবাক্ হইয়া গিয়াছেন। স্তব্ধবিস্ময়ে

তাঁহারা শুধু ভাবিতেছেন—অতুলনীয় যোগৈশ্বর্য্য, জ্ঞান ও ভক্তির এই অপূর্ব্ব সমন্বয় মহাপুরুষের জীবনসত্তায় কোন্ ইন্দ্রজাল বলে সাধিত হইয়াছে ?

আশ্রমে প্রতিদিন নিষ্ঠার সহিত শিবপূজা অনুষ্ঠিত হইত। আবার কৃষ্ণজন্মাষ্টমীর আড়ম্বরও সেখানে কম হইত না। ভোলাগিরি মহারাজ ভক্তিসহকারে সেদিন ভাগবত শুনিতেছেন! কৃষ্ণবিগ্রহকে মোহন সাজে সাজাইয়া প্রেমাপ্লুত কণ্ঠে গিরিজীকে বলিতে শুনা যাইত, "মহারাজ, তোমার এ কি অপূর্ব্ব লীলা! জীবের কল্যাণে তুমি স্বেচ্ছায় গর্ভযন্ত্রণা ভোগ করেছো। কৃষ্ণ বাসুদেব, নারায়ণ—হরি হে! সব তোমারি মায়া।" ভক্তির-আবেশে 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' বলিয়াও তাঁহাকে এক এক দিন সমাধিস্থ হইতে দেখা যাইত। একবার ঢাকায় থাকাকালে জাগ্রত শক্তি-বিগ্রহ ঢাকেশ্বরী দেবীর প্রসাদী ফুল পাইয়া গিরিজী ভাবাবিষ্ট হন, অতঃপর গদগদকণ্ঠে বলিয়া উঠেন, "মায়ের প্রসাদ আমি পেয়েছি, এ কৃপাপ্রসাদ পেয়ে ধন্য হয়েছি!"

সাধারণ ভক্ত বা যোগসাধনায় অসমর্থ সাধকের জন্য তাঁহার ব্যবস্থা ছিল নিতান্ত সহজ ও সাধারণ! এ সম্পর্কে এক বাংলা ছড়া নিজে রচনা করিয়া পরমানন্দে সবাইকে উপদেশ দিতেন, "কর নাম ও দান—হবে কল্যাণ।" সর্ব্বসাধারণের জন্য রচিত তাঁহার হিন্দী ছড়াতেও রহিয়াছে নামজপের নির্দ্দেশ—

গৌরীশঙ্কর সীতারাম,
সদা বোলো চারো নাম।
সদ্‌গুরু দিয়া হরকা নাম,
খালি জিহ্বায় কৌন কাম?

নাম-জপের এই প্রেরণা গিরিজী তাঁহার খৃষ্টান এবং মুসলমান ভক্ত দর্শনার্থীদের দিতেও ছাড়িতেন না। প্রাণায়ামের পূরক রেচক শ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদিগকে তিনি গড্ বা আল্লার নাম জপ করিতে উৎসাহ দিতেন।

সার্থক যোগী এবং অপরিমেয় যোগবিভূতির অধিকারীরূপে কীর্ত্তিত হইয়াও গিরি মহারাজ কিন্তু জপের গুরুত্ব কোন দিন কম দেন নাই। প্রায়ই তাঁহাকে বলিতে শুনা যাইত—"জপ সাধন কর্‌লে মানুষ অসামান্য অধ্যাত্মশক্তির অধিকারী হতে পারে।" এ সম্পর্কে অভিজ্ঞতার এক বৃত্তান্ত তিনি বর্ণনা করিতেন—

বহু পূর্ব্বে ভোলাগিরি মহারাজের লালতারাবাগ আশ্রমে এক সরল গ্রাম্য মজুর কাজকর্ম্ম করিত। কল্যাণপুরীজী নামে এক প্রাচীন সাধু এই লোকটির প্রতি সদয় হইয়া ভোলানন্দকে ধরিয়া বসেন, কৃপা করিয়া ইহাকে তিনি যেন দীক্ষা দেন। স্বামীজীকে শেষ অবধি রাজী হইতে হইল। মজুরটীকে তিনি পঞ্চাক্ষর মন্ত্র প্রদান করিলেন। তারপর গলায় রুদ্রাক্ষের কণ্ঠি বাঁধিয়া দিয়া কহিলেন, "ছাখো বাবা, আজ থেকে তুমি আমার শিষ্য হলে। পরিচয়ের দিক দিয়ে তুমি কিন্তু এবার সাধু—আর তুমি মুটে মজুর নও। ওসব কাজকর্ম্ম ছেড়ে এবার শিব মন্দিরে গিয়ে জপ সাধনে লেগে যাও।"

এ লোকটি ছিল আপনভোলা, নিতান্ত সরল বিশ্বাসী। গিরি-মহারাজের নির্দ্দেশ অনুযায়ী সে নিকটস্থ গ্রামের এক শিব মন্দিরে গিয়া নাম জপে মগ্ন হইয়া গেল। এখন হইতে অযাচক বৃত্তি নিয়া দিনরাত সে বসিয়া থাকে, দর্শনার্থীদের কেহ যৎসামান্য কিছু আহার্য দিলে তাহা দিয়াই নিজের ক্ষুন্নিবৃত্তি করে। প্রায় দুই বৎসর কঠোর তপস্যা অনুষ্ঠানের পর এ সাধকের ইষ্ট দর্শন হয়। তাহার বাক্‌সিদ্ধি ও নানা অলৌকিক বিভূতির খ্যাতি প্রচারিত হয়।

ভোলাগিরি মহারাজ তাঁহার এই জনসাধনকারী শিষ্যের অসামান্য ক্ষমতার উল্লেখ করিয়া সকলকে কহিতেন, "জপকে তোরা কখনো তুচ্ছ ব'লে অবহেলা করিস্‌নে। এর মত উৎকৃষ্ট সাধন নেই।"

লালতারাবাগ আশ্রমে বানর দলের উৎপাত লাগিয়াই থাকিত। বাগানের গাছ ও ফলপাকড়ের উপর ইহাদের দৌরাত্ম্যের অন্ত ছিল না। আশ্রমে আগত গৃহী ভক্তদের এ বানরেরা জ্বালাতন করিত।

কিন্তু কোন সাধু সন্ন্যাসীর উপর ইহারা কখনো উপদ্রব করিতে আসিত না। এ আচরণের রহস্য সম্বন্ধে স্বামীজীকে জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি একটি পুরাতন কাহিনী বর্ণনা করেন—

আশ্রম তখন সবেমাত্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। বানরদের উৎপাতে সকলে অস্থির। এই সময়ে ভোলানন্দজী একদিন গুরুগম্ভীর স্বরে কপি সমাজকে আহ্বান করিলেন। বিস্ময়ের বিষয়, বানরেরা একে একে আসিয়া তাঁহার চারিদিকে সমবেত হইল। অতঃপর গিরি মহারাজ তাহাদের উদ্দেশে এক ভাষণ দিলেন। তিনি কহিতে লাগিলেন, "ভ্যাখো, এই বাগিচার যত কিছু ফলপাকড় সব তোমাদের জন্য রাখা হয়েছে। কিন্তু জেনে রেখো, তোমরা যেমন এ সব খাবার জন্য চেষ্টা ক'রবে আমরাও তেমনি লাঠি নিয়ে তোমাদের তাড়াতে থাকবো—তোমাদের দিক দিয়ে অবশ্যই বিক্রম প্রকাশের কোন বাধা নেই। কিন্তু আমার একটি হুকুম তোমাদের মান্‌তে হবে। আমি এ আশ্রমে থাকা অবধি এখানকার কোন সাধুর কমণ্ডলু, কৌপীন, বহির্ব্বাস বা পরিচ্ছদ তোমরা কখনো স্পর্শ করবে না।" সঙ্গে সঙ্গেই নেতৃস্থানীয় এক বৃদ্ধ বানর সেখানে মাথা নাড়িয়া সজোরে সম্মতিসূচক আওয়াজ করিল। এই নর-বানরের সভা ভঙ্গ হইবার পর হইতে বানরকুল কোন দিনই স্বামীজীর আদেশ অমান্য করে নাই।

আশ্রমের কুকুর এবং কুকুরের ছানাগুলিকে নিয়া ভোলানন্দজীর ব্যস্ততার সীমা ছিল না। ইহাদের খাওয়ানো দাওয়ানো ও আদর যত্নের ঘটা দেখিয়া সকলে বড় বিস্মিত হইতেন। দুর্দ্দান্ত কালু কুকুর ছিল গিরিমহারাজের পরম ভক্ত—উহার ভোজনের জন্য আশ্রম হইতে রোজ এক সের দুধের বরাদ্দ ছিল।

সন্ন্যাসী শিষ্যদের বেলায় কিন্তু দেখা যাইত, স্বামীজী বড় অদ্ভুত আচরণ করিতেছেন। দূর-দেশান্তর হইতে ভক্তেরা আশ্রমে প্রায়ই নানা উপাদেয় ফল ও খাবার প্রেরণ করিতেন। গিরি মহারাজ

একলা আর কত খাইবেন? সামান্য কিছু গ্রহণের পর বাকী সবই পচিয়া উঠিত। এগুলি গঙ্গাগর্ভে নিক্ষেপ করা হইত অথচ শিষ্যদের ভক্ষণের কোন উপায় ছিল না। বৈরাগ্য ও কৃচ্ছ্র-ব্রতের ধৃতিকে দৃঢ় করবার জন্য এমনি ছিল ভোলাগিরিজীর কঠোর ও সতর্ক নিয়ন্ত্রণ। আশ্রমিকগণ মাঝে মাঝে ঠাট্টা করিয়া কালু কুকুরের দুগ্ধ বরাদ্দের কথা উল্লেখ করিতেন। পরিহাস সহকারে তাঁহাদের অনেককে বলিতে শুনা যাইত, "ভোলাগিরিজীর আশ্রমে কুকুর, বেড়াল ও গরু হয়ে থাকাও এক মহাতপস্যার ফল।"

গিরিজীর প্রিয় সারমেয় কালুর কাহিনী বড় অদ্ভুত। কালুর মৃত্যু দিবসের আচরণ আশ্রমিকদের দৃষ্টি খুলিয়া দেয়।

প্রায় একমাস রোগভোগের পর এই সারমেয়ের জীবনদীপ নিভিয়া আসিতেছে। দেহরক্ষার লগ্নটিও আশ্রম পালিত পশুর অজানা নাই। ঠিক সময়ে রোগজীর্ণ শরীরটি নিয়া হাঁফাইতে হাঁফাইতে সে গঙ্গাতীরে গিয়া উপস্থিত। কোনক্রমে অবগাহন স্নান করিয়া তটে উঠিল। তারপর দেহের অর্দ্ধাংশ পুণ্যতোয়া জাহ্নবীর জলে ডুবাইয়া রাখিয়া শেষ নিঃশ্বাসটি ত্যাগ করিল। ভোলাগিরিজীর প্রিয় কুকুর কালুর এই গঙ্গাভক্তি দর্শন করিয়া সেদিন হরিদ্বারের অনেকেই বিস্ময়াবিষ্ট না হইয়া পারে নাই।

ভোলানন্দজীর সাধনগুহায় কতকগুলি বিষধর সর্প বাস করিত। ইহাদের সহিত যোগীবর ছিলেন এক অচ্ছেদ্য সখ্যবন্ধনে আবদ্ধ। কখনো কখনো দেখা যাইত, ইহারা অঙ্গনে বাহির হইয়া ফণা নাচাইয়া মনের আনন্দে খেলা করিতেছে। এ সময়ে কেহ ইহাদের লাঠি দিয়া হত্যা করিতে উদ্যত হইলে গিরি মহারাজ তিরস্কারের সুরে বলিতেন, "খবরদার এদের কখনো মার্‌বিনে। এরাই হচ্ছে শিবজীর গলার ভুষণ। তোদের কোন অনিষ্টই এরা করবে না। তাছাড়া, এ সাপগুলো আমার কত দীর্ঘ দিনের বন্ধু! আমার সঙ্গে কত রাত্রিতে একই শয্যায় কোন কোনটা আবার আরামে শুয়েও

থাকে। ওদের তাড়াস্ নে। নিজের মনে খেলা করতে দে।”

সেদিন শেষ রাত্রিতে স্নান করিয়া স্বামীজী ভজন কুটিরে প্রবেশ করিয়াছেন। প্রদীপ জ্বালাইতে হইবে, তাই দিয়াশলাইর জন্য দেয়ালের তাক হাতড়াইতেছেন। হঠাৎ তাঁহার হাতটি গর্ত্তস্থিত এক বিষধর সর্পের ফণা স্পর্শ করিল। নাগপ্রবর একবার ফোঁস করিয়া উঠিয়াই কক্ষ হইতে ধীরে ধীরে নিক্রান্ত হইলেন। এ যেন সঙ্গীর উপর অভিমানভরে গৃহত্যাগ।

ইষ্টদেব 'শিবজীব ভূষণ' তাঁহার এই হস্তস্পর্শে ভুল বুঝিয়াছেন, তাঁহারই দোষে চলিয়া যাইতেছেন, এজন্য গিরিজীর খেদের অন্ত রহিল না। করজোড়ে এই সাপটিকে মিনতি করিতে লাগিলেন,—এমন অসতর্ক ব্যাপার আর কখনো ঘটিতে দিবেন না। ফিরাইয়া আনার জন্য বারবার সে কি ব্যাকুল অনুরোধ! কিন্তু কে তাহাতে কর্ণপাত করে? সাপটি চিরতরে সে স্থান ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল। কক্ষের গর্ত্তস্থিত অপর সর্পদের যাহাতে এরূপ অসুবিধা আর না হয়, এজন্য গিরিমহারাজ ইহার পর প্রায় বার বৎসর অবধি সেখানে দ্বীপ জ্বালান নাই।

সর্ব্বজ্ঞ মহাযোগীর দূরসন্ধানী দৃষ্টি অবলীলায় শিষ্যদের অন্তরের নিভৃততম প্রদেশে গিয়া উপস্থিত হইত, প্রয়োজন মত তাহাদের জটিলতম সমস্যার সমাধান করিয়া দিতেও তাঁহার কখনো আটকাইত না। চন্দ্রকুমারবাবু তাঁহার এক শিষ্য। সেদিন ভক্তজন পরিবৃত গুরুজীর সম্মুখে তিনি বসিয়া রহিয়াছেন। দর্শনার্থী ও ভক্তদের সহিত স্বামীজী নানা তত্ত্বের আলোচনা করিতেছেন। চন্দ্রবাবুর মনে কিছুদিন যাবৎ একটি জটিল প্রশ্ন বার বার উঁকি মারিতেছে—সাধকদের ইষ্ট এক, না পৃথক পৃথক। প্রশ্নটি কোনরূপে উত্থাপন করিবার সাহস কিন্তু তিনি পাইতেছেন না। হঠাৎ সম্মুখস্থ এক দর্শনার্থিনী মহিলা ইষ্টের স্বরূপ সম্বন্ধেই প্রশ্ন করিয়া বসেন। চন্দ্রবাবু এ প্রশ্নটি শুনিয়া তখনি উচ্চকিত হইয়া উঠিয়াছেন। গিরি

মহারাজ কথা-প্রসঙ্গে বলিতে লাগিলেন, "তোমরা জেনে রেখো ইষ্ট এক—ইষ্ট একং পূর্ণং নিত্যং সর্ব্বাধিষ্ঠানং।" ইহা বলিতে বলিতেই ঘুরিয়া শিষ্য চন্দ্রবাবুর দিকে মুখ ফিরাইয়া কহিয়া উঠিলেন, "চন্দ্র, বুঝেছ? এই তোমার ইষ্টের স্বরূপ।" অন্তর্য্যামী মহা কারুণিক গুরুর অন্তরে শিষ্যের সমস্যাক্ষুব্ধ মনের স্পন্দনটি পূর্ব্ব হইতেই পৌঁছিয়া গিয়াছিল।

দর্শনার্থী ও ভক্তদের ইষ্টনিষ্ঠা দৃঢ় করিবার উদ্দেশ্যে গিরিজীকে অনেক সময় তাঁহার অলৌকিক শক্তি প্রয়োগ করিতে দেখা যাইত। কয়েকটি কাহিনী এখানে বিবৃত হইতেছে—

স্বামীজীর এক বিশিষ্ট শিষ্যের ভ্রাতা শশীকান্ত গুপ্ত ব্রাহ্মভাবাপন্ন ছিলেন। সাধু সন্ন্যাসীদের প্রতি ভক্তি বিশ্বাস তাঁহার তেমন ছিল না, ইহাদের তেমন গ্রাহ্যও তিনি করিতেন না। সেবার ভ্রাতার সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে তিনি কলিকাতায় গিরিজীর সহিত সাক্ষাৎ করিলেন।

দর্শনার্থীরা উপদেশাদি শ্রবণের পর ঘরের বাহিরে প্রসাদ পাইতে গিয়াছেন, এ অবসরে স্বামীজী শশীবাবুকে নিকটে আহ্বান করিলেন। দুই চারিটি স্নেহপূর্ণ বচন ও তত্ত্বোপদেশের পর কি জানি কেন, তিনি ভাবাবিষ্ট হইয়া এই নবাগত দর্শনার্থীকে বারবার আলিঙ্গন করিতে থাকেন। দুই নয়নে তাঁহার প্রেমাশ্রুর ধারা ঝরিতেছে। বিস্ময়াবিষ্ট শশীবাবু আরও দেখিলেন, স্বামীজীর দেহ হইতে এক দিব্য জ্যোতির প্রবাহ নির্গত হইতেছে। ইহার ফলে কক্ষটি মুহূর্ত্তমধ্যে আলোকোদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। নবাগত ব্যক্তির হৃদয়ে বিশ্বাসের বীজ বপন করিতেই ভোলানন্দ মহারাজ সেদিন এই অলৌকিক লীলা প্রদর্শন করেন। শশীবাবু তাঁহার নিকট দীক্ষা নিয়া এক পরম ভক্তে রূপান্তরিত হইয়াছিলেন।

সুপ্রসিদ্ধ গণিতবিদ্ সোমেশচন্দ্র বসুর স্ত্রী অকালে লোকান্তরিতা হন। স্ত্রীর মৃত্যুর পর সোমেশবাবুর হৃদয়ে তীব্র বৈরাগ্যের সঞ্চার

হয়—অধ্যাত্মসাধন গ্রহণের জন্য তিনি মনস্থ করেন। কিন্তু সেই সঙ্গে মনে মনে এক দৃঢ় প্রতিজ্ঞাও করেন—যে শক্তিধর যোগী তাঁহার মৃতা সহধর্ম্মিণীর সহিত একত্রে তাঁহাকে দীক্ষা দিতে পারিবেন, শুধু তাঁহার শিষ্যত্বই তিনি গ্রহণ করিবেন। বহু সাধু সন্ন্যাসীর নিকট ব্যর্থ মনোরথ হইয়া সোমেশবাবু ভোলাগিরিজীর পদপ্রান্তে উপস্থিত হইলেন। মহারাজ তাঁহাকে দীক্ষা দিতে সম্মত হইলে সোমেশবাবু তাঁহার মৃতা পত্নীর দীক্ষার প্রস্তাবও তুলিলেন। গিরিজী তৎক্ষণাৎ নির্ব্বিকার চিত্তে উত্তর দিলেন, "বেশ তো বেটা, তাঁর দীক্ষাও এ সঙ্গে হতে পারবে! তুমি মোটেই ঘাবড়াবে না।"

নিভৃত দীক্ষাগৃহে তিনটি আসন স্থাপিত হইল, গিরিজী ও সোমেশ বসু উভয়ে দুইটিতে উপবেশন করিলেন। অনুষ্ঠান শুরু হইবার সঙ্গে সঙ্গে সোমেশচন্দ্র সবিস্ময়ে দেখিলেন, পার্শ্বে রক্ষিত তৃতীয় আসনটিতে তাঁহার পরলোকগতা স্ত্রী সশরীরে উপবিষ্টা।

স্বামীজীর নির্দ্দেশ ছিল, দীক্ষাগৃহে আকর্ষিতা স্ত্রীর দেহটি তিনি স্পর্শ করিতে পারিবেন না। মর্ত্তলোকের বিরহী স্বামী আজ তাই শুধু অপার আগ্রহে সূক্ষ্মলোকবাসিনী সহধর্ম্মিণীর দিকে নির্নিমেষে তাকাইয়া রহিলেন। দীক্ষা অনুষ্ঠানের শেষে পত্নীর মূর্ত্তিটি কোথায় অন্তর্হিত হইয়া গেল।

বিস্ময়াভিভূত গণিতবিদ্ তখন শুধু যোগীগুরুর যোগসামর্থ্যের কথাই নয়—পরম করুণার কথাও বারবার ভাবিতেছিলেন।

স্বামীজীর শিষ্য অমরনাথ রায় আসামের একজন গণ্যমান্য ব্যক্তি। তৎকালে তিনি শ্রীহট্টের সুনামগঞ্জে বাস করিতেছেন। তাঁহার বালক পুত্রটি এ সময়ে এক দুশ্চিকিৎস্য রোগে আক্রান্ত হয়। রোগীর অবস্থা সঙ্কটাপন্ন হইয়া উঠে এবং ডাক্তারগণ তাহার আশা একেবারে ত্যাগ করেন।

এই অবস্থাটি জানাইয়া হরিদ্বারে গিরিমহারাজকে তার করা হইল। উত্তরে স্বামীজী শুধু লিখিলেন, "যথাসম্ভব নামজপ কর ও

দান কর।" বিস্ময়ের বিষয়, সেই রাত্রিতেই মুমূর্ষু বালক সকলকে বলিতে থাকে, "আমি ভাল হয়ে গিয়েছি—স্বামীজী যে আমার কাছে এসেছিলেন!" সকলের কৌতূহলী প্রশ্নের উত্তরে বালক আরো যাহা বলে তাহার মর্ম্ম এই—স্বামীজীকে সে দেখিয়াছে, খুব উজ্জ্বল মূর্ত্তি, মাথায় পাগড়ী, পায়ে খড়ম, হাতে কমণ্ডলু; তাঁহার পশ্চাতে রহিয়াছে একদল সন্ন্যাসী।

সে আরো জানায়, স্বামীজী তাঁহার কমণ্ডলুর জল ছিটাইয়া দিবার সঙ্গে সঙ্গে সর্ব্ব রোগ যন্ত্রণার অবসান ঘটে।

রোগীর পিতা সানন্দে অবিলম্বে হরিদ্বারস্থিত গিরিমহারাজকে জানাইলেন, তাঁহারই কৃপায় মরণাপন্ন পুত্র প্রাণ পাইয়াছে।

স্বামীজী সকলকে ডাকিয়া সোৎসাহে বলিতে লাগিলেন, "তোমরা তো বিশ্বাস কর না যে, চৈতন্য বা পরমাত্মা সর্ব্বব্যাপী; কিন্তু এই দেখ, আমি তো আর সুনামগঞ্জে যাইনি? আমি তোমাদের কাছেই রয়েছি। পরমাত্মা সর্ব্বত্রই বর্ত্তমান, তিনি দূরে থেকেই এই কাজ করছেন। সাধনবলে তাঁকে জানাতে পারলে তোমরাও সর্ব্বজ্ঞ এবং সর্ব্বশক্তিমান হতে পারবে।" তারপর সহাস্যে আরো কহিতে লাগিলেন, "দেখ অমরকে লিখে দাও, ডাক্তারের পেছনে তো কত খরচ সে করলো, অথচ তারা ব্যর্থ হয়েছে। আমিই যখন রোগীকে আরোগ্য করলাম, তখন আমার ভিজিট বাবদ সাধু সেবার কিছু চা'ল এবার যেন সে বেশী করে পাঠিয়ে দেয়।

স্বামীজীর এক বাঙালী শিষ্য সেবার সুন্দরবন অঞ্চলে দলবলসহ বাঘ শিকার করিতে গিয়াছেন। গভীর অরণ্যে সকলে ঘুরিতেছেন, এমন সময় হঠাৎ এক হিংস্র ব্যাঘ্র এ শিষ্যের সম্মুখে লাফাইয়া পড়ে। সঙ্গীগণ হইতে তিনি বিচ্ছিন্ন। অতর্কিতভাবে আক্রান্ত হওয়ায় তিনি বড় বিপদে পড়িয়া গেলেন। হাতের বন্দুক কোথায় ছিটকাইয়া পড়িয়াছে—তিনি শুধু একটি সড়কী মাত্র হাতে নিয়া

একলা বাঘের সহিত যুঝিতেছেন। ক্রমে তাঁহার ক্ষত-বিক্ষত দেহ অবসন্ন হইয়া আসিল !

এই সময়ে সহসা কোথা হইতে তাঁহার গুরুদেব ভোলাগিরিজী সেই বিজন অরণ্যে আবির্ভূত হইলেন। তেজোদৃপ্ত কণ্ঠে শিষ্যকে উৎসাহিত করিয়া কহিলেন, "ওরে কোন ভয় নেই! বাঘটার মুখগহ্বরে জোরে শড়কী মার—ও এখনি মরবে।" কোন্ দৈব বলে লুপ্ত সাহস ও শক্তি তাঁহার ফিরিয়া আসে। গুরুদেবের এই নির্দ্দেশ তড়িৎবেগে পালন করেন—দুই একটি তীব্র আঘাতের পর শড়কীটি তিনি বাঘের মুখের ভিতর চালাইয়া দেন। সঙ্গে সঙ্গেই পশুটি পর্য্যুদস্ত হইয়া ধীরে ধীরে ভূমিতে লুটাইয়া পড়ে। অতঃপর তিনি গুরুদেবকে দর্শনের জন্য ফিরিয়া দাঁড়াইতে দেখিলেন, তাঁহার মূর্ত্তি কোথায় অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছে।

কিছুদিন পর হরিদ্বার উপনীত হইয়া তিনি ভক্তি-আপ্লুত হৃদয়ে গিরিজীকে কহিলেন, "বাবা, সেদিন সে অরণ্য মধ্যে আপনি উপস্থিত না হ'লে বাঘের আক্রমণ থেকে আমার জীবন রক্ষা হত না।"

গিরিজী প্রকৃত রহস্য এড়াইয়া গিয়া স্মিতহাস্যে উত্তর দিলেন, দূর পাগল! কি যে বলিস্। আমি তো তখন হরিদ্বারে, এ সবই পরমাত্মার মায়া বলে জান্‌বি।"

অলৌকিক শক্তির প্রকাশ ও বহিরঙ্গ জীবনের লীলাভিনয়—গিরিজীর জীবনে দুই-ই বর্ত্তমান ছিল। পরম চৈতন্যের কেন্দ্রে মহাযোগী সদা অবস্থিত, তাই তাঁহার জীবনে স্থূল ও সূক্ষ্মের আবরণ ও ভেদ-বিভেদ অপসৃত না হইয়া পারে নাই।

আশ্রমে সমাধি হইতে ব্যুত্থিত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি গোশালায় গিয়া চেঁচাইতে থাকিতেন, "দ্যাখো দ্যাখো, কারুর কোন কর্ত্তব্য বুদ্ধি নেই। গোমাতার খো'ল, ভূষিদানা এখনও মাখা হয়নি। এদিকে দৃষ্টি দেয় না—সব হয়েছে জামাই-ভাই, সব কণে বউ, সব 'বাঙালীকা হুক্কা'।"

সুদূর আসামে মুমূর্ষু রোগীর পার্শ্বে বা সুন্দরবনে ব্যাঘ্র কবলিত শিষ্যের উদ্ধারকার্য্যে যিনি গভীর অরণ্যে আবির্ভূত—সেই শক্তিমান যোগীকেই কিন্তু আবার দেখা যাইত লালতারাবাগ আশ্রমে এক অভিনব অভিনয়ের ছদ্মবেশে। সেখানে দেখা যাইত, বাগানের মধ্যে এক গুলিবাঁশ হস্তে তিনি উপদ্রবকারী বানর বিতাড়নে রত। কম্প্রহস্তের নিশানা ঠিক হইতেছে না, দুষ্ট বানরের দল তাঁহাকে দাঁত খিঁচাইয়া ভয় দেখাইতেছেন—আর তিনি আশ্রমের সাধুদের উদ্দেশ্যে অবিরত গালিবর্ষণ করিয়া চলিয়াছেন, "সব বাবুর দল, কাজ না ক'রে কেবল ব'সে বসে রুটি খাবে। সব শিব্‌জীকা বাচ্চা—সিদ্ধপুরুষ হয়ে গিয়েছে। এ বুড়োই কাজ করবে, আর সবাই আরাম খাবে। আশ্রমের জন্য দরদ এতটুকু কারুর নেই!"

মহাসমর্থ যোগী আর লীলাপর অভিনয়কুশল মহাপুরুষের জীবনের এ এক অপূর্ব্ব সুমধুর দ্বৈতরূপ!

দীর্ঘ লীলাভিনয়ের পর ভোলাগিরিজীর বাহ্যজীবনের উপর যবনিকাটি নামিয়া আসিল। ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দের ৮ই মে, কৃষ্ণাচতুর্দ্দশী তিথিতে মহাযোগী তাঁহার মরজীবনের পালা সাঙ্গ করিয়া শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিলেন।

উত্তরাখণ্ডের বিশিষ্ট সাধু, মোহান্ত ও মণ্ডলীশ্বর, অগণিত ভক্তজন হরিদ্বারের লালতারাবাগে সমবেত হইয়া তাঁহাদের শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করিলেন। ওঁ নমঃ পার্ব্বতীপতয়ে হর, গঙ্গামাঈকি জয়, হর হর বম্ বম্ বম্—ধ্বনির মধ্যে মহাপুরুষের পুষ্পমাল্য শোভিত দেহখানি গঙ্গার কালিকুণ্ডে ধীরে ধীরে নিমজ্জিত করা হইল।

প্রভু শ্রীজগদ্বন্ধু

মুর্শিদাবাদে রাণী স্বর্ণময়ীর প্রাসাদে সেদিন এক নেপালী সন্ন্যাসী আসিয়াছেন। যোগ ও জ্যোতির্বিদ্যা দুইয়েতেই তাঁহার পারদর্শিতা। ভবিষ্যতের কথা জানার আগ্রহে অনেকেই তাঁহাকে ঘিরিয়া বসিয়া আছে। আয়ুর্ব্বেদ-শিরোমণি গঙ্গাধর কবিরাজ ও পণ্ডিত দীননাথ ন্যায়রত্ন, এই দুই অন্তরঙ্গ বন্ধুও সেখানে উপস্থিত।

কৌটা হইতে এক টিপ নস্য দিয়া গঙ্গাধর সোৎসাহে ন্যায়রত্নকে বলিলেন, "কোথায় হে তোমার নবজাত পুত্রের ঠিকুজীখানা ?"

ঝুলি হইতে ঠিকুজী বাহির হইল। সন্ন্যাসী তাহা গভীরভাবে নাড়িয়া চাড়িয়া সবিস্ময়ে প্রশ্ন করিয়া বসিলেন, "আচ্ছা, আপনার এ শিশুটি কি জীবিত রয়েছে ? একবার কি একে আমায় দেখাতে পারেন ?"

ন্যায়রত্নকে তখনি গৃহাভিমুখে ছুটিতে হইল। শিশুটিকে আনামাত্র সন্ন্যাসী সাগ্রহে তাহাকে কোলে তুলিয়া নিলেন। কিন্তু এ কি কাণ্ড ! গৈরিকধারী সন্ন্যাসী ঐ শিশুর রাঙা পা দু'খানি বার বার মাথায় ঠেকাইতেছেন, আর তাঁহার নয়ন বহিয়া অশ্রু ঝরিতেছে।

দীননাথ ন্যায়রত্ন ব্যাকুল কণ্ঠে এবার বলিয়া উঠিলেন, "সাধু বাবা, আপনি এসব কি কাণ্ড করছেন, বলুন তো ? এতে যে আমার পুত্রের অকল্যাণ হবে।"

সন্ন্যাসী বলিলেন, "পণ্ডিতজী, আমার এ অঞ্চলে আসা আজ সার্থক হয়েছে! তোমার এ শিশু সর্ব্বসুলক্ষণযুক্ত। জেনে রেখো, সে এক মহাপুরুষরূপে খ্যাত হবে। এঁকে দর্শন করবার সৌভাগ্য লাভ ক'রে আমি ধন্য হ'লাম।" ইহার পরেই নেপালী সাধু কোথায় অদৃশ্য হইয়া গেলেন।



প্রভু জগদ্বন্ধু

আর এক দিনের কথা। ন্যায়রত্ন ছেলেকে কোলে নিয়া বারান্দায় বসিয়া আছেন। এক জটাজুটধারী সাধু সেখানে আসিয়া উপস্থিত। দেবী কিরীটেশ্বরীর মন্দির হইতে ফিরিবার পথে এ-পথে দিয়া তিনি যাইতেছিলেন। হঠাৎ এই নয়নাভিরাম শিশুর দিকে তাঁহার চোখ পড়িল।

স্থির দৃষ্টিতে বহুক্ষণ তাকাইয়া থাকিয়া সাধু গম্ভীর কণ্ঠে বলিলেন, "এ শিশু কা'র? উত্তরকালে এ যে রাজা হবে!"

ন্যায়রত্ন স্মিতহাস্যে উত্তর দিলেন, "সাধুজী, আমি এক গরীব ব্রাহ্মণ। আমার পুত্রের পক্ষে রাজা হওয়া কি ক'রে সম্ভব?"

সংক্ষিপ্ত উত্তর আসিল, "ভোগের রাজা নয়, যোগের রাজা!" সন্ন্যাসী আর সেখানে অপেক্ষা করেন নাই।

ন্যায়রত্ন মহাশয়ের অন্তরের আলোড়ন থামিতে চায় না। সঙ্কিত হৃদয়ে পত্নীর সহিত শিশুর সম্বন্ধে আলোচনা করেন। দরিদ্রের বুকজোড়া নিধি বাঁচিলে হয়, তারপর ঘরে থাকিলে হয়। বাষ্পাকুল নয়ন মুছিয়া অস্ফুটস্বরে বলিয়া উঠেন,—"নারায়ণ, নারায়ণ।"

এই শিশুই উত্তরকালের প্রভু জগদ্বন্ধু। নামপ্রেমের মহাচারণরূপে পূর্ব্ববঙ্গের ফরিদপুরে তিনি হরিনামের প্রাণবন্যা বহাইয়া দেন, ভক্তিরসের বর্ষণে অগণিত মানুষকে রসায়িত করিয়া তুলেন।

ব্রজরস-সাধনে নিগূঢ় তত্ত্বটি জগদ্বন্ধুর দিব্য জীবনে প্রতিফলিত হইয়া উঠে তাঁহার অলৌকিক মহাজীবন সেদিন আত্মপ্রকাশ ক'রে প্রেমধর্ম্মের এক উৎসরূপে—দিকে দিকে বহাইয়া দেয় হরিনামামৃতের পবিত্র স্রোতধারা।

প্রায় সাড়ে চারিশত বৎসর আগের কথা। গোয়ালন্দের নিকটস্থ কোমরপুর গ্রামের তখন খুব প্রসিদ্ধি। পদ্মাতীরে এ গ্রামটিতে ছিল সুপণ্ডিত ধর্ম্মনিষ্ঠ ব্রাহ্মণ বাসুদেব চক্রবর্ত্তীর বাস। পূর্ব্ববঙ্গে ভ্রমণের কালে শ্রীগৌরাঙ্গদেব এই বাসুদেব চক্রবর্ত্তীর গৃহে অতিথি হন।

কোমর জলে দাঁড়ইয়া মহাপ্রভু এখানে স্নান করেন, তাই এ স্থানের নাম হয় কোমরপুর। পরবর্তীকালে এ গ্রাম নদীগর্ভে নিশ্চিহ্ন হইলে চক্রবর্তীরা গোবিন্দপুরে আসিয়া বাস করিতে থাকেন।

এই বংশেরই, এক শাস্ত্রজ্ঞ, আচারনিষ্ঠ ব্রাহ্মণ দীননাথ ন্যায়রত্ন। মুর্শিদাবাদের ডাহাপাড়া অঞ্চলে আসিয়া তিনি অধ্যাপক বৃত্তি গ্রহণ করেন। ন্যায়রত্ন মহাশয়ের পাণ্ডিত্যের খ্যাতি যেমন ছিল, সাধননিষ্ঠ পরম ভাগবতরূপেও তেমনি সে অঞ্চলে কম পরিচিত ছিলেন না। ভক্তিমতী পত্নী বামাদেবীর সহিত কুলবিগ্রহ রাধাগোবিন্দের সেবাপূজায় পরম আনন্দে তাঁহার দিন কাটিত। এই আদর্শ দম্পতির গৃহে সীতানবমী তিথির মাহেন্দ্রক্ষণে তাঁহাদের তৃতীয় সন্তানটি ১৮২১ খ্রীষ্টাব্দের ১৭ই মে তারিখে ভূমিষ্ঠ হয়। পরম রূপলাবণ্যময় এই শিশুর নামকরণ হয় জগৎ। ইনিই উত্তরকালের বহু ভক্তের প্রাণপ্রিয় প্রভু—শ্রীজগবন্ধু।

ন্যায়রত্নের গৃহের আনন্দময় পরিবেশে শীঘ্রই কিন্তু এক দুর্দ্দৈব নামিয়া আসিল। মাতা বামাদেবী চৌদ্দ মাসের শিশুকে পরিত্যাগ করিয়া একদিন স্বর্গারোহণ করিলেন। মাতৃহীন শিশুকে নিয়া দীননাথ ন্যায়রত্নের বিপদের সীমা নাই। কি করিয়া তাহার লালনপালন চলিবে তাহা ভাবিয়া পান না। নিরুপায় হইয়া জগৎকে নিয়া তিনি স্বগ্রাম গোবিন্দপুরে উপস্থিত হন। এখানে দীনাথের ভ্রাতুষ্পুত্রী বালবিধবা দিগম্বরীদেবী শিশুর সমস্ত দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

পদ্মাবিধৌত গোবিন্দপুরের শ্যামলবক্ষে কনককান্তি শিশু, জগৎ ঘুরিয়া বেড়ায়। দিদি দিগম্বরীরই শুধু নয়ন-পুত্তলী সে নয়, প্রতিবেশীদের আনন্দধন রূপেও সে দিন দিন বর্দ্ধিত হইতে থাকে। তাহার যখন চার বৎসর বয়স পরিবারে তখন আরও একটি দুর্ঘটনা ঘটিয়া গেল, দীননাথ ন্যায়রত্ন মহাশয় আকস্মিকভাবে পরলোক গমন করিলেন। দুর্জ্ঞেয় ঐশী বিধানে শিশুকালেই জগতের জীবনের দুইটি বড় বন্ধন উন্মোচিত হইয়া গেল।

ন্যায়রত্নের লোকান্তর প্রাপ্তির কয়েকমাস মধ্যেই চক্রবর্তীদের গোবিন্দপুরের বাস্তুভিটা পদ্মায় নিমজ্জিত হইয়া যায়। ইহার পর ফরিদপুরের সহরতলী ব্রাহ্মণকান্দায় তাঁহাদের নূতন আবাস নির্ম্মিত হয়। সকলে সেখানেই বসবাস করিতে থাকেন।

জগৎ যখন ফরিদপুর জেলা স্কুলের ষষ্ঠ শ্রেণীতে পড়ে তখন তাহার বয়স তের বৎসর। এ সময়ে তাহার উপনয়ন সংস্কার অনুষ্ঠিত হয়, আর এ সময় হইতেই বালকের অন্তর্লোকে বিচিত্র পরিবর্তন ঘটিতে থাকে। রাত্রির অন্ধকারে বনে জঙ্গলে কোথায় সে ঘুরিয়া বেড়ায় তাহা কে বলিবে? আবার কখনো মৌনাবস্থায়, কখনো বা ধ্যানস্থ হইয়া সে ঘরে বসিয়া থাকে। বহুতর বালকের মধ্যে জগৎ নিজের পার্থক্যটি একান্তে রচনা করিয়া নেয়। গৌরকান্তি দীর্ঘায়ত দেহটি সহজেই হইয়া উঠে সকলের আকর্ষণের বস্তু।

সর্ব্বাঙ্গ সে বস্ত্রাবৃত করিয়া রাখে, এটা যেন তাহার এক জন্মগত অভ্যাস। ঈশ্বরভক্তি ও পবিত্রতার দিকে তাহার ঝোঁক, তাই চরিত্রবলে চারিপাশের সঙ্গীদের সে টানিয়া আনে, আর তাহার হরিনামের অনুরাগ সকলেরই নয়নে মাখাইয়া দেয় প্রেমাঞ্জন।

অন্তরের প্রেম-উন্মাদনা ও তন্ময় ভাবের জন্য জগৎকে এ বয়সেই কিন্তু কম মূল্য দিতে হয় নাই। সেদিন জেলা স্কুলের অষ্টম শ্রেণীর বার্ষিক পরীক্ষা চলিতেছে। প্রশ্নপত্রের কিছুটা উত্তর লিখিবার পর কি জানি কি এক ভাবাবেশে সে উন্মনা হইয়া বসিয়া আছে। উদাস দৃষ্টিটি সম্মুখের দিকে নিবদ্ধ।

এমন সময় প্রধান শিক্ষক আসিয়া চাপিয়া ধরিলেন। তাঁহার ধারণা, জগৎ অন্যায়ভাবে অপর পরীক্ষার্থীদের উত্তর জানিতে চাহিতেছে। তেজস্বী বালক গ্রীবা উন্নত করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। শিক্ষকের ভুলের বিরুদ্ধে বৃথা বাক্যবয় না করিয়া দৃঢ় পদক্ষেপে সে বিদ্যালয় ছাড়িয়া চলিয়া গেল।

শিক্ষকেরা জগতের খাতা পরীক্ষা করিয়া বুঝিলেন, উত্তর তাহার নিজেরই—কোন অসাধুতা সে করে নাই। তখনই তাহাকে ফিরাইয়া আনিতে সকলে ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। কিন্তু তেজস্বী বালককে কোথাও আর সেদিন খুঁজিয়া পাওয়া গেল না। ফরিদপুর বিদ্যালয়ের সহিত তাহার সম্বন্ধ চিরতরে ঘুচিয়া যায়, আর এখানে পড়িতে সে রাজী হয় নাই। প্রধান শিক্ষক মহাশয় নিজের এই শোচনীয় ভুলের কথাটি সখেদে চিরদিন মনে রাখিয়াছিলেন।

জগৎ জেঠতুতো ভ্রাতা তারিণীবাবুর নিকট রাঁচিতে গিয়াছে। এখানে এক প্রতিবেশীর দুর্দ্দান্ত একটি ঘোড়া আছে, কেহই ইহাকে বাগ মানাইতে পারে না। যে কোন আরোহীকেই এই ঘোড়া অল্প সময়ের মধ্যে ভূতলে ফেলিয়া দেয়। বালক এ দৃশ্য চাহিয়া দেখে, আর মিটি মিটি হাসে। একদিন সে ঘোড়ার মালিকের নিকট প্রস্তাব করিয়া বসিল, এই একগুঁয়ে ঘোড়াকে সে অনায়াসে বশে আনিবে। তারিণীবাবু তো মহা আতঙ্কিত। কহিতে লাগিলেন, "ওরে, এমন দুঃসাহস দেখিয়ে কাজ নেই—তুই থাম্।"

বালক উত্তর দিল, "ঘোড়া তো ঘোড়া, কত সিংহ বাঘকে মুষিকের মত ক'রে নিয়ে আমি খেলতে জানি।" ঘোড়ার পিঠে উঠিয়া চাবুক মারা মাত্র সওয়ারসহ ঘোড়া মুহূর্ত্তে কোথায় উধাও হইয়া গেল।

ফিরিয়া আসিলে দেখা গেল, এই দুর্দ্দান্ত পশুটি একেবারে তাহার বশে আসিয়া গিয়াছে। সকলে সবিস্ময়ে দেখিল, আর ইহা আরোহীদের পিঠে নিয়া কোনরূপ অশান্ত আচরণ করে না। বালক জগতের স্পর্শে সে নিরীহ হইয়া পড়িয়াছে।

ইহার পর জগৎ পাবনায় পড়িতে আসে। এবার জাগিয়া উঠে তাহার কিশোর জীবনে সাত্ত্বিক সংস্কার, নাম-প্রেমের উন্মাদনা শুরু হয়। তাছাড়া, এ অদ্ভুত বালকের ব্যক্তিত্ব ও সহজাত শক্তিকে যেন এড়াইবার উপায় নাই। এখন হইতে তাহার চারিদিকে ভক্তিমান সহপাঠীরা ধীরে ধীরে জড়ো হইতে থাকে।

ছাত্রদের উপর তাহার এ প্রভাব দেখিয়া একদল লোক বড় চটিয়া যায়। এ আবার কি কথা? ব্রহ্মচর্য্য সাধন ও নাম-কীর্ত্তনের মধ্যে ছাত্রদের টানিয়া আনা কেন? জগৎ ছেলেদের ঘোরতর অনিষ্ট সাধন করিতেছে, তাহাদের সংসার-ছাড়া করিবার ষড়যন্ত্র সে করিতেছে, এ অভিযোগও কেহ কেহ উঠাইলেন। এ জন্য একদল লোক তাহার উপর এ সময়ে নানা উপদ্রব ও অত্যাচার করিতেও ছাড়ে নাই। কিন্তু ক্ষমাসুন্দর কিশোরের প্রেমপূর্ণ আচরণে ইহাদের বিরোধিতা ক্রমে নিস্তেজ হইয়া আসে।

জগতের চালচলন ও হাবভাব এবার আরও বদলাইতেছে। অলৌকিক মাধুর্য্যরসে জীবন হইয়া উঠিতেছে ভরপুর। প্রেম-ভক্তির ভাবাবেশে প্রায়ই তাহাকে অধীর উদ্বেল দেখা যায়।

সেদিন সে ইচ্ছামতীতে স্নান করিতে গিয়াছে। দূরে কে যেন প্রহ্লাদ পালা অভিনয়ের গান গাহিয়া উঠিল, 'আর কবে দেখা পাব, যুগলরূপ একাসনে।' এ গান শোনামাত্র জগৎ বাহ্যজ্ঞান হারাইয়া তীব্র প্রেমাবেশে নদীর তটে একেবারে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়ে। এক বৃদ্ধ বৈষ্ণব নিকটেই দাঁড়াইয়া ছিলেন, কিশোর জগতের এই সাত্ত্বিক বিকারের মর্ম্ম বুঝিয়া তিনি ছুটিয়া আসিলেন। সাধুটির নির্দ্দেশে সকলে নাম কীর্ত্তন শুনাইয়া অতিকষ্টে তাহার চৈতন্য সম্পাদন করে। অতঃপর ধরাধরি করিয়া তাহাকে গৃহে রাখিয়া আসা হয়।

বাড়ীর লোকের হইয়াছে মহা বিপদ। জগতকে নামকীর্ত্তন আসরে পাঠাইলে প্রেমোন্মত্ত হইয়া সে অনর্থ ঘটায়, আবার ঘরে আবদ্ধ করিয়া রাখিলেও নিস্তার নাই। একবার নামকীর্ত্তন ও মৃদঙ্গের ধ্বনি শুনিলেই সে বিহ্বল হয়, মূর্চ্ছিত হইয়া পড়ে। প্রেমাবিষ্ট দেহে অষ্টসাত্ত্বিক ভাবের লক্ষণ প্রকাশ পাইতে থাকে।

এই তরুণ ভক্তকে দেখিতে আসিয়া সকলেরই বিস্ময়ের সীমা থাকে না! রূপ লাবণ্যময় এ প্রেমোন্মত্ত কিশোর সাধকের ভিতরে

রহিয়াছে এ কোন বৈষ্ণব মহাপুরুষ? দর্শন মাত্র সকলে চমকিয়া উঠে। জগতের কীর্ত্তন শুনিতে যাহারা আসে, শুদ্ধচারী কিশোর সাধকের চরণে শ্রদ্ধাঞ্জলি ঢালিয়া তাহারা ধন্য হয়।

জীবনরাগিণীতে এসময়ে বাজিয়া উঠে প্রেমের ঠাকুরের বাণী। দূর-দূরান্ত হইতে আগত ভক্তদের প্রাণে এ বাণী দিব্য প্রেমের ঝঙ্কার তুলিয়া দেয়। কিশোর জগৎ এবার হইতে লোকগুরু জগদ্বন্ধুর আসন ধীরে ধীরে গ্রহণ করিতে থাকেন।

পাবনার উপকণ্ঠে প্রাচীন বটের ছায়ায় এক পুরাতন, জরাজীর্ণ ভবন। ইহারই এক দুর্গন্ধময় অন্ধকারাচ্ছন্ন কক্ষে শুদ্ধাচারী জগৎ প্রায়ই কাহাকে জড়াইয়া ধরিয়া বসিয়া থাকেন?

এক অর্দ্ধ-উলঙ্গ উন্মাদ তাহার বাহুলগ্ন। কটিতে তাহার জড়ানো এক টুকরা নোংরা কাপড়। পাগল মাঝে মাঝে উল্লাসভরে চিৎকার করিয়া উঠিতেছে, কখনো সাশ্রুনয়নে জগৎকে আদর করিতেছে।

শহরের ছোট বড় সকলে ইহাকে 'ক্ষ্যাপা' বলিয়া ডাকে। জগতের আদরের দেওয়া নাম—বুড়োশিব। এ বাসস্থানটিতে সাপের বড় উপদ্রব, এই নিভৃত জরাজীর্ণ আবাসে সহসা কেউ বড় একটা আসে না। কিন্তু ক্ষ্যাপা যখন বাজারে ভিক্ষা করিতে যায় তখন সবাই তাঁহাকে সাগ্রহে ঘিরিয়া ধরে। রোগ, শোক, মামলা মোকদ্দমা হইতে শুরু করিয়া সকল কিছু বিপদে আর্ত্ত ভক্তের দল তাঁহার শরণ না নিয়া পারে না।

বাক্‌সিদ্ধ মহাপুরুষ এই ক্ষ্যাপা, তাঁহার করুণা-লীলার সহিত শহরের সবাই পরিচিত। ক্ষ্যাপার নানা অলৌকিক শক্তির কাহিনীও কাহারো অজানা নাই। এই ক্ষ্যাপাই হঠাৎ সেদিন জগতের দিদি গোলকমণির নিকট বলিয়া ফেলিয়াছিলেন, "দ্যাখ্ দিদি, জগা মানুষ নয়, আমিও মানুষ নই। তবে জগা কিন্তু রাজা, আমরা সব প্রজা।" এ প্রহেলিকাময় বাক্যের মর্ম্মোদ্ধার কে করিবে? দিদিকে শুধু নয়ন বিস্ফারিত করিয়া চাহিয়া থাকিতে হয়।

কিশোর জগতের সাধকজীবনের আবরণখানি এইবার উন্মোচিত হইতেছে। চিহ্নিত মহাজীবনের ভূমিকায় অবতীর্ণ হইবার তাহার আর বেশী দেরী নাই। আরো বিস্ময়ের কথা, তাড়াসের ভূম্যধিকারী বনমালী রায়, নিত্যানন্দ কুলোদ্ভব শ্যামলাল গোস্বামী, অদ্বৈত বংশের রঘুনন্দন গোস্বামী প্রভৃতি বিশিষ্ট ব্যক্তি এখন হইতে এ শক্তিধর কিশোরকে 'প্রভু' বলিয়া সম্বোধন শুরু করিয়াছেন। লোকগুরু জগদ্বন্ধুর এবার প্রকাশের পালা।

ঈশ্বরীয় কোন প্রসঙ্গ, ভক্তিমূলক কোন সঙ্গীত শুনিলেই জগদ্বন্ধুর অপূর্ব্ব প্রেম-বিকার ও ভাবাবেশ উপস্থিত হয়। তাই তাঁহাকে নিয়া সঙ্গী সাথীদের বিপদের সীমা নাই। সেবার পাবনার সহরতলীতে ধ্রুবচরিত্র যাত্রাভিনয় হইতেছে। আসরের এক প্রান্তে জগৎ তাঁহার কিশোর সঙ্গীগণসহ সাগ্রহে বসিয়া আছেন। 'কোথায় পদ্মপলাশ লোচন হরি' বলিয়া ধ্রুব আকুল কণ্ঠে একটি গান ধরিল। আর যায় কোথায়? ভক্ত জগদ্বন্ধুর অন্তরের ভাবসমুদ্র আলোড়িত হইয়া উঠিল, তিনি বাহ্যজ্ঞান হারাইয়া ফেলিলেন। চারিদিকের কৌতূহলী জনতা তাঁহার দিকে শুধু নির্নিমেষে চাহিয়া আছে।

প্রসিদ্ধ ডাক্তার চন্দ্রশেখর কালীর তখন তরুণ বয়স, সবেমাত্র ডাক্তারী পাশ করিয়া বাহির হইয়াছেন। ডাঃ কালীও সেদিন ঐ কীর্ত্তন আসরে উপস্থিত। এ দৃশ্য দেখিয়া তাঁহার মন বিরক্তিতে ভরিয়া উঠিল। ভাবিলেন, এটা হয়তো জগদ্বন্ধুর হিষ্টিরিয়া রোগ অথবা কৃত্রিম ভাবাবেগ।

ধরাধরি করিয়া জগৎকে তখনি পার্শ্বস্থ গৃহে নিয়া যাওয়া হইল। ডাঃ কালী সর্ব্বপ্রকার বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা চালাইবার পর দেখিলেন, এ ভাব তন্ময়তার স্বরূপ চিকিৎসা-যন্ত্রাদিতে ধরা পড়িতেছে না। বুঝিলেন এই প্রেমিক সাধককে এভাবে পরীক্ষার জন্য টানিয়া আনিয়া তিনি ভাল করেন নাই। ডাক্তার এক অব্যক্ত ভয়ে ভীত হইয়া পড়িলেন, তাড়াতাড়ি তিনি জগৎকে আবার যাত্রার আসরে

রাখিয়া আসিতে বলিলেন। ডাঃ কালীর মনোলোকে সেদিন এক প্রচণ্ড ঝাঁকুনি লাগিল। তিনি বুঝিলেন, বুদ্ধিগ্রাহ্য মানবীয় জ্ঞানের উপরেও এক পরম চৈতন্যের অস্তিত্ব রহিয়াছে, যাহার সংবাদ তাঁহার মত লোকেরা সত্যই জানেন না।

আর একদিনের কথা। কীর্ত্তনানন্দের পর জগদ্বন্ধুর দেহে প্রেমাবেশ দেখা দিয়াছে। এক দুষ্টবুদ্ধি ব্যক্তি ঐ সময়ে পরীক্ষা করার জন্য তাঁহার পায়ের অঙ্গুলির উপর এক জ্বলন্ত টিকা রাখিয়া দেয়। অঙ্গুলিটি পুড়িয়া যাইতেছে অথচ জগদ্বন্ধুর সেদিকে ভ্রুক্ষেপই নাই। হঠাৎ তাঁহার সঙ্গীরা ঐ জ্বলন্ত টিকা দেখিতে পাইয়া তখনি দূরে নিক্ষেপ করে। অগ্নিদগ্ধ পায়ের এই ঘা শুকাইতে দীর্ঘদিন লাগিয়াছিল। উত্তরকালে ঐ দুষ্কৃতিকারী লোকটি কিন্তু জগদ্বন্ধুর স্নেহাশ্রয় পাইয়া ধন্য হয়।

ভক্তপ্রবর বনমালী রায়ের আগ্রহে জগদ্বন্ধু একবার তাড়াসের রাজবাড়ীতে উপস্থিত হইয়াছেন। তাঁহার সেবা ও আনন্দ বিধানের জন্য সকলের তৎপরতার অন্ত নাই। নাম কীর্ত্তন ও উদ্দণ্ড নর্ত্তনে চারিদিক আনন্দ-চঞ্চল।

বনমালী শুনিয়াছেন, ইতিপূর্ব্বে একদল দুষ্টলোক প্রভু জগদ্বন্ধুকে প্রহার করিয়াছিল।

প্রভুকে তিনি চাপিয়া ধরিলেন, তাঁহার অঙ্গে কোন্ পাষণ্ডীরা আঘাত করিয়াছিল আজ অবশ্যই তাদের নাম বলিতে হইবে। সমুচিত দণ্ড না দিয়া তিনি ছাড়িবেন না।

বহু অনুরোধেও জগদ্বন্ধু কিন্তু কাহারো নাম প্রকাশ করিলেন না। ভাবতন্ময় হইয়া উদাস নেত্রে বেশ কিছুক্ষণ তাকাইয়া রহিলেন, তারপর কহিলেন, "ওগো, আমি তো দণ্ড দিতে আসিনি, এসেছি উদ্ধারণ দিতে!"

তাড়াসের জমিদার ভবনে শ্রীরাধাবিনোদ বিগ্রহ স্থাপিত। ভক্তিমান সেবাইতগণ ইহাকে বলেন 'জামাই-বিনোদ'। কবে কোন

সময়ে ঠাকুর রাধাবিনোদ নাকি জমিদার বংশের এক ভক্তিমতা কুমারীকে কান্তারূপে অঙ্গীকার করেন, তাঁহাকে তিনি আত্মসাৎ করিয়াও নেন। সেই হইতে জামাই-বিনোদের বড় সম্মান ও প্রতাপ —তাঁহার আদর যত্নের পারিপাট্যও জামাতারই মত। পরম বৈষ্ণব বংশের সন্তান বনমালীবাবু নিজে স্বভাবতঃই বড় ভক্তিমান। কিন্তু ইংরেজী শিক্ষা ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর প্রভাব এড়ানো সহজ নয়, তাই জামাই 'বিনোদ'-এর সব সেবাকে তিনি সহজ বিশ্বাসে সব সময়ে গ্রহণ করিতে পারেন না। প্রভু জগদ্বন্ধু বনমালী রায়কে এবার একটু শিক্ষা দিতে চাহিলেন।

মন্দিরে রাধাবিনোদের স্নান, অর্চ্চনা ও ভোগ-প্রসাদ নিবেদন হইয়া গেল। এবার তামাকু সেবনের পালা। প্রাচীন প্রথা অনুযায়ী, জামাই-আদরের বিগ্রহকে তামাকু নিবেদন করা হইয়াছে।

জগদ্বন্ধু বনমালী রায়কে ডাকিয়া বলিলেন, "চলুন, এবার জামাই বিনোদের গড়গড়া-সেবন দেখে আসি।"

বনমালীবাবু কোনদিনই এ প্রথাটির গুরুত্ব তেমন দেন নাই। এবার প্রভুর কথায় সবাইকে নিয়া তিনি মন্দিরে প্রবেশ করিলেন। বহুক্ষণ ধরিয়া সকলে দেখিতে লাগিলেন, ঠাকুরের নিকট নিবেদিত গড়গড়া হইতে ধূম্র উদগীরিত হইতেছে, অনবরত গড় গড় শব্দ শুনা যাইতেছে। অলক্ষ্যে বসিয়া কৌতুকী 'জামাই-বিনোদ' সত্য সত্যই সেদিন তামাকু সেবনে রত হইয়াছেন!

এই লোকোত্তর লীলা দর্শনে বনমালীবাবুর গণ্ড বাহিয়া পুলকাশ্রু ঝরিয়া পড়িতে থাকে। বিগ্রহ সেবার পরম তাৎপর্য্যটি এবার দৃষ্টির সম্মুখে ফুটিয়া উঠে। আজ তিনি বুঝিতে পারেন, মন্ত্রচৈতন্যের মত সেবাচৈতন্যও প্রভুর কৃপাবলে স্ফূরিত হইয়া উঠে এবং বৈষ্ণবগৃহে রাধামাধবের পূজা ও সেবা নিষ্ঠার মধ্য দিয়াই এ সৌভাগ্য লাভ করা যায়। সেদিন এই অলৌকিক শক্তি প্রকাশের মধ্য দিয়া জগদ্বন্ধু বনমালী রায়ের দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্ত্তন আনিয়া দেন!

দুই বৎসর পরের কথা। নানা তীর্থস্থান পরিক্রমার পর প্রভু জগদ্বন্ধু বৃন্দাবনে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। ব্রজের রজে গড়াগড়ি দিয়া তাঁহার প্রাণের আর্ত্তি হইয়া উঠিয়াছে দুর্নীবার। রাধারাণীর দর্শন ছাড়া তাঁহার জীবন বৃথা! কৃষ্ণের আহ্লাদিনী শক্তি এই রাধা—তাঁহারই শরণাগতি জগদ্বন্ধু নিয়াছেন, আর তাঁহারই ধ্যানে রহিয়াছেন সদা বিহ্বল। কখনো অস্ফুটস্বরে গাহিতেছেন, "এই ভবকুহক রে—রাই তুমি উদ্ধারণ"। কখনো বা ভূতলে আছড়াইয়া পড়িয়া বৃষভানুনন্দিনীর করুণা ভিক্ষা চাহিতেছেন। রাধাকুণ্ডের তীরে চলিয়াছে তাঁহার আকুতি, কান্না ও পরিক্রমা!

অপ্রাকৃত আনন্দ-নির্ঝরের উৎস মুখ খুলিয়া গেল, পরম প্রার্থিত কৃপা-সম্পদ জগদ্বন্ধু এইবার প্রাপ্ত হইলেন। আরাধ্যা মহাভাবময়ী রাধারাণীর দর্শন মিলিল, আর সঙ্গে সঙ্গেই তিনি হতচেতন হইয়া ভূতলে পড়িলেন। সম্বিৎ পাইবার পর কিছুটা প্রকৃতিস্থ হইয়া তিনি ধীরে ধীরে নিজ হস্তে লিখিলেন—

জয় রাধে ধর্ম্ম, জয় রাধে জয়।
জয় রাধে কর্ম্ম, জয় রাধে রয়॥

জগদ্বন্ধুর জীবনের সর্ব্বস্তরে এবার দিব্য আনন্দ তরঙ্গায়িত হইতেছে। অদ্বৈত বংশোদ্ভব ভক্ত রঘুনন্দন এই সময়ে তাঁহাকে একদিন কৌতূহলী হইয়া জিজ্ঞাসা করেন, 'প্রভু, আপনার গুরু কে? কোথা হতে এ অপরূপ প্রেম সাধনার দীক্ষা আপনি পেলেন?"

প্রেমাপ্লুত কণ্ঠে তিনি উত্তর দেন, "আমার গুরু? তোদের বৃষভানুকুমারীই যে আমাকে মন্ত্র দান করেছেন।"

এ মন্ত্র প্রাপ্তির প্রতিক্রিয়াও বড় অদ্ভুত। ইহার পর হইতে প্রভু তাঁহার কণ্ঠে আর কখনো রাধা শব্দটি উচ্চারণ করিতে পারেন নাই। শুধু নিজের মুখে উচ্চারণ নয়, অন্য কারুর মুখে ঐ নাম শুনিলেও তিনি দিশাহারা হইয়া পড়েন। নিজে কখনও 'রাধা কুণ্ড', বলিতে হইলে বলেন, 'অমুক কুণ্ড'। প্রসঙ্গক্রমে শ্রীরাধার কথা

উল্লেখ করা হইলে বলেন, "তোদের কিশোরী"। পরবর্ত্তীকালে দেখা যাইত, ভক্ত প্রবর রাধিকা গুপ্তকে (উত্তরকালের রামদাস বাবাজী) তিনি রাধিকা বলিতে পারিতেন না, 'শারিকা' নামে অভিহিত করিয়া কাজ চালাইতেন।

রাধা নাম একবার শুনিতে পাইলেই রক্ষা নাই, প্রভুর দেহে তীব্র প্রেম-বিকারের সৃষ্টি হয়। আর সেই জন্যই সন্তর্পণে তিনি এ নাম এড়াইয়া চলেন। একবার জগদ্বন্ধু শুনিলেন, তাঁহার দেখাদেখি প্রিয় ভক্ত রায় হরিদাসও রাধানাম উচ্চারণ করা ছাড়িয়া দিয়াছেন। তখন তিনি তাঁহাকে নিকটে ডাকাইয়া আনিলেন। ধীর গম্ভীরস্বরে তিরস্কার করিয়া বলিলেন, "হরিদাস, ও নাম করবি নে, তো তরবি কিসে?" হরিদাসের বুঝিতে দেরী হইল না—অনধিকারী হইয়া প্রভুর অন্ধ অনুকরণের দ্বারা তিনি সঙ্গত কাজ করেন নাই। প্রভু জগদ্বন্ধুর সংক্ষিপ্ত ভৎর্সনাটির মধ্য দিয়া এই নাম তাঁহার হৃদয়ে চিরতরে গাঁথা হইয়া রহিল।

বৃন্দাবনে রাধারাণীর আশীর্ব্বাদ লাভ করার পর জগদ্বন্ধু ফরিদপুর ব্রাহ্মণকান্দায় উপস্থিত হইয়াছেন। ইহা তাঁহার স্বগ্রাম। তরুণ সাধককে কেন্দ্র করিয়া অল্পকাল মধ্যে কীর্ত্তনানন্দ উৎসারিত হইয়া উঠিল। প্রথমে আসিয়া জুটিল তাঁহার বাল্যসঙ্গীগণ, তাহার পর গ্রামের জনসাধারণ। দূর দূরান্তের গ্রামের লোকও জড় হইতেছে। প্রহরের পর প্রহর, দিনের পর দিন কীর্ত্তনের বিরাম নাই, কোন অদৃশ্য হস্ত স্পর্শে ইহার ব্যবস্থাপনা চলিতেছে, কে ইহার ভার বহন করিতেছে, তাহা কেহই জানে না। কীর্ত্তনস্থলীতে আকর্ষিত হইয়া যাহারাই আসে, জগদ্বন্ধুর দিব্য শ্রীমণ্ডিত রূপ দেখিয়া তাহারা বিহ্বল হইয়া পড়ে, ভক্তির ডোরে বাঁধা পড়িয়া যায়।

ভাবাবেশে উদ্বেলিত প্রভু সঙ্গীতের পর সঙ্গীত রচনা করিয়া চলিয়াছেন, নিজেই তাহাতে সুর যোজনা করিতেছেন। আবার কীর্ত্তন-অঙ্গনে দেখা যায় তাঁহার দিব্য প্রেরণার এক মূর্ত্ত প্রকাশ।

পূর্ব্ববঙ্গের পদ্মাতীরে লোকোত্তর পুরুষ জগদ্বন্ধু এ সময়ে এক ঐশী নির্দ্দিষ্ট ভূমিকায় আত্মপ্রকাশ করিতেছেন।

ফরিদপুর সহরের উপান্তে বুনো বাগ্‌দীদের বাস। সাঁওতাল পরগণা হইতে নীলকরগণ এককালে ইহাদের আমদানী করিয়াছিল। এখন রাস্তাঘাট ও ভিত বাঁধিয়া, আর শূকর মারিয়া ইহারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে। হিন্দু সমাজের উপেক্ষিত ও অস্পৃশ্য এই বুনোরা।

জগদ্বন্ধু শুনিলেন, এই বুনোদের খৃষ্টান করিয়া নিবায় জন্য প্রবল চেষ্টা এ সময়ে চলিতেছে। এ সংবাদে চারিদিকেই রটিয়াছে, কিন্তু জরাজীর্ণ হিন্দুসমাজের পক্ষে তাহা কোন আলোড়নই সৃষ্টি করে নাই। করুণাময় প্রভু জগদ্বন্ধুর প্রাণ সেদিন কাঁদিয়া উঠিল। ব্যাকুল হইয়া তাই তিনি বুনো-বাগ্‌দীদের মোড়ল রজনী সর্দ্দারকে ডাকাইয়া আনিলেন।

রজনী নিজে তন্ত্রমন্ত্র জানে, সিদ্ধাই এবং ঝাড়-ফুকের জন্য তাহার সুনাম দুর্নাম দুই-ই আছে। বিশাল বক্ষপট, আরক্ত নয়ন ও ঝাঁকড়া চুল নিয়া কৃষ্ণকায় রজনী সর্দ্দার স্থানীয় অঞ্চলে অনেকেরই ভীতি উৎপাদন করে। রজনী জগদ্বন্ধুকে দেখিয়াছে, কীর্ত্তনকালে নগর পরিক্রমায় তাঁহার ভাবাবিষ্ট মূর্ত্তি দেখিয়া সে মুগ্ধ হইয়াছে। প্রভু তাহার সমগ্র দেহ মন প্রাণ কাড়িয়া নিয়াছেন। কিন্তু প্রকাশ্যে সাহস করিয়া সে এতদিন তাঁহার নিকট উপস্থিত হয় নাই। আজ সেই প্রেমময় প্রভুই ডাকিয়া পাঠাইয়াছেন। আনন্দে অধীর রজনী সর্দ্দার জগদ্বন্ধুর আঙ্গিনায় ছুটিয়া আসিল।

"রজনী এসেছো, রজনী এসেছো"—বলিয়া প্রভু বুনো সর্দ্দারকে বক্ষে জড়াইয়া ধরিলেন। রজনী সেদিন এ দিব্যদেহের আলিঙ্গনে এক মুহূর্তে আত্মসাৎ হইয়া গেল। প্রভু তাহাকে স্নেহভরে বলিলেন —"রজনী, স্মরণ রেখো, তোমারা বুনো জাতেরা হীন নও। তোমরা শ্রীহরির দাস, আমার অতি প্রিয়জন। সেই নিত্যকালের পরিচয়েই তোমরা আমার সাথে পরিচিত হয়ে ওঠ। অচিরে সকল দুঃখ

তোমাদের ঘুচবে। আজ হতে তুমি আর রজনী সর্দ্দার নও, তুমি হচ্ছো, হরিদাস। ভুবনমঙ্গল হরিনাম করো, সকলে ধন্য হও। তোমরা আজ থেকে আর বুনো নও, তোমরা এবার থেকে 'মোহান্ত সম্প্রদায়' বলে অভিহিত হবে!"

প্রভু আরও আদেশ দিলেন, "কাল তুমি সগোষ্ঠী এখানে এসে রাধাগোবিন্দের প্রসাদ পাবে। তোমাদের সম্প্রদায়ের যত লোক আছে, নরনারী বালক বৃদ্ধ সবাইকে নিয়ে আসবে।"

পতিতপাবন জগদ্বন্ধুর স্পর্শে রজনী সর্দ্দার সেদিন রূপান্তরিত না হইয়া পারে নাই। শ্রীঅঙ্গনের বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইয়া সে দেখে তাহার পায়ের তলায় নূতন পৃথিবী—মাথার উপরে নূতন আকাশ! সে নিজেও এক নূতন মানুষরূপে জন্মলাভ করিয়াছে!

রজনী সর্দ্দারের মধ্য দিয়া জগদ্বন্ধু সমগ্র বুনো বাগ্‌দীদের প্রভাবিত করিলেন। আজিকার দিনের হরিজন-আন্দোলনের পর্ব্বের বহু পূর্ব্বে প্রভু জগদ্বন্ধুর মোহান্ত সম্প্রদায় নাম-কীর্ত্তনের মধ্য দিয়া সত্যকার হরিজনত্ব লাভ করিয়া ধন্য হয়! প্রভুর কৃপাবলে অল্পকাল মধ্যেই এই বুনো বাগ্‌দীদের মধ্যে মৃদঙ্গবাদক ও কীর্ত্তন-গায়কের সৃষ্টি হয়—গোপী-চন্দন ও তিলক-কণ্ঠিভূষিত শত শত ভক্ত বৈষ্ণবজন আত্মপ্রকাশ করে।

স্পর্শমণি জগদ্বন্ধু স্পর্শে অন্ত্যজ বুনো-বাগ্‌দীদের দল এখন হরিনাম প্রচারকারী মোহান্ত সম্প্রদায়ে পরিণত, কীর্ত্তনীয়া হিসাবেও তাহাদের খ্যাতি চারিদিকে হইয়াছে। কিছুদিন পর এই কীর্ত্তনীয়াদের নেতৃস্থানীয় ব্যাক্তিদের কাহারো কাহারো মনে কিছুটা অহঙ্কার আসিয়া পড়ে। অন্তর্য্যামী জগদ্বন্ধুর সতর্ক দৃষ্টি তাহা এড়ায় নাই, অঙ্কুরেই তিনি ইহার মূল উৎপাটন করিলেন।

ফরিদপুরের কয়েক ক্রোশ দূরে সেদিন মোহান্ত সম্প্রদায়ের কীর্ত্তন হইতেছে। হঠাৎ মূল কীর্ত্তনীয়া হরিদাস ও মৃদঙ্গবাদক মহিমের মধ্যে ঝগড়া বাধিয়া গেল। উভয়ে পরস্পরের দোষ

দেখাইয়া নিজ প্রতিষ্ঠা বাড়াইবার জন্য ব্যস্ত। বচসা তীব্র মনান্তরে পরিণত হওয়ায় কীর্ত্তন অনুষ্ঠানটি ভাঙ্গিয়া যায়, বিষণ্ণ মনে শ্রোতারা সকলে বাড়ী ফিরিয়া আসে। তাহাদের এ অহঙ্কারের মূলে জগদ্বন্ধু এক নির্ম্মম আঘাত হানিলেন।

পরদিন ভোরে প্রভু পাবনা হইতে ব্রাহ্মণকান্দায় আসিয়া উপস্থিত। পৌঁছামাত্র হরিদাস ও মহিমকে ডাকিয়া পাঠাইলেন।

আহ্বান শুনিয়া উভয়ের দুশ্চিন্তার অবধি নাই। ব্যাপার কি? প্রভু কি তাহা হইলে গত রাত্রির অবাঞ্ছিত আচরণ ও ঝগড়ার কথা কিছু টের পাইয়াছেন? তাই কি তিনি আজ ডাকিয়াছেন? প্রভুর অন্তর্য্যামীত্বের কিছু কিছু তথ্য হরিদাসের জানা আছে। পথ চলিতে চলিতে মহিমকে সে তাহার এক কাহিনী শুনাইতে লাগিল।

—সেবার গৃহে বসিয়া হরিদাস প্রভাতী কীর্ত্তন গাহিতেছিল। প্রতিবেশী বিহারী কি একটা কাজে তাহাদের সেদিকে আসিয়াছে। হরিদাস তাহার নিকট কিছু টাকা পাইবেন—কীর্ত্তন থামাইয়া সে বিহারীকে তখনি টাকার তাগাদা দেয়। তাছাড়া এসময়ে কিছু কঠিন কথা শুনাইয়া দিতেও সে ছাড়ে নাই। অতঃপর যথারীতি তাহার কীর্ত্তন সে সমাপণ করে। ইহার পর প্রভুর সঙ্গে দেখা। তখনি তিনি হরিদাসকে ঐরূপে কীর্ত্তন বন্ধ করার জন্য গালি দিতে লাগিলেন।

তিনি শান্ত হইলে হরিদাস সবিনয়ে প্রশ্ন করিল "প্রভু, আপনি এটা কি ক'রে জানলেন? আপনি তখন কোথায় ছিলেন?"

"তোর ঘরের বেড়ার সঙ্গে যে ছবিটা টাঙানো আছে, তার মধ্যেই যে আমি ছিলাম রে।"

প্রভুর সর্ব্বজ্ঞতা সম্বন্ধে হরিদাসের এইরূপ নানা ঘটনা জানা আছে। তাই শঙ্কিতচিত্তে চলিতেছে।

দণ্ডবৎ করিয়া উঠিবামাত্র জগদ্বন্ধু আর্ত্তস্বরে কহিয়া উঠিলেন, "হ্যাঁরে হরিদাস! কাল রাতে তোরা আমায় এত বেদনা দিলি

কেন? কীর্ত্তন যে আমার জীবন! তোরা আমার সেই জীবনের উপর আঘাত করলি? সারারাত যে আমি যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ ক'রে মরেছি। ওঃ! সে কি কষ্ট রে!"

ভর্ৎসনা ও শাসনের পরিবর্ত্তে একি আর্ত্তি, একি মিনতি। প্রভুর অশ্রুসজল, বেদন-সুন্দর মূর্ত্তির সম্মুখে দাঁড়াইয়া হরিদাস ও মহিম কাঁদিয়া উঠিল। অশ্রুজলে সেদিন তাহাদের সমস্ত কলুষরাশি শ্রীঅঙ্গন ধুইয়া মুছিয়া গেল।

কিছুদিন পরে তাদের প্রশ্নের উত্তরে প্রভু বলিলেন, "ওরে আমি, সব দেখেছি। আমি যে তোদের সঙ্গেই ছিলাম।"

মহিম এই সময়ে আবদারের ভঙ্গীতে বলিয়া উঠিল, "প্রভু, যদি সঙ্গেই ছিলেন, তো কৃপা ক'রে কীর্ত্তন যাতে ঠিকভাবে চলে সে শক্তি কেন দিলেন না?"

জগদ্বন্ধু এবার গুরু-গম্ভীর কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, "তোদের হৃদয়ে অহঙ্কার হয়েছিল, তাই আমার থাকবার মত জায়গা সেখানে যে হয়ে ওঠেনি।"

এইরূপে আশ্রিত ও স্নেহভাজন কীর্ত্তনীয়াদের অহঙ্কার চূর্ণ করিয়া প্রভু সেদিন তাহাদের প্রতি কৃপাও কিছুটা করিয়াছিলেন। একখণ্ড প্রস্তর তিনি এ সময়ে মহিমকে দেন। মৃদঙ্গবাদনের পূর্ব্বে এই প্রস্তর সে স্পর্শ করিয়া যাইত; ইহার ফলে কীর্ত্তনের আসরে অপ্রতিদ্বন্দ্বীরূপে সে থাকিত অধিষ্ঠিত। মহিমের উত্তরপুরুষও প্রভু-প্রদত্ত এই পাথরটি না ছুঁইয়া মৃদঙ্গে হাত দিত না।

ভক্তদের নিকট যুগল-ভজনের তত্ত্ব নির্দ্দেশ করিয়া প্রভু জগদ্বন্ধু বলিতেন, "মানসে সদা যুগল সঙ্গ ক'রে নিজেকে 'অমুক' দাসী মনে ক'রবে। কৃষ্ণকান্তি সদা নয়নে ও মানসে ভাসবে। কৃষ্ণই জীবনসর্ব্বস্ব, কৃষ্ণ গতি ও কৃষ্ণ পতি—এই সার করাই পরম ধর্ম্ম। কৃষ্ণই জীবন-ব্রত, তাঁকে ছাড়া অন্য কিছু জানবে না। 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ' এই লিখিবে, ভাবিবে, জপিবে, কাঁদিবে।"

বৃন্দাবনের স্বরূপতত্ত্ব ও সাধ্য-সাধন বিচার প্রসঙ্গে তিনি বলিতেন, "বৃন্দাবন তিন প্রকার। নিত্য বৃন্দাবন, লীলা বৃন্দাবন ও ধাম বৃন্দাবন। নিত্য বৃন্দাবনে সচ্ছিদানন্দ বিগ্রহরূপী একক কৃষ্ণ বর্ত্তমান, সখাসখী সেখানে নাই। লীলা বৃন্দাবনে যুগল-কিশোরের নিত্য হয়ে থাকে। আর ধাম বৃন্দাবন—কাম্যবন থেকে মান সরোবর অবধি চৌরাশী ক্রোশব্যাপী, সেখানে ভক্ত ও দর্শনার্থীরা সকলে যায়। লীলা বৃন্দাবনকে ভজনীয় বলে জানবে।"

ভক্ত প্রতাপ প্রভুর সম্মুখে উপবিষ্ট। তিনি মনে মনে ভাবিতেছেন, সখাসখীহীন একক কৃষ্ণের স্বরূপটি কি? প্রভুর ইহাদ্বারা কোন্ বিশেষ তত্ত্বের ইঙ্গিত দিতেছেন? এই চিন্তা মনে আলোড়িত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই প্রভু জগদ্বন্ধু সুমধুর কণ্ঠে ভক্ত প্রতাপচন্দ্রকে বলিলেন, "ওরে, ধারণার বাইরে যে পরমতত্ত্ব, তা পরিহার ক'রে চল্‌তে হয়। নিত্য বৃন্দাবনের কথা ভাবনায় টেনে আনিতে নেই। লীলাবৃন্দাবনের রস-মাধুর্য্যে অবগাহন করতে আগে চেষ্টা কর্।"

যুগলভজনের প্রাথমিক প্রস্তুতিরূপে প্রভু একদিকে শুদ্ধাচার ও ব্রহ্মচর্য্য, অপরদিকে নাম-কীর্ত্তন ও নিত্য টহলের আদর্শকে তাঁহার ভক্তদের সম্মুখে স্থাপন করিয়াছিলেন। বাল্যাবধি তাঁহার নিজ জীবনেও এই আদর্শটি রূপায়িত দেখি। অখণ্ড ব্রহ্মচর্য্য অপাপবিদ্ধ জীবন ও শুদ্ধাচারিতা নিয়া তিনি তাঁহার সাধন জীবনে অগ্রসর হন। তারপর রাধারাণীর কৃপাবলে পরম মধুর ব্রজরস তাঁহার জীবনপাত্র কানায় কানায় পূর্ণ হইয়া উঠে।

অতুল চম্পটি আরা-ইংরেজী বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক। কয়েকবার মাত্র জগদ্বন্ধুর সান্নিধ্যে তিনি আসিয়াছেন। মহাপুরুষের স্পর্শ, তাঁহার চাহনি এ স্বভাবগম্ভীর শিক্ষাব্রতীর জীবনে প্রেম-রসের স্রোত প্রবাহিত করিয়া দিল। সংসার ত্যাগ করিয়া, অপূর্ব্ব দৈন্য ও আর্ত্তি নিয়া ভক্ত চম্পটি প্রভুর চরণাশ্রয় গ্রহণ করিলেন। দেহ মন

ও প্রাণে তখন তাঁহার যে বৈরাগ্যের ঢল্ নামিয়াছে, অঙ্গাবরণেও তাহার ছোপ না লাগিয়া পারে নাই। গৈরিক বসন ধারণ করিয়া চম্পটি মহাশয় নাম কীর্ত্তনে মত্ত হইয়া পড়িলেন।

জগদ্বন্ধুর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি কিন্তু বারবার চম্পটির পরিচ্ছদের উপরই পড়িতেছে, কিন্তু মুখে কিছুই বলিতেছেন না। অবশেষে একদিন তাঁহাকে ডাকিয়া শান্ত—দৃঢ়কণ্ঠে বলিলেন, "আচ্ছা, আপনি গৈরিক পরেছেন কেন? গৈরিকে তো আপনার অধিকার হয়নি!"

"প্রভু, আমি এ বেশ এমনিই পরেছি। অধিকার অনধিকারের কথা ভাবিনি!"

গম্ভীর স্বরে জগদ্বন্ধু আদেশ প্রদান করিলেন, "আপনি অবিলম্বে গৈরিক ত্যাগ করিবেন!" প্রভুর অন্তর্ভেদী কল্যাণদৃষ্টি গেরুয়াধারী শিষ্যের মর্ম্মকেন্দ্রে গিয়া প্রবিষ্ট হয়। তাঁহার সদা জাগ্রত দিব্যদৃষ্টি গৈরিক ধারণের সূক্ষ্ম অহমিকাবোধ হইতেই সেদিন চম্পটিকে রক্ষা করিতে চাহিয়াছিল।

চম্পটিকে একখানি সাদা ধুতি ও উত্তরীয় প্রদান করিয়া জগদ্বন্ধু তাঁহাকে ভক্তিমার্গের প্রাথমিক সাধন নির্দ্দেশাদি দেন, প্রেমিক ভক্তও পরম শ্রদ্ধায় তাহা শিরোধার্য্য করিয়া নেন! রোজ প্রত্যূষে জগন্নাথ ঘাটে একবার তিনি ডুব দেন, তারপর করতাল যোগে কলিকাতার রাস্তায় গাহিয়া চলেন—

'কৃষ্ণগোবিন্দ গোপাল শ্যাম।
রাধা মাধব রাধিকা নাম॥'

উচ্চস্বরে রোজ এ কীর্ত্তন করিতে করিতে তাঁহাকে কালীঘাটে পৌঁছিতে হয়। আদি গঙ্গায় আবার নিমজ্জনের পর ঐ কীর্তন গাহিতে গাহিতেই জগন্নাথ ঘাটে ফিরিয়া আসেন। এভাবে প্রভুর উপদিষ্ট টহলব্রত তাঁহাকে অনুষ্ঠান করিতে দেখা যায়। কলিকাতার পথে ঘাটে জগদ্বন্ধু সেদিন প্রিয় ভক্ত চম্পটির মধ্য দিয়া এমনি করিয়া নাম-রসের ধারা ঢালিয়া দিতে থাকেন।

জগদ্বন্ধুর জীবনে পাবনার হারাণ ক্ষেপার প্রভাব নিতান্ত কম নয়, ইহার কিছুটা পরিচয় আমরা ইতিপূর্ব্বে পাইয়াছি। ক্ষেপাকে প্রভু 'বুড়োশিব' বলিয়া ডাকিতেন, শক্তিমান মহাপুরুষ জ্ঞানে যথেষ্ট সমাদর ও সম্মান করিতেন। তাঁহার সাধন জীবনের প্রথম পর্য্যায়ে আমরা ক্ষেপার আবির্ভাব দেখিতে পাই। কিন্তু এই জীবনের পরিণতির সঙ্গে সঙ্গে তিনি কোথায় অন্তর্হিত হইয়া যান।

ভক্ত চম্পটি ঠাকুরকে প্রভু সেবার পাবনায় নিয়া যান। তারপর অধ্যাত্মপথের প্রবীণ সুহৃদ, শক্তিধর হারাণ ক্ষেপার হাতেই তাঁহাকে কিছুদিনের জন্য সমর্পণ করিয়া আসেন! ক্ষেপা ও জগদ্বন্ধু-শিষ্য চম্পটির একত্রে বসবাসের কাহিনী বড় কৌতূহলোদ্দীপক।

রাত্রির শেষ যাম প্রভাত হইতে অনেক দেরী। ক্ষেপা ত্রিশূলের খোঁচা মারিয়া ঘুমন্ত চম্পটি ঠাকুরকে ডাকেন "ওরে, শিগ্‌গীর ওঠ্!" প্রাতঃকৃত্য শেষ করিয়া উভয়ে রাস্তায় বাহির হইয়া পড়েন। ক্ষেপার পরিধানে রহিয়াছে শতছিন্ন আলখাল্লা কাঁধে জীর্ণ কন্থা আর হাতে উদ্যত ত্রিশূল।

বাজারে কুমোরদের দোকানে প্রথমে তিনি উপস্থিত হইলেন। তারপর ত্রিশূলের আঘাতে গুটিকয়েক হাঁড়ি অবলীলায় ভাঙ্গিয়া খুব হাঁকডাক সুরু করিয়া দিলেন। দোকানের মালিক ক্রুদ্ধ হওয়া দূরে থাকুক, একেবারে আনন্দে আটখানা! ক্ষেপা কোন দোকানের ক্ষতি করিলে ব্যবসায়ীরা মনে করে, সেদিন তাহাদের বড় সৌভাগ্য —প্রচুর লাভ নিশ্চয়ই হইবে। ক্বচিৎ কাহাকেও যদি তিনি কোন আদেশ দেন—সে ব্যক্তি হাতে স্বর্গ পাইয়া বসে, এই শক্তিমান সাধকের সেবার অধিকার পাইয়া সে ধন্য হয়।

ক্ষেপা একদিন চম্পটিকে বড় অদ্ভুত আদেশ দিয়া বসিলেন। নদীর ওপারে বঙ্কু মণ্ডলের বাড়ী, জাতিতে সে চণ্ডাল। বঙ্কুর পাতের উচ্ছিষ্ট ভাত তাঁহাকে খাইয়া আসিতে হইবে। চম্পটি বুঝিলেন—ইহা তাঁহার এক পরীক্ষা। প্রিয় সুহৃদ হারাণ ক্ষেপার

কাছে রাখিয়া প্রভু জগদ্বন্ধু ভক্তের অন্তস্তল হইতে একটি একটি করিয়া অহঙ্কারের কাঁটা তুলিয়া ফেলিতেছেন।

বঙ্কু মণ্ডল সেদিন সকালে তাহার দাওয়ায় বসিয়া ভাত খাইতেছে। চম্পটি জোর করিয়া তাহার পাত হইতে উচ্ছিষ্ট নিলেন, ভোজনের পর হরিধ্বনি দিতে দিতে ক্ষেপার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কিন্তু এত কিছু করিয়াও তাঁহার নিষ্কৃতি নাই! ক্ষেপা চম্পটিকে বাজারে দাঁড় করাইয়া চেঁচাইতে লাগিলেন, "তোমরা সকলে শোন শোন, এ ব্রাহ্মণের ছেলে হয়ে চাঁড়ালের ভাত খেয়ে বেড়ায়!"

চম্পটি মহাশয় এত বড় ধাক্কা প্রথমটায় সহিতে পারেন নাই, লজ্জা ও সঙ্কোচে মাথাটি নিচু করিয়া পড়িয়াছিল। ক্ষণকাল পরেই দৃঢ় চিত্তে সোজা হইয়া দাঁড়াইলেন। বুঝিলেন, প্রভুর ইচ্ছায় ক্ষেপা আজ তাঁহার অভিমানের মূল উৎপাটন করিয়া দিতেছেন। সর্ব্ব আকর্ষণ ত্যাগ করিয়া দীনহীনের বেশে চম্পটি গৃহের বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন। শুধু হরিনামের মর্য্যাদাই এখন হইয়াছে তাঁহার নিজের মর্য্যাদা। জাতিবর্ণ নির্ব্বিশেষে প্রভু জগদ্বন্ধু এ হরিনাম বিলাইয়া ফিরিতেছেন—তবে চম্পটির জাত্যভিমানকে চূর্ণ না করিয়া তিনি ছাড়িবেন কেন?

সেবার জগদ্বন্ধু বৃন্দাবন হইতে কলিকাতায় আসিয়াছেন। চম্পটি মহাশয় প্রভুর থাকার জন্য জমিদার কালীকৃষ্ণ ঠাকুরের বাগানবাড়ীতে বন্দোবস্ত করিলেন। কালীকৃষ্ণ তখন অবধি প্রভুকে স্বচক্ষে দর্শন করেন নাই। চম্পটি ও অন্যান্য ভক্তদের মুখে তাঁহার মহিমা শুনিয়া তিনি মুগ্ধ হইয়াছেন। বাগানবাড়ীর অট্টালিকার এক কোণে প্রভুর স্থান করিয়া দেওয়া হইল। কীর্ত্তনপ্রিয় জগদ্বন্ধুর জন্য খোল করতাল প্রভৃতি কেনার জন্যও কালীকৃষ্ণ মোটা টাকা দিতেও কার্পণ্য করিলেন না।

কিন্তু শীঘ্রই এক গোলযোগ বাধিয়া উঠিল। জগদ্বন্ধু বড় একটা

জনসমক্ষে বাহির হন না। প্রায়ই আপাদমস্তক শুভ্র বস্ত্রে জড়িত রাখেন, অসূর্য্যম্পশ্য থাকিতে চাহেন। প্রত্যূষে গঙ্গায় অবগাহন স্নানের পর শয্যায় টাঙানো মশারির মধ্যে ঢুকিয়া পড়েন, সারাদিন আর তাঁহার দর্শন পাওয়া যায় না।

একজন কর্ম্মচারী বাগানবাড়ীতে বৈষ্ণবদের থাকাটা বেশী পছন্দ করে নাই। তাছাড়া, 'প্রভু' নামক ব্যক্তিটিকেও বড় রহস্যময় ঠেকিতেছে। লোকচক্ষুর আড়ালেই বা তিনি থাকেন কেন?

সেদিন স্নানকালে ইহাদের একজন দূর হইতে প্রভুকে দেখার চেষ্টা করিতে থাকে। লোকটির ধারণা জন্মে, এই ব্যক্তি আসলে জগদ্বন্ধুই নন, ভক্তগণ কোথা হইতে এক রূপসী তরুণীকে আনিয়া এ বাগানবাড়ীতে লুকাইয়া রাখিয়াছে। শুধু তাহাই নয়,—জমিদার কালীকৃষ্ণকে ছলনা করিতেও ছাড়ে নাই। কীর্ত্তনের সাজসরঞ্জাম বাবদ বহু অর্থ তাঁহার নিকট হইতে ইহারা আদায় করিয়াছে। কালীকৃষ্ণ ঠাকুরকে এ সব কথা বুঝানো হয়। ফলে ক্রুদ্ধ হইয়া হঠাৎ সেদিন দারোয়ান বরকন্দাজসহ তিনি বাগানে আসিয়া উপস্থিত।

কালীকৃষ্ণ ঠাকুরের মনে দৃঢ় ধারণা হইয়াছে, এই ভক্তেরা সবাই মিলিয়া তাঁহাকে প্রতারণা করিয়াছে। প্রকৃতপক্ষে প্রভু জগদ্বন্ধু তাঁহার বাগানবাড়ীতে নাই। তৎপরিবর্ত্তে আপাদমস্তক ঢাকিয়া এক সুন্দরী নারীকেই এখানে গোপন করিয়া রাখা হইয়াছে। ইহার প্রতিকার তাঁহাকে এখনই করিতে হইবে। ভক্তদের গালিগালাজ করিতে করিতে কালীকৃষ্ণ প্রভুর গৃহে ঢুকিয়া পড়িলেন।

প্রভু কিন্তু তাহার মশারীর ভিতরে নীরব নিশ্চল হইয়া বসিয়া আছেন। কালীকৃষ্ণ ঠাকুর তাঁহার নিকটে অগ্রসর হইয়া আসিলে আসন হইতে একবার শুধু শান্ত স্নেহমধুরকণ্ঠে ডাক দিলেন, "কে রে? কালীকৃষ্ণ?" সামান্য, সংক্ষিপ্ত আহ্বান। কিন্তু ইহা কোন্

ইন্দ্রজালের সৃষ্টি করিল তাহা কে জানে? কালীকৃষ্ণ ঠাকুর মুহূর্ত্তমধ্যে যেন এক ভিন্ন মানুষ হইয়া গেলেন।

অনুতপ্ত হৃদয়ে প্রভুর নিকট মার্জ্জনা চাহিয়া তিনি বাগানবাড়ী হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন! যাইবার সময় নিজের ম্যানেজার ও জগদ্বন্ধুর ভক্তদের বারবার বলিয়া গেলেন, প্রভু যতদিন ইচ্ছা এখানে অবস্থান করিতে থাকুন, ইহাতে তিনি অনুগৃহীতই হইবেন।

প্রভু কিন্তু সেই দিনই বাগান ত্যাগ করেন, রামবাগানের ডোমপল্লীতে তাঁহার এক অন্তরঙ্গ ভক্তের গৃহে চলিয়া যান। যাওয়ার সময় কেবলই বলিতে থাকেন, "ডোমপাড়ায় আমার এত নিজ জন থাকতে চম্পটি কেন শুধু শুধু আমায় রাজার বাগানে এনে উপস্থিত করলে? তাই তো আজ এই বিপদ। যাক্, ওখানকার দেওয়া বিছানা কাপড় টাকাকড়ি সব কিছু গঙ্গায় ফেলে দাও।"

ফরিদপুরের বুনোজাতিদের মত রামবাগানের ডোমদের উপরও জগদ্বন্ধুর কৃপারশ্মি পতিত হইয়াছিল।

মাঝে মাঝে বৃন্দাবন ও নবদ্বীপে তিনি যাতায়াত করিতেন, সে সময়ে কিছুকাল কলিকাতায় থাকিয়া যাইতেন। এ শহরে খুব কম লোকই তখন তাঁহার নাম শুনিয়াছে। এই সময়ে চুঁচুড়ায় অন্নদাচরণ দত্তের গৃহকে কেন্দ্র করিয়া জগদ্বন্ধুর পরিচয় পশ্চিমবঙ্গে ছড়াইতে থাকে। অন্নদাবাবু পরম বৈষ্ণব, একনিষ্ঠ গৌরভক্ত। অমৃতবাজার পত্রিকার শিশিরকুমার ঘোষ, মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি প্রভৃতি তাঁহার বাড়ীতে এ সময়ে প্রায়ই সমবেত হইতেন। ভক্ত অন্নদাবাবুর দেহে অনেক সময় পরলোকগত সাধুদের আবেশ হইত। তাঁহার মাধ্যমে নানা নির্দ্দেশ সকলে পাইতেন।

১২৯৮ সালের কথা। প্রভু জগদ্বন্ধু তখন ফরিদপুর ব্রাহ্মণকান্দায় বাস করিতেছেন। এ সময় অন্নদাবাবু চুঁচুড়ায় ভাবাবিষ্ট হইয়া একদিন বলেন, "জীব উদ্ধারের জন্য পূর্ব্ববঙ্গে যিনি অবতীর্ণ হয়েছেন তাঁর নাম—জগদ্বন্ধু"।

অন্নদাবাবু বা তাঁহার বন্ধুরা জগদ্বন্ধুর কথা তখনও শোনেন নাই। অতঃপর অনুসন্ধানের ফলে জানা গেল, ফরিদপুরে এক প্রেমিক মহাপুরুষের আবির্ভাব হইয়াছে। দেহে তাঁহার অপরূপ দিব্য লাবণ্যের ছটা—সদাই হরিনামে বিভোর। লোকচক্ষুর অন্তরালে থাকিয়া এক ভক্তি আন্দোলনের উৎসরূপে তিনি বিরাজিত আছেন, এখনও আত্মপ্রকাশ করেন নাই।

অন্নদাবাবু আবিষ্ট অবস্থায় আর একদিন কহিলেন, "প্রভু জগদ্বন্ধুর দেখা কালই পাওয়া যাবে। নবদ্বীপগামী ষ্টীমারে তিনি থাকবেন। খুঁজে পেতে তোমাদের কোন কষ্ট হবে না। তাঁর মনোহর দেবদুর্লভ মূর্ত্তিই তাঁকে চিনিয়ে দেবে।"

পরদিন সত্যই দেখা গেল ঐ ষ্টীমারের এক নিভৃত কোণে প্রভু ভক্ত-দলসহ বসিয়া আছেন। অন্নদা দত্ত, শিশিরকুমার ঘোষ প্রভৃতি ষ্টীমারের ডেকে প্রভুকে আবিষ্কার করেন, তাঁহার চরণে লুটাইয়া পড়িয়া সকলে কৃতার্থ হন।

ইহার কিছুদিন পরে শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার ঘোষ অমৃতবাজার পত্রিকায় প্রভুর পুণ্য কাহিনী প্রকাশ করিয়া বসেন। সন্ন্যাসী প্রবর স্বামী প্রেমানন্দ ভারতীও এসময়ে প্রভু জগদ্বন্ধুর নামগানে পঞ্চমুখ হইয়াছেন, প্রচার ও শুরু করিয়াছেন।

নবদ্বীপে বসিয়া জগদ্বন্ধু ইহা শুনিতে পান। একদিন শিষ্যদের বলেন, "ওরে তোরা শিশির ও ভারতীকে নিষেধ করে দিস্, তারা যেন এভাবে আমায় বিপদে না ফেলে। একেই তো এত লোকে আমায় 'দেখা দাও, দেখা দাও' বলে অস্থির করে তুলেছে। তার ওপর যদি ওরাও এরকম করিতে থাকে তবে আমার কোঠার ইট ক'খানাও লোকে রাখবে না। ওদের বলিস, বাতির আলোকে সূর্য্যকে কখনো দেখতে হয় না। সূর্য্য স্বপ্রকাশ, তিনি যখন প্রকাশিত হন জগতের সকলেই তাঁকে দেখতে পায়।"

পূর্ব্বোক্ত অন্নদাবাবুই ভাবাবিষ্ট হইয়া ভারতী মহারাজকে

আবিষ্কার করিয়াছিলেন। একদিন তিনি জানান, কলিকাতার এক কোণে জটাজুটধারী এক জ্ঞানী সন্ন্যাসী অবস্থান করিতেছেন, ইঁহাকে তাঁহার নিকট তৎক্ষণাৎ আনয়ন করিতে হইবে। খোঁজাখুঁজির পর সাধুকে সেদিন পাওয়া গেল—ইঁহার নাম প্রেমানন্দ ভারতী। অন্নদাবাবু এসময়ে ভারতী মহারাজকে জানাইয়া দেন, তাঁহাকে জটাজুট মুণ্ডন করিতে হইবে, গেরুয়া ত্যাগ করিয়া প্রেমিক বৈষ্ণবের বেশ ধারণ করিতে হইবে—শুধু তাহাই নয়, ভারতে ও বহির্ভারতে বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচারের কাজ তাঁহাকে না নিলে চলিবে না।

পূর্ব্বাশ্রমে ভারতী মহারাজের নাম ছিল সুরেন্দ্র মুখোপাধ্যায়। বারদীর ব্রহ্মচারী ও পাবনার হারাণ ক্ষেপার কৃপা-স্পর্শ তিনি প্রথম জীবনে প্রাপ্ত হন। উত্তরকালে কাশীর ব্রহ্মানন্দ ভারতীর নিকট তিনি সন্ন্যাস-দীক্ষা গ্রহণ করেন। এক দুর্জ্জেয় ঐশী বিধানে এইবার প্রেমানন্দ ভারতীর জীবনে নামিয়া আসে প্রেমের বন্যাধারা। প্রভু জগদ্বন্ধুর দর্শন তখনও তিনি পান নাই, কিন্তু তাঁহার নাম-লীলার কথা শুনিয়াই আকুল হইলেন। ব্রজসখ্যভাবে সদাই তিনি বিভোর থাকিতেন। এই সন্ন্যাসীর মুখে জগদ্বন্ধুর নামকীর্ত্তন যে শুনিত সে মুগ্ধ না হইয়া পারিত না।

উত্তরকালে প্রভুর নির্দ্দেশে ভারতী মহারাজ বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচারের জন্য আমেরিকায় যান। নিউ ইয়র্ক ও ক্যালিফোর্ণিয়া অঞ্চলে বহু আমেরিকাবাসীকে তিনি দীক্ষা দেন। তাঁহার সাধনকেন্দ্ররূপে তিনি সেখানে এক 'শ্রীকৃষ্ণ হোম্' স্থাপন করেন।

আমেরিকায় দশ বৎসর প্রচার করিয়া ১৩১৫ সালে ভারতী মহারাজ ভারতবর্ষে প্রত্যাবর্তন করেন। তাঁহার সঙ্গে কয়েকটি আমেরিকান শিষ্য শিষ্যাও এদেশে উপস্থিত হন। বৈষ্ণবধর্ম্মে দীক্ষা দিয়া প্রেমানন্দজী ইঁহাদের নব নামকরণ করিয়াছিলেন শ্যামদাস, গৌরীদাসী, হরিমতী, হরিদাসী ইত্যাদি। ভারতবর্ষ ও জগদ্বন্ধুকে দর্শনের জন্য ইঁহারা ব্যাকুল হইয়া এদেশে আসেন, কিন্তু

প্রভুর দর্শন ইঁহাদের ভাগ্যে ঘটে নাই। তৎপূর্ব্বেই শ্রীঅঙ্গনে অভ্যন্তর-গৃহে তিনি আত্ম-গোপন করিয়াছেন।

ফরিদপুরে বুনো বাগ্‌দীদের কৃপা করার পর কলিকাতার রামবাগানের ডোম সমাজের উপর জগদ্বন্ধুর দৃষ্টি পতিত হইয়াছিল। পূতিগন্ধময় পরিবেশে, সমাজের নিম্নতর স্তরে, এই অনাচারী মদ্যপ ডোমদের মধ্যে তিনি হরিনামের মহামন্ত্র প্রচার করিতে থাকেন, ডোমপল্লীতে নূতন প্রাণের স্পন্দন জাগিয়া উঠে। তাঁহাকে কেন্দ্র করিয়া এই অন্ত্যজদের জীবনে আসে এক মহা পরিবর্ত্তন।

বৈষ্ণবীয় নিষ্ঠা ও নামকীর্ত্তনের ফলে প্রভুর পরম ভক্তরূপে হিতহরিদাস, পীতাম্বর বাবাজী, দয়াল তিনকড়ি প্রভৃতি সাধককে আত্মপ্রকাশ করিতে দেখা যায়। কলিকাতার বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি ডোমপল্লীর পর্ণকুটিরবাসী প্রভু জগদ্বন্ধুকে দেখার জন্য ভীড় করিতেছেন। চম্পটি ঠাকুরের সাহায্যে প্রভু এই ডোমপল্লীতেই হরিনাম প্রচারের এক কেন্দ্র খুলিয়া বসেন। সমাজের নিম্নতম-স্তরের মানুষ ও অন্ত্যজদের মধ্য দিয়াই তাঁহার উদ্ধারণ ব্রত সেদিন পথ খুঁজিয়া নেয়।

বৃন্দাবনধামে প্রভু জগদ্বন্ধু তাঁহার তরুণ বয়সে বহুতর ভাবলীলা দেখাইয়া গিয়াছেন। শেঠের মন্দিরে সেদিন এক উৎসব উপলক্ষে পালাগান চলিতেছে। শোতৃমণ্ডলীর ভীড়ের মধ্যে পরম বৈষ্ণব বনমালী রায়ও বসিয়া আছেন। আসরে ঘন ঘন 'জয় রাধে শ্যাম' ধ্বনি উঠিতেছে। ইহার মধ্যে একটি যুবক অকস্মাৎ মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল। অপূর্ব্ব লাবণ্য শ্রীমণ্ডিত দেহে প্রাণের চিহ্নমাত্র নাই। পালাগান প্রায় ভাঙ্গিয়া গেল, এই সম্বিৎহারা যুবকের চিকিৎসার জন্য সকলে মহা ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন।

বনমালীবাবু কৌতূহলী হইয়া আগাইয়া আসিলেন। দেখিয়াই জানিলেন—প্রভু জগদ্বন্ধু বৃন্দাবনে আসিয়াছেন, আর পালা গানের উদ্দীপনায় তাঁহার সাত্বিক মূর্চ্ছা ঘটিয়াছে।

উৎকণ্ঠিত জনতাকে আশ্বাস দিয়া বনমালী রায় বলিলেন, "এঁর চিকিৎসার জন্য আপনারা বেশী ব্যস্ত হবেন না। ইনি প্রভু জগদ্বন্ধু, একজন প্রেমিক মহাপুরুষ, আর আমার সুপরিচিত। ঈশ্বরীয় উদ্দীপনা হলেই এঁর প্রেম বিকার উপস্থিত হয়। আমি যা হয় ব্যবস্থা করছি।"

জগদ্বন্ধুকে শিবিকা সাহায্যে বনমালী রায়ের গৃহ শ্রীরাধা বিনোদজীর কুঞ্জে আনা হয়। তাঁহাকে সন্তর্পণে শয়ন্ করাইয়া বাহির হইতে দ্বার বন্ধ করা হয়, যাতে বিশ্রামের কোন বিঘ্ন না ঘটে। কয়েকজন এখানে প্রহরা দিতে থাকে।

বিস্ময়ের বিষয়, যথেষ্ট সতর্কতা সত্ত্বেও ইহারা সকলেই কি জানি কেন ঘুমে একেবারে ঢলিয়া পড়ে। ইতিমধ্যে প্রভু জগদ্বন্ধু কখন যে গৃহ হইতে নিক্রান্ত হইয়া গিয়াছেন, তাহার সদুত্তর কেহই দিতে পারিতেছে না। ইহার কিছুদিন পরেই স্বেচ্ছাময় প্রভুর দর্শন আবার পাওয়া যায়।

ভক্তপ্রবর বনমালী রায় এসময়ে শ্রীকুণ্ড তীরে তাঁহার আরাধ্য বিগ্রহ বিনোদিয়ার কুঞ্জ নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিতেছেন। নিকটেই বনখণ্ডী মহাদেবের মন্দির। এখানকার এক মাটির গোফায় জগদ্বন্ধুও আশ্রয় নেন। শ্রীকুণ্ড পরিক্রমা করিতে আসিয়া বনমালী রোজ এই গোফার দ্বারে অপেক্ষা করিতেন, তারপর প্রভুর অমৃতবাণী শুনিয়া কুঞ্জে ফিরিতেন।

একদিন প্রভু তাঁহাকে বলিয়া উঠিলেন, "দেখুন, আগামী কাল মধ্যাহ্নে একটি মহাপুরুষ দেহরক্ষা করবেন। এজন্য প্রাতঃকাল থেকে তাঁকে ঘিরে সংকীর্ত্তনের ব্যবস্থা করুন।" সেই মহাপুরুষের পরিচয় ও ঠিকানা কি, জিজ্ঞাসা করা হইলে এক বিশাল তেঁতুল গাছ দেখাইয়া প্রভু কহিলেন, "ইনিই সেই মহাপুরুষ।"

প্রভুর বাক্য বনমালীবাবু অভ্রান্ত বলিয়া মানিতেন। তাছাড়া, ভক্ত বৈষ্ণব হিসাবে তাঁহার নিজেরও বিশ্বাস ছিল, বৃন্দাবনের

অপ্রাকৃত লীলা দর্শনের লোভে বহুতর মহাপুরুষ ব্রজভূমিতে গোপন-ভাবে অবস্থান করেন। প্রভুর কথামত ঐ বৃক্ষকে ঘিরিয়া অষ্টপ্রহর সাড়ম্বরে নাম কীর্ত্তনের ব্যবস্থা হয়। পরদিন মধ্যাহ্নে কিন্তু সত্যই দেখা গেল, ঝড়বৃষ্টি কোথাও কিছু নাই, বৈষ্ণবদের কীর্ত্তন ও পরি-ক্রমার মধ্যে গাছটি হঠাৎ মড়মড় শব্দে ভাঙ্গিয়া পড়িল।

জগদ্বন্ধু ইচ্ছামত গোফায় ও এক একটি কুঞ্জে বাস করেন, আর ব্রজধামের মন্দিরে মন্দিরে স্বচ্ছন্দে ঘুরিয়া বেড়ান। কাহারো সহিত তাঁহার বাক্যলাপ হয় না, তাই বৃন্দাবনের বৈষ্ণবদের অনেকে এই সময়ে তাঁহাকে বলিতেন 'মৌনী বাবা'।

রাধারাণীর ভাবে ভাবিত প্রভু অধিকাংশ সময় ঘোমটা দিয়া থাকেন, তাই ব্রজমাঈগণ তাঁহাকে রঙ্গ করিয়া ডাকেন 'ঘুংঘটওয়ালী'।

'বৃক্ষ-মহাপুরুষের' দেহরক্ষা সম্বন্ধে প্রভু যে ভবিষ্যদ্বাণী করেন তাহাতে এ সময়ে এ অঞ্চলে তিনি সুপরিচিত হইয়া উঠেন।

সেবার বৃন্দাবনের কুসুম সরোবর তীরে এক মৃত্তিকা-কুটিরে তিনি অবস্থান করিতেছেন। মথুরার ডাক্তার প্রমথ সান্যাল কয়েক-জন দর্শনার্থীসহ 'জয় রাধে' বলিয়া উপস্থিত হইলেন।

দ্বার খুলিতেই দেখা গেল, জগদ্বন্ধু দিব্য মহিমায় দণ্ডায়মান, আর পশ্চাতে মাটির দেওয়ালের গর্ত্ত হইতে এক বিষধর সর্প বারবার ফণা উত্তোলন করিতেছে। ভীত আগন্তুকেরা ঐ সাপটির দিকে প্রভুর দৃষ্টি আকর্ষণ করিলে তিনি প্রশান্ত কণ্ঠে কহিলেন, "ওখানে যে উনি আছেন, আমি তা আগে থেকেই জানি। আমি যে ওঁর অতিথি। আর উনি অতিথির তো কোন অনিষ্ট করিবেন না!" দর্শনার্থীদের ভয় কিন্তু কোনমতেই যাইতে চায় না। অবশেষে প্রভু বলিলেন, "উনি কিন্তু সত্যিই এক পরম ভক্ত! তবে ওঁর সম্বন্ধে আপনাদের ভয় যদি দূর না-ই হয়, তবে আপনাদের আর উদ্বেগ না দিয়ে নিজেই অন্যত্র সরে যাবেন।" সাপটিকে ইহার পর আর সেই কুটিরে কখনো দেখা যায় নাই।

এই সময়ে প্রভু জগদ্বন্ধুর প্রেরণা ভক্ত বনমালী রায়ের জীবনে কল্যাণকর হইয়া উঠে—বৈষ্ণবধর্ম্মের পুনরুজ্জীবনে ইহা কম সহায়ক হয় নাই। বৃন্দাবনের কুঞ্জ, মন্দির সংস্কার, বৈষ্ণব বিদ্যালয় স্থাপন প্রভৃতির সঙ্গে সঙ্গে বাংলাদেশের দিকে দিকে কীর্ত্তন আন্দোলন বাড়িয়া যাইতে থাকে।

বৈষ্ণব গ্রন্থরাজী এই সময়ে দুষ্প্রাপ্য ছিল। বটতলার ছাপানো পুস্তকের মর্য্যাদা শিক্ষিতদের মধ্যে তখন নাই বলিলেই চলে। বনমালী রায়কে উৎসাহিত করিয়া প্রভু বহু বৈষ্ণব-গ্রন্থ প্রকাশের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। তিনি বলিতেন, গুরু-অভিপ্রেত কার্য্যকেই বলে গুরুদীক্ষা। আর এ দীক্ষাই বনমালী রায়কে তিনি দিয়াছিলেন। এই গ্রন্থ প্রকাশনার মধ্য দিয়া বৈষ্ণব সমাজের মঙ্গল সাধিত হয়।

নিতান্ত তরুণ বয়সে জগদ্বন্ধু ব্রজের প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব বাবাজীদের স্বীকৃতি প্রাপ্ত হন, এ স্বীকৃতি অবশ্যই তাঁহার প্রেমশক্তির এক বিস্ময়কর নিদর্শন। মাধব দাস ও মনোহর দাস বাবাজী জগদ্বন্ধুর সহিত সদাই অন্তরঙ্গ সুহৃদের মতন ব্যবহার করিতেন। তোত্‌লা নিত্যানন্দ দাস বাবাজীর স্নেহধন্য শিষ্য, সদা ভজনশীল জগদীশবাবাকে প্রভু প্রায়ই দর্শন দিতেন। এই জগদীশবাবা তাঁহাকে দেখিলেই বলিতেন, "প্রভু! বড় আশ্চর্য্যের কথা, আপনি কাছে এলে আমার আর স্মরণ মনন থাকে না। আপনার ভেতরে যেন কি এক অলৌকিক শক্তি রয়েছে, যা আমার ভজন-কীর্ত্তন সব ভুলিয়ে দেয়।" রহস্যাবৃত 'ঘুংঘট-ওয়ালী' এই ধরণের উক্তি শুনিয়া শুধু নীরবে হাস্য করিয়া সরিয়া পড়িতেন।

শ্যামদাস বৃন্দাবনের এক তীব্র বৈরাগ্যবান বৈষ্ণব সাধক। প্রভুর সহিত তাঁহার সবেমাত্র কিছুটা পরিচয় ঘটিয়াছে, কিন্তু তখনো তেমন ঘনিষ্ঠতা জন্মে নাই। জগদ্বন্ধু এসময়ে মৌনী, কিন্তু কোথাও স্থির হইয়া থাকেন না—স্বেচ্ছামত কখন কোথায় তিনি অদৃশ্য হইয়া যান, কেহই জানিতে পারে না। একদিন প্রভাতে বৃন্দাবনের এক

বনের ধারে শ্যামদাস মাধুকরী করিতে গিয়াছেন। দূর হইতে হঠাৎ দেখিতে পাইলেন, একদল গাভী একত্র হইয়া পরম আনন্দে কি যেন লেহন করিতেছে। অগ্রসর হইয়া শ্যামদাসের বিস্ময়ের সীমা রহিল না। দেখিলেন, এক কনককান্তি দীর্ঘ পুরুষ ভূতলে শায়িত, আর গাভীরা নাক দিয়া তাঁহার দেহসৌরভ গ্রহণ করিতেছে—মধ্যে মধ্যে চলিতেছে সস্নেহ অবলেহন! "গোবিন্দ গোবিন্দ" উচ্চারণ করিয়া এসময়ে ঐ সাধক পুরুষটি পুলকাঞ্চিত কলেবরে তাহাদের স্নেহ ও আদর উপভোগ করিতেছেন। নিকটে গিয়া শ্যামদাস চিনিলেন, তিনি প্রভু জগদ্বন্ধু।

শ্যামদাসের ভজন কুটিরে প্রভু কিছুদিন অবস্থান গ্রহণ করেন। এ সময়ে মাঝে মাঝে তাঁহার অলৌকিক বিভূতির প্রকাশ দেখিয়া ভক্ত শ্যামদাসের বিস্ময়ের সীমা থাকিত না।

একদিন প্রভু গোফার মধ্যে নিভৃতে বসিয়া আছেন, নিকটে কেহ কোথাও নাই। শ্যামদাস দেখেন, কোথা হইতে যেন চন্দনচর্চিত তুলসীপত্রের গুচ্ছ বারবার টুপটাপ করিয়া তাঁহার কুটিরের অঙ্গনে পতিত হইতেছে।

আর একদিনের কথা। প্রভু কুসুম সরোবরে স্নান করিতেছেন। নিকটে দাঁড়াইয়া শ্যামদাস দেখিলেন, সরোবরের জলে স্নানরত প্রভু অলৌকিকভাবে কোথায় অদৃশ্য হইয়াছেন। তাঁহার স্থলে সেখানে ছুটাছুটি করিতেছে এক লীলাচঞ্চল বালক। আবার গোফার নিকটে আসিতেই সে মূর্ত্তি কোথায় অপসৃত হইয়া গেল! সবিস্ময়ে তিনি দেখিলেন, শাল্মলী বৃক্ষের মত দীর্ঘ—জ্যোতির্ম্ময় এক বড় বপু তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মান।

গোফায় প্রবেশ করার পর শ্যামদাস সোৎসাহে বলিলেন, "প্রভু আজ আপনার স্বরূপ দর্শন করেছি।" তিনি উত্তর দিলেন, "ওকে কি স্বরূপ বলে রে? ও কিছুই না। এ দেহটাকে ইচ্ছেমত বড় করা যায়, ছোটও করা যায়।"

প্রভু জগদ্বন্ধু ফরিদপুরে স্থায়ীভাবে বাস করিতে চাহেন, ইহা শুনিয়া বৃন্দাবনের এক প্রধান বৈষ্ণব তাঁহাকে বলেন, "প্রভু ফরিদপুর কি আপনার উপযুক্ত ভজনস্থান? এই ব্রজভূমিতে যমুনা-তীরেই আমরা আপনাকে এক ভজন মন্দির নির্ম্মাণ করে দিচ্ছি। আপনি এখানেই বাস করুন।" শুনিয়া প্রভু সেদিন কি জানি কেন বলিয়া উঠিলেন, "ওরে জানিস্! যদি কোন দিন পৃথিবী প্রলয়ের জলে ডুবে যায়, সেদিনও ফরিদপুরে থাকবে হাঁটুজল। ফরিদপুরকে এবার যে আমি এই পৃথিবীর কেন্দ্রস্থানে পরিণত করবো।"

শিতিকণ্ঠ পণ্ডিত নবদ্বীপের এক বিশিষ্ট শাস্ত্রজ্ঞ বংশের সন্তান। ভক্ত ও মনীষী ব্রজনাথ বিদ্যারত্ন তাঁহার পিতামহ, আর গৌরগতপ্রাণ পরম বৈষ্ণব দীননাথ পদরত্ন তাঁহার পিতা। ইঁহাদের গৃহেই নবদ্বীপের প্রসিদ্ধ 'হরিসভা' অনুষ্ঠিত হয়। নটবর গৌরাঙ্গ বিগ্রহ এখানে স্থাপিত রহিয়াছেন। শিতিকণ্ঠ একাধারে প্রেমিক সাধক এবং ভক্ত বংশের উপযুক্ত ধারক ও বাহক। লীলাময় গোরাচাঁদের মধুময় মূর্ত্তি দীর্ঘকাল ভজন করিয়া চলিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার অন্তরের পিপাসা ও খেদ তো কিছুতেই মিটিতেছে না! প্রত্যক্ষ দর্শনাদি তাঁহার কোথায়? লীলামাধুর্য্য ভুঞ্জনের সৌভাগ্যই বা হইতেছে কই?

সেদিন নিভৃতে পদচারণা করিতে করিতে তিনি নবদ্বীপের এক প্রান্তে আসিয়া পৌঁছিয়াছেন। শ্মশানভূমির কাছেই একটি ঝোপের আড়ালে পণ্ডিত এক অলৌকিক দৃশ্য দেখিয়া বিহ্বল হইয়া পড়িলেন। সুধা স্নিগ্ধ এক জ্যোতির্ম্মণ্ডল সেখানে বিরাজিত।

পণ্ডিত শিতিকণ্ঠ তাড়াতাড়ি সেদিকে ছুটিয়া গেলেন। নিকটে গিয়া তাঁহার বিস্ময় আরো বাড়িয়া গেল। দেখিলেন, অপরূপ লাবণ্যশ্রীমণ্ডিত এক মহাপুরুষ দিব্যভাবে আবিষ্ট হইয়া ভূতলে পড়িয়া রহিয়াছেন। তাঁহার দেহের অলৌকিক দ্যুতি, আর দিব্য সৌগন্ধ এই স্থানটির চারিদিকে বিস্তারিত।

পণ্ডিতের সর্ব্ব মন প্রাণ তৎক্ষণাৎ বলিয়া উঠিল—ইনিই তিনি,

যাঁহার জন্য দিনের পর দিন আকুল হইয়া কাঁদিয়াছেন, আর যাঁহার পদে আত্মসমর্পণ করিয়া ধন্য হইয়াছেন। মহাপুরুষ যেন তাঁহার চির পরিচিত। মধুর কণ্ঠে তিনি ডাকিলেন, "শিতিকণ্ঠ"। চির অনুগত ভক্তের মত শিতিকণ্ঠ উত্তর দিলেন—"প্রভু।"

প্রভুর পরিচয় জানিয়া পণ্ডিতের আনন্দ আর ধরে না। গৃহে ফিরিয়া পিতার কাছে ছুটিয়া গেলেন। পিতা দীননাথ বৃদ্ধ হইয়াছেন, একান্তে ভজন সাধন নিয়াই ব্যাপৃত থাকেন। কিন্তু 'জগদ্বন্ধু' নামটি শুনিয়াই বৃদ্ধের সংযমের বাঁধ ভাঙ্গিয়া গেল, পুলকাঞ্চিত দেহে সজল চক্ষে পুত্রকে জড়াইয়া ধরিলেন। বলিয়া বসিলেন, প্রভু যে এ গৃহে আসিবেন তাহা তিনি পূর্ব্বেই জানিতেন। রাগানুগা ভক্তির সিদ্ধ সাধক, তাহার গুরু নেহালদাস বাবাজী বহু-দিন আগে বলিয়া যান—তাঁহাদের গৃহের এই নাম-কীর্ত্তন ঝঙ্কৃত হরিসভায় এই মহাপ্রেমিক পুরুষ পদার্পণ করিবেন—ঘটিবে পরম সৌভাগ্যোদয়। শিতিকণ্ঠ উত্তরকালে তাঁহার সেদিনকার অলৌলিক দর্শনের সম্বন্ধে বলিতেন, "এক দর্শনেই সব!"

জগদ্বন্ধুর আবির্ভাবের পর শিতিকণ্ঠের হরিসভায় কীর্ত্তনানন্দ ও হরিকথার স্রোত অবিরল ধারায় বহিয়া যাইতে থাকে। এই স্থানকে কেন্দ্র করিয়াই প্রভু নবদ্বীপ ধামের বহু ভক্ত ও বৈষ্ণবকে প্রেম সাধন প্রদান করেন। ইহাদের মধ্যে সাধন-সামর্থ্যের দিক দিয়া রাইমাতার নাম অগ্রগণ্য। রাই উন্মাদিনীভাবে এই মহীয়সী সাধিকা সদা বিভোর থাকিতেন। কীর্ত্তন ও কৃষ্ণ নাম শ্রবণে তাঁহার দেহে সাত্ত্বিক বিকার ফুটিয়া উঠিত, এ দৃশ্য দেখিয়া সকলেই বিস্মিত হইয়া যাইতেন! ইহার সেবা ও ভজননিষ্ঠা ছিল অসামান্য। প্রভু জগদ্বন্ধু নবদ্বীপ হইতে বহুদূরে থাকিয়াও মাঝে মাঝে অপ্রাকৃত দর্শন দিয়া তাঁহাকে ধন্য করিতেন।

নবদ্বীপের শ্রীবাস-অঙ্গন ঘাটে প্রভু সেদিন সন্ধ্যাকালে স্নানে নামিতেছেন! কি এক অজ্ঞাত কারণে হঠাৎ থমকিয়া দাঁড়াইলেন।

সঙ্গে রহিয়াছেন ভক্ত নবদ্বীপদাস। তাহাকে ডাকিয়া ব্যাকুল কণ্ঠে কহিলেন, "নবদ্বীপ, তুই শীগ্‌গির বড়াল-ঘাটে ছুটে যা। সেখানে এক পরম ভক্ত বৈষ্ণব গঙ্গায় ডুবে আত্মহত্যা করতে যাচ্ছেন। তাঁর নাম বালকৃষ্ণ। তাঁকে ডেকে বলবি, এভাবে জীবন নাশ করতে আমি নিষেধ করেছি।"

নবদ্বীপদাস তখনি ছুটিতে ছুটিতে বড়াল-ঘাটে গিয়া উপস্থিত। চন্দ্রালোকে দূর হইতে দেখিলেন, এক ব্যক্তি ধীরে ধীরে গঙ্গাগর্ভে নামিয়া চলিয়াছেন। উচ্চ স্বরে হাঁক দিলেন, "বালকৃষ্ণ! বালকৃষ্ণ! ফিরে আসুন, প্রভু আত্মহত্যা করতে নিষেধ করেছেন।"

প্রাণত্যাগে কৃতসঙ্কল্প বৈষ্ণব সবিস্ময়ে ফিরিয়া দাঁড়াইলেন। তীরে ফিরিয়া আসিয়া নবদ্বীপদাসকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে তুমি ভাই? আমার নাম তুমি কি ক'রে জানলে? আমার আত্মহত্যার গোপন সঙ্কল্পই বা কে তোমার কাছে প্রকাশ করলো?"

নবদ্বীপদাস সবিনয়ে জানাইলেন, এসব ব্যাপারের তিনি কিছুই জানেন না। তাঁহার প্রভু জগদ্বন্ধু সর্ব্বজ্ঞ—শুধু তাঁহার আদেশেই তিনি এখানে ছুটিয়া আসিয়াছেন।

বালকৃষ্ণ উন্নত স্তরের সাধক। প্রেমসাধনার মধ্য দিয়া আনন্দ ও বিষাদের তীব্র জোয়ার ভাঁটা খেলিয়া যায়—তাহারই এক ভাঁটার টানে ক্লিষ্ট হইয়া তিনি দেহ বিসর্জ্জন দিতে যাইতেছিলেন। জগদ্বন্ধু আজ অলৌকিকভাবে তাঁহার প্রাণ বাঁচইলেন।

বালকৃষ্ণ প্রভুপাদ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর শিষ্য। গোঁসাইজীর মুখে ও হুগলীর অন্নদা দত্তের নিকট ইতিপূর্ব্বে তিনি জগদ্বন্ধুর মহিমা শুনিয়াছেন। আজ হইতে প্রভুর পদে তিনি আত্মসমর্পণ করিলেন। ব্রজগোপীর ভাবে ভাবিত এই বৈষ্ণব সাধক উত্তরকালে 'ব্রজবালা' নামে পরিচিত হইয়া উঠেন।

ফরিদপুরকে কেন্দ্র করিয়া জগদ্বন্ধু তাঁহার মহানাম ব্রত উদ্‌যাপন করিতেছেন, পূর্ব্ববঙ্গের নানা স্থানে ধীরে ধীরে তাঁহার নামকীর্ত্তনের

মঙ্গল-বীজ প্রবিষ্ট হইতেছে। পরিকরগণসহ যেদিন তিনি কীর্ত্তন নর্ত্তনে বহির্গত হন দিগ্বিদিকে সেদিন পরম আনন্দের সাড়া পড়িয়া যায়। একদিকে আশা-শোটা ও চামর-ব্যজনের সমারোহ, অপর দিকে অগণিত মাদল-করতাল ও কাঁসর-ঝাঁঝের আনন্দ মুখরতা। সর্ব্বত্র এক অপূর্ব্ব উৎসবের পরিবেশ।

এমনই এক উৎসবের শুভদিনে বালক রাধিকা গুপ্ত প্রভুর দর্শন পান, প্রভুও তাঁহাকে তখনি আত্মসাৎ করিয়া নেন। রাধিকা নামটি জগদ্বন্ধুর মুখে উচ্চারিত হইতে চাহে না, তাই 'শারিকা' বলিয়াই তাঁহাকে তিনি ডাকেন। প্রভুর নিকটে থাকিয়া আচারনিষ্ঠা, কীর্ত্তন ও নাম জপের মধ্য দিয়া বালকের জীবন রূপান্তরিত হইতে থাকে। নূতন নামকরণ হয় রামদাস। ইনিই উত্তর কালের খ্যাতনামা বৈষ্ণব আচার্য্য, নাম কীর্ত্তনের মহাচারণ—রামদাস বাবাজী।

অতি অল্প বয়সে রামদাস সংসারের বন্ধন ছিন্ন করিয়া ত্যাগ ও বৈরাগ্যের পথে বাহির হইয়া পড়িলেন। প্রভু জগদ্বন্ধুর নির্দ্দেশে তাঁহাকে বৃন্দাবনে রওনা হইতে হইল। রামদাসের বয়স এ সময়ে মাত্র পনের বৎসর। প্রভু বৃন্দাবনধামে গিয়া এবার প্রায় তিন মাস বাস করেন। এ সময়ে রামদাসের জীবনে ব্রজের ভজন তিনি ধীরে ধীরে অনুপ্রবিষ্ট করাইয়া দিতে থাকেন। রামদাসের ধুতি বস্ত্রটি একদিন ছিঁড়িয়া প্রভু তাহা দিয়া কৌপীন ও বহির্ব্বাস তৈয়ার করাইয়া দেন—তাঁহাকে বলেন, "ওরে ব্রজে থাকবি, ভক্ত বৈষ্ণবের বেশ না হলে কি মানায়?"

জগদ্বন্ধু সেদিন গোবিন্দজীর দর্শনে চলিয়াছেন। কখন কি ভাবাবেশ আসিয়া পড়ে তাহার কোন ঠিক নাই। তাই রামদাসকে নির্দ্দেশ দিয়া রাখেন, "শারিকা, সর্ব্বদা প্রখর দৃষ্টি রাখবি, দেখবি, আমার শরীরে যেন প্রকৃতি-স্পর্শ না লাগে।" সেদিন ভীড়ের মধ্যে হঠাৎ এক স্ত্রীলোকের ছোঁয়া প্রভুর দেহে লাগিয়া গেল। রামদাস উন্মনস্ক ছিলেন, তাই চকিতে ইহা সঙ্ঘটিত হইয়াছে। এ স্পর্শ এক

মহা অনর্থ সৃষ্টি করিয়া বসিল। জগদ্বন্ধু আর্ত্তস্বরে—"জ্বলে গেল, জ্বলে গেল" বলিয়া কাতরোক্তি করিতে লাগিলেন।

রামদাস তো অপরাধীর মত দাঁড়াইয়া আছেন। দীর্ঘ সময় পরে ব্রজের রজে বারবার গড়াগড়ি দিয়া তবে সেদিন প্রভুর জ্বালা কমে, তিনি শান্ত হন। বৈরাগ্যবান পুরুষের পক্ষে প্রকৃতি-স্পর্শ কত গ্লানিকর তাহারই চিত্র রামদাসের অন্তরে তিনি এভাবে আঁকিয়া দিলেন?

সেদিন প্রভু একটি অপূর্ব্ব কীর্ত্তন রচনা করিয়াছেন। রামদাসকে আদেশ করিলেন, তখনই বনমালীবাবুর কুঞ্জে গিয়া শ্রীবিনোদ বিগ্রহকে ঐ গান শুনাইয়া আসিতে হইবে। আদেশ তৎক্ষণাৎ পালিত হইল!

ফিরিবার সময় বনমালীবাবুর স্ত্রী প্রভুর জন্য গোবিন্দজীর এক হাঁড়ি প্রসাদ দিয়া দিলেন। অন্তঃপুরের এক পরিচারিকা এই ভাণ্ডটি আনিয়া শ্রদ্ধাভরে রামদাসের হস্তে অর্পণ করিল।

প্রসাদ নিয়া তিনি সবেমাত্র কুঞ্জে ফিরিয়া আসিয়াছেন! প্রভু মহা ক্রুদ্ধ হইয়া কহিতে লাগিলেন, "সেকি রে! তুই এভাবে প্রকৃতিস্পর্শ করলি? আমার শপথ, এরূপ কাজ আর কখন করিস নে।"

দণ্ডবৎ করিয়া প্রসাদের হাঁড়িটি প্রভু যমুনায় ভাসাইয়া দিলেন। নারী সংশ্রব হইতে নূতন সাধকদের এমনই সতর্ক নিষ্ঠায় তিনি রক্ষা করিয়া চলিতেন।

বৃন্দাবনে থাকাকালে জগদ্বন্ধু তাঁহার মহানাম কীর্ত্তনের অন্যতম সংবাহকের সন্ধান প্রাপ্ত হন। মৃদঙ্গ বাদনে এবং নামকীর্ত্তনে ইহার প্রতিভার স্ফুরণ হইবে, প্রভু তাহা একবার দেখিয়াই বুঝিয়াছিলেন। বৈষ্ণবীয় সাধনভজন দান করিয়া ইহাকে ধীরে ধীরে আত্মসাৎ করিয়া নেন। এ ভাগ্যবান ব্যক্তি উত্তরকালের অদ্বিতীয় মৃদঙ্গবাদক নবদ্বীপদাস ব্রজবাসী। গড়ানহাটী সঙ্গীত

পদ্ধতি আয়ত্ত করিতেও তিনি অপূর্ব্ব প্রতিভার পরিচয় দেন। কলিকাতার ভক্ত বৈষ্ণব সমাজে নবদ্বীপদাস ব্রজবাসীর কীর্ত্তন-শিক্ষা সুফল আনয়ন করে। এই প্রবীণ ভক্ত চিরকাল প্রভুর কৃপার কথা পুলকাঞ্চিত দেহে স্বীকার করিতেন।

জগদ্বন্ধু বাংলায় ফিরিবেন। রামদাসকে তিনি বৃন্দাবনে থাকিয়া আরও কিছুকাল সাধন ভজন করিতে আদেশ দিলেন। রামদাস প্রভুর পাদপদ্মে জীবন সমর্পণ করিয়াছেন, ছায়ায় ন্যায় তাঁহাকে অনুসরণ করিয়া আশ মিটে না, সেবা করার লোভও ছাড়িতে পারেন না। তাই বৃন্দাবনে থাকিতে মোটেই রাজী নহেন।

প্রভু বুঝাইতে লাগিলেন, "ওরে তুই এখানেই থাক্।—বৃন্দাবনে থাকা যে মহাভাগ্যের কথা। তোর মঙ্গল হবে।" অবশেষে রামদাস এ কথা মানিয়া নিলেন, বৃন্দাবনেই তিনি থাকিবেন।

প্রভু এবার হাসিয়া বলিলেন, "ছিঃ। চাঁদে কলঙ্ক হ'লো।" অর্থাৎ রামদাসকে বুঝাইয়া দিলেন, নির্ব্বিচারে প্রভু-বাক্য পালন করাই যেখানে কর্ত্তব্য, নিজ মতের প্রাধান্য দিবার এ অপচেষ্টা কেন? এ যে তাঁহার পবিত্র চরিত্রে কলঙ্ক বিশেষ।

ব্রজধাম ছাড়ার আগে রামদাসকে তিনি বলিয়া গেলেন—"নিত্য লক্ষ নাম ক'রবে ও মাধুকরী ক'রবে। আমার হস্তাক্ষর ছাড়া কিছু পড়বে না। অন্যের চিঠি গেলে যমুনায় ভাসিয়ে দেবে।"

শ্রীবৃন্দাবনে রামদাসকে এ সময়ে তিনি লীলা-বিলাসের কিছু কিছু পদ রচনা করিয়া পাঠান। শুধু যে ভাব ও ভাষার লালিত্যে এই পদগুলি সমৃদ্ধ তাহাই নয়, প্রভু জগদ্বন্ধুর জীবনদর্শনের ইঙ্গিতও এগুলিতে নিহিত রহিয়াছে। নিম্নের উদ্ধৃতি হইতে ইহার কিছুটা আভাষ প্রাপ্ত হওয়া যায়।—

এ কি নব রঙ্গ হের সখীগণ,
শ্যাম অঙ্গে রাই রেখেছে চরণ,

মরি কিবা শোভা হয়েছে এখন,
হেমলতা যেন তমালে বেড়িল।
ধীরে কথা কও সকল সজনী,
যেন না জাগেন কমলিনী ধনী,
জাগিলে চরণ ঘুচাবে অমনি,
চল যাই নিশি অধিক হইল।
সব সহচরী করিল গমন,
নিজ নিজ কুঞ্জে করিল শয়ন,
নিঃশব্দ নিবিড় নিকুঞ্জ কানন,
দ্বারে জগদ্বন্ধু কোটাল রহিল!

রামদাসের জীবনে এ অপূর্ব্বপদগুলি দিব্য অমৃতের ধারা উৎসারিত করিয়া দেয়। রাগানুগা ভজনের পথে ধীরে ধীরে তিনি অগ্রসর হইতে থাকেন।

ইহার পর জগদ্বন্ধু রামদাসকে কলিকাতায় ডাকাইয়া আনেন। তরুণ ভক্তের হৃদয়ে তখন যুগল কিশোরের প্রেম-লীলার ধারা বহিতেছে। কুঞ্জভঙ্গের গান গাহিতে গেলে তিনি কাঁদিয়া অস্থির হন, আসর ত্যাগ করিয়া যান। জগদ্বন্ধু তাঁহার এই অবস্থা দেখিয়া বলিতেন, "রামী পাগল হয়েছে!"

একদিন কীর্ত্তনের সময় তীব্র ভাবাবেশে রামদাস অধির হইয়া গানের খাতাটি প্রভুর আসনের উপর নিক্ষেপ করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। জগদ্বন্ধু সতর্ক দৃষ্টিতে সব কিছু চাহিয়া দেখিলেন।

ভক্ত শান্ত হইলে তাঁহাকে ডাকিয়া স্নিগ্ধ মধুর কণ্ঠে বলিলেন, "রামী, খাতাটি যে এভাবে ছুঁড়ে মারলি, লাগলো কার? নামরূপে নামী এর ভেতরে বিবাজ করছেন নাকি?" রামদাস লজ্জিত, অধোবদন হইয়া চুপ করিয়া রহিলেন।

ভাবাবেগে উচ্ছল ভক্তদের কোন রকম অসংযম—কথায় অথবা আচরণে—জগদ্বন্ধু সদা সজাগ দৃষ্টিকে এড়াইতে পারিত না।

রামদাস একদিন সমাদর করিয়া প্রভুকে 'গৌর-গরবিনী' বলিয়া সম্বোধন করিয়াছিলেন। শুনিয়া তিনি চুপ করিয়া রহিলেন, পরে অপর এক ভক্তকে ডাকিয়া দৃঢ় স্বরে কহিলেন, "ছাখ্, রামদাসকে নিষেধ করে দিস্ ও যেন কখনো আমাকে প্রকৃতি জ্ঞানে সম্বোধন না করে। আমিই একমাত্র পুরুষ এটা তোরা মনে রাখ্‌বি। পুরুষকে প্রকৃতি বলে সম্বোধন করলে অপমান করা হয়।"

রামদাস একবার স্থায়ীভাবে বৃন্দাবন বাসের সঙ্কল্প করিতেছিলেন, প্রভু তাঁহাকে নিরস্ত করিলেন। কহিলেন, "কি বৃন্দাবন বৃন্দাবন করিস্? কোন জিনিস কেউ শুধু নিজে খেলে লোকে বলে স্বার্থপর। পাঁচজনকে খাইয়ে যে খায়, সেই তো প্রকৃত মানুষ রে! এযুগে হরিনামেই জগতের উপকার। জীবের দ্বারে দ্বারে ঘুরে সদা নিতাই গৌরাঙ্গের নাম প্রচার কর্‌বি—এই যে তোর কাজ!'

প্রভুর নির্দ্দেশে উত্তরকালে রামদাস নবদ্বীপের বড়বাবাজী, রাধারমণ চরণদাসজীর আশ্রয় নিয়েছিলেন। কিন্তু আদিষ্ট নাম-প্রচারের চারণব্রত কোনদিনই ত্যাগ করেন নাই।

জয়-নিতাই জগদ্বন্ধুর এক বিশিষ্ট ভক্ত। "নিতাইর কি মহিমা, নিতাইর কি মহিমা" বলিয়া তিনি একদিন ভাবাবিষ্ট হইতেছেন। প্রভু তৎক্ষণাৎ বলিয়া উঠিলেন, "সে কি গো! নিতাইর মহিমা বলিতে নেই! মহিমার সাথে ঐশ্বর্য্যের কথাও যে পড়ে। বলতে হয়—নিতাইর কি মাধুরী।" জয়-নিতাইর ধারণা ছিল, নিতাই-তত্ত্ব তিনি ভালভাবে উপলব্ধি করিয়াছেন, প্রভুর এ সংশোধন-বাক্যে তাঁহার সে গর্ব্ব চূর্ণ হইয়া গেল। তত্ত্বের প্রকৃত তাৎপর্য এবং বাক্য সংযমের দিকেই প্রভু সেদিন তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া দিলেন।

সেবার এক ভক্তের মনে ব্রজরস-সাধন ও রাধাকৃষ্ণলীলা সম্বন্ধে সন্দেহ উপস্থিত হয়। গোপীভাবের প্রকৃত তত্ত্ব সম্বন্ধে জিজ্ঞাসু হইয়া তিনি জগদ্বন্ধুকে প্রশ্ন করেন। প্রভু সামান্য কয়েকটি কথায়

তাঁহার হৃদয়ের সংশয় কিছুটা মিটাইয়া দিলেন। তারপর বলিলেন, "ওরে, সে যে অপ্রাকৃত ভাবমাধুর্য্য। তুই এই তত্ত্ব সহজে বুঝতে পারবি নে ; সময়ে বুঝবি। গোপীভাবের একটু আভাষ না পেতেই বিদ্যাপতির ব্রহ্মরন্ধ্র ফেটে গিয়েছিলো। এখন তোকে সে তত্ত্ব বল্‌লে তুই ধারণা করতে পারবি কেন ? ব্রহ্মরন্ধ্র ফেটে মারা যাবি। নাম ক'রে যা সময়ে সব বুঝতে পারবি।"

এক ভক্ত মাঝে মাঝেই প্রেমাবেশে উচ্চ কণ্ঠে বলিয়া উঠিতেছেন, "হরি হে প্রাণবল্লভ।" প্রভু তাঁহার ভাবময়তা দুই একবার লক্ষ্য করিলেন। তাহার পর তীক্ষ্ণ কণ্ঠে ভর্ৎসনা করিয়া উঠিলেন, "প্রেমের কথা, প্রাণবল্লভের কথা তো প্রাণের গোপন কথা রে। প্রাণের ভেতরে তা আঁকড়ে ধরে রাখতে হয়, এসব চেঁচিয়ে বলতে নেই।" ভক্তটি বড় লজ্জিত হইলেন। প্রভুর সতর্ক দৃষ্টি এমনি করিয়াই আশ্রিতদের ঘিরিয়া রাখিত।

কলিকাতায় রামবাগান ডোম পল্লীতে জগদ্বন্ধুন একদিন বসিয়া আছেন। চম্পটি ঠাকুর সবেমাত্র নিত্য টহল হইতে ফিরিলেন, সেদিন তিনি বড় উত্তেজিত। হরিনাম শুনিয়া লোকে উপহাস করে তাই খুব চটিয়া গিয়াছেন। জগদ্বন্ধু সম্মুখে ঝোলা ও করতাল ছুঁড়িয়া ফেলিয়া তিনি কহিতে লাগিলেন, "নাও! এই রইলো তোমার ঝোলা আর করতাল! আমার দ্বারা আর তোমার নাম প্রচারের কাজ হবে না। শেয়াল কুকুরের মত মানুষগুলো কামিনী কাঞ্চন নিয়ে কাড়াকাড়ি করছে। হরিনামে লোকের বিশ্বাস ভক্তি তো এতটুকুও দেখতে পাই নে। তুমি এত বড় প্রভু, কিন্তু তুমি আজ অবধি করলে কি ? কেউ তোমায় চিনলো না!"

জগদ্বন্ধু নিঃশব্দে বসিয়া সব শুনিতেছেন। কিছুক্ষণ পরে শান্ত আত্মপ্রত্যয়ভরা কণ্ঠে বলিতে লাগিলেন, "ওরে অতুল! সময়—সময়—সময়। দেখছিস্ না, এমন যে দুর্জ্জয় ইংরেজ রাজত্ব, তাও দিনে দিনে আজ কেমন শীর্ণ হয়ে যাচ্ছে। একটা গাছ যখন বাড়ে

তখন কি তোরা বুঝতে পারিস, কতটুকু বাড়ছে? তবে দশ বিশ দিন পরে কতটা বেড়েছে তা বোঝা যায়। আমার ধর্ম্ম ও কর্ম্ম, ইচ্ছা ও উদ্দেশ্য তোরা কতটুকু বুঝবি? অমন পাগলামি করতে নেই। শান্তভাবে হরিনাম করতে থাক্। এটা প্রলয় কাল—নামকীর্ত্তনই সত্য। এ যুগে একমাত্র হরিনামই সৃষ্টি রক্ষার উপায়। কেউ হরিনাম করুক, আর না করুক, তাতে তোর কিছু আসে যায় না। তুই নির্ব্বিচারে হরিনাম করে বেড়াবি। সবাই ভেতরে ভেতরে হরিনামের ভিখারী সেজে বসে আছে—দেখবি, শিগ্গীর স্থান বিশেষে মহাশক্তির প্রকাশ হবে।"

চম্পটির অন্তরের সমস্ত দুঃখ ও তাপ এতক্ষণে খানিকটা শান্ত হইয়া আসিয়াছে। ব্যগ্র হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "প্রভু! তবে বলুন, কোথায় এই বিশেষ প্রকাশটি হবে? জগদ্বন্ধু গম্ভীর স্বরে তাঁহাকে উত্তর দিলেন, "তোদের এই ক'লকাতায়!"

শিশিরকুমার ঘোষ প্রায়ই জগদ্বন্ধুর চরণ দর্শনে আসিতেন। প্রভু তাঁহাকে বলিতেন, "ওগো, প্রলয় কাল, নামের অভাব—কেবল হরিনাম কর, হরিনাম কর, টহলই শেষ ধর্ম্ম।"

কখনো প্রেমাবেশে মত্ত থাকিয়া, কখনো অর্দ্ধবাহ্য অবস্থায় প্রভু এই পাপময় কলিযুগের মহতী বিনষ্টির ও মহাপ্রলয়ের ইঙ্গিত দিয়া গিয়াছেন। তাঁহার নানা উপদেশ, লেখা ও সঙ্গীতের পদে রহিয়াছে আসন্ন সৃষ্টি ধ্বংসের ভবিষ্যদ্বাণী। মহানাম প্রচারের মধ্য দিয়া প্রলয়ের বুকে আবার নব সৃষ্টির উন্মেষ ঘটিবে, কলিযুগের অবসানে সত্যযুগের অমৃতময় জীবন-জ্যোতি ফুটিয়া উঠিবে, একথা তিনি নানাভাবে, বারবার বলিতে ছাড়েন নাই।

স্বরচিত সঙ্গীতে তিনি গাহিয়া গিয়াছেন—

হরিনাম লও ভাই,
আর অন্য গতি নাই,
হের প্রলয় এল প্রায়।

(যদি সৃষ্টি রাখ ভাই
হরিনাম প্রচার কর)

সৃষ্টি রক্ষার নিগূঢ় মন্ত্রটি যে মহানামের মধ্যেই নিহিত এবং এই মহানাম অনিবার্য্যরূপে অবতারণ করিবে—এই কথাটি প্রায়ই তাঁহার মুখে শোনা যাইত।

মানবপ্রেমিক প্রভু মানবের উদ্ধারের জন্য সেদিন সখেদে কহিয়া গিয়াছেন, "আমি ঘরে ঘরে এত ক'রে সেধে বেড়াচ্ছি, কিন্তু কেউ হরিনাম ক'রলো না। দেখবে, এমন একদিন আসবে, যেদিন কি ধনী কি নির্ধন কি রাজা, কি সাধু কি অসাধু সকলেই একেবারে নাকের জলে চোখের জলে এক হয়ে যাবে। তখন দায়ে পড়ে সকলেই হরিনাম ক'রবে।"

আসন্ন মহাপ্রলয়, সত্যযুগের আবির্ভাব প্রভৃতি উক্তির সঙ্গে সঙ্গে ভগবৎ-শক্তির অবতরণ সম্বন্ধেও কতকগুলি উক্তি তিনি করিয়া গিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন—

"যুগাবতার ছাড়াও শ্রীভগবান আসিতে পারেন। যুগাবতারের ভগবান ও স্বয়ং ভগবানে কিছু পার্থক্য আছে। যুগাবতারে সম্পূর্ণ শক্তি প্রকাশ পায় না। এই শ্রীভগবান যুগাবতারে যে শক্তি নিয়ে আসেন, তা অপেক্ষা বেশী শক্তি নিয়ে এসে মহা-উদ্ধারণ কার্য করেন।**যুগাবতারের ভগবান, আর স্বয়ং ভগবান একই জিনিস। তবে শক্তি প্রকাশে তারতম্য আছে। যখন স্বয়ং ভগবান আসেন তখন যুগাবতারের ভগবান তাঁতেই মিলিত হন। আর শ্রীভগবানের ধরাধামে অবতীর্ণ হওয়া? তাহা শুধু শাস্ত্রের প্রমাণে কি বুঝবে? এ যে তাঁর নিজের ইচ্ছে! যখন তাঁর আসবার প্রয়োজন হয় তখনই তিনি আসেন। লক্ষণে চিনবে! তিনি শক্তি প্রকাশ করলে ও জানালে, তবেই তো জগৎ জান্‌তে পারে!"

মহানাম অবতরণের কথা প্রভু বলিয়া গিয়াছেন। কিন্তু এখানেই তিনি নিরস্ত হন নাই, দিকে দিকে ইহারই প্রস্তুতি সাধনে তিনি

আত্মনিয়োগ করেন। তিনি প্রেমধর্ম্ম ও নামকীর্ত্তনের স্তিমিত ধারাকে পুনরুজ্জীবিত করিতে চেষ্টিত হন। শুধু তাঁহার দিব্য দেহের দর্শন স্পর্শন ও তাঁহার কীর্ত্তন-লীলার অলৌকিক প্রভাবে অগণিত মানুষের হৃদয়ে ভক্তিরসের ঢল নামিতে থাকে।

ভক্ত ও মুমুক্ষুর দল তাঁহার আশ্রয় নিয়াছে বটে, কিন্তু প্রভু কোনদিন কাহাকেও দীক্ষা দান করেন নাই। ব্যবহারিকভাবে শিষ্য গ্রহণ করা পছন্দ করিতেন না। এবিষয়ে প্রশ্ন করিলে গম্ভীরভাবে উত্তর দিতেন "মানুষ-গুরুমন্ত্র দেয় কাণে, জগৎগুরু মন্ত্র দেয় প্রাণে।" আনুষ্ঠানিক মন্ত্রাদি দান না করিয়াও এই শক্তিধর প্রেমিক-পুরুষ তাঁহার চরণতলে সমবেত বহু ভক্তের অধ্যাত্ম-জীবনে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন।

একবার প্রভু শ্রীবৃন্দাবনে রওনা হইয়াছেন। হাওড়া ষ্টেশনে পৌঁছিয়া তিনি ভক্ত-প্রবর চম্পটি ঠাকুরকে টিকিট কাটিয়া আনিতে আদেশ দিলেন। চম্পটি ঠাকুরের তো মহা বিপদ। তিনি অকিঞ্চন বৈষ্ণব, তাঁহার নিকট টাকা কোথায়? তাছাড়া, সময় বেশী হাতে নাই। বিপন্ন হইয়া প্রশ্ন করিলেন, "প্রভু, এতরাত্রে টাকা কোথায় পাবো?"

জগদ্বন্ধু সংক্ষেপে উত্তর দিলেন, "ব্রজের পাথেয় যে গৌরভক্তই যোগাবে।" ইহার উপর আর কিছু আলোকপাত করিলেন না, নিঃশব্দে ষ্টেশনে আপন মনে বসিয়া রহিলেন।

চম্পটি তো ভাবিয়া কুল কিনারা পাইতেছেন না। এখনি কোথা হইতে তাঁহাকে কে টাকা দিবে? কে-ই বা সে গৌরভক্ত? প্রভু তো লোকটির ঠিকানা কিছুতেই বলিবেন না। তবে উপায়?

চম্পটি এবার ষ্টেশন হইতে ছুটিয়া বাহির হইলেন। পরিচিত দুই একটি ভক্তের নিকট গিয়া কোন ফল হইল না। ফিরিবার পথে বীডন স্কোয়ারের কাছে আসিয়া তিনি থমকিয়া দাঁড়াইলেন। সম্মুখে দেখিলেন, তিলক-কণ্ঠিধারী এক যুবক তাহার দোকান বন্ধ করিতে যাইতছে।

চম্পটি ঠাকুর দ্রুতপদে এই ব্যবসায়ীর সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইলেন। প্রশ্ন করিলেন, "মশাই, আপনি কি গৌরভক্ত? সরলভাবে সত্বর একথার উত্তর দিন!" অপরিচিতের মুখে একি অদ্ভূত প্রশ্ন? দোকানের মালিক সবিনয়ে, বলিলেন, "আজ্ঞে, এ অধম গৌরভক্তি না পেলেও গৌরভক্ত-রূপে পরিচিত বটে।" চম্পটি ঠাকুর তখন সব কথা খুলিয়া বলিলেন। তাঁহার প্রভু জগবন্ধু আজ বৃন্দাবনে যাইবার জন্য ষ্টেশনে বসিয়া আছেন। টিকিট কেনার টাকা হাতে নাই। তাঁহাকে তিনি এই কথাটি শুধু বলিয়া দিয়াছেন,—কোন গৌরভক্ত তাঁহার পাথেয় দিয়া দিবে। বৃন্দাবনের গাড়ী ছাড়িবার আর দেরী নাই। এখনই পঞ্চাশ টাকা আট আনা তাঁহাদের দরকার। কিন্তু এত টাকা দোকানের তহবিলে কোথায়? তরুণ ব্যবসায়ী মাথা নাড়িয়া তাই সন্দেহ প্রকাশ করিতেছেন।

চম্পটি বলিলেন, "মশাই, আপনিই যদি প্রভু-কথিত ব্যক্তি হয়ে থাকেন, তবে নিশ্চয় আপনার দোকানে ঐ নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা রয়েছে। শিগ্‌গীর আপনি গুণে দেখুন।"

গণনার পরে দেখা গেল, সেদিনকার তহবিলে ঠিক ঐ টাকাই রহিয়াছে। বিস্মিত দোকানী প্রভুর উদ্দেশে প্রণাম করিয়া ভক্তিভরে তখনই উহা দিল। চম্পটি ঠাকুর উর্দ্ধশ্বাসে হাওড়া ষ্টেশনে ছুটিলেন। পাথেয় প্রদানকারী এই ব্যবসায়ীর নাম মুকুন্দ ঘোষ। এই ভক্তবৈষ্ণবটি কীর্ত্তন ও মৃদঙ্গ বাদনে বেশ পারদর্শী ছিলেন। প্রভু জগদ্বন্ধুর অন্যতম পরিকররূপে ইনি পরবর্ত্তীকালে তাঁহার নাম-প্রচারের সহায়ক হইয়া উঠেন।

ফরিদপুরের বুনো-বাগ্‌দী ও কলিকাতা রামবাগানের ডোমদের রূপান্তরে জগদ্বন্ধুর করুণালীলার অপূর্ব্ব পরিচয় আমরা পাইয়াছি। কলিকাতার রামবাগানের কয়েকটি পতিতার উদ্ধার সাধনেও তাঁহার পতিতপাবন রূপটি কম ফুটিয়া উঠে নাই। ইহাদের মধ্যে সুরতকুমারীর নাম উল্লেখযোগ্য। এই ধনী পতিতা নারী তাহার

একমাত্র কন্যার মৃত্যুতে সংসারে বীতস্পৃহ হইয়া উঠে, অতঃপর তীর্থে তীর্থে মুক্তির সন্ধানে সে ঘুরিয়া বেড়ায়।

জগদ্বন্ধুকে সুরতকুমারী তখনও দর্শন করে নাই। শুধু তাঁহার লীলাকাহিনী শ্রবণ করিয়াই সে চরণতলে আত্মসমর্পণ করিয়া বসিয়াছে। প্রভু প্রকৃতি সংস্পর্শ এড়াইয়া চলিলেও কৃপাভরে এই পতিতা নারীর গৃহে উপস্থিত হন ও তাহার শিরে পদস্থাপন করেন, তাঁহার করুণাঘন মূর্ত্তিটি সুরতকুমারীর অন্তরে চিরদিনের জন্য অঙ্কিত হইয়া যায়। প্রভু এই পতিতার উদ্ধার সাধনের পর তাঁহার নাম রাখিয়াছিলেন—সুর-মাতা। এই আশ্রিতা ও রূপান্তরিতা ভক্তকে তিনি একবারের বেশী আর দর্শন দেন নাই।

সুরতকুমারীকে প্রভু যে পত্র প্রেরণ করিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার উপদিষ্ট সাধনতত্ত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি লিখেন—

—শ্রীসুর, তোমায় কারুণ্য-লিপি পাঠ করিলাম। সাক্ষাতাদি করা বৃষভানুন্দিনীর নিষেধ। সাক্ষাৎ হইবে না। ত্রিস্নান করিও। নিত্য লক্ষ নাম করিও! শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করিও। প্রেম ভক্তি-চন্দ্রিকা মুখস্থ করিও। নিদ্রালস্য ত্যাগ করিও। স্ত্রী পুরুষের সহিত সাক্ষাৎ ও বাক্যাদি ত্যাগ করিও। চক্ষু কর্ণে মনুষ্য বিষয় গ্রহণ করিও না। হবিষ্য করিও, লবণ সৈন্ধবাদি ত্যাগ করিও। হৃদয়ে গৌরচন্দ্র জপিও। স্বরূপ দামোদরে আত্মসমর্পণ করিও। গৌরগদাধর ধ্যান করিও। মিলনাদি স্মরণে আবিষ্ট হইও।—বন্ধু।

ইহার কিছুদিন পরে এক বিচিত্র কাণ্ড ঘটিয়া যায়। স্বেচ্ছাময় জগদ্বন্ধু ঘুরিতে ঘুরিতে সেদিন একাকী হুগলী শহরে উপস্থিত হন। তিনি সব সময়েই সর্ব্বাঙ্গ বস্ত্রাবৃত করিয়া চলেন। তাঁহাকে দেখিয়া পুলিশের সন্দেহ হয়, তিনি হয়তো কোন পলাতক আসামী। গ্রেপ্তার করার পর তদন্ত সাপেক্ষ তাঁহাকে আটক রাখা হয়।

কিন্তু এইখানেই মস্ত গোল বাধিল। আটক থাকিতে প্রভুর

কোন আপত্তি নাই, কিন্তু কোনমতেই থানায় বা কাহারো গৃহে থাকিতে তিনি রাজী নহেন। অবশ্য কোন গোশালায় রাত্রিবাস করিতে তাঁহার আপত্তি নাই।

শহরের প্রান্তে হুগলীর নাজীরের এক ইষ্টক নির্ম্মিত গোশালা আছে। নানা বিতর্কের পর বন্দীকে রাত্রির মত সেখানেই তালাবন্ধ করিয়া রাখা হয়। এদিকে ধৃত হইবার পরই প্রভু এক ব্যক্তিকে দিয়া কলিকাতায় সুরমাতার নিকট টেলিগ্রাম পাঠাইয়া দেন।

পরদিন কিন্তু তালা খুলিয়া দেখা গেল, বন্দী গোশালা হইতে কোথায় অন্তর্হিত হইয়াছেন। দরজার অর্গল ও তালা সবই ঠিকমত রহিয়াছে, অথচ তিনি কি করিয়া বাহির হইয়া গেলেন? এ বড় অদ্ভুত রহস্য!

এ ঘটনায় শহরে সেদিন চাঞ্চল্যের অবধি রহিল না! নাজীরের গোশালা হইতে বন্দী পলাইয়াছে, তাই তাঁহার আতঙ্কের অবধি নাই। অবশেষে চাকুরী নিয়া টানাটানি হইবে কি না কে জানে?

পরদিন সুরমতা ও কয়েকজন ভক্ত হুগলীতে উপস্থিত হন। প্রভুর প্রকৃত পরিচয় সম্পর্কে তাঁহারা সাক্ষ্য প্রমাণ দেন, নাজীরকেও বুঝান—ইনি এক শক্তিশালী মহাপুরুষ, সর্ব্বদা স্বেচ্ছাময় হইয়া বিচরণ করেন, ইঁহার পলায়নের ফলে নাজীর মহাশয়ের কোন ক্ষতি হইবে না। ঘটনাটি অতঃপর চাপা পড়িয়া যায়। পরবর্ত্তীকালে হুগলীর এ ঘটনার উল্লেখ করা হইলে প্রভু ভক্তদের বলিয়াছিলেন, "ওরে, আমার এটা অপ্রাকৃত দেহ—এটা স্থান কালের অধীন নয়।"

ইতিমধ্যে ফরিদপুরের বিভিন্ন স্থানে কীর্ত্তন এবং নাম প্রচারের কেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছে। প্রভু এযাবৎ ভক্তদের আগ্রহে বিভিন্ন অঞ্চলে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিলেন, এবার তিনি ফরিদপুরে তাঁহার স্থায়ী অধিষ্ঠান ভূমি সূচনা করিলেন।

সেদিন তিনি তাঁহার সাঙ্গোপাঙ্গসহ ভ্রমণে বাহির হইয়াছেন। ফরিদপুর শহরের উপকণ্ঠে এক জঙ্গলাকীর্ণ স্থানে আসিয়া হঠাৎ

থমকিয়া দাঁড়াইলেন। তারপর একটি নির্দ্দিষ্ট স্থানে পদ স্থাপন করিয়া কহিলেন, "এইখানেই শ্রীঅঙ্গন প্রতিষ্ঠিত হইবে।" তখনি জমির মালিক রামসুন্দর মুদীকে ডাকানো হইল। প্রভু তাহাকে কহিলেন, "আমি এখানে শ্রীঅঙ্গন করবো, এ জমিটা তুমি আমায় দাও!" প্রভুর এই প্রস্তাবে রামসুন্দর সম্মতি দিল।

জগদ্বন্ধুকে দর্শনের আশায় সহস্র সহস্র ভক্ত চারিদিক হইতে তখন সমবেত হয়। তাঁহার শ্রীঅঙ্গন ধীরে ধীরে প্রেমভক্তির এক উৎসরূপে আত্মপ্রকাশ করিতে থাকে। দলে দলে ছাত্রগণ এ সময়ে প্রভুর সান্নিধ্য লাভের আশায় ভীড় জমায়। তাঁহার দিব্য লাবণ্যময় রূপ, অপরূপ সুধাকণ্ঠ ও অঙ্গের অপার্থিব সৌগন্ধ এই তরুণদের প্রাণে এক অজানা আকর্ষণের সৃষ্টি করিতে থাকে। প্রভুর ভাবময় জীবনের অমৃত আস্বাদ পাইয়া, তাঁহার মহা জীবনের সান্নিধ্যে থাকিয়া তাহারা ধন্য হয়।

এই সব বালক ভক্ত কিন্তু জগদ্বন্ধুকে এক বিরাট মহাপুরুষ জ্ঞানে দূরে সরাইয়া রাখে নাই। প্রভুকে তাহারা বন্ধু বলিয়াই ডাকিত, কখনো বা 'হরিবোল' বলিয়াও অভিহিত করিত। তরুণ জীবনের নানা জটিল সমস্যা অকপটে এই বন্ধুর কাছে প্রকাশ করিতে তাহাদের কখনো দ্বিধা হইত না। তরুণ বন্ধুদের কল্যাণের জন্য প্রভুরও ব্যাকুলতার অন্ত নাই। ইহাদের ডাকাইয়া আনিয়া পরম আত্মীয়ের মত তিনি নির্দ্দেশাদি প্রদান করিতেন। কখনও বা তিনি অনুনয় করিয়া বলিতেন,—"হেলায়, শ্রদ্ধায় যে কোন প্রকারে তোরা নাম কর। হরিনামের শক্তিতে অসাধ্য সাধন হয়। তোরা জানবি এটা ঘোর প্রলয়কাল। এ যুগে হরিনাম-কীর্ত্তন ছাড়া সৃষ্টি রক্ষার আর কোন উপায় নেই। এবার মানুষ তো মানুষ, দেখবি, রাস্তার ইট পাটকেল পর্য্যন্ত হরিনামে মত্ত হয়ে যাবে। হরিনামে, হরিপ্রেমে ধরা টলমল ক'রে উঠবে।"

প্রভু জগদ্বন্ধু ঢাকা শহরে দুইবার পদার্পণ করেন। এখানকার

পাড়ায় পাড়ায় রাধাকৃষ্ণের যুগলবিগ্রহ সেবা অনুষ্ঠিত হয়, পূজা-উৎসবের দিনে বৈষ্ণব নবশাখ সম্প্রদায়ের ভজন কীর্ত্তনে নগর মুখরিত থাকে। ঢাকার গৌরব বাড়াইয়া প্রভু এ শহরকে কহিতেন, হরিনামের 'ক্যাপিট্যাল' বা রাজধানী। এখানে এক সময়ে তাঁহার নানা অলৌকিক লীলা অনুষ্ঠিত হয়।

ডাঃ উষারঞ্জন মজুমদার একজন ব্রাহ্ম, ইনি মিটফোর্ড হাসপাতালের অন্যতম চিকিৎসক। প্রভুর বৈষ্ণবীয় আচরণ সম্বন্ধে নানা কটাক্ষ ও বিদ্রূপ করা তাঁহার অভ্যাস। প্রভু তখন রাম সাহার বাগানে এক নব নির্ম্মিত মন্দিরে বাস করিতেছেন। একদিন দেখা গেল—তিনি সর্ব্বাঙ্গ অনাবৃত করিয়া বসিয়া আছেন, তাঁহার নাকি ভয়ঙ্কর অসুখ। ভক্ত সুধন্ববাবুকে বারবার ব্যাকুল কণ্ঠে বলিতে লাগিলেন, "ওরে, শিগ্‌গীর কোন ভাল ডাক্তার নিয়ে আয়।"

সুধন্ববাবু ছুটিয়া গিয়া তাঁহার বন্ধু অধ্যাপক ডাঃ উষারঞ্জনকে ডাকিয়া আনেন। ডাক্তার আসিয়া দেখেন, রোগী একেবারে উলঙ্গ হইয়া বসিয়া আছে। পরীক্ষা করিয়া তিনি বিস্ময়বিমূঢ় হইয়া গেলেন। সুধন্ববাবুকে ডাকিয়া কহিলেন, "তোমরা আমায় এ কা'কে দেখাতে এনেছো ? এঁর তো হৃদ্‌স্পন্দন নেই, নাড়ীর খোঁজও পাওয়া যাচ্ছে না। অথচ কথাবার্ত্তা তো বেশ সুস্থ মানুষের মতই বলছেন!"

জগদ্বন্ধু তখন ব্যাধিগ্রস্তের ভান করিয়া বার বার অসহায়ভাবে বলিতেছেন, "ডাক্তারবাবু, এখুনি আমায় ওষুধ দিয়ে ভাল ক'রে দিন! আমার দেহে ছত্রিশ কোটী ব্যাধি হয়েছে।"

ভক্ত সুধন্বের ইঙ্গিতে চিকিৎসক তাড়াতাড়ি একটা পুষ্টিকর ঔষধের কথা লিখিয়া দিয়া হাঁফ ছাড়িলেন। ডাক্তারের বৈজ্ঞানিক বুদ্ধিতে এক প্রচণ্ড ধাক্কা লাগিল। বুঝিলেন, বাস্তব জীবনের পরিধির বাহিরেও একটা লোকোত্তর ক্ষেত্র রহিয়াছে, আর প্রভুর ন্যায় মহাপুরুষেরাই তাহার প্রকৃত সংবাদ রাখেন। ডাঃ উষারঞ্জন

ক্রমে প্রভুর অন্যতম ভক্তরূপে পরিগণিত হন। বলাবাহুল্য ইহাকে আত্মসাৎ করার জন্যই প্রভুকে সেদিন ঐ অলৌকিক লীলা প্রকাশ করিতে হয়।

নামকীর্ত্তন ও কৃষ্ণকথা ছাড়া প্রায় সময়ই প্রভু গৃহের ভিতরে নিভৃতে ও একান্তে থাকিতেন। একবার এক বালক ভক্ত আশানুরূপ তাঁহার দর্শন না পাইয়া সখেদে বলিতে থাকে, "বন্ধু, ওরকম ঘরে বন্ধ না থেকে তুমি এবার বার হও। তোমায় দেখে সবাই আনন্দ-লাভ করুক।" জগদ্বন্ধু গৃহাভ্যন্তর হইতে তাহাকে উত্তর দিলেন, "ওরে আমি কার কাছে বার হবো? আমায় চায় কে? কেউ তো আমার জন্য কষ্ট স্বীকার ক'রে হরিনাম ক'রতে চায় না!"

তরুণ ভক্তদের শুনাইয়া এক একদিন তিনি বলিতেন, "সময়ে এমন সব লোক আসবে, তোরা দেখে অবাক হয়ে যাবি। তাদের হরিনামে বিশ্বাস-ভক্তি অটল থাকবে। তারা ভুবন-মঙ্গল হরিনামের জন্য জীবন উৎসর্গ করবে, দিনরাত হরিনামে মেতে থাকবে। আর তোরা ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে তাদের দিকে চেয়ে থাকবি। তোরা আর তারা—সমুদ্রের এপার আর ওপার তফাৎ, বুঝলি?"

রাসপূর্ণিমা, দোল, ঝুলন, রথযাত্রা—এক একটি পর্ব্ব উপস্থিত হয় আর প্রভু শ্রীঅঙ্গনে নাম কীর্ত্তনের রসধারা উৎসারিত করিয়া দেন। রথের উৎসব আসিয়া পড়িলে তিনি যেন আপনাকে একেবারে হারাইয়া ফেলেন। দলে দলে কীর্ত্তনীয়া, বাদক ও ভক্তগণ আনন্দে উচ্ছল হইয়া প্রভুর রচিত পদ গাহিয়া চলে—

নবঘন শ্যাম,
স্থ-ত্রিভঙ্গ বাঁকা ঠাম,
নব নটবররূপ
জিনি কোটী কাম,
চারু চাঁচর চিকরে চূড়া—
অধরে রেণু রসাল।

উদ্দণ্ড কীর্ত্তনের সঙ্গে প্রভু কীর্ত্তনমণ্ডলীতে ঘুরিয়া বেড়ান, অপার্থিব প্রেমরসের স্রোত তাঁহার চতুর্দ্দিকে বিস্তারিত হয়। শ্রীবৃন্দাবন ও নবদ্বীপে বার বার গিয়া রথযাত্রায় তিনি কত আনন্দ করিয়া আসিয়াছেন। কিন্তু বিস্ময়ের বিষয়, একবারও তিনি এই পুণ্য-উৎসবে পুরীধামে উপস্থিত হন নাই। সেবার তাঁহার কোন অন্তরঙ্গ ভক্ত এ প্রশ্ন তাঁহার কাছে উত্থাপন করায় প্রভু বলিয়াছেন, "ওরে, ও যে মহাধাম। ওখানে গেলে কি এ দেহ আর থাক্‌বে ? ওখানে গেলে এ দেহ একেবারে গ'লে জল হয়ে যাবে !"

জগদ্বন্ধু অধ্যাত্মসত্তায় এবার মহাভাবের লক্ষণনিচয় পরিস্ফুট হইয়া উঠিতেছে। ধীরে ধীরে অতীন্দ্রিয় লোকের গভীর স্তরে তিনি নিমজ্জিত হইতেছেন। এবার মহাপুরুষের লীলাময় জীবনে মৌন অধ্যায়ের আরম্ভ। ১৩০৯ সাল হইতে ইহার কিছুটা লক্ষণ দেখা যায়। এই সময়ে তিনি বলিয়াছেন,—"তোরা শীগ্‌গীর আর আমার কথা পাবি নে।···এবার আমি ঘুড়ি উড়িয়ে দিয়েছি। তার ডুরি আমার হাতের মুঠোর মধ্যে। যখন ডুরি ধরে টান দেব, তখন সবাইকেই আমার কাছে আসতে হবে। আমি ক্রমাগত এই ত্রিশ বছর ধরে ঘরে ঘরে এত কেঁদে বেড়ালাম। কিন্তু কেউ আমার কথা শুনলো না, হরিনাম করলো না। তোরা আমার কোন কথা রাখ্‌লি নে। দেখ্‌বি, সময়ে এমনি দিন আসবে যে পৃথিবীর লোক নাকের জলে চোখের জলে এক হয়ে যাবে।"

মৌনী হইবার কিছু পূর্ব্ব হইতে প্রভুর বালক স্বভাবটি যেন বেশী ফুটিয়া উঠিতেছে। নিভৃতে গৃহাভ্যন্তরে বসিয়া তিনি মৃদঙ্গ বাজাইতে থাকেন, আর বালক ভক্তেরা হরিনাম কীর্ত্তনে দশ দিক মুখরিত করে, অঙ্গনে নাচিয়া বেড়ায়। প্রভুর হরিলুট দেওয়া এক অপূর্ব্ব দৃশ্য। বিশেষ করিয়া অঙ্গনে বালক সম্মেলন হইলেই তাঁহার আনন্দ উচ্ছ্বলিত হইয়া উঠে। তাহাদের সঙ্গীত ও নৃত্যের

তালে প্রকোষ্ঠের ভিতর হইতে সরল শিশুর হাসি হাসেন, কখনও বা সেচ্ছামত মৃদঙ্গ বাজান, করতালি দিতে থাকেন।

অঙ্গনে দাঁড়াইয়া নামগানরত ভক্ত বালকেরা গ্রাম্য ভাষার বলে "পিরভু—ও পিরভু, এখন নুটদাও"। জগদ্বন্ধু প্রথমে বাতাসার হাঁড়ি তো উজাড় করিবেনই, তাহার পর গৃহমধ্যস্থ জিনিসপত্র,—ভক্তিগ্রন্থ, খোল, করতাল ইত্যাদিও বালকেদের বিতরণ না করিয়া ছাড়িবেন না। কখনো কখনো দেখা যায়, তিনি লুটদানের নেশায় উলঙ্গ হইয়া পরিধেয় বস্ত্রখানিও বাহিরে ছুঁড়িয়া মারেন। তারপরই কোন ভক্তকে কাগজের চিরকুট প্রেরণ করা হয়, "বস্ত্র একেবারে নেই, এখনি একটুকরো বস্ত্র পাঠাও।"

প্রভু যেন পাঁচ বছরের শিশুটি হইয়া গিয়াছেন। অন্তরে ব্রজরসের পরিপূর্ণতা নিয়া ধীরে ধীরে বাহির দুয়ারে কপাট লাগাইয়াছেন। অন্তরঙ্গ ভক্তদের প্রায়ই করুণ কণ্ঠে বলেন, "তোমরা আমার কথা রাখ, হরিনাম কর। আমি তা শুনতে শুনতে সমস্ত পৃথিবীর ধূলোয়, আকাশে মিশে যাই। আমার শপথ, তোমরা সবাই হরিনাম ক'র। হরিনামের মঙ্গল হোক, তোমাদের মঙ্গল হোক, আর তা হলেই আমার উদ্দেশ্য ও ভবধামের লীলা শেষ হয়। তোমরা হরিনাম ক'রে আমায় তোমাদের সাথে মিশিয়ে নাও। আমি হরিনামের—এ ভিন্ন আর কারুর নই। তোমরা মানুষ না হলে, হরিনাম না ক'রলে, আমি আর ঘর থেকে যে কখনো বার হব না। ঘরে থেকে থেকে একেবারে পাষাণ হয়ে যাবো।"

প্রভু এক এক সময়ে বলিয়া উঠিতেন, "ওরে, আমি যে ঝাড়ুদার। কলির জঞ্জাল আর ময়লা নিষ্কাশনের জন্য আমার আগমন।" আবার কখনো তাঁহাকে বলিতে শুনা যাইত,—"আমার দেহে এখন নানা বিষ্ণু লক্ষণ প্রকাশিত হচ্ছে। আর আমি বাইরে থাকতে পারছিনে। ঘরে থেকে থেকে ব্যাধির দ্বারা এগুলো বিলুপ্ত

করে তবে তোদের মধ্যে ফিরবো।" সতর বৎসরের জন্য তিনি তাঁহার নির্জ্জন বাস এ সময়ে বরণ করিয়া নেন।

নিজের আসন্ন অন্তর্ম্মুখীন অবস্থার বর্ণনা দিয়া কয়েকটি বালক ভক্তকে বলিতেন, "ছ্যাখ, এমন সময় আসবে, যখন আমি জড়ের মত হবো। কোন জ্ঞান থাকবে না, পাঁচ বৎসরের শিশুর ন্যায় হবো।" আবার অসহায় শিশুর ভাবে ভাবিত হইয়া বালক সুহৃদ্‌দের নিকট প্রভু মিনতিও জানাইয়া রাখিতেন,—"সে সময় কিন্তু তোরাই আমার অভিভাবক। দেখিস, দুষ্ট লোক যেন আমায় বিরক্ত না করে।"

১৩০৯ সাল হইতে প্রভুর মৌনাবলম্বন ও নিভৃত বাস শুরু হয়। অঙ্গনের প্রান্তে তাঁহার গম্ভীরা প্রকোষ্ঠ। আলো হাওয়া প্রবেশ করার মত ছিদ্র বা জানালা তাহাতে নাই। চারিদিকে পুরু আবরণ ও ঘন খুঁটির বেড়া,—অভ্যন্তরভাগ সদা অন্ধকারময়। নির্দ্দিষ্ট সেবক যখন প্রভুর আহার্য্য রাখিয়া আসে, তখনই সে শুধু একটি আলো জ্বালাইয়া দিয়া যায়। সত্বর আবার তাহা নির্ব্বাপিত করিয়া প্রভু ভাবতন্ময় হইয়া অবস্থান করেন।

প্রভু নিজে যেমন ভক্তগণকে বলিয়া রাখিয়াছিলেন, তেমনই ক্রমে ক্রমে বালকবৎ ও জড়বৎ হইয়া যাইতেছেন। নিজে ইচ্ছা করিয়া স্নান ভোজন করেন না, আবার সেবকদের কেহ চাপ দিয়া করাইয়া দিলেও আপত্তির কারণ নাই। নিস্পৃহ, নৈর্ব্যক্তিক অবস্থা।

দ্বাদশ বর্ষ পরে ১৩২০ সনে প্রভু নিভৃত প্রকোষ্ঠটি ত্যাগ করিয়া বাহিরে অঙ্গনে মাঝে মাঝে পদার্পণ করিতেন, আর দূরদূরান্ত হইতে প্রতিদিন সহস্র সহস্র লোক তাঁহাকে দর্শন করিতে ভীড় জমাইত! আনন্দময় কনককান্তি দীর্ঘায়ত পুরুষ বালকের মত উলঙ্গ হইয়া নির্ব্বিকারে বসিয়া থাকিতেন। অঙ্গের দ্যুতি ও সৌরভে গৃহ অঙ্গন একেবারে ভরপুর। লোক শুধু চোখের দেখা দেখিয়া আনন্দে বিহ্বল হইত! মুসলমান ধর্ম্মাবলম্বীরাও দর্শনার্থীরূপে আসিতেন। তাঁহারা কেন দর্শনে আসিতেছেন, এ প্রশ্ন করা হইলে উত্তর হইত,

"বাধা কি? এ তো হিন্দুর দেব মন্দিরে আসিনি? ইনি জগদ্বন্ধু। আমাদেরও তো উনি বন্ধু হন! আমরা জগতের বন্ধুটিকে দেখতে এসেছি।" ১৩২৩ সালের বৈশাখের পর হইতে তিনি আবার তাঁহার গম্ভীরা প্রকোষ্ঠে আত্মগোপন করিলেন।

চম্পটি ঠাকুর ও তাঁহার সহধর্ম্মিণী গোড়ার দিকে তাঁহার সেবার ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইহার পর ভক্তপ্রবর মহেন্দ্রজী তাঁহার পরিচর্য্যার সৌভাগ্য লাভ করেন। এই ভক্ত সাধক শ্রীবৃন্দাবন ধামে প্রভু জগদ্বন্ধু অলৌকিক দর্শন প্রাপ্ত হন—স্থূলদেহে তখনও তিনি প্রভুকে দেখিতে পান নাই। বৃন্দাবন হইতে তিনি যখন ফরিদপুরে পৌঁছিলেন তখন জগদ্বন্ধুর মৌনাবস্থা ও নিভৃত বাসের নবমবর্ষ পূর্ত্তি হইয়াছে। সে সময় হইতেই তিনি তাঁহার সেবায় আত্মনিয়োগ করেন। প্রভুর অধ্যাত্মজীবনের ঐশী নির্দ্দিষ্ট ভূমিকা সম্বন্ধে মহেন্দ্রজীর বিশ্বাস ছিল অগাধ। তাঁহারই উদ্যোগে সংগঠিত মহানাম কীর্ত্তন সম্প্রদায় দীর্ঘদিন জগদ্বন্ধুর আদর্শ প্রচার করিয়া ফিরিয়াছে।

প্রভুর সেবার কথা ভাবিয়া একদিন মহেন্দ্রজীর মন আলোড়িত হইতেছে। সখেদে ভাবিতেছেন, যদি তাঁহার দশখানি হাত হইত তবে প্রভুর সেবা তো তিনি একাই করিতে সমর্থ হইতেন। কিন্তু এ চিন্তায় যে সূক্ষ্ম অহং বোধটি জড়িত রহিয়াছে তাহা সেদিন প্রভু জগদ্বন্ধুর দৃষ্টি এড়ায় নাই। ইহার পর কোন কার্য্যে প্রভুর প্রকোষ্ঠে গিয়াই ভক্ত মহেন্দ্রজী হাউ-হাউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন। তিনি দেখিলেন, জগদ্বন্ধু তাঁহার সম্মুখে এক দিব্য রূপে আবির্ভূত হইয়া বলিতেছেন "মূর্খ, ওদের সবার হাতকে নিজের হাত বলে মনে করলেই তো পারিস্। ওরা সেবা করলেই তুই নিজে করছিস, এটা ভাবলেই তো হয়!" প্রভুর কথায় মহেন্দ্রজীর জ্ঞান হইল। ইহার পর হইতে তিনি অপর ভক্তদের সেবার সুযোগ দিতে সদা উন্মুখ থাকিতেন।

১৩২৮ সনের ১লা আশ্বিন। প্রভু জগদ্বন্ধু এইদিন অমৃতময় নিত্য লীলায় প্রবিষ্ট হন। অগণিত ভক্তের ক্রন্দনরোলে শ্রীঅঙ্গনের আকাশ বাতাস আকুল হইয়া উঠে।

নিত্য অনিত্যের তত্ত্ব ও ব্রজরস সাধনার ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে জগদ্বন্ধু বলিয়া গিয়াছেন, "জান্‌বি—ব্রজ, ব্রজরাখাল ব্রজসখী অর্থাৎ ব্রজে যা কিছু সম্ভব, তা ভিন্ন সমস্তই অনিত্য। সমস্তই প্রলয়কালে লয় হয়ে যাবে। দেবতারাও অনিত্য। তাঁহাদেরও প্রলয়কালে আর সমস্তের মতই লয় হতে হবে। অতএব নিত্য যে ব্রজ সম্বন্ধীয় বস্তু তাতেই স্নেহ, মমতা, আসক্তি, আশা ও ভরসা করতে হয়।"

ইহাই প্রভু জগদ্বন্ধুর চরম ও পরম কথা। তাঁহার অধ্যাত্মসাধনায় এই কথাই রূপায়িত হইয়া উঠিয়াছে।

জীবের মঙ্গল ও তাহার মুক্তি কামনা প্রভুর সমগ্র জীবনে আমরা ওতপ্রোত দেখিতে পাই। মানবের নিকট তাঁহার বাণী পরম আশ্বাসের বার্ত্তা বহন করিয়া আনিয়াছিল, তিনি বলিয়াছেন,—"ব্রজলীলায় অষ্টসখী আর গৌরাঙ্গ লীলায় সাড়ে তিনজন মাত্র রাসমাধুর্য্য আস্বাদন করেছে তাতে সমগ্র জীবের বিশেষ কিছু হয়নি। এবার—সময় এলেই অণু-পরমাণুগুলোকে পর্য্যন্ত স্বরূপরস আস্বাদন করাবো, তবে আমার নাম জগদ্বন্ধু।"

মানবাত্মার মুক্তির জন্য জগদ্বন্ধু কাঁদিয়া কাঁদিয়া শ্রীঅঙ্গনের মাটি সিক্ত করিয়া গিয়াছেন। কহিয়াছেন, "তারক ব্রহ্ম হরিনামই মহা উদ্ধারণ মন্ত্র—গুপ্ত নয়, ইহা সর্ব্বদা প্রকাশ্য। তোমরা দেশে দেশে হরিনাম প্রচার কর। হরিনামে সৃষ্টি রক্ষা পাবে। তোমাদের বন্ধুর এই ভিক্ষা। নিষ্ঠা আর ভক্তি ছড়াও। আমায় মুক্ত কর।" জগদ্বন্ধুর অধ্যাত্মজীবন এই ভুবনমঙ্গল মহানামেরই এক অবতরণিকা।

শ্রীসন্তদাস মহারাজ

১৩০০ সনের মাঘ মাস। প্রয়াগ সঙ্গমে কুম্ভমেলা শুরু হইয়াছে। চারিদিকে সহস্র সহস্র সাধু সন্ন্যাসীর জমায়েত ও ছাউনী। ইহাদের ঘিরিয়া লক্ষ লক্ষ ভক্ত ও দর্শনার্থীর ভীড়। তারাকিশোর চৌধুরী মহাশয়ও সেদিন এই পুণ্যময় মেলাক্ষেত্রে আসিয়া পৌঁছিয়াছেন। কলিকাতা হাইকোর্টের অন্যতম শ্রেষ্ঠ আইনজীবীরূপে তাঁহার বিপুল প্রতিষ্ঠা। দানব্রতী, ধর্ম্মনিষ্ঠ ও মনস্বী সমাজনেতা হিসাবেও তাঁহার খ্যাতি প্রতিপত্তি কম নয়। কিন্তু ব্যবহারিক জীবনের কোন সম্পদের মূল্যই তাঁহার কাছে আজ নাই। ঈশ্বর দর্শনের জন্য তারাকিশোরের সর্ব্ব সত্তা ব্যাকুল ও উন্মুখ হইয়া উঠিয়াছে।

এজন্য সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন সদ্‌গুরুর কৃপা। কিন্তু আজিও কোন ব্রহ্মজ্ঞ গুরুর আশ্রয় প্রাপ্তির সৌভাগ্য তাঁহার জীবনে হয় নাই, বৃথাই এতকাল ইহার সন্ধানে ফিরিয়াছেন। কুম্ভমেলার পুণ্যক্ষেত্রে পৌঁছিয়াই তারাকিশোর কেবলই ভাবিতেছেন, ব্রহ্মজ্ঞপুরুষদের অধ্যুষিত এই মহামেলায় কি তাঁহার প্রার্থিত গুরু মিলিবে না? ভগবান কি বিমুখ হইয়াই থাকিবেন?

প্রভুপাদ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীকেও তারাকিশোর বহুকাল যাবৎ জানেন, উভয়ের মধ্যে সম্প্রীতিও যথেষ্ট। সম্মুখেই গোস্বামীজীর তাঁবু। বহুতর শিষ্য ও ভক্তজনসহ সেদিন তিনি সেখানে সমাসীন, তারাকিশোর তাঁহাকে দর্শন করিয়া প্রণাম করিলেন। আশীর্ব্বাদ করিবার পর গোস্বামীজী কহিলেন, "তারাকিশোরবাবু, এখানে এসে খুব ভালো করেছেন। অনেক মহাত্মা ও মহাপুরুষের অধিষ্ঠান এই পুণ্যভূতিতে কারুর শুভদৃষ্টি একবার পড়লেই উদ্ধার হয়ে

যাবেন সন্দেহ নেই।" গোঁসাইজীর স্নিগ্ধমধুর কথা কয়টি তারাকিশোরের অন্তরে সেদিন শান্তির প্রলেপ বুলাইয়া দিল।

তাঁহার সঙ্গে আছেন এক বন্ধু, ইহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা অভয়নারায়ণ কাঠিয়াবাবাজীর শিষ্য। গোঁসাইজীর তাঁবুতেই তিনি এ সময়ে ছিলেন। অভয়বাবু সোৎসাহে তারাকিশোরকে তাঁহার গুরুদেব কাঠিয়াবাবার দর্শনের জন্য নিয়া গেলেন। বৃদ্ধ সাধুর শিরে শুভ্র জটার ভার, দেহটি দিব্য লাবণ্য শ্রীমণ্ডিত, আননে স্মিত হাসির রেখা। প্রণাম করিয়া উঠিতে অঙ্গুলি সঙ্কেতে তারাকিশোরকে দেখাইয়া বাবাজী কহিলেন, "ইন্‌কো তো হম বৃন্দাবন্‌মে দর্শন কিয়া।"

কয়েক মাস পূর্ব্বে তারাকিশোর বৃন্দাবনে গিয়াছিলেন ঠিকই। কিন্তু এ মহাত্মার সহিত তাঁহার সেখানে দেখা হইয়াছে বলিয়া তো মনে পড়ে না! তিনি কিছুটা বিস্মিত হইলেন। কিন্তু ক্ষণকাল পরেই তাঁহার এ বিস্ময় একেবারে সীমা ছাড়াইয়া গেল। কাঠিয়াবাবা মহারাজের পদপ্রান্তে বহু ভক্ত বসিয়া আছেন। মহাপুরুষ হঠাৎ তারাকিশোরকে লক্ষ্য করিয়া কি জানি কেন একটি নিগূঢ় তত্ত্ব ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন। কি আশ্চর্য্যের কথা! এই বিশেষ প্রশ্নটিই যে কলিকাতায় থাকিতে মাঝে মাঝে তাঁহার মনে আলোড়িত হইতেছিল! তাছাড়া, ইহা তারাকিশোরকে কয়েকমাস পূর্ব্বে এক নিশীথে খুব ব্যতিব্যস্ত করিয়াও তুলে। আপ্রাণ চেষ্টা করিয়া প্রশ্নের উত্তর তিনি তখন পান নাই। তাঁহার সাধন জীবনের সেদিনকার গোপন সমস্যাটির কথা কাঠিয়াবাবা কি করিয়া জানিলেন? তবে কি ইনি সর্ব্বজ্ঞ? ভগবান কি কৃপা করিয়া সত্য সত্যই তাঁহাকে এক ব্রহ্মজ্ঞ মহাপুরুষের আশ্রয় জুটাইয়া দিলেন?

পরদিনই এক সংবাদ শুনিয়া তারাকিশোরের উৎসাহ স্তিমিত হইয়া গেল। তিনি শুনিলেন কাঠিয়াবাবা মহারাজ মোট চারজন

শিষ্য করিবেন বলিয়া ঠিক ছিল, সে সংখ্যা পূর্ণ হইয়াছে, এখন আর নূতন কোন শিষ্য গ্রহণ করিবেন না। তারাকিশোর বড় ভাবিত হইলেন। কিন্তু একি অদ্ভুত ব্যাপার! পরদিন বাবাজীর ছাউনীতে যাইবামাত্র মহাপুরুষ তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া সহাস্যে কহিয়া উঠিলেন, "হামারা তো পাঁচ ছে চেলা হ্যাঁয়। সুপাত্র মিল্‌নেসে অব্‌ভী চেলা করতা হুঁ।"—উপযুক্ত অধিকারী পাইলে বাবাজী মহারাজ আরও চেলা করিতে ইচ্ছুক। তারাকিশোর আশ্বস্ত হইয়া ভাবিতে থাকেন, তবে এখনও কিছুটা ক্ষীণ আশা রহিয়াছে। সর্ব্বাপেক্ষা বিস্ময়ের বিষয়, বাবাজী মহারাজকে তিনি নিজ মুখে কোন প্রশ্নই করেন নাই, কিন্তু উত্তর ঠিকভাবেই মিলিতেছে।

কুম্ভমেলা হইতে ফিরিবার দিন তারাকিশোর বাবাজীকে প্রণাম করিতে গিয়াছেন। মহারাজ হঠাৎ তাঁহাকে বলিয়া বসিলেন, তারাকিশোর যেন চৈত্রমাসে বৃন্দাবনে গিয়া তাঁহাকে দর্শন দেন। কিন্তু চৈত্রমাসে হাইকোর্টের ছুটি কোথায়? এ অসুবিধার কথাটি জানানো মাত্র মহাপুরুষ বলিয়া উঠিলেন, "ঘবড়াও মৎ। তুমকো মহাবীরজী জরুর লে যায়েঙ্গে।"

চৈত্রমাসে কিন্তু সত্য সত্যই এক সুযোগ আসিয়া যায়। তারাকিশোর বৃন্দাবনধামে বাবাজী মহারাজের আশ্রমে আসিয়া উপস্থিত হন। এখানে পৌঁছিবার পর তিনি এক প্রকাণ্ড ধাঁধাঁয় পড়িলেন। ভাবিয়াছিলেন, আশ্রমের পরিবেশে নিজ সাধনস্থলীতে বাবাজীকে তাঁহার প্রকৃত স্বরূপেই দর্শন করিতে পাইবেন। শান্ত সমাহিত শিবকল্প তাপসের লোকোত্তর মহিমা তাঁহার কাছে এবার উদ্‌ঘাটিত হইবে। কিন্তু এখানে পৌঁছিয়া বাবাজীর যে মূর্ত্তি দেখিলেন, তাহাতে হতাশ না হইয়া পারিলেন না।

বাহ্যিক স্বভাব ও আচরণের দিক দিয়া দেখিতে গেলে কাঠিয়া বাবাজীকে মনে হয় এক পাকা বিষয়ী ব্যক্তি। শুধু তাহাই

নয়—এ সঙ্গে গ্রাম্য দোষও নিতান্ত কম নাই। বাবাজী নিজেই আশ্রমের হাট বাজার করেন, শাক সব্জী ফলমূল বহিয়া আনেন। কাহারো উপর ভার দিয়া তাঁহার স্বস্তি নাই, বিশ্বাসও কাহাকেও করেন না। দুইটি পয়সার হিসাবে গরমিল হইলে সকলের চৌদ্দপুরুষের বাপান্ত করিয়া তবে ছাড়েন। বৃন্দাবনের তীর্থযাত্রীদের কেহ তাঁহাকে আধ পয়সা বা পাই পয়সা দিলে সোৎসাহে তিনি গ্রহণ করেন, পুরা একটি পয়সা পাইলে তো প্রসন্নতার সীমাই থাকে না।

বাবাজীর প্রধান আড্ডাটি আশ্রমের সন্নিকটে, রাস্তার ধারে। তাঁহার এই ভাঙ-চরসের সভায় চোর ডাকাত ও উচ্ছৃঙ্খল সদস্যের অভাব নাই। সুযোগ পাইলেই বাবাজীর মহিমা কীর্ত্তন করিয়া তাঁহার এই সঙ্গীরা পথচারীদের নিকট হইতে দুই চার পয়সা আদায় করে, আর তিনিও সম্মুখে বসিয়া তৃপ্তির হাসি হাসিতে থাকেন। সামান্য যাহা কিছু পয়সা-কড়ি থাকে, তাহার নিরাপত্তা নিয়া উদ্বেগের অবধি নাই। কে কখন অর্থ অপহরণ করিবে, এ দুশ্চিন্তায় তিনি সদা অস্থির।

আশ্রমিকদের সঙ্গে সাধারণতঃ যে সব কথাবার্ত্তা বাবাজী মহারাজ বলেন, তাহাতে অধ্যাত্ম প্রসঙ্গ খুব কমই থাকে। বাজারে জিনিসপত্রের মূল্য বাড়িতেছে—ইহা নিয়া প্রায়ই তাহার আতঙ্কের সীমা নাই। ব্রজধামে কোন্ মহারাজা আসিতেছে, কে কত টাকার ভেট দিবে, কত মূর্ত্তির খোরাক তাঁহার আশ্রমে পাঠাইবে এ আলোচনায় তিনি মহা উৎসাহী। যে সব দর্শনার্থী টাকাকড়ি প্রণামী দেয় না, তাহাদের নিন্দায় বাবাজী একেবারে পঞ্চমুখ।

মহারাজের এই সব আচরণ ও ক্রিয়াকলাপ বড়ই রহস্যপূর্ণ। তারাকিশোর রোজ ইহা দেখেন, আর মনে মনে ব্যথিত হইয়া উঠেন। আবার মনে নানা প্রশ্নও উদিত হয়—যদি সত্য সত্যই ইনি এমন বিষয়ী হইবেন তবে কুম্ভমেলার প্রাচীন সাধু সন্ন্যাসীদের

মধ্যে ইঁহার এমন অসামান্য প্রতিষ্ঠা দেখা যায় কেন? তিনি শুনিয়াছেন, ভারতীয় সাধক সমাজ কাঠিয়াবাবাজীর প্রতি শ্রদ্ধায় নতশির। তাহাই বা কি করিয়া সম্ভব হয়?

একদিন বাবাজীর সহিত কোন প্রসঙ্গের আলোচনাকালে তারাকিশোর হঠাৎ অতিরিক্ত দৃঢ়তার সহিত উচ্চ কণ্ঠে তাঁহার মতামত জ্ঞাপন করিয়া ফেলিয়াছেন! মহাপুরুষ অমনি এক সরল গ্রাম্য লোকের মত হাত দুইটি যুক্ত করিয়া ফেলিলেন, সঙ্গে সঙ্গে কহিতে লাগিলেন "বেটা, হম বুড্‌ঢা আদমি, মূরখ্‌ হ্যায়। শাস্ত্রকা বাৎ নহি জান্‌তা, তুম হম্‌কো সমঝায় দো।" বিস্ময়ভরা নয়নে তারাকিশোর তাঁহার দিকে শুধু চাহিয়া থাকেন।

বাবাজীর প্রকৃত স্বরূপ উদ্‌ঘাটনে তারাকিশোর একেবারেই বিফল হইলেন। কখনো ভাবেন, এসব নিতান্ত বাহ্যিক ব্যবহার—এক চতুর লীলাভিনয় মাত্র। এ দুর্ভেদ্য যবনিকার অন্তরালে রহিয়াছে সত্যকার এক বিরাট ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ। আবার সন্দেহ হয়, এই বহিরঙ্গ রূপেই কি ইঁহার প্রকৃত পরিচয় নিহিত? অবশেষে ঠিক করিলেন, আর এ রহস্য নিয়া মোটেই তিনি মাথা ঘামাইবেন না। সত্যই তো, এই বিরাট পুরুষকে বুঝিবার মত দিব্য দৃষ্টি তাঁহার কোথায়? প্রকৃতপক্ষে ইঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণই যদি অদৃষ্টে লেখা থাকে তবে নিজেই কৃপা করিয়া ইনি কি নিজের প্রকৃত পরিচয় জানাইয়া দিবেন না?

বাবাজী মহারাজের স্পষ্ট অভিমত ইতিমধ্যে একদিন জানা গেল। তারাকিশোরকে কহিলেন, এবার তাঁহাকে তিনি দীক্ষা-দিবেন না। স্ত্রীকে সঙ্গে করিয়া শ্রাবণ মাসে তাঁহাকে আবার বৃন্দাবনে আসিতে হইবে, দুইজনকেই একসঙ্গে দীক্ষা দেওয়া হইবে। তারাকিশোর ভাবিলেন, তবুও ইহা মন্দের ভাল। বাবাজী মহারাজের উপর প্রকৃত বিশ্বাস তাঁহার এখনও জন্মে নাই, তাই দীক্ষার সময় কয়েক মাস পিছাইয়া যাওয়াতে ভালই হইল।

ইতিমধ্যে তিনি নিজের মনকে প্রস্তুত করিতে ও স্থির সিদ্ধান্তে পোঁছিতে কিছুটা অবসর পাইবেন।

তারাকিশোর কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার অন্তরের তীব্র ব্যাকুলতা ও জ্বালার বিরাম নাই। কোথায় কোন পরম শুভক্ষণে তাঁহার জীবনে ঐশী নির্দ্দিষ্ট সদ্‌গুরু আবির্ভূত হইবেন কে তাহা বলিয়া দিবে?

আষাঢ় মাস। গভীর নিশীথে। সাধন ভজনের পর তারাকিশোর ছাদে শয়ন করিয়া আছেন। হঠাৎ নিদ্রা ভাঙ্গিয়া গেল, শয্যায় তিনি উঠিয়া বসিলেন। এবার সম্মুখ দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া যাহা দেখিলেন, তাহাতে তাঁহার বিস্ময়ের অবধি রহিল না। দেখিলেন, আকাশমার্গ হইতে কাঠিয়াবাবাজীর জ্যোতিঃসমুজ্জল মূর্ত্তিখানি ধীরে ধীরে তাঁহার দিকে অগ্রসর হইতেছে। এই দিব্য মূর্ত্তি ছাদের উপর তাঁহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। ব্যাকুলচিত্ত তারাকিশোরকে বাবাজী স্নেহভরে তাঁহার আশ্বাসবাণী শুনাইতে লাগিলেন। তারপর তাঁহার কাণে এক মন্ত্র প্রদান করিয়া মহাপুরুষ আকাশপথে কোথায় অদৃশ্য হইয়া গেলেন।

যেমন অলৌকিক এ আবির্ভাব, তেমনি বিচিত্র এ দীক্ষার ধরণ। উত্তরকালে তারাকিশোর গুরুদেবের সেদিনকার এই অলৌকিক আবির্ভাবের বর্ণনা নিজেই দিয়াছেন,—"শ্রীযুক্তবাবাজী মহারাজ অন্তর্হিত হইলে আমি অনুভব করিতে লাগিলাম যেন আমার অন্তরের প্রত্যেক স্তরে স্তরে তাঁহার প্রদত্ত মন্ত্র অনুপ্রবিষ্ট হইয়াছে এবং তাঁহার সম্বন্ধে যে সব সংশয় আমার ছিল তৎসমস্ত এখন একেবারে বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে। আমি বোধ করিতে লাগিলাম যে, সেই মুহূর্ত্ত হইতে আমার জীবন ধন্য হইল এবং অভিলষিত সদ্‌গুরু লাভ করিলাম!"

শ্রাবণ মাসে বৃন্দাবনে গিয়া তিনি কাঠিয়াবাবার নিকট সস্ত্রীক

দীক্ষা গ্রহণ করিলেন। বাবাজী মহারাজ অলৌকিকভাবে কলিকাতায় আবির্ভূত হইয়া যে মন্ত্রটি তাঁহাকে সেদিন দিয়া আসেন এবার কিন্তু তাহাই আবার আনুষ্ঠানিকভাবে এখানে প্রদান করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে বলিলেন, এ মন্ত্র তাঁহাকে নিরন্তর জপ করিতে হইবে না, আপনা হইতেই ইহা তাঁহার মধ্যে স্ফুরিত হইয়া উঠিবে।

সর্ব্বজ্ঞ, মহাশক্তিধর গুরুর রোপিত এই বীজ শুধু অঙ্কুরিতই হয় নাই, বিরাট বনস্পতিরূপে অতঃপর পরিণতি লাভ করে। সাধক তারাকিশোর বৈষ্ণবাচার্য্য সন্তদাস মহারাজরূপে কীর্ত্তিত হইয়া উঠেন, বহু ভক্ত ও মুমুক্ষু ইঁহার আশ্রয় লাভ করিয়া কৃতার্থ হয়। ব্রজমণ্ডলের মোহান্তরূপে, কাঠিয়াবাবাজীর সাধনার উত্তরাধিকারী-রূপে ধীরে ধীরে তাঁহার অভ্যুদয় ঘটে।

শ্রীহট্ট জেলায় হবিগঞ্জের অন্তর্গত বামৈ গ্রাম। এই গ্রামেরই বনেদী জমিদার চৌধুরীদের বংশে সন্তদাস বাবাজী জন্মগ্রহণ করেন। ধর্ম্মনিষ্ঠ বলিয়া চৌধুরীদের খ্যাতি যথেষ্ট। কথিত আছে, ইহাদের এক পূর্ব্বপুরুষ হিমালয় গিয়া দীর্ঘ তপস্যার পর শক্তিসাধনায় সিদ্ধিলাভ করেন। হরকিশোর চৌধুরী ছিলেন এই বংশের একমাত্র বৈষ্ণব। শুদ্ধাচারী ও তেজস্বী পুরুষ বলিয়া তাঁর সুনাম কম ছিল না। চৌধুরী মহাশয়ের পত্নী গিরিজাসুন্দরীও ছিলেন বহুগুণের অধিকারী। ইঁহাদের পুত্ররূপে সন্তদাসজী ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দের ১০ই জুন শুক্রবার ভূমিষ্ঠ হন। শিশুর নামকরণ হয় তারাকিশোর। ধনী গৃহের আদর যত্নে—ধর্ম্মপ্রবণ, আচারনিষ্ঠ পরিবেশে তারাকিশোর বর্দ্ধিত হইতে থাকেন। মাত্র নয় বৎসর বয়সে তিনি মাতৃহারা হন।

তারাকিশোর যে বৎসর প্রবেশিকা পরীক্ষা দেন সেই বৎসরই তাঁহার বিবাহ দেওয়া হয়। পত্নী শ্রীমতী অন্নদা দেবী ছিলেন বিখ্যাত বিশারদ বংশীয় হরচন্দ্র ভট্টাচার্য্যের কন্যা, পিতৃকুলের বহুতর সদ্‌গুন এই নিষ্ঠাবতী মহিলার মধ্যে বর্ত্তমান ছিল। উত্তরকালে সাধক

তারাকিশোর চৌধুরীর উপযুক্ত সহধর্ম্মিণীরূপেই নিজেকে তিনি ফুটাইয়া তুলিতে সক্ষম হন।

প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার পর তারাকিশোর কলিকাতায় পড়িতে আসিলেন। শ্রীহট্টের সুন্দরীমোহন দাস, বিপিন চন্দ্র পালের তখন ছাত্রাবস্থা, একই মেসে থাকিয়া সকলে পড়াশুনা করেন! বাংলার সমাজ জীবনে ও রাজনীতিতে তখন নব জীবনের সাড়া জাগিয়াছে। মনস্বী উন্নতচেতা তারাকিশোর ইহাতে যোগ না দিয়া পারেন নাই। জনকল্যাণ সাধন, কুসংস্কার বিরোধী সংগ্রাম, ব্রাহ্মসমাজের আন্দোলন সমস্ত কিছুতেই এই তরুণ ছিলেন তৎকালীন অগ্রণীদের অন্যতম। ডাঃ সুন্দরীমোহন দাস তারাকিশোরের এ-সময়কার জীবনের বর্ণনা প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন,—"কী রাজনৈতিক রাজ্যে, কি ধর্ম্মনৈতিক রাজ্যে, তিনি সর্ব্বত্রই চাহিতেন গণতান্ত্রিকতা। ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ যখন, একমাত্র কেশবচন্দ্রের শাসনাধীন মনে করিলেন, তারাকিশোর কুচবিহার বিবাহ প্রতিবাদ সভায় ঐ সমাজের বিরুদ্ধে অ্যালবার্ট হলে প্রবল যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তরুণদের মধ্যে তিনিই প্রথমে বোধহয় সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কার্য্য নির্ব্বাহক সভার সভ্য হন।"

ব্রাহ্মসমাজে তারাকিশোরের যোগদান রক্ষণশীল হরকিশোরকে উত্তেজিত করিয়া তুলে। পুত্রের বিরুদ্ধে তিনি একেবারে ক্ষেপিয়া যান। একবার তো কলিকাতায় আসিয়া তিনি তাঁহাকে কাটিয়া ফেলিতেই উদ্যত হন। তারাকিশোর সেদিন দৃঢ়, প্রশান্ত কণ্ঠে ক্রুদ্ধ পিতাকে জানাইয়া দিয়াছিলেন, "আমার শরীর আপনা থেকে উৎপন্ন সত্য, কিন্তু আমার আত্মা আপনা থেকে উৎপন্ন হয় নি। শরীরকে আপনি অনায়াসে বিনষ্ট করুন, কিন্তু যে পথে আত্মার কল্যাণ আমি দেখতে পাচ্ছি, সে পথ তো আমি ত্যাগ করতে পারিনে ?" পিতা ও পুত্রের এই আদর্শগত কলহ বেশ কিছুদিন চলিয়াছিল।

ইতিমধ্যে জীবনের নানা সংগ্রাম ও কর্ম্মব্যস্ততার মধ্যে থাকিয়া তারাকিশোর এম, এ, পাশ করেন। রায়চাঁদ প্রেমচাঁদ বৃত্তির জন্য তিনি অতঃপর প্রস্তুত হইতে থাকেন। এজন্য যে মেধা ও শ্রমনিষ্ঠা প্রয়োজন তাহা তাঁহার যথেষ্টই ছিল, কিন্তু নানা অবস্থা বিপর্য্যয়ের ফলে এ পরীক্ষা তাঁহাকে বাদ দিতে হয়। শিক্ষকতা ও বহুবিধ জনহিতকর কাজে এবার হইতে তিনি আত্মনিয়োগ করেন।

তারাকিশোরকে এ সময়ে একবার কাশী যাইতে হয়। পিতা হরকিশোর সেখানে খুব অসুস্থ হইয়া পড়েন এবং তারযোগে পুত্রকে সেখানে ডাকিয়া পাঠান। অল্প কিছুদিনের মধ্যেই হরকিশোর আরোগ্যলাভ করিলেন। ইহার পর তিনি ব্যাকুল হইয়া ভাবিতে লাগিলেন, এই পুণ্যতীর্থে কি করিয়া পুত্রের মতিগতি পরিবর্ত্তন করা যায়। এজন্য এসময়ে তিনি কিছুটা কর্ম্মতৎপরও যে হন নাই তাহাও নয়।

পিতার সঙ্গী এবং বন্ধুদের সঙ্গে তারাকিশোরকে এ সময়ে নানা দেবালয়ে যাইতে হইত, সমর্থ সাধু ও সন্ন্যাসী পুরুষদের দর্শন করিয়াও তিনি বেড়াইতেন। মহাযোগী ত্রৈলঙ্গস্বামী ও ভাস্করানন্দজীর সান্নিধ্য লাভের সৌভাগ্য এই সময়ে তাঁহার হয়। তরুণ ব্রাহ্ম তারাকিশোরের হৃদয়ে এই যোগীদ্বয়ের দর্শন এক বড় আলোড়ন তুলিয়া দেয়। বিস্ময় বিমুগ্ধ হইয়া তিনি ভাবিতে থাকেন; কোন্ সাধনার বলে এই মহাপুরুষগণ এমন অলৌকিক শক্তির অধিকারী হন, কি করিয়াই বা তাঁহারা অতীন্দ্রিয় রাজ্যের বার্ত্তা মানবলোকে এমন অবলীলায় বহন করিয়া আনেন?

অন্তরের এই আন্দোলন ও দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্ত্তন প্রসঙ্গে তারাকিশোর বলিয়াছেন, "যতই আন্দোলন করতে লাগলাম, ততই হিন্দুধর্ম্মের ব্যবহার বিষয়ক শাস্ত্রের প্রতি আমার বিশ্বাস দৃঢ় হতে লাগল। ব্রাহ্ম সমাজভূক্ত হয়ে আমি যে সে সমস্ত পরিত্যাগ করেছি তা আমার সঙ্গত হয়নি—এই ধারণা ক্রমেই দৃঢ় হতে লাগলো।"

তারাকিশোরের এক ব্রাহ্মবন্ধু এ সময়ে গোপনে এক যোগী সম্প্রদায়ে থাকিয়া সাধন করিতেন। ইহাদের শিক্ষাদাতার নাম জগৎচন্দ্র সেন। তারাকিশোর তাঁহার নিকট মন্ত্র গ্রহণ করিয়া আসন, প্রাণায়াম ইত্যাদি সুরু করিয়া দিলেন। সাধনজনিত কিছু কিছু অনুভূতি লাভ যে তখন তাঁহার নাই, তাহাও নয়। কিন্তু কিছুকাল মধ্যেই ভাবিলেন, এই সম্প্রদায় ও ইহার সাধন পদ্ধতি তাঁহাকে বেশী দূরে নিয়া যাইতে পারিবে না। যে ব্রহ্মদর্শনের জন্য তাঁহার অন্তরাত্মা ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে, সেদিক দিয়া এখনকার কেহই তাঁহাকে সাহায্য করিতে পারিবে না—ইহাও বুঝিতে তাঁহার বাকী রহিল না। প্রাণায়াম ও ধ্যান ধারণা তিনি ঠিকমতই চালাইয়া যাইতেছেন বটে, কিন্তু অন্তরের পিপাসার নিবৃত্তি হওয়া দূরে থাকুক ক্রমে তাহা বাড়িয়াই চলিল।

এবার তাঁহার জীবনে এক মহাসঙ্কট উপস্থিত। হিন্দু সমাজ হইতে পূর্ব্বেই বাহির হইয়া আসিয়াছেন, সেখানে ফিরিবার পথ নাই। ব্রাহ্মসমাজের আকর্ষণও আজ বিলুপ্ত হইয়াছে। কে এমন ব্রহ্মবিদ সেখানে আছেন যিনি তাঁহাকে পথ প্রদর্শন করিবেন? তাছাড়া, আস্থাই যখন নাই তখন ব্রাহ্মসমাজের সহিত সামাজিক সম্বন্ধ রাখিবার ভান করা কেন। সিটি কলেজে তারাকিশোর তখন অধ্যাপনা করিতেছেন। ব্রাহ্মসমাজের ভাব ও আদর্শ প্রচারের জন্যই প্রধানতঃ এই শিক্ষাকেন্দ্রের স্থাপনা—অন্তরের যোগসূত্র যখন ছিন্ন হইয়া গিয়াছে তখন এ কলেজের শিক্ষকতা করাও তো তাঁহার আর সাজে না। তারাকিশোর তাই এ কাজ ছাড়িয়া দিলেন। এই পদত্যাগে তাঁহার মত সঙ্গতিহীন যুবকের সেদিন বিপদের অন্ত রহিল না। কিন্তু চরম অর্থকষ্টের মধ্যেও তিনি অবিচলিত রহিলেন।

ইহার পর তাঁহার আইন ব্যবসায় আরম্ভের পর্ব্ব। অধ্যাপনার সময় হইতেই তারাকিশোর আইন পড়িতে থাকেন। এবার তাহা শেষ হইল এবং পিতার আগ্রহাতিশয্যে শ্রীহট্টে উকিল হইয়া

বসিলেন। প্রতিষ্ঠা ও পশার হইতে খুব বেশী দেরী হয় নাই। অল্পকাল মধ্যেই তিনি খ্যাত ও সর্ব্বজনপ্রিয় হইয়া উঠিলেন। আর্ত্তের সেবায়, হরিসভার অধ্যাত্ম-আলোচনায় বা নগরকীর্ত্তনে কোথাও তারাকিশোর ছাড়া আর চলিবার উপায় নাই। আইন ব্যবসায়, সামাজিক ও ধর্ম্মমূলক নানা কর্ম্মের মধ্যেও তিনি কিন্তু নিজস্ব সাধন ভজন নিয়মিতভাবে চালাইয়া যাইতেন। এই সময়ে তাঁহার প্রভাবশালী পিতার চেষ্টায় হিন্দু সমাজের মধ্যে তিনি পুনরায় গৃহীত হন।

১৮৮৮ সালে তারাকিশোর চৌধুরী কলিকাতা হাইকোর্টে যোগদান করিলেন। স্বীয় কর্ম্মনিষ্ঠা ও প্রতিভাবলে ধীরে ধীরে এখানকার আইনজীবীদের মধ্যে এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিতেও তাঁহার বিলম্ব হয় নাই। কিন্তু ব্যবহারিক জীবনে যত কিছু পরিবর্ত্তনই ঘটুক না কেন, অধ্যাত্মজীবনের ফল্গুধারাটি তাঁহার জীবনে অব্যাহতভাবেই বহিয়া চলিয়াছে। বহিরঙ্গ জীবনের সব কিছু কর্ম্ম, সব কিছু কর্ত্তব্যের অন্তরালে তারাকিশোর জীবনের মূল ধৃতিটিকে ক্রমে আরও জোরে আঁকড়াইয়া ধরিতে থাকেন।

যোগসাধনার যে পদ্ধতিকে তিনি অনুসরণ করিয়া চলিয়াছেন, তাহা এযাবৎ তাঁহাকে শান্তি ও তৃপ্তি দিতে পারে নাই। এ সময়কার মনোভাব সম্বন্ধে তারাকিশোর বলিয়াছেন, "আমার অবলম্বিত এই সাধনে শক্তি প্রকাশিত হয়, এটা আমি নিজে প্রত্যক্ষ করেছি। তাছাড়া, এর দ্বারা একপ্রকার ভাবাবেশ হয়ে থাকে তা বড়ই মধুর—এটাও আমি বহুবার দেখেছি। এই অর্জ্জিত শক্তি দিয়ে আমি শুধু মাত্র দৃষ্টিপাত করে নিজে রোগীকে রোগমুক্ত করেছি। আমার দর্শন মাত্র হিষ্টিরিয়া রোগীর মূর্চ্ছা রোগ দূর হয়েছে, এমনও কখন কখন ঘটেছে। আমাকে স্পর্শ ক'রে অনেকে ভাবাবিষ্ট হয়েছে, মূর্চ্ছিত পর্য্যন্ত হয়ে পড়েছে, এরূপ ঘটনা প্রত্যক্ষ করেছি। কিন্তু এ সকল শক্তি আমার

আত্মজ্ঞান অথবা ব্রহ্ম দর্শনের দ্বার উদ্‌ঘাটিত করেনি। অতএব এই সাধন অবলম্বনে আমার অভীষ্ট সিদ্ধ হবে না, এটা আমি নিশ্চিতরূপে ধারণা করলাম। এজন্য আমাকে অন্য উপযুক্ত গুরু গ্রহণ করতে হবে—তা নিশ্চিতরূপে বুঝলাম। সুতরাং যিনি যথার্থ ব্রহ্মজ্ঞ হয়েছেন এবং যাঁর কৃপায় আমি ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার লাভ করিতে পারি এমন সদ্‌গুরুর আশ্রয় পাওয়া আমার পক্ষে একান্ত আবশ্যক। এই সদ্‌গুরু লাভের চিন্তায় বড় ব্যাকুল হ'লাম।"

তারাকিশোরের গুরুলাভের ব্যাকুলতা ক্রমে ক্রমে খুব তীব্র হইয়া উঠিতেছে। তিনি শুনিয়াছেন, আকাশ-গঙ্গা পাহাড়ে গোস্বামী বিজয়কৃষ্ণের সদ্‌গুরু লাভ হইয়াছে। তাই উদ্বিগ্ন চিত্তে কেবলই ভাবিতে থাকেন, অভিলষিত পরম ধন আজ তিনি কোথায় পাইবেন? কাহার নিকট আশ্রয় নিবেন? সংসার ত্যাগ করিয়া পরিব্রাজন ও তীর্থ দর্শনে বাহির হইয়া পড়িতেও এসময়ে একবার তিনি কৃতসঙ্কল্প হন। নানা কারণে তাহাতেও বাধা আসিয়া পড়ে।

তারাকিশোর প্রায় প্রত্যহই গঙ্গাস্নান করিতেন। গঙ্গাতীরে বসিয়া ধ্যান, জপ ও প্রার্থনা নিবেদনে তাঁহার বহু সময় অতিবাহিত হইত। ১৮৯১ সালের গ্রীষ্মকাল। সেদিন সন্তাপিত চিত্তে তিনি ঘাটে বসিয়া আছেন, হঠাৎ ভিতর হইতে উত্থিত প্রবল আর্ত্তি ও ক্রন্দনে তাঁহার সারা অন্তর মথিত হইয়া উঠিল। তিনি গঙ্গাদেবীকে সম্বোধন করিয়া সখেদে কহিতে লাগিলেন,—"মাগো! ত্রিতাপনাশিনী কলুষহারিণী বলে তোমার প্রসিদ্ধি। কিন্তু মা, আমার পাপ কি এতই বেশী যে তোমার ত্রিলোকপাবনী ধারা তা শুদ্ধ করতে পারলো না!"

খেদোক্তি থামিতে না থামিতেই কিন্তু তারাকিশোরের দৃষ্টিতে এক অলৌকিক দৃশ্য ভাসিয়া উঠিল। এই ঘটনার বর্ণনা প্রসঙ্গে নিজে বলিয়াছেন, "দেখলাম আমার চোখের সামনে—হিমালয়ের

যে স্থান থেকে গঙ্গা উদ্ভূত হইয়াছেন, সেই মূল গঙ্গোত্রী গোমুখী স্থান হঠাৎ প্রকাশিত হল এবং সেই স্থানে বিরাজমান উমা-মহেশ্বরদেবও আমার দৃষ্টিগোচর হলেন। আমি তখন বিস্মিত হয়ে ঐ স্থান ও তাঁদের দেখতে লাগলাম। এরপর মহেশ্বরদেব একটি একাক্ষরী বীজমন্ত্র আমাকে উপদেশ করলেন এবং আরো বলে দিলেন যে এই মন্ত্র জপের দ্বারা আমি যথার্থ সদ্‌গুরু লাভ করবো!"

অপ্রাকৃতিক দৃশ্যটি ক্ষণপরেই অন্তর্হিত হইয়া গেল। তারাকিশোরের হৃদয় তখন এক অনির্ব্বচনী স্বর্গীয় আনন্দে ভরপুর হইয়া গিয়াছে। পথপ্রদর্শক ব্রহ্মজ্ঞ গুরু যে এবার তাঁহার জীবনে সত্য সত্যই মিলবে এ বিষয়ে তাঁহার আর কোন সন্দেহ রহিল না। ইহার তিন বৎসরের মধ্যেই সদ্‌গুরু তাঁহার জীবনে আবির্ভূত হন। ব্রহ্মবিদ্ মহাপুরুষ কাঠিয়াবাবা মহারাজের নিকট্ দীক্ষা নিয়া তিনি কৃতার্থ হন।

দীক্ষাদানের পর গুরুদেব দীর্ঘকাল তারাকিশোরকে সংসারধর্ম্ম পালন করান, কলিকাতার হাইকোর্টের অন্যতম আইনজীবীরূপে তাঁহার খ্যাতি প্রতিপত্তি বিস্তৃত হইতে থাকে। কিন্তু দেখা যায় অহঙ্কার বা অর্থের মোহ কখনও তাঁহাকে কলুষিত করিতে পারে নাই। গার্হস্থ্য-জীবনের পরিবেশেও তাঁহার রূপটি এক অনাসক্ত ও মানবসেবা পুরুষরূপেই ফুটিয়া উঠে।

সাংসারিক লোভ ও দ্বেষদ্বন্দ্বের বিষয়বস্তু নিয়াই আইনজীবীর কাজ। অথচ তারাকিশোর এই স্পর্শ হইতে নিজেকে বিস্ময়করভাবে দূরে রাখিতে পারিতেন। মামলার 'ব্রীফ্' পাইয়াই তাঁহার প্রথম জিজ্ঞাস্য ছিল, ইহাতে তাঁহার মক্কেলের দিক দিয়া কোন মিথ্যা বা প্রবঞ্চনা আছে কি না? সে রকম কোন কিছু থাকিলে কাগজপত্র তখনই তিনি ফেরৎ দিতেন। সাধারণতঃ, মামলার নথিপত্র পড়ার জন্য তিনি ভাল পরিশ্রমিকই নিতেন এবং

ইহা তন্ন তন্ন করিয়া পড়বার পর নিজের দিক দিয়া স্থির করিতেন, ঐ মোকদ্দমা গ্রহণ করিবেন কিনা। একবার তাহা গ্রহণ করিলে এই মামলার তথ্য ও আইনের কূট প্রশ্নাদি তিনি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে জানিয়া নিতেন। সমস্ত মামলাটি যেমন তাঁহার নখাগ্রে আসিয়া যাইত, তেমনি ত্রুটিহীনভাবে তিনি তাঁহার বক্তব্যও প্রকাশ করিতে পারিতেন।

একাগ্রতা, তীক্ষ্ণ বিচারবুদ্ধি ও গভীর মননশীলতার বলে তারা-কিশোর অতি সহজে তাঁহার প্রতিপক্ষকে পরাস্ত করিতে পারিতেন। আইনের প্রগাঢ় বুৎপত্তির জন্যও প্রবীণ আইনজীবীদের মধ্যে তাঁহার মর্য্যাদা ছিল অসামান্য। স্যর রাসবিহারী ঘোষ সে সময়ে আইন-জীবীদের মধ্যে অপ্রতিদ্বন্দ্বী। কোন কোন মামলা সম্পর্কে নিজ মক্কেলকে তিনি বলিতেন, "এ মোকদ্দমায় আমরা প্রস্তুত ঠিকই হ'য়েছি—হারবার কোন কারণ দেখছিনে। শুধু এক ভয়, অপর পক্ষে তারাকিশোর রয়েছে।" গুরুত্বপূর্ণ কোন আইন-ঘটিত অভিমতের ব্যাপারে নিজ মক্কেলদেরও অনেক সময় তিনি তারাকিশোরের পরামর্শ গ্রহণ করিতে বলিতেন।

উকিল হিসাবে সহকর্ম্মী শুধু আইনজীবীদেরই নয়, প্রবীণ-বিচারকদেরও শ্রদ্ধা আকর্ষণে তারাকিশোর সমর্থ হন। হাইকোর্টে যোগদানের সময় হইতেই তথ্য ও যুক্তিনিষ্ঠ তীক্ষ্ণধী আইনজীবীরূপে তিনি মর্য্যাদা লাভ করেন। একবার বিচারপতি নরিস সাহেবের এজলাসে তাঁহার একটি মামলার শুনানী হইতেছে। এই এজলাসে তারাকিশোর প্রথম সাওয়াল করিবেন। তিনি বক্তব্য বলিবার জন্য দণ্ডায়মান হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই বিচারপতি মিঃ নরিস এক দীর্ঘ বক্তৃতা আরম্ভ করিলেন। আইনজীবীরা অনাবশ্যকভাবে দীর্ঘ সওয়াল করিয়া কিভাবে হাকিমের সময় নষ্ট করেন, নিজেদের ও মক্কেলদের ক্ষতি করেন—ইহাই তাঁহার বক্তৃতার নির্গলিতার্থ। উৎসাহ সহকারে তরুণ উকিলকে এ অবসরে তিনি নানা সদুপদেশ দিতেও ছাড়িলেন না।

তারাকিশোর মিঃ নরিসের সব কথাই ধৈর্য্য ধরিয়া শুনিলেন। তারপর ইহার উত্তরে শুধু সংক্ষিপ্তভাবে তিনি কহিলেন, "মিঃ লর্ড আপনাকে যথেষ্ট ধন্যবাদ, কিন্তু আপনি এ অবধি আমার বক্তব্যের একটি কথাও তো শোনেন নি!" একজন নূতন উকিলের নিকট এই তীক্ষ্ণ, সংক্ষিপ্ত উত্তর শুনিয়া বিচারকের চোখ মুখ লাল হইয়া গেল। চকিতে বুঝিয়া নিলেন, তাঁহার বক্তৃতাটি একেবারে মাঠেমারা গিয়াছে। অপর বিচারপতি এবং এজলাসে উপস্থিত প্রবীণ উকিলগণ তখন মুখে রুমাল দিয়া চাপা হাসি হাসিতেছেন। অতঃপর তারাকিশোর তাঁহার সওয়াল আরম্ভ করিলেন। আইন ও তথ্যের বিশ্লেষণ, যুক্তিনিষ্ঠা ও বক্তব্য বলার সংক্ষিপ্ত গুছানো ভঙ্গী দেখিয়া বিচারক কিন্তু খুশি হইয়া উঠিলেন। ক্রমে ক্রমে এই বিচারক তারাকিশোরের আইন-বুৎপত্তি ও চরিত্রের মহত্ত্ব দেখিয়া তাঁহার অনুরক্ত না হইয়া পারেন নাই।

তারাকিশোর স্বভাবতঃ উদাসীন ও সাধনভজনপরায়ণ। কি করিয়া এমন শ্রমনিষ্ঠা ও আন্তরিকতা নিয়া তিনি মক্কেলের মামলা পরিচানা করিতেন, তাহা ভাবিয়া অনেকেই বিস্মিত হইতেন। কিন্তু তাঁহার দিক দিয়া এব্যাপারে অস্বাভাবিকতা কিছু ছিল না। মক্কেলের কাজকে ভগবৎ সেবার অঙ্গরূপে মনে না করিয়া তিনি পারিতেন না। তাই পরিচালনায় বিন্দুমাত্র ফাঁক বা ফাঁকি তাঁহার কাজে কখনো দেখা যায় নাই। যে জুনিয়র উকিলেরা তাঁহার সহিত কাজ করিতেন, তাঁহাদের মধ্যেও তিনি সেবাবুদ্ধি, শুদ্ধতা ও সততার আদর্শ সঞ্চারিত করিয়া দিতেন। প্রসিদ্ধ আইনজ্ঞ ব্রজলাল শাস্ত্রী মহাশয় লিখিয়াছেন, "তারাকিশোর স্বীয় আদর্শ ও আধ্যাত্মিকতার বলে হাইকোর্টের উকিলদের মধ্যে যেন এক নূতন সমাজের সূচনা করেন। তাঁহার পুত জীবনের সংস্পর্শে আসিয়া অনেক আইনজীবীই উপকৃত হন।"

বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয় তাঁহার আত্মজীবনীতে তারাকিশোরের

জীবন সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন তাহার মর্ম্ম এই—সমসাময়িক আইনজীবীদের কাহারো কাহারো মত অত বেশী উপার্জ্জন তাঁহার না থাকিলেও, শ্রেষ্ঠ আইনজীবীদের অন্যতম বলিয়া গণ্য হইতেন। তাঁহার সহকর্ম্মীদের অনেকের মতে, উকিল হিসাবে স্যর রাসবিহারী ঘোষের পরেই ছিল তাঁহার স্থান। কিন্তু উপার্জ্জন বিষয়ে তিনি অগ্রগণ্য আইনজীবীদের কাহারো মত সাফল্য লাভে সক্ষম হন নাই। তাহার কারণ, ওকালতি কার্য্যের জন্য তিনি কখনই নিজের নিয়মিত সাধন ভজনের ব্যাঘাত হইতে দিতেন না।" তারাকিশোর প্রতিভাবান আইনজীবী—ইহাই ছিল তাঁহার সত্যকার পরিচয়।

সাধনার আলোক তারাকিশোরের ব্যবহারিক জীবনের বিভিন্ন স্তরগুলিকেও উদ্ভাসিত করিয়া তুলিয়াছিল। আইনজীবীর বৃত্তিকে যেমন ভগবৎসেবার ক্ষেত্ররূপে তিনি দেখিতেন, দৈনন্দিন গার্হস্থ্য-জীবনকেও ভগবানের সংসাররূপে গণ্য করিতেন। নিজেকে মনে করিতেন এক দীন সেবকমাত্র।

নিজ সংসারজীবনের নিত্যকার ঝামেলা নিতান্ত কম ছিল না। একদিকে বিগ্রহের নিত্য সেবা, সাধু সজ্জনের অভ্যর্থনা ও অতিথি ভোজন, আর অপরদিকে বহুসংখ্যক দরিদ্র আত্মীয় ও ছাত্রের অন্ন সংস্থান। এই বিরাট দায়িত্বের ভার যাহার উপর সেই গৃহস্বামীর সঞ্চয়ের ঝোঁক কিন্তু কিছুই ছিল না। নিজের সংসারকে তিনি বলিতেন, 'ঠাকুরের সংসার।' যত্র আয় তত্র ব্যয়—ইহাই ছিল তাঁহার এই ঠাকুরের সংসারের চিরন্তন রীতি ইহার কোনো ব্যতিক্রম হইলে তাহা মনে হইত নিতান্ত অস্বাভাবিক।

তারাকিশোরের গৃহিণী অন্নদা দেবী ছিলেন সত্যকার সহধর্ম্মিণী। ত্যাগ-তিতিক্ষা ও সেবানিষ্ঠা নিয়া দীর্ঘকাল স্বামীর পার্শ্বে তিনি দণ্ডায়মান ছিলেন। বিগ্রহ সেবা ও গৃহের পোষ্যদের দায়িত্বের কথা ভাবিয়া একবার তিনি অর্থ সঞ্চয় করিয়া রাখেন। ফল হইল

বিপরীত। গৃহস্থালীর অর্থকষ্ট এ-সময়ে কেবলই বাড়িয়া চলিল। লব্ধপ্রতিষ্ঠ আইনজীবী তারাকিশোর চৌধুরীর হাতে তখন কি জানি কেন একটি পয়সাও আসিতেছে না।

বিগ্রহসেবা ও পরিজনদের পোষণে এ বিঘ্ন তো ঘটিবার কথা নয়! তিনি প্রথমটায় কিছুটা বিস্মিতই হইলেন। তারপর অনুসন্ধান করিয়া জানিতে পারিলেন, গৃহিণী অন্নদা দেবী পুঁটলীতে একশত টাকা জমাইয়া রাখিয়াছেন। যদি কখনো ঠাকুরসেবার অর্থ না জোটে এজন্য চিন্তিত হইয়াই এ টাকা পৃথক করিয়া রাখা। তারাকিশোর গৃহিণীকে তীব্র তিরস্কার করিয়া কহিলেন, "এই জন্যেই তো ঠাকুর আর আমায় টাকাকড়ি দিচ্ছেন না! ত্যাখো, একটা কথা সর্ব্বদা মনে রেখো—ফকিরীতেই ঈশ্বর প্রাপ্তি হয় ফিকিরীতে নয়।"

তারাকিশোরের শ্বশুরবাড়ীর সম্পর্কিত এক ভদ্রলোক সেবার কিছুদিন কলিকাতায় তাঁহার বাসায় রহিয়াছেন। বহু দরিদ্র আত্মীয় ও ছাত্রের দল সেখানে বসবাস ও খাওয়াদাওয়া করে। ইহাদের কেউ কেউ স্বেচ্ছামতই চলাফেরা করে, বাড়ীর কাউকে গ্রাহ্য করার তেমন প্রয়োজন বোধ করে না। ইহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া ঐ আত্মীয়টি একদিন তারাকিশোরকে নানা অভিযোগ শুনাইতে থাকেন। মনোযোগ দিয়া সমস্ত কিছু শুনিবার পর তিনি কহিলেন, "দেখুন আপনার সব কথাই সত্য। কিন্তু আমি বুঝতে পার্‌ছিনে—আসলে দোষ কার? ওদের না আমার? আমি নিমিত্তমাত্র হয়ে আছি। এই সংসারটি হচ্ছে ঠাকুরের, তিনিই এদের খাওয়া পরা সব যোগাচ্ছেন, আমি যোগাচ্ছি না। কাজেই এরা একান্তভাবে আমার বশ্যতা স্বীকার ক'রে থাক্‌বে, তাই বা কেন?" শুভানুধ্যায়ী লোকটির সেদিন আর বাক্‌স্ফূর্ত্তি হইল না।

বাড়ীর চাকর-বাকরদের অধিকারও তারাকিশোরের দৃষ্টিতে অপর কাহারো অপেক্ষা কম ছিল না। ভৃত্য রামলগন সেদিন রান্নাঘরে খাইতে গিয়াছে। তাহার জন্য ঘোল নির্দ্দিষ্ট করিয়া রাখা

হয়, কিন্তু তাহা পরিবেশন করা হইল না। রাঁধুনে বামুনের সঙ্গে ঝগড়া করিয়া ভৃত্য সমস্ত ভাত আঙিনা ও সিঁড়িময় ছড়াইয়া দিল। গৃহকর্ত্রী অন্নদা দেবী এ ঔদ্ধত্য দেখিয়া বড় রুষ্ট হইলেন।

তারাকিশোর তখন উপস্থিত ছিলেন না। বাড়ী ফিরিয়া আসিয়া এ দৃশ্য দেখিয়া তিনি বড় বিস্মিত হইলেন। গৃহিণী কহিলেন, "চেয়ে ছ্যাখো তোমার প্রিয় চাকরের কাণ্ড! ঘোল আজ ছিল না এজন্য রেগে গিয়ে সে এ কাজ ক'রেছে।"

ভৃত্যের দিকে তাকাইতেই সে সকাতরে কহিল, "আজ্ঞে ঘোল ছাড়া এতগুলো ভাত আমি কি ক'রে খাবো?"

তারাকিশোর স্বভাবতঃই রাশভারী লোক। তাছাড়া, অন্যায় দেখিলে একেবারে অগ্নিমূর্ত্তি হইয়া উঠিতেন। বাড়ীর সকলে তখন ভাবিতেছে, এবার ভৃত্যের আর রক্ষা নাই, এখনই কি জানি এক সাজ্ঘাতিক কাণ্ড ঘটিয়া বসিবে। তারাকিশোর কিন্তু তখনই স্মিত হাস্যে দোতলায় চলিয়া গেলেন। তারপর পত্নীকে ডাকিয়া নিম্নস্বরে কহিলেন, "ওগো, ছেলের আবদার মাকে মাঝে মাঝে শুনতে হয়। আজ আমার জন্য বরাদ্দ-করা দুধ খানিকটা ওকে এনে দাও।"

কি দৈনন্দিন সাংসারিক জীবনে, কি হাইকোর্টের সংগ্রামময় ক্ষেত্রে তারাকিশোর আপনাকে সহজেই পৃথক করিয়া নিতে পারিতেন, এক অন্তঃসঞ্চারী আনন্দস্রোতে সদাই থাকিতেন নিমজ্জিত। একদিন রাত্রিতে শয্যায় শুইয়া গড়গড়া টানিবার সময় নলটি তাঁহার বাঁ চোখের মধ্যে ঢুকিয়া পড়ে। ইহার ফলে ক্ষত ও যন্ত্রণার সৃষ্টি হইল। নিজের চোখ দিয়া তখন কিছু পড়িবার উপায় নাই, তাই তারাকিশোর প্রত্যহ এ সময়ে মহাভারত পাঠ শুনিতেন। এই সময়ে শোনা ঘটনাবলীর চিত্রগুলি অলৌকিকভাবে তাঁহার সম্মুখে ভাসিয়া উঠিত, আঘাতের যন্ত্রণা ভুলিয়া অপার্থিব আনন্দসাগরে তিনি ডুবিয়া যাইতেন।

উপরোক্ত দুর্ঘটনার ফলে তারাকিশোরের এ চক্ষুটি দৃষ্টিহীন

হইয়া যায়। এ সময়কার চোখের পীড়ার কথা উল্লেখ করিয়া উত্তরকালে তিনি কহিতেন, "ভগবান কোন্ পথ দিয়ে কল্যাণ করেন, তা কি বলা যায়? চোখে সেদিন আঘাত ও যন্ত্রণা দিলেন বটে, কিন্তু এরই ভেতর দিয়ে নানা আধ্যাত্মিক অনুভূতি দান ক'রে আমার জীবনের পরিবর্ত্তন সাধন কি করেননি?"

তারাকিশোরের সাধন জীবনের বৈশিষ্ট্য—তাঁহার দীর্ঘকালের আর্ত্তি, ত্যাগ ও একনিষ্ঠা। তাঁহার অধ্যাত্মজীবনের প্রস্তুতির শেষ পর্য্যায়ে গুরু-কৃপায় অনুকূল বাতাস বহিতে থাকে, ব্রহ্মজ্ঞ গুরু কাঠিয়াবাবা মহারাজের আশীর্ব্বাদে ক্রমে ক্রমে এক সার্থকনামা সাধকরূপে তাঁহার রূপান্তর ঘটে। কলিকাতায় বাস করিবার সময়ও এই বৃন্দাবনবাসী গুরুমহারাজের কৃপার ধারা অপরূপ মহিমায় তাঁহার উপর প্রায়ই ঝরিয়া পড়িত, মাঝে মাঝে নিতান্ত অলৌকিকভাবেও ইহার প্রকাশ ঘটিত।

বিচিত্র তাঁহার এই সদ্গুরুর কৃপা, আবার বিচিত্র তাঁহার পরিবেশন ভঙ্গী! কাঠিয়াবাবার নির্দ্দেশ ছিল, শেষ রাত্রে জাগিয়া তারাকিশোরকে সাধনভজন করিতে হইবে। শিষ্যের ঘুম গোড়ার দিকে নির্দ্দিষ্ট সময়ে ভাঙিতে চাহিত না। এজন্য গুরুদেবকে সে-বার এক রাত্রে সূক্ষ্মদেহে শিষ্যের শয্যাপার্শ্বে উপস্থিত হইতে হয়। এই সময় একটি ঢিল মারিয়া তিনি তারাকিশোরের ঘুম ভাঙ্গাইয়া দেন। তারপর রাত্রির শেষ যামের বিশেষ সাধন ক্রিয়ার কথাটি স্মরণ করাইয়া দিয়া বাবাজী মহারাজ চকিতে অন্তর্হিত হন। এমনই ছিল শিষ্যের সাধন সম্বন্ধে ব্রহ্মবিদ্ গুরুর সতর্ক ও অতন্দ্র দৃষ্টি।

তারাকিশোরের গৃহে কাঠিয়াবাবাজীর একটি আলোকচিত্র শ্রদ্ধার সহিত পূজিত হইত। তারাকিশোর ও তাঁহার সহধর্ম্মিণী বলিতেন, "এ চিত্র বড়ই জাগ্রত, গুরুমহারাজ এর ভেতর দিয়ে আবির্ভূত হন, কত মধুর লীলা আমাদের দেখান।" এই ভক্তদম্পতি ছাড়াও আরো অনেকের এ লীলা দর্শনের সৌভাগ্য হইয়াছিল।

তারাকিশোর ও তাঁহার স্ত্রী গৃহমধ্যে গুরু-মহারাজের চিত্রটি স্থাপন করিয়াছেন। কিন্তু পূজার বিশদ অনুষ্ঠানগুলির সহিত কেহই তেমন পরিচিত নহেন। তাছাড়া কোন কোন কাজের গুরুত্বও তাঁহারা তেমন বুঝিতে সক্ষম নহেন্। গুরুকেই তাই এ বিষয়ে অগ্রসর হইতে হইল, যোগ বিভূতির কিছুটা প্রকাশদ্বারা তিনি স্বকার্য্য সাধন করিলেন।

তুলারাম নামে তারাকিশোরের এক ভৃত্য ছিল। লোকটি বড় সরল এবং ভক্তিমান। কাঠিয়াবাবা মহারাজের চিত্রপটের সম্মুখে প্রদীপ জ্বালানো ও ধূপধূনা দেওয়া ছিল তাহার দৈনন্দিন কাজ। একদিন সন্ধ্যায় তুলারাম ধূপদীপের ব্যবস্থা করিতে পূজার ঘরে গিয়াছে। হঠাৎ সে হাঁফাইতে হাঁফাইতে তারাকিশোরবাবুর স্ত্রীর নিকট আসিয়া উপস্থিত। কিছুটা সামলাইয়া নিয়া সে বলিল, গুরু মহারাজের আলোকচিত্রের মত আকৃতি বিশিষ্ট, জটাজুটসমন্বিত এক সাধু তড়িৎ গতিতে আসিয়া তাহার হাত হইতে ধুনুচিটি কাড়িয়া নিয়াছে। এই মূর্ত্তি অন্তর্হিত হইবার সময়ে তিরস্কারের সুরে বলিয়া গেল, "ওরে ছাখ্ তোরা সন্ধ্যার সময় আমার ফটোর সামনে রোজ আরতি করিস্ নে কেন ?"

বহু চেষ্টায়ও এই সাধুর কোন সন্ধান বা চিহ্ন আর পাওয়া যায় নাই। তবে গভীর রাত্রিতে দেখা গেল, ভৃত্যের হাত হইতে কাড়িয়া নেওয়া ধুনুচিটি জলের চৌবাচ্চার কোণে পড়িয়া রহিয়াছে। ইহার পর হইতে গৃহে প্রতিষ্ঠিত কাঠিয়াবাবাজীর চিত্রের সম্মুখে নিয়মিত-ভাবে প্রতি সন্ধ্যায় আরতি ও স্তবগান হইতে থাকে।

কাঠিয়াবাবাজীর অলৌকিক কৃপাবলে একবার তারাকিশোরের প্রাণরক্ষা হয়। উত্তরকালে তিনি এই কাহিনীটি বিবৃত করিতেন। সেবার শ্রীহট্টাঞ্চলে ভ্রমণকালে হাতীতে চড়িয়া তিনি তাঁহার শ্বশুর-বাড়ীর দিকে যাইতেছেন। একটি কাঁচা রাস্তার উপর দিয়া হাতী দ্রুতবেগে চলিয়াছে, হঠাৎ সে তাহার গতিবেগ আরো বাড়াইয়া

দিল। মুহূর্ত্তমধ্যে তারাকিশোর একটি বৃক্ষের সম্মুখে আসিয়া পড়িলেন। তিনি সভয়ে দেখিলেন, বড় একটি ডাল এমনভাবে নীচু হইয়া আছে যে হাতীটি আর একটু অগ্রসর হইলেই ঐ বৃক্ষশাখার আঘাতে তাঁহার দেহটি ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যাইবে।

ক্ষণপরেই কিন্তু এক ইন্দ্রজাল ঘটিয়া যায়। হাতীটি আরোহী সমেত ঐ বিপজ্জনক স্থান অতিক্রম করিয়া গেল, অথচ দেখা গেল, বৃক্ষশাখাটি পশ্চাতে পূর্ব্ববৎ নীচু হইয়াই রহিয়াছে! কি করিয়া যে তিনি উহাকে এড়াইয়া আসিলেন, কোন বিচার বিশ্লেষণ দ্বারাই সে রহস্য ভেদ করা গেল না।

ইহার অল্প কয়েকদিন পর তারাকিশোর বৃন্দাবনে আসিয়াছেন। সেদিন গুরুদেবের পদপ্রান্তে তিনি উপবিষ্ট। মনে কোন প্রশ্ন নাই, মুখেও কোন কথা কহিতেছেন না। কাঠিয়াবাবা মহারাজ হঠাৎ তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন, "বেটা, গাছের ডাল কি করে তোমার প্রাণনাশ ক'রবে? ভগবান যে সদাই তোমার সঙ্গে ছায়ার মত রয়েছেন, তোমায় রক্ষা করে যাচ্ছেন।"

বৃন্দাবনের আশ্রমে কাঠিয়াবাবাজী একটি অন্ধকার সর্প-সঙ্কুল প্রকোষ্ঠে বাস করিতেন। ইহা দেখিয়া তারাকিশোর বড় ব্যথিত হন, সত্বর গুরুদেবের জন্য একটি ভাল আশ্রম-ভবন তৈরীর জন্য খুব উদ্যোগী হইয়া পড়েন। কলিকাতা হইতে তিনি টাকা পাঠাইতেন, আর বাবাজী মহারাজের তত্ত্বাবধানে এটি নির্ম্মিত হইত।

১৮৯৭ সালে এ নূতন আশ্রম সম্পূর্ণ হইবার পর যুগল শ্রীবিগ্রহ সাড়ম্বরে সেদিন স্থাপিত হইল। এই বিগ্রহপ্রতিষ্ঠার দিন সমগ্র ভারতে ভূমিকম্প হয়, কিন্তু আশ্চর্যের কথা বৃন্দাবনে ইহা মোটেই অনুভূত হয় নাই। এমন কি, নিকট অঞ্চল মথুরায় ভূমিকম্প হইলেও বৃন্দাবনে সেদিন কোন কম্পন ধরা গেল না।

দুই একদিন পরের কথা। তারাকিশোর গুরুজীর পদপ্রান্তে বসিয়া আছেন। বিগ্রহের দিকে দেখাইয়া বাবাজী মহারাজ তাঁহাকে

কহিলেন "বাবুজী, তোমার যে ঠাকুরজী এখানে আসন নিয়েছেন, ইনি কিন্তু বড় জাগ্রত, বড় অলৌকিক শক্তি সম্পন্ন। ঠাকুরজী কৃপালু হয়েছেন, তোমায় আজ তিনি বর দেবেন। তোমার মনে যা প্রার্থনা থাকে, তাহা জানিয়ে ঠাকুরের কাছ থেকে বর মেগে নাও।"

তারাকিশোর উত্তর দিলেন, "বাবা, আপনার সন্তোষই আমার প্রার্থনীয়। আপনি প্রসন্ন থাকলে কোন্ বস্তুর অভাব আমার থাকতে পারে? আমি আর কি বর চাইবো?"

কাঠিয়াবাবা মহারাজের নয়ন আনন্দে ঝলকিয়া উঠিল। সস্নেহে প্রিয় শিষ্যকে আবার কহিলেন, "বেটা তোমার কথা খুবই ঠিক। কিছু কিছু পরীক্ষা করে নেওয়াও তো চাই। আমি বলি কি, তুমি সামনে গিয়ে তোমার মনে যা কিছু অভিলাষ আছে তা দয়াল ঠাকুরজীকে নিবেদন কর—তাঁর কাছ থেকে সব কিছু চেয়ে নাও!"

এই সুস্পষ্ট নির্দ্দেশ না মানিয়া উপায় নাই। তারাকিশোর এবার মন্দিরস্থিত শ্রীবিগ্রহের কাছে উপস্থিত হইলেন। দণ্ডবৎ করিয়া প্রার্থনা জানাইলেন, "দয়াময়, গীতায় তুমি শ্রীমুখে বলেছ ব্রহ্মভূত প্রসন্নাত্মার কথা যাঁর শোক নেই, আকাঙ্ক্ষা নেই, সর্ব্বভূতে যিনি সমদর্শী, তোমার পরাভক্তি লাভ ক'রে তিনি তোমার পরমতত্ত্ব জ্ঞাত হন—তোমাতেই প্রবিষ্ট হন। তোমার শ্রীমুখ বর্ণিত শ্লোকে যে পরম অবস্থার কথা বর্ণনা ক'রেছ, তাই যেন আমি প্রাপ্ত হই—এই কৃপাই তুমি আজ আমায় কর।"

তারাকিশোর মন্দির হইতে ফিরিয়া আসিলে কাঠিয়াবাবাজী তাঁহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন। প্রসন্ন উদার দৃষ্টিতে শিষ্যের দিকে চাহিয়া কহিতে লাগিলেন, "বেটা, তুম্‌হারা অভিষ্ট সিদ্ধ হোগা, তুম্‌হে ঋদ্ধি সিদ্ধিকা কভী টুটা নহী পড়েগা—হাঁ, মহন্তীভী মিলেগী"।—বাবা তোমার মনোভিলাষ পূর্ণ হবে—ঋদ্ধি, সিদ্ধি তোমার কখনও ক্ষুণ্ণ হবে না, তাছাড়া, মোহান্তও তুমি হবে।

বাবাজী আবার আশ্বাস দিলেন, "ভগবৎ দর্শন তুম্‌কো

মিলেগা। যদি মেরী ইয়ে বাতে সচ্চী নহী হোঁ তো হামভী সাচ্চা সাধু নহী হ্যায়।"—অর্থাৎ, ঈশ্বর দর্শন তোমার হবেই, যদি আমার একথা মিথ্যা হয় তবে আমি সাচ্চা সাধু নই, একথা জেনো।

তারাকিশোর আনন্দে গুরুজীর চরণে লুটাইয়া পড়িলেন।

গুরুকৃপার অমৃতের ধারা এবার তাঁহার জীবনপাত্রকে ভরিয়া তুলিতেছে। এদিকে যেমন চলিয়াছে কঠোর সাধনা, অপর দিকে তেমনই অধ্যাত্ম-অনুভূতির দুয়ার একটির পর একটি খুলিয়া যাইতেছে। প্রায়ই তারাকিশোর ভাবেন, সংসারের কর্ম্মে জড়িত থাকা আর তাঁহার পক্ষে সম্ভব নয়। এবার তিনি সর্ব্বত্যাগী হইয়া গুরু মহারাজ কাঠিয়াবাবাজীর চরণতলে পড়িয়া থাকিবেন, তাঁহার সেবায়ই জীবনের অবশিষ্ট দিন কয়টি কাটাইয়া দিবেন।

সেবার তিনি গৃহত্যাগের জন্য স্থিরসঙ্কল্প। পত্নী অন্নদা দেবী কোনদিনই স্বামীর ধর্ম্মাচরণের অন্তরায় হন নাই—তিনিও তাঁহার সম্মতি দান করিলেন। চূড়ান্ত ব্যবস্থাদির পর তারাকিশোর নিশ্চিন্ত হইয়াছেন, কিন্তু রাত্রে শয়নঘরে ঢুকিতে গিয়াই বিস্ময়ের অবধি রহিল না। দেখিলেন, দিব্য জ্যোতির্ম্মণ্ডিত মূর্ত্তিতে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সম্মুখে দণ্ডায়মান। পরম প্রভু মধুর হাসি হাসিতেছেন আর সারা ঘরটি স্বর্গীয় আলোকচ্ছটায় উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে।

সেদিনকার এই অতীন্দ্রিয় দর্শন সম্বন্ধে তারাকিশোর নিজে লিখিয়াছেন, "তখন আমার হৃদয়ে অনির্ব্বচনীয় আনন্দস্রোত বহিতে লাগিল, সমস্ত জগৎকে আনন্দময় বলিয়া বোধ করিতে লাগিলাম। অবশভাবে অশ্রুপূর্ণনেত্রে শ্রীভগবানকে সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ করিলাম। উঠিয়া দেখিলাম, তিনি অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছেন। আমার অন্তরে আনন্দস্রোত তখনও বহিতে লাগিল, কয়েকদিন সেই স্রোত চলিয়াছিল। সংসার দুঃখময়, অতএব পরিত্যাজ্য বলিয়া বোধ হওয়াতে আমার যে তীব্র বৈরাগ্য আসিয়াছিল, সমস্ত সংসারকে আনন্দময়-রূপে দর্শন করিয়া আমার সেই ভাব আর রহিল না। বরঞ্চ আমার

শয়নকক্ষেই যে তিনি দর্শন দিয়াছেন ইহাতে আপাততঃ আমার সংসারে অবস্থানই তাঁহার অভিপ্রেত বলিয়া বোধ হইল। সংসার পরিত্যাগ করিয়া সাধু হইবার ইচ্ছাও ইহার ফলে তিরোহিত হইয়া গেল এবং পরমানন্দে দিন অতিবাহিত হইতে লাগিল।"

কয়েকমাস অতিক্রান্ত হইবার পর তারাকিশোর বৃন্দাবনে গিয়া কাঠিয়াবাবাজীর চরণ বন্দনা করিলেন। কলিকাতায় থাকিতে শয়নগৃহের মধ্যে যে অপ্রাকৃত দর্শন ঘটিয়াছিল তাহাও গুরুমহারাজকে জানাইতে দেরী হইল না। কাঠিয়াবাবাজী আনুপূর্ব্বিক তাঁহার সমস্ত কথা শুনিয়া খুসী হইলেন। তারপর শিষ্যকে সতর্ক করিয়া দিয়া কহিলেন,—"ইয়ে দর্শন বহুৎ ভাগ্‌সে মিলতা হ্যায়। লেকিন্ ইয়ে দর্শন ছায়া দর্শন হ্যায়, ইস্‌কে পিছে ঔরভী দর্শন হ্যায়"—অর্থাৎ, এ প্রকার দর্শন সাধকের পরম সৌভাগ্যের ফলেই সম্ভব হয়, কিন্তু এটা ছায়াদর্শন মাত্র—এর পরেও বহুতর দর্শন রয়েছে।

কাঠিয়াবাবা মহারাজের সহিত ব্রজপরিক্রমায় বাহির হইতে তারাকিশোরের বড় উৎসাহ ছিল। গুরুদেবের সেবার সর্ব্ব ব্যবস্থা অনুগামী সাধুদের খাওয়া দাওয়া এবং ভ্রমণের ব্যয় বহন ও তত্ত্বাবধান তিনি সানন্দে করিয়া যাইতেন। সেবার পরিক্রমাকালে তারাকিশোর নন্দগ্রামে পৌছিয়াছেন। গ্রামের রাস্তা দিয়া তিনি কুণ্ডের দিকে যাইবেন, এমন সময় কতকগুলি গ্রাম্য বালক ছুটিয়া আসিয়া তাঁহাকে ঘিরিয়া ধরিল, বাবুজী আজ সবাইকে জিলাপী খাওয়াইবেন, তবে তাঁহাকে ছাড়া হইবে।

তারাকিশোরের আদেশে দোকানী ভিয়ান চড়াইয়া দিল। মিষ্টি প্রস্তুত হইবামাত্র হঠাৎ কোথা হইতে এই বালকদের মধ্যে দুইটি অপূর্ব্ব দর্শন বালক আসিয়া উপস্থিত। যেমন তাহাদের নয়নাভিরাম রূপ, তেমনই মোহন কণ্ঠস্বর। তারাকিশোরের দিকে চাহিয়া বঙ্কিম হাসি হাসিয়া বালক দুইটি কহিল, "বাবা, ইয়ে সব বড়া উপদ্রবী, তুম্ হম দোনোকে জিলাবী দে দো, হম্ সবকো বাট দেঙ্গে।"

চারিদিক দুষ্ট বালকদের হৈ-চৈ। তারাকিশোর তাহাদের মধ্যে দণ্ডায়মান হইয়া কেবলই নির্নিমেষে ঐ দিব্যদর্শন বালকদ্বয়ের দিকে তাকাইতে লাগিলেন। কি অপরূপ—এ যেন সাক্ষাৎ কৃষ্ণ বলরাম! জিলাপী তৈরী হইলে তাহাদেরই হস্তে উহার সবটা তুলিয়া দেওয়া হইল। চঞ্চল বালকদের মধ্যে বণ্টন করিয়া তাহারা নিজেরাও কিছুটা ভোজন করিল। উপস্থিত সকলে যেন নিতান্ত স্বাভাবিক ভাবেই এই দুই বালকের নেতৃত্ব মানিয়া নিয়াছে।

ইহার কিছুকাল পরেই দেখা গেল, দিব্যদর্শন বালক দুইটি আর সে ভীড়ের মধ্যে নাই। কোন সময় কি করিয়া যে তাহারা অদৃশ্য হইয়া গেল তাহা কেহ বলিতে পারে না। তারাকিশোরের মর্ম্মকোষে কোন্ মায়াবী আজ তাহার মোহন স্পর্শটি বুলাইয়া দিল? তাঁহার সমগ্র দেহটি তখন পুলকাঞ্চিত, দুই চক্ষু বাহিয়া প্রেমাশ্রুর ধারা ঝরিয়া পড়িতেছে। লীলাপর কৃষ্ণ বলরাম কৃপা করিয়া ছদ্মবেশে তাঁহাকে দেখা দিয়া গেলেন, ইহাই হইল তাঁহার দৃঢ় প্রতীতি। তাঁহার আনন্দের আর অবধি রহিল না।

আর একবারের কথা। ব্রজপরিক্রমার সময় তারাকিশোর সকলকে নিয়া পথ চলিতেছে। পূর্ব্বদিন একাদশী গিয়াছে, পরদিনও গুরুজী ও সাধুদের ভোজনাদি করাইতে সন্ধ্যার আঁধার ঘনাইয়া আসিল।

তারাকিশোরের ভাগ্যে সেদিন আহার জুটিল না। নিজের মনকে বুঝাইলেন, আজ বোধ হয় শ্রীঠাকুরের ইচ্ছা নয় যে, তাঁহার কোন আহার জুটুক্।

কাজকর্ম্ম এবং সাধনভজন সারিয়া তারাকিশোর মধ্য রাত্রে সবেমাত্র তাঁহার শয্যায় একটু গা এলাইয়া দিয়াছেন। হঠাৎ তাঁবুর বাহিরে অন্ধকারে এক অপরিচিত বালকের হাঁক-ডাক শুনা যাইতে লাগিল। "বাবুজী কাঁহা হ্যায়," বলিয়া বারংবার সে তারস্বরে চিৎকার করিতেছে।

কাঠিয়াবাবা মহারাজ তখনো নিদ্রা যান নাই, স্বস্থানে বসিয়া বিশ্রাম করিতেছেন। আগন্তুক বালকের স্বর তাঁহার কাণে প্রবেশ করিল। অমনি রহস্যময় হাসি হাসিয়া তাঁহার সেবকশিষ্য বালকদাসকে বলিলেন, "ওরে শুন্‌ছিস্ না? তারাকিশোরকে কে যেন ডাকাডাকি করছে? একবার শীগ্‌গীর বাইরে ডেকে দে।"

বালকদাস অনুসন্ধিৎসু হইয়া বাহিরে যাইবামাত্র একটি বালক এক লোটা দুধ দিয়া অন্তরঙ্গভাবে জানাইল, ইহা বাবুজীর জন্য—তাহাকেই যেন পান করিতে দেওয়া হয়। ভাণ্ডটি তারাকিশোরের সম্মুখে রাখা হইল। নিতান্ত অপ্রত্যাশিতভাবে এই আহার্য্যের ব্যবস্থা দেখিয়া তারাকিশোর তো অবাক। ছুটিয়া গিয়া আগন্তুক বালককে তখনই ধরিতে চেষ্টা করিলেন। কিন্তু চকিতে সে কোথায় উধাও হইয়া গিয়াছে।

গুরুদেবের সম্মুখে গিয়া তারাকিশোর দেখিলেন, প্রসন্ন হাসিতে তাঁহার মুখখানা ভরিয়া উঠিয়াছে! কাঠিয়াবাবাজী প্রিয় শিষ্যকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন, "বেটা, পহেলে ইয়ে দুধ তো পী লেও, তুম্‌হারে লিয়েই সব দুধ আগিয়া।" পেস্তা বাদাম মিছ্‌রী মিশ্রিত এই দুগ্ধের স্বাদ বড় অপূর্ব্ব। তারাকিশোর পরম তৃপ্তিসহকারে সমস্ত দুগ্ধই পান করিয়া ফেলিলেন। দুগ্ধবাহী এই রহস্যময় বালকের সন্ধান কিন্তু পরের দিনও কোনমতেই মিলিল না।

কাঠিয়াবাবাজী শিষ্যকে নানাভাবে পরীক্ষা কম করেন নাই। একবার কিছু সময়ের জন্য তারাকিশোরের ওকালতির আয় খুব কমিয়া গেল। অথচ সংসারের বিপুল খরচ কিছুমাত্র হ্রাস করার উপায় নাই। গরীব ছাত্রদল ও আত্মীয় স্বজনকেই বা হঠাৎ তাঁহার আশ্রয় ত্যাগ করিয়া কোথায় যাইতে বলিবেন? গুরুদেবকে প্রতি মাসে কিছু টাকা পাঠাইতে হয়, তাহাও না চালাইয়া উপায় নাই। বেশ কিছু ঋণ হইতে লাগিল। তদুপরি বৃন্দাবনে যাওয়ার সময়ে তিনি অনেক টাকা ধার করিলেন।

সেখানে পৌঁছিবার পর কাঠিয়াবাবা মহারাজ তারাকিশোরকে নিয়া এক বিচিত্র খেলা খেলিতে লাগিলেন। প্রায়ই তিনি তাঁহাকে ডাকিয়া আশ্রমের এক একটি প্রয়োজনীয় দ্রব্য সংগ্রহের নির্দেশ দেন। কোনদিন গরুর ভূষি বা ঘাস, কোনদিন বা আশ্রমের অধিবাসীদের জন্য গম, ছোলা ও চাল আনাইয়া নেন। মাঝে মাঝে ইচ্ছা করিয়া নিজেই ইহার কতক অংশ নষ্ট করিয়া তারাকিশোরের উপর আবার এ সব জিনিসই নূতন করিয়া আনিবার চাপ পড়ে। তিনি কিন্তু চরম অর্থকষ্ট ও দুর্দ্দশার মধ্যে থাকিয়াও গুরুজীর প্রতিটি বাক্য অক্ষরে অক্ষরে পালন করিয়া চলিয়াছেন। ইহার উপর একবার ব্রজ পরিক্রমার ব্যয় বহনের জন্যও ঋণের বোঝা তাঁহার আরো বাড়িয়া গেল।

তারাকিশোরের স্ত্রীকে কাঠিয়াবাবা মহারাজ এ সময়ে সহজে নিষ্কৃতি দেন নাই। পরীক্ষার জন্য ব্রজপরিক্রমার সময় এক শিষ্যকে তিনি এক একদিন চূড়ান্ত পথকষ্টে কাতর করিয়া তবে ছাড়িতেন।

একদিন তারাকিশোরের গৃহিণী কি এক কাজে আশ্রমে বাহিরে গিয়াছেন। চারিদিক কালো করিয়া প্রচণ্ড ঝড়বৃষ্টি সাজিয়া আসিতেছে। বাবাজী মহারাজ তাঁহার সেবক শিষ্যটিকে আদেশ দিলেন, "ওরে আশ্রমের কপাট এখনি বন্ধ ক'রে দে।" অন্নদা দেবী ঠিক সে সময়ে আশ্রম ভবনের অতি নিকটে আসিয়া পড়িয়াছেন। দরজায় বহুক্ষণ ধাক্কাধাক্কি করার পর তিনি নিস্তেজ হইয়া পড়িলেন, সিঁড়িতে বসিয়া ঘণ্টার পর ঘণ্টা ঝড়বৃষ্টিতে ভিজিতে লাগিলেন।

বহুক্ষণ কাটিয়া গেল, সিক্ত দেহ যখন প্রায় অসাড় হইয়া গিয়াছে, আশ্রমে উপবিষ্ট মহারাজ তখন হঠাৎ সজাগ হইয়া উঠিলেন। সেবকদের ডাকিয়া ব্যস্তভাবে চেঁচামেচি করিয়া কহিতে লাগিলেন, "ওরে তোরা ছাখ্, নিশ্চয় আশ্রমের কোন চাকর বাইরে গিয়ে এই ঘোর বর্ষায় আটকে পড়েছে, তোরা খোঁজ নে।"

দুয়ার খুলিয়া দেখা গেল, তারাকিশোরগৃহিণী মৃতকল্প অবস্থায় মাটিতে মূৰ্ছিত হইয়া পড়িয়া আছেন।

সকলে মিলিয়া দীর্ঘ সময় অগ্নির উত্তাপ দিলে তবে তিনি সুস্থ ও স্বাভাবিক হইয়া উঠেন। তারাকিশোর এবার স্ত্রীকে কহিলেন "দ্যাখো, তুমি কিন্তু এতে একটুও মনক্ষুণ্ণ হয়ো না। গুরুমহারাজ অন্তর্য্যামী, কোন কিছুই তাঁর দৃষ্টির বাইরে ঘটছে না, এটা জেনো। আমাদের কল্যাণের জন্যই এ সব যত কিছু দুঃখ-কষ্টের পরীক্ষা।"

ইহার পর অন্নদা দেবী কাঠিয়াবাবাকে প্রণাম করিতে গেলে তিনি স্নেহভরে বলিতে লাগিলেন, "মাঈ এবার বৃন্দাবনে আসবার পর হতেই তোমাদের দুজনকে নানারূপে আমি পরীক্ষা করেছি। তোমরা তাতে উত্তীর্ণও হয়েছ। আমি প্রসন্ন হয়ে বল্‌ছি, তোমাদের সর্ব্বাভীষ্ট সিদ্ধ হবে।"

স্বামী স্ত্রীর চোখে তখন পুলকাশ্রু ঝরিয়া পড়িতেছে।

কলিকাতায় ফিরিয়া আসিবার কিছুদিন পরে তারাকিশোর একটি বড় মোকদ্দমায় নিযুক্ত হন। ইহাতে তাঁহার অজস্র অর্থাগম হইতে থাকে এবং তাঁহার সমস্ত ঋণ শোধ হইতেও বেশী দেরী লাগে নাই। পরবর্ত্তী জীবনে লব্ধপ্রতিষ্ঠ উকিল হিসাবে তাঁহার একটানা উন্নতির ধারা বহিয়া গিয়াছে। তাছাড়া, কলিকাতার হাইকোর্টের অন্যতম শ্রেষ্ঠ আইনজীবীরূপেও তিনি কীর্ত্তিত হইয়াছেন।

বিবিধ শাস্ত্রগ্রন্থের সম্পাদনা ও প্রচার সংসারজীবনে তারা-কিশোরের এক মহৎকার্য্য। তাঁহার রচিত 'ব্রহ্মবাদীঋষি ও ব্রহ্মবিদ্যা' 'দার্শনিক ব্রহ্মবিদ্যা' কল্যাণকর অধ্যাত্ম-সাহিত্যরূপে এদেশে দীর্ঘকাল পরিচিত থাকিবে। সাধক তারাকিশোরের তত্ত্বোজ্জ্বলা বুদ্ধির নিদর্শনে এ গ্রন্থগুলি ভরপুর।

এইসব শাস্ত্রগ্রন্থ প্রণয়নের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে তারাকিশোর নিজে অপূর্ব্ব সারল্যের সহিত লিখিয়া গিয়াছেন,—"আমার পাণ্ডিত্যের অভাব এতই অধিক যে, সাধারণ ব্যাকরণ শাস্ত্রেও আমার ব্যুৎপত্তি

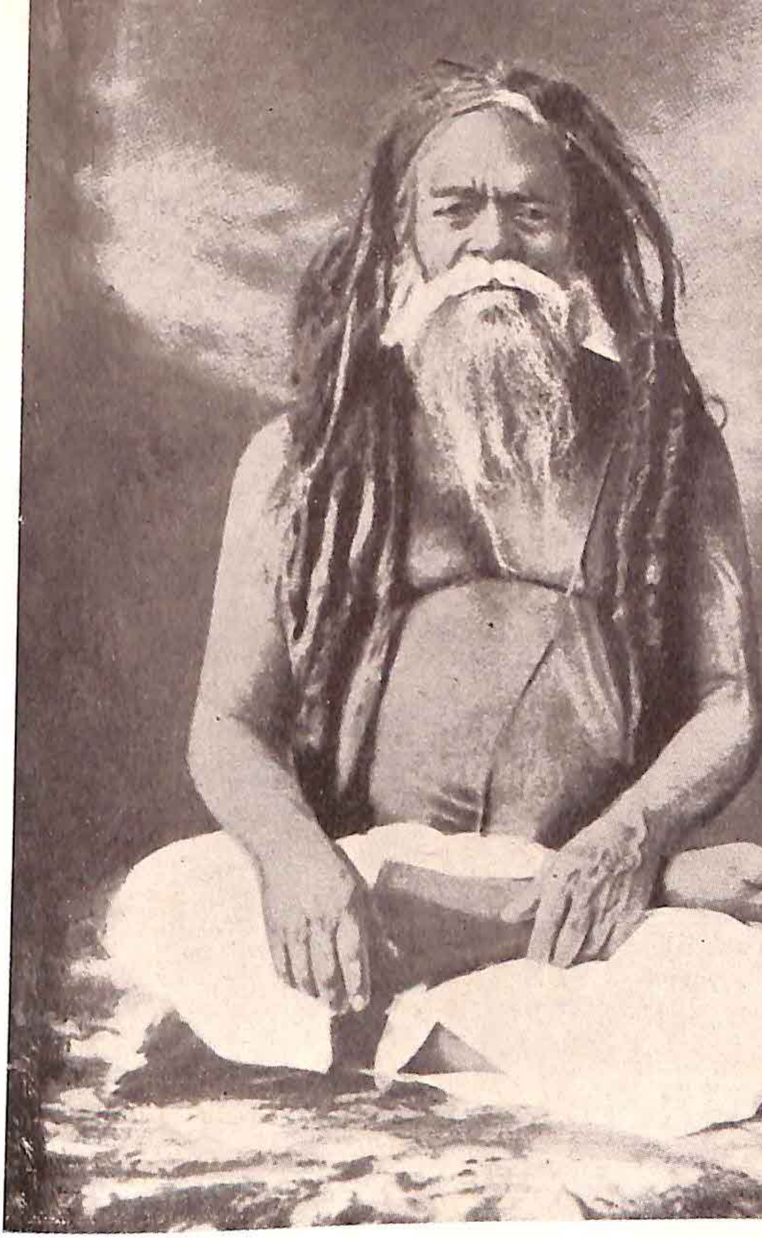
অতি অল্প। তবে আমার ভাগ্য অতি অসাধারণ, কারণ আমি মহৎ কৃপা লাভ করিয়াছি। সেই কৃপাবলে, অতি ছুর্ব্বোধ্য দর্শনশাস্ত্র সকলও স্নেহময়ী জননীর ন্যায়, তাঁহাদের গোপনে রক্ষিত জ্ঞানামৃত আমার নিকট প্রকাশিত করিয়াছেন, তাহা দেখিয়া আমিই স্থানে স্থানে বিস্মিত হইয়াছি।"

"হিন্দু পণ্ডিত সমাজে অবশ্য ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত যে, শ্রীভগবান বেদব্যাস, মহর্ষি কপিল, পতঞ্জলি, গৌতম প্রভৃতি সিদ্ধর্ষিগণ ভ্রম প্রমাদশূন্য 'আপ্ত' পুরুষ ছিলেন ; সুতরাং তাঁহাদিগের মধ্যে প্রকৃত মতবিরোধ থাকা অসম্ভব। ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য যে, আপাততঃ যে সকল বিরোধ তাঁহাদের উপদিষ্ট গ্রন্থে দৃষ্ট হয়, তাহার অবশ্য কোন না কোন মীমাংসা আছে। আমার হৃদয়ে শ্রীগুরুকৃপায় দর্শনশাস্ত্র সকলের সামঞ্জস্য স্থাপনে সমর্থ একপ্রকার মীমাংসা প্রকাশিত হইয়াছে। তাহা পণ্ডিত সমাজে প্রকাশ করা হইলে, তাহাদ্বারা মঙ্গল সাধিত হইবে বলিয়া বিশ্বাস করিয়া ঐ গ্রন্থ প্রকাশিত করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি।"

কি শাস্ত্রের রহস্য ভেদে, কি ভগবৎ সাক্ষাৎকার লাভে গুরু কৃপাই মানুষের প্রধানতম অবলম্বন—ইহাই ছিল তারাকিশোরের বিশ্বাস এই বিশ্বাসের উপর নির্ভর করিয়াই তিনি দীর্ঘ সংসারজীবন যাপন করিয়া গিয়াছেন।

সেবার বৃন্দাবনে থাকিতে গুরুমহারাজকে তারাকিশোর সখেদে বলিতেছিলেন, "বাবা, নামজপের সময় আমার চিত্ত ঠিকমত স্থির থাকছে না, ভজন পূজনের সময়ও তেমনভাবে আমি পাচ্ছিনে। আমার প্রতি আপনার পূর্ণ কৃপা কবে হবে ?"

বাবাজী প্রিয় শিষ্যকে উত্তর দিলেন, "ছাখো, আমার এসব কোন কিছুই অজানা নেই। কিন্তু প্রকৃত ভজন এক মহাবস্তু, তা তুমি এখনি কি ক'রে জানবে ? সে ভজন করার মত সামর্থ্য তোমার নেই। তোমার ভজন তো আমিই করে যাচ্ছি।"



সন্তদাস মহারাজ

গুরুসেবা ও আশ্রমের পরিচর্য্যার মধ্য দিয়া চিত্ত নির্ম্মল হয়, নিষ্ঠা ও একাগ্রতা গড়িয়া উঠে, আর ইহার ফলেই প্রকৃত ভজনের অধিকার জন্মে। এ তত্ত্বটি কাঠিয়াবাবাজীর নিকট তারাকিশোর বিশেষভাবে শিক্ষা করিয়াছিলেন। বৃন্দাবনে একবার তাঁহার উপর আশ্রমের হাটবাজারের ভার অর্পিত হয়। প্রভাতে উঠিয়াই দৈনন্দিন প্রয়োজনের জিনিসপত্রাদি তাঁহার ক্রয় করিবার কথা। কিন্তু তারাকিশোরের সেদিকে কোন হুঁসই নাই, মনের আনন্দে এক প্রকোষ্ঠে বসিয়া তিনি একাগ্রচিত্তে নাম জপ করিয়া চলিয়াছেন। সাধন ভজনে রত থাকিলে কি হয়, সেবাকার্য্যের এই শৈথিল্যের জন্য সেদিন কাঠিয়াবাবার নিকট তাঁহাকে কম তিরস্কার সহ্য করিতে হয় নাই।

জন্মান্তরের অধিকার ও সংস্কার নিয়া তারাকিশোর গুরুর আশ্রয়-ছায়ায় আসিয়া পড়িয়াছেন। গুরুদেবের যোগসিদ্ধি যেমন অপরিমেয় তেমনি কৃপারও তাঁহার অন্ত নাই। শিষ্যের অধ্যাত্ম-জীবনের প্রতিটি তরঙ্গভঙ্গীতে তাঁহার দিব্য দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকে, অবলীলাক্রমে তিনি উহা নিয়ন্ত্রিত করেন। গুরু ও শিষ্যের একটি ব্যক্তিগত সংলাপের মধ্যে ইহার চমৎকার নিদর্শন মিলে—

বৃন্দাবনে থাকিতে তারাকিশোর একদিন তাঁহার দেহে তীব্র যন্ত্রণা বোধ করিতেছেন। কাঠিয়াবাবাজীর নিকটে গিয়া নিবেদন করিলেন "মহারাজ, আমার বুকের ভেতর একটা শক্তির উর্দ্ধগতি কেবল বেধে যাচ্ছে। বড় কষ্ট পাচ্ছি।"

"হাঁ-হাঁ, তা তো হবারই কথা। ভেতরকার কমল যে ওকে বাধা দিচ্ছে।"

"মহারাজ, আমায় কৃপা করুন, সে বাধা আজ আপনি অপসারিত করে দিন।"

দৃঢ় স্বরে কাঠিয়াবাবাজী কহিয়া উঠিলেন, "কভি নহী!"

তারাকিশোর নির্ব্বাক বিস্ময়ে দাঁড়াইয়া রহিলেন। কিছুক্ষণ পরে

গুরুজী সস্নেহ দৃষ্টি তাঁহার উপর বুলাইয়া নিয়া ধীরে ধীরে কহিলেন, "এখনি যদি তোমার গ্রন্থি আমি খুলে দিই তবে তোমাকে দিয়ে আর কোন কাজই যে হবে না! সংসারে থেকে আরও কিছু কর্ত্তব্য, কল্যাণকর কাজ, তোমায় করতে হবে। চিন্তা নেই, ঠিক সময়মতই আমি এটা খুলে দেব।"

পরম ক্ষণটি আসিতে দেরী হয় নাই। কয়েক বৎসরের মধ্যে সাধক তারাকিশোরের কর্ত্তব্যের এই বিধি নির্দ্দিষ্ট নিগড় উন্মোচিত হইয়া যায়, চিরতরে তিনি সংসার ত্যাগ করেন। মুক্ত বিহঙ্গ উদার আকাশের বুকে সানন্দে ঝাঁপাইয়া পড়ে!

১৯১৫-র আগষ্ট মাসের অপরাহ্ণ। হাইকোর্টের বার লাই-ব্রেরীতে সেদিন মস্ত আলোড়ন! প্রবীণ ও নবীন সব উকিল, ব্যারিষ্টার সেখানে ভীড় করিয়াছেন। সুপ্রসিদ্ধ আইনজীবী তারা-কিশোর ওকালতি ছাড়িয়া চিরতরে বৃন্দাবনে যাইবেন। যে শেষ মোকদ্দমাটির পরিচালনভার হাতে ছিল তাহার কাজ এইমাত্র সমাপ্ত হইয়াছে। তারাকিশোর সহকর্ম্মীদের নিকট বিদায় নিবার জন্য স্মিতহাস্যে বসিয়া আছেন। ক্রমে অভিবাদন ও আলিঙ্গনের পালা সুরু হইল। সমবেত সকলেরই হৃদয় ভারাক্রান্ত, কেহ কেহ অতিকষ্টে উদ্গত অশ্রু গোপন করিতেছেন।

ভীড় ঠেলিয়া স্যর রাসবিহারী ঘোষ তারাকিশোরের নিকটে উপস্থিত হইলেন। নীচু হইয়া তিনি তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করিতে যাইবেন, এমন সময় তারাকিশোর ব্যস্তসমস্ত হইয়া হাতটি ধরিয়া ফেলিলেন। ব্যাকুলকণ্ঠে কহিলেন, "ছি ছি, একি কচ্ছেন? আপনি সর্ব্বজনমান্য, তাছাড়া, বয়োজ্যেষ্ঠ। প্রণাম ক'রে আমায় দোষের ভাগী করবেন না।"

স্যর রাসবিহারী উত্তর দিলেন, "না-না তারাকিশোর, তুমি আমায় বাধা দিয়ো না। আমি বয়োবৃদ্ধ ঠিকই, কিন্তু তুমি যে

জ্ঞানবৃদ্ধ। চুল পাকিয়ে ফেললাম, বস্তু অবস্তু, সত্য ও মিথ্যা এ জ্ঞান-তো আজো হয়নি! তোমার তা হয়েছে। তাই সাংসারিক জীবনের এত কিছু সম্ভাবনা অবহেলায় ছুঁড়ে ফেলে তুমি বৃন্দাবনের পথে পা বাড়াচ্ছো—বাধা দিয়োনা, আজ তোমার পদধূলি আমায় গ্রহণ করতে দাও।" ভাবাবেগে, কম্পিত দেহে, ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ আইনজ্ঞ ও প্রবীণ নেতা স্যর রাসবিহারী তারাকিশোরকে প্রণাম করিয়া তবে সেদিন নিরস্ত হন।

স্যর রাসবিহারী পূর্ব্ব হইতেই জানিতেন, তারাকিশোরের প্রাণে মুক্তির আহ্বান আসিয়া গিয়াছে, সোণার শিকল তিনি অচিরেই কাটিয়া বাহির হইবেন। তবুও মাঝে মাঝে প্রিয় সহযোগীকে তিনি বলিতেন, "তারাকিশোর, আমার শরীর অপটু হয়েছে। শিগগীর প্র্যাক্‌টিস্ ছাড়বো। অল্প কিছুকাল তুমি অপেক্ষা ক'র, কয়েক লাখ টাকা নিয়ে বৃন্দাবনে যেতে পারবে। তোমার গুরুজীর আশ্রমের তাতে কাজ হবে।" উত্তরে তারাকিশোর শুধু মৃদু হাসিতেন।

অর্থের উপার্জ্জন ও সঞ্চয়কে তিনি মুখ্য বলিয়া কখনই ধরেন নাই। সাধন ভজনেই তাঁহার বেশী সময় ব্যয় হইত, সন্ধ্যার পর মোকদ্দমার নথিপত্র নিয়া মোটেই বসিতেন না, কাজেই বহু মামলার 'ব্রীফ' তাঁহাকে ফেরৎ দিতে হইত। শুধু মিথ্যা মামলাই যে নিতেন না তাহাই নয়, আপিলের হার হইবে এমন সম্ভাবনা দেখিলে মক্কেলকে প্রায়ই প্রতিনিবৃত্ত করিতেন। নিজের প্রাপ্য অর্থের আকর্ষণ ত্যাগ করিয়া শরণাগত মক্কেলের অর্থের অপচয় নিবারণেই তিনি ব্যস্ত হইতেন বেশী। প্রতিভাবান আইনজীবী হিসাবে যশ ও প্রতিষ্ঠা যতই হোক, এমন অর্থ-বিমুখ বৈরাগীর কাছে অর্থ কি করিয়া ভীড় করিবে?

কাঠিয়াবাবাজীর জন্য এক নূতন বৃহদায়তন আশ্রম-ভবন ইতিমধ্যে তারাকিশোর শুরু করিয়া দেন, ইহা দেখিয়া যাইবার

আগেই গুরুমহারাজ দেহত্যাগ করেন। অর্দ্ধসমাপ্ত এই মন্দির অগৌণে শেষ না করিলেই নয়, এজন্য এক বিরাট ঋণের বোঝা আজ তাঁহার মাথায় চাপিয়া বসিয়াছে। হাইকোর্ট ও সংসারজীবন তারাকিশোর আরো আগেই ত্যাগ করিতেন, কিন্তু ঋণভার মোচনের অপেক্ষাই এতদিন রহিয়াছেন।

বৃন্দাবনের মন্দির নির্ম্মাণ অতঃপর শেষ হইয়া গেল। বহু ব্যয়ে তারাকিশোর তাঁহার বড় সাধের নিম্বার্ক আশ্রমের প্রতিষ্ঠা উৎসব সম্পন্ন করিলেন। কিন্তু মূল্যও এজন্য কম দিতে হয় নাই—ঠিকাদার ও বন্ধুবান্ধবদের দেওয়া ঋণের বোঝা প্রায় দুর্ব্বহ হইয়া উঠিয়াছে। তবে স্বস্তি শীঘ্রই মিলিল, ভগবৎ কৃপায় কয়েকটি নূতন বড় মামলার উপার্জ্জন হইতে এ দায় মিটিয়া গেল। তাহার পরই হাইকোর্ট হইতে তারাকিশোরের সেদিনকার এই বিদায় গ্রহণ।

আরও প্রায় দুইমাস বাধ্য হইয়া সংসারে থাকিতে হয়। বহু দুঃস্থ আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুবান্ধবকে নিয়মিতভাবে তিনি সাহায্য করেন, হঠাৎ তাহা বন্ধ করিয়া দিলে লোকগুলি নিতান্ত বিপন্ন হইয়া পড়িবে। তারাকিশোর ভাবিলেন, সাহায্য বন্ধ হইলে আর তো ইহারা তাঁহার সংসার-ত্যাগ ও সাধনজীবনকে সুচক্ষে দেখিবে না। আর এই দুঃস্থদের শুভেচ্ছা হইতে বঞ্চিত হওয়া তাঁহার দিক দিয়াও কল্যাণকর নয়। ইহাদের একটা ব্যবস্থা না করিয়া বৈরাগ্য-আশ্রমের পথে অগ্রসর হইতে তাঁহার মন চাহিতেছে না।

মফঃস্বলের এক মামলায় কিছু টাকা পাওনা ছিল, তাহার কয়েক হাজার টাকা এসময়ে হাতে আসিয়া পৌঁছে। দামী আসবাবপত্র বিক্রয় করিয়াও কিছু পাওয়া গেল। মাসিক সাহায্য তিনি যাহাদের প্রদান করিতেন, এ টাকা হইতে এককালীন কিছু কিছু দিয়া তাহাদের কতকটা সন্তুষ্ট করিলেন।

এবার সস্ত্রীক কলিকাতা ত্যাগ করিয়া বৃন্দাবনের আশ্রমে চলিয়াছেন। গৃহ হইতে এই শেষ বিদায়ের দৃশ্যটি বড়ই মর্ম্মস্পর্শী।

বাড়ীর অধিকাংশ মুল্যবান জিনিসপত্র পূর্ব্বেই বিক্রয় করিয়া দিয়াছেন। যাহা কিছু অবশিষ্ট ছিল, শেষের দিনটিতে তাহাও বিলাইয়া দিলেন। এখন বৃন্দাবনে যাওয়ার তৃতীয় শ্রেণীর রেল ভাড়ার সংস্থানও তাঁহার নাই।

মুক্ত জীবনের স্বাদ গ্রহণের জন্য সাধক আজ আগ্রহব্যাকুল। মাঝে মাঝে এক অপার্থিব আনন্দস্রোত তাঁহাকে ভাবতন্ময় করিয়া ফেলিতেছে। প্রকৃত অবস্থাটি বুঝিয়া এক অন্তরঙ্গ বন্ধু কোন এক সুযোগে উত্তরীয়ের কোণে পাথেয় স্বরূপ কিছু টাকা বাঁধিয়া দিলেন। আপনভোলা সাধকের সেদিকে কোন ভ্রূক্ষেপই নাই। কাঙাল বৈষ্ণব হইয়া তিনি গুরুধামে থাকিবেন, শ্রীরাধাবিহারীর ভিক্ষান্ন সংগ্রহ করিয়া তাঁহার সেবায় আত্মনিয়োগ করিবেন—এই আনন্দেই তিনি মাতোয়ারা!

তারাকিশোর এবার বৃন্দাবনের আশ্রমে আসিয়া পৌঁছিলেন। গুরুজী প্রায় ছয় বৎসর যাবৎ মরদেহ ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন, গুরুধাম আজ তাঁহার বিহনে খাঁ-খাঁ করিতেছে। কিন্তু তারাকিশোর নিজে জানেন, তাঁহার ব্রহ্মবিদ্ গুরুর করুণালীলায় আজিও কোন ছেদ পড়ে নাই, ভাগ্যবান ভক্ত শিষ্যদের এখনও তিনি কৃপা করিয়া দর্শন দেন, প্রয়োজনমত সাধন-নির্দ্দেশও তাঁহারা প্রাপ্ত হন। তারাকিশোরের নিজ জীবনেও এ অলৌকিক অভিজ্ঞতা কয়েকবার ঘটিয়াছে।

কৃপাময় কাঠিয়াবাবাজীর আশীর্ব্বাণী আজিও তাঁহার অন্তরে গুঞ্জরণ করিয়া ফিরে, অতীন্দ্রিয় অনুভূতির রাজ্যে স্তরের পর স্তর তাঁহাকে অতিক্রম করাইয়া দেয়। বৃন্দাবনের গুরুধামে বসিয়া তারাকিশোর এবার তাঁহার শেষ তপস্যায় ব্রতী হইলেন।

সমস্ত দিন একনিষ্ঠ হইয়া সাধন ভজন করেন, আর ইহার সঙ্গে চলে রাধাবিহারীজীর নিয়মিত সেবা। রান্না, বাসনমাজা হইতে

শুরু করিয়া শ্রীবিগ্রহের পূজা, শৃঙ্গারবেশ পর্যন্ত সব কিছুই তিনি নিজ হাতে করেন। আশ্রমের নানা কর্ম্মে লিপ্ত থাকার ফলে ক্ষোভ ও ক্রোধের উদ্রেক হইতে পারে, এজন্য তিনি মৌন অবলম্বন করিলেন। যোগাভ্যাসের ফলে গৃহাশ্রমে থাকিতেই তাঁহার নিদ্রা কম ছিল, এবার তাহা আরও কমিয়া গেল। সারাদিনের সাধন ভজনের পর কখন যে তিনি শয্যায় শয়ন করিতেন, আশ্রমিকদের অনেকেই তাহা জানিতে পারিত না। মধ্য রাত্রে সামান্য একটু নিদ্রা দিয়াই আবার শেষ রাত্রি হইতে চলিত তাঁহার ধ্যানজপ।

সেদিন প্রত্যূষে দেখা গেল, মন্দিরের ভিতরকার প্রকোষ্ঠ হইতে বিগ্রহের অলঙ্কার সব চুরি হইয়া গিয়াছে। এই ঘটনায় তারাকিশোরের মর্ম্মবেদনার আর অন্ত রহিল না। বিষণ্ণ হইয়া ভাবিতে লাগিলেন, 'আমি ভজন সাধন ছেড়ে নিয়মিতভাবে শয্যা গ্রহণ করি, তা বোধহয় গুরুমহারাজের ইচ্ছে নয়। তাছাড়া, বায়ুর ঊর্ধ্বগতির জন্য ঘুম তো প্রায় হয়ই না। তবে কেন আর আলস্য ক'রে এই মূল্যবান সময়টুকু নষ্ট করা?' ইহার পর হইতে কঠোরব্রতী তাপসের জীবনে নিদ্রা একেবারেই পরিত্যক্ত হইল। সমস্ত রাত্রিটাই ভজন ও ধ্যান জপে তিনি কাটাইয়া দিতেন। শেষ রাত্রিতে রাধাবিহারীজীর মঙ্গলারতির সময়। সে সময়ে ঘুমন্ত মন্দির-পূজারীকে জাগাইয়া দিয়া সামান্য একটু বিশ্রাম নিতেন মাত্র।

আশ্রমে এ তপস্যার কালে তারাকিশোর তাঁহার সমগ্র অতীত জীবনের উপরই এক বিস্মৃতির যবনিকা টানিয়া দিতেছিলেন। সংসার-আশ্রমের বিরাট প্রতিষ্ঠা, বিত্ত ও মানসম্ভ্রমের স্মৃতি নিষ্করুণ-ভাবে এসময়ে মুছিয়া ফেলিতেছেন। অন্তর্জ্জীবনের এই নূতন অধ্যায়ে তাঁহার চেহারারও এক বিরাট পরিবর্ত্তন সাধিত হয়। খুব সহজে আর তাঁহাকে আগের মানুষটি বলিয়া চিনিবার উপায় নাই।

এই সময়ে একবার তাঁহার পরিচিত কোন ভদ্রলোক বৃন্দাবনে নিম্বার্ক আশ্রমে আসিয়া উপস্থিত হন। সম্মুখে দণ্ডায়মান, দীনবেশ

তারাকিশোরকেই তিনি ব্যগ্রভাবে প্রশ্ন করেন, "সংসার ত্যাগ ক'রে এসে তারাকিশোর চৌধুরী এখানে বাস কচ্ছেন, তিনি কোথায় ?"

পরম ঔদাসীন্যের সহিত তারাকিশোর সহজ কণ্ঠে উত্তর দিলেন, "মশাই, তিনি তো মারা গিয়েছেন !"

ভদ্রলোকটি সখেদে চলিয়া গেলেন। পূর্ব্বাশ্রমের পরিচয় ও প্রতিষ্ঠাকে তারাকিশোর এমনিভাবে অবলুপ্ত করিতে চাহিতেন।

তাঁহার দীর্ঘ সাধনা ও কঠোর তপস্যার কথা কেহ কখনো উল্লেখ করিলে তৎক্ষণাৎ মহাপুরুষ বলিয়া উঠিতেন, "তপস্যা ক'রে কিভাবে ভগবানকে লাভ ক'রতে হয় তা বুঝতে হলে আমার বাবাকে দেখ।" গুরুমহাজের নাম উল্লেখ করা মাত্রই প্রবীণ সাধকের তুই চোখে প্রেমাশ্রু টলমল করিয়া উঠিত। বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে তিনি বলিতে থাকিতেন, "আমার সাধন ভজন তো কিছুই ছিল না ! গুরুর কৃপাতেই আমার সব কিছু হয়েছে।" সদ্‌গুরুর অমোঘ আশীর্ব্বাদ এই সর্ব্বনিবেদিত প্রাণ সাধকের জীবনে সফল হইয়া উঠে, অচিরে তিনি পূর্ণমনস্কাম হন।

বাহ্যত: দেখা যাইত, তারাকিশোর গুরুধাম বৃন্দাবনে বসিয়া নিতান্ত সাধারণ এক ভক্ত ও আশ্রমিকের জীবনই যাপন করিয়া চলিয়াছেন। অথচ তাঁহার দৈনন্দিন জীবনের অন্তরালে যে জ্ঞানময় রূপটি উদ্ভাসিত, তাহার সহিত পরিচয়ের সৌভাগ্য খুব কম লোকেরই ছিল। প্রকৃত সাধকের সন্ধানী দৃষ্টি ছাড়া সহসা এই মহাপুরুষের স্বরূপটি ধরা সম্ভব হইত না।

বৃন্দাবনের ব্রজবিদেহী মোহান্তের পদমর্য্যাদা অসামান্য। ব্রজধামের বৈষ্ণবমণ্ডলীর ইনি একচ্ছত্র নেতা, ইঁহার নির্দ্দেশাদি সকলকে মানিয়া চলিতে হয়। মঠ, আশ্রম, বিত্তবৈভব কিছু থাক্ বা না থাক্ সম্প্রদায়-গুরুরূপে ইঁহার পদাধিকার সর্ব্বত্র স্বীকৃত না হইয়া উপায় নাই।

মর্য্যাদার সঙ্গে সঙ্গে দায়িত্বভারও বড় কম নয়। ব্রজপরিক্রমার

সময়ে নানা স্থান হইতে আগত বৈষ্ণব সাধু জমায়েতের পরিচালনা, তাঁহাদের দ্বন্দ্ব ও মতবিরোধের মীমাংসা, অনেক কিছুর ভার ইঁহারই উপর ন্যস্ত থাকে।

কাঠিয়াবাবা মহারাজের ঘরেই গুরু পরম্পরাক্রমে দীর্ঘকাল যাবৎ এ মোহান্তাই বর্ত্তমান রহিয়াছে। কিন্তু বাবাজী মহারাজের দেহত্যাগের পর হইতে ইহা নিয়া নানা সমস্যার উদ্ভব হইতে থাকে। বর্ত্তমান মোহান্ত বিষ্ণুদাসজী বয়সে তরুণ, বড় সাধকও নন, তাই তাঁহার নেতৃত্ব ভালরূপে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিতেছে না। তাছাড়া, এই কর্ত্তব্যের গুরুভার বহন করিতেও তিনি আর সম্মত নহেন। তাই কাঠিয়াবাবাজীর পরম স্নেহভাজন শিষ্য, সর্ব্বজনশ্রদ্ধেয় সাধক তারাকিশোরকে তিনি ধরিয়া পড়িলেন—তাঁহাকেই এই মোহান্তপদ গ্রহণ করিতে হইবে।

তারাকিশোর ইহা এড়াইতে চান। তিনি ভাবিলেন, বৃন্দাবনের সকল মোহান্তদের দিয়া বিষ্ণুদাসজীকে বলাইবেন—তিনি যেন অন্ততঃ আরও এক বৎসর এই পদে অধিষ্ঠিত থাকেন, ইতিমধ্যে সম্প্রদায়ের নূতন গুরু নির্ব্বাচন করিয়া নেওয়া যাইবে। এ উদ্দেশ্যে ঝুলন পূর্ণিমার পরের দিন তিনি বৃন্দাবনের সকল মোহান্তকে কাঠিয়াবাবা মহারাজের নূতন আস্তানা, নিম্বার্ক আশ্রমে ভোজনের নিমন্ত্রণ করিলেন। তাঁহার ইচ্ছা, ঐদিনকার সাধু পঙ্গতের দ্বারাই বিষ্ণুদাসজীকে মোহান্তাই চালাইয়া যাইতে অনুরোধ করিবেন।

আগের দিনই নিম্বার্ক আশ্রমে এক অলৌকিক কাণ্ড ঘটিয়া গেল। পূর্ণিমার রাত। সারা আশ্রম মন্দির ও প্রাঙ্গণ শুভ্র জ্যোৎস্নায় ছাইয়া গিয়াছে। সাধক তারাকিশোর ধ্যানের গভীরে নিমগ্ন। হঠাৎ তাঁহার সম্মুখে বিদেহী কাঠিয়াবাবার জ্যোতির্ম্ময় মূর্ত্তিটি উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। গুরুমহারাজের আননে অপরূপ প্রসন্নতার দীপ্তি। সস্নেহ ভঙ্গীতে তিনি কহিলেন, "বেটা, যা কিছু কর্ত্তব্যকর্ম্ম তুমি ক'রবে, তবে নিজে ক'রছো—তা কখনো ভেবো না। তোমার

সকল কর্ম্মের ভার আমার ওপর, এ কথাটাই সার জেনো।” তারাকিশোরের দিকে প্রেমপূর্ণ দৃষ্টিটি কিছুক্ষণ নিবদ্ধ রাখিবার পর বাবাজী মহারাজের মূর্ত্তি ধীরে ধীরে কোথায় মিলাইয়া গেল।

পরদিনই আশ্রম ভবনে বৈষ্ণব মোহান্তপদের পঙ্গৎ হইবার কথা, ইহাতে বিষ্ণুদাসজীর মোহান্তাইর প্রশ্ন সম্বন্ধে চরম সিদ্ধান্ত গৃহীত হইবে। ঠিক ইহার পূর্ব্ব রাত্রে বিদেহী গুরুমহারাজ কোন্ কল্যাণময় ইঙ্গিত দিতে আবির্ভূত হইলেন? তারাকিশোর এই কথাই শুধু বসিয়া বসিয়া ভাবিতেছেন।

পরদিন মোহান্তদের নিকট যাওয়ামাত্র সকলে তারাকিশোরকে সোৎসাহে সম্বর্দ্ধনা জানাইলেন। তাঁহার দিব্য লাবণ্যশ্রীমণ্ডিত মূর্ত্তিটি দেখিয়া এক প্রাচীন সাধু সহর্ষে বলিয়া উঠিলেন, “ইয়ে তো বহুৎ আচ্ছা দর্শনী মূর্ত্তি হ্যায়, ইয়ে সব তরেসে মোহান্ত হোনে কি লায়েক হ্যায়।” অর্থাৎ, এঁর রূপ তো বড় চিত্তাকর্ষক, ইনিই দেখছি মোহান্তপদ লাভের যোগ্যতম ব্যক্তি।

বিশিষ্ট বৈষ্ণব মোহান্তদের অনেকেই সেদিন সেখানে উপস্থিত। সর্ব্বসম্মতিক্রমে সকলে তারাকিশোরকেই মোহান্ত নিযুক্ত করার ইচ্ছা প্রকাশ করিতেছেন। আগের রাত্রিতে গুরুজীর অলৌকিক আবির্ভাবের কথা তারাকিশোরের মনে ভাসিয়া উঠিল। যে কর্ত্তব্য সম্মুখে উপস্থিত হইবে, গুরুদেবেরই নিজ কার্য্য বলিয়া তাহাকে গণ্য করিতে তিনি নির্দ্দেশ দিয়াছেন। মোহান্তপদ নেওয়া সম্বন্ধে তাঁহার অভিপ্রায় সেদিনকার ঐ আবির্ভাবের মধ্য দিয়া প্রকাশিত হইয়াছে। তাই সাধুদের কথা অমান্য করার উপায় রহিল না।

কৌপীন ধারণা করিয়া তারাকিশোর যথাবিধি সন্ন্যাস গ্রহণ করেন নাই, এখনও তিনি গৃহাশ্রমের নামেই পরিচিত। কিন্তু উপস্থিত সাধু মোহান্তগণ ইহাতে দমিবার পাত্র নহেন, তাঁহাকে বৈষ্ণব প্রথানুযায়ী সন্ন্যাস দিবার জন্য সবাই উদ্যোগী হইয়া

পড়িলেন। অনুষ্ঠানটি অগোণে উদ্‌যাপিত হইল এবং মোহান্তাই-এর মালা ও নূতন চাদর পরাইয়া তাঁহারা তারাকিশোরকে অভিনন্দিত করিলেন। সকল মোহান্ত একত্র হইয়া তাঁহাকে এই বৈরাগ্য-আশ্রম প্রদান করিলেন, তাই নামকরণ হইল সন্তদাস। ১৩২৫ সালের এই শুভ দিবসটি তারাকিশোরের জীবনে এক নূতন অধ্যায় উন্মোচিত করিয়া দিল।

এই সন্ন্যাস গ্রহণের কালে ভাবতন্ময় তারাকিশোরের স্মৃতিতে গুরুদেবের পূর্ব্বেকার আশীর্ব্বাণীটি জাগরূক হইয়া উঠে। তিনি সেদিন বলিয়াছিলেন, 'মোহান্তাই ভী মিল্ জায়গী।' এ আকস্মিক সংঘটনটি অবশ্যই বাবাজী মহারাজের এক কৃপালীলা, নতুবা নিম্বার্ক আশ্রমে এত লোক থাকিতে মোহান্তের দল তাঁহাকেই বা এ মর্য্যাদাপূর্ণ পদে বসাইতে এমন ব্যগ্র হইবেন কেন? সুদূর বাংলার এক সাধক তিনি। তাছাড়া, এখনও তিনি সন্ন্যাসী নহেন—গৃহস্থাশ্রমী। শুধু তাহাই নয়, পত্নী তাঁহার সঙ্গে বৃন্দাবনের আশ্রমেই অবস্থান করিতেছেন। এ অবস্থায় ব্রজভূমির প্রাচীন সাধুরা কাঠিয়াবাবার গদী ও ব্রজমণ্ডলের বৈষ্ণবদের নেতৃত্বের পদে তাঁহাকে বসাইবেন, এ তাঁহার কল্পনার অতীত!

বিদেহী গুরুজীর অভিপ্রায় বুঝিয়া নিয়া দায়িত্বভারটি তাঁহাকে নিতে হইল। বৈরাগ্য আশ্রমে প্রবেশ করার পর পত্নীর সহিত এক আশ্রমে বসবাস করা সাধুদের প্রথাবিরুদ্ধ। তাই এই সময়ে পত্নী অন্নদাদেবীকে তিনি বৃন্দাবন ত্যাগ করান, স্থায়ীভাবে তাঁহাকে কাশীতে রাখিবার ব্যবস্থা করেন।

মোহান্ত পদ প্রাপ্তির পর সন্তদাসের জীবনে নূতনতর কর্ম্মের ভার চাপিয়া বসিল। আশ্রমে আগত সাধু ও অতিথিদের সেবা, ব্রজ পরিক্রমা ও কুম্ভমেলায় বৈষ্ণবমণ্ডলীর নেতৃত্ব প্রভৃতি অনেক কিছু দায়িত্ব না নিয়া আর তাঁহার উপায় রহিল না।

১৩২৭ সালে সন্তদাসজী নাসিক কুম্ভমেলায় যোগদান করেন।

সর্ব্ব ভারতের বৈষ্ণবমণ্ডলীতে এই সময়ে তাঁহার নেতৃত্ব স্থাপিত হয়। নিম্বার্ক, শ্রী, বিষ্ণু-স্বামী ও মাধ্ব--চারিটি বৈষ্ণব সম্প্রদায়েরই নিজ নিজ মোহান্ত রহিয়াছেন। ইঁহারা সকলে সমবেত হইয়া একজনকে তাঁহাদের এই চারি সম্প্রদায়ের প্রধানের পদে বরণ করেন। এই পরম সম্মানের পদটি সাধারণতঃ বৃন্দাবনধামের ব্রজবিদেহী মোহান্তেরই অধিকারে থাকে। সন্তদাস মহারাজ এবার ব্রজবিদেহী মোহান্তরূপেই নাসিকের কুম্ভমেলায় আসিয়া পৌঁছিয়াছেন। বৈষ্ণব সমাজের সকল মোহান্ত মিলিয়া এসময়ে তাঁহাকে বিরাট সম্বর্দ্ধনা ও মর্য্যাদা দান করিলেন, সম্প্রদায়ের প্রধান মোহান্তরূপে এখানে তাঁহাকে বরণ করা হইল।

এই নেতৃত্ব গ্রহণের পর চিরাচরিত প্রথানুযায়ী বিভিন্ন সাধুমণ্ডলীকে ভাণ্ডারা দিতে হয়, মোহান্তদের আপ্যায়ন ও ভেট প্রদানের ঝঞ্ঝাটও কম পোহাইতে হয় না। এখানকার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা ও কর্ম্মাদি সেদিন নিখুঁতভাবে সম্পন্ন হয় এবং সমগ্র মেলাক্ষেত্রে সন্তদাস মহারাজের খ্যাতি ও প্রতিপত্তি এ সময়ে ছড়াইয়া পড়ে। অর্থসঙ্গতিহীন নূতন মোহান্ত তাঁহার ভাণ্ডারা ও ব্যয়বহুল কার্য্যাদি কি করিয়া সম্পন্ন করিলেন, সকলেই তাহা সবিস্ময়ে ভাবিতে থাকেন।

সন্তদাসজীর পরিচালিত বৃন্দাবনের নিম্বার্ক আশ্রমের মর্য্যাদাও এ সময়ে ক্রমে ক্রমে খুব বাড়িয়া উঠে। অতিথি সাধু সন্ন্যাসীর ভীড় এখানে সর্ব্বদা লাগিয়াই আছে। আর সন্তদাস মহারাজ অকৃপণ করে, একান্ত নিষ্ঠায় ইঁহাদের ভোজন ও আদর আপ্যায়নের ব্যবস্থা করেন।

এক এক সময় কাজের এমন চাপ পড়ে যে, মোহান্ত সন্তদাসজীকেই স্বহস্তে আশ্রমের বহুতর দৈনন্দিন কাজ করিতে হয়। শ্রীবিগ্রহের পূজা ও আরতি হইতে শুরু করিয়া জল তোলা, ভোগ রাঁধা, বাসন মাজা প্রভৃতি কোন কিছুই বাদ যায় না।

আশ্রমের কোন সঞ্চিত অর্থ বা নিয়মিত অর্থাগমের ব্যবস্থা নাই। অথচ প্রতিদিন বহু বৈষ্ণব ও অভ্যাগতের প্রসাদের ব্যবস্থা করিতে হয়। বিস্ময়ের বিষয়, একদিনের তরেও অভাব অনটনের জন্য ভোগান্ন নিবেদনে বা অতিথি সেবায় কোন বাধা হয় নাই।

আশ্রম-বিগ্রহের কৃপার কথা উল্লেখ করিয়া সন্তদাসজী প্রায়ই কহিতেন, "বানপ্রস্থ আশ্রম নেবার পর থেকে বৃন্দাবনে এসে বাস করবো, ভিক্ষান্নের দ্বারা উদর পূর্ত্তি করবো—এই মনে ক'রে সংসারাশ্রম ত্যাগ করি, বৃন্দাবনে বাস করতে আসি। কিন্তু ঠাকুরজীর এমনই কৃপা যে, আমাকে একদিনও ভিক্ষার জন্য বের হতে দিলেন না। আমি বৃন্দাবনে এসে বাস করতে থাকলে কেউ পাঁচ টাকা, কেউ দশ টাকা, এই ভাবে অর্থ পাঠাতে লাগলেন, তাতে সাধুসেবার ব্যয় কোনমতে চলে যেতে লাগলো। তারপর সাধু সমাগম যেমন ক্রমশঃ বাড়তে লাগলো, আশ্রমের অর্থাগমও তেমনি বেশী হতে লাগলো।"

আশ্রমে নিয়মিতভাবে সাধুসেবার অনুষ্ঠানে সন্তদাসজীর বড় উৎসাহ ছিল। বলা বাহুল্য, এজন্য অতিথি অভ্যাগতের সংখ্যা সেখানে নিতান্ত কম হইত না। এক সময়ে সেবাকার্য্যের কঠোর পরিশ্রমে ও দৈনন্দিন দায়িত্বের ভারে আশ্রম-শিষ্যগণ ক্লান্ত হইয়া পড়েন। তাঁহাদের কেহ কেহ ইহাও ভাবিতে থাকেন, সংসার ও আত্মপরিজন ছাড়িয়া তাঁহারা সাধন ভজন করিতে আসিয়াছেন, অথচ রোজ সাধু সন্ত ও অতিথিদের সেবাতেই অধিকাংশ সময় কাটিয়া যায়। এ অবস্থায় অধ্যাত্মসাধনার অবসর কোথায়?

সকলে মিলিয়া একদিন সন্তদাস বাবাজীকে তাঁহাদের এই অভিযোগ নিবেদন করিলেন। উত্তরে তিনি বলিলেন, "বাবা তোমরা নিশ্চয় জানবে যে, বহু ভাগ্যে সাধু সেবার এ সুযোগ পেয়েছো। ভগবৎ সেবা ও সাধু সেবার মধ্য দিয়ে চিত্ত নির্ম্মল হতে থাকে, তারপর ভজন সাধনে অধিকার আপনা হতেই জন্মে।

সেবানিষ্ঠা ছেড়ে কেবল ভজনে বসলেই এখন তোমরা চিত্ত স্থির করতে পারবে না। কাজকর্ম্ম শেষ হবার পর সামান্য যেটুকু অবসর পাও, উপদেশমত ভজন সাধন করে যাও। প্রসন্ন চিত্তে ঠাকুরজী ও সাধুমহাত্মাদের সেবা করতে থাকো, তাতেই তোমাদের যথার্থ কল্যাণ হবে। শ্রীগুরুতে আত্মসমর্পণ করেছো, বিচারবুদ্ধি ও সাধনাভিমান ত্যাগ ক'রে আদেশ প্রতিপালন ক'রে যাওয়াই কি তোমাদের কর্ত্তব্য নয়?"

বাবাজীর কথা সেবকদের সংশয় দূর করিয়া দিল।

হরিদ্বার কুম্ভমেলার দুইমাস পূর্ব্বে বৃন্দাবনে এক অর্দ্ধকুম্ভ মেলা অনুষ্ঠিত হয়। এ সময়ে ভারতের দিকদিগন্ত হইতে সহস্র সহস্র বৈষ্ণব সাধু পবিত্র যমুনাপুলিনে জড়ো হন। যমুনার পুণ্য সলিলে তাঁহাদের অবগাহন স্নান চলে, বিস্তৃত তটভূমিতে আনন্দ উৎসবের এক বিরাট মেলাক্ষেত্র গড়িয়া উঠে। প্রাচীন প্রথা অনুযায়ী এস্থানে সমবেত চার সম্প্রদায়ের সাধুগণ ব্রজবিদেহী মোহান্তের অতিথি। ইঁহাদের প্রতিদিনকার ভোজনের দায়িত্বভার তাঁহার উপর।

১৩৩৩ সালের বৃন্দাবনের মেলা। সাধু জমায়েৎগুলির সেবায় সন্তদাসজী এখানে পরম নিষ্ঠা সহকারে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন। যমুনার চড়ায় বিশিষ্ট মোহান্তগণ নিজেদের অনুবর্ত্তী সাধু-খালসা নিয়া উপস্থিত। সর্ব্বত্যাগী মোহান্ত সন্তদাস বাবাজী কি করিয়া এ ব্যয়বহুল সেবার দায়িত্ব পালন করিবেন, ইহা নিয়া আশ্রমিকদের জল্পনা-কল্পনার অন্ত নাই। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, প্রতিদিনকার এই সাধুসেবায় কোন অন্তরায়ই উপস্থিত হয় নাই! সহস্র সহস্র বৈষ্ণবের ভোজনোপকরণ যেন কোন্ অদৃশ্য হস্তের ইঙ্গিতে আশ্রম ভাণ্ডারে স্তূপীকৃত হইতে থাকে। রোজকার সাধুভোজনের বিরাট পর্ব্ব অনায়াসে সম্পন্ন হইতে কোনই বাধা হইল না।

পঞ্চক্রোশী পরিক্রমার দিনে সন্তদাস মহারাজ কিন্তু বড় বিপদে পড়িলেন। বৈষ্ণব মোহান্তেরা আসিয়া তাঁহাকে চাপিয়া ধরিলেন—

তিনি তাঁহাদের নেতা, সাড়ম্বরে তাঁহাকে হাতীতে আরোহণ করাইয়া, পুরোভাগে রাখিয়া, সকলে এই পরিক্রমা উৎসব উদ্‌যাপন করিতে চান। সকলেরই জানা আছে, কাঠিয়াবাবা মহারাজের মানসপুত্র এই মহাপুরুষের মোহান্তসুলভ মনোবৃত্তি এবং আয়োজন উপকরণ মোটেই কিছু নাই। অথচ সম্প্রদায়ের অনেক মোহান্তেরই এসব ঠাট পোষাক রহিয়াছে। সোৎসাহে সকলে মিছিলের সুদৃশ্য হস্তী, মনোরম কিংখাবমণ্ডিত হাওদা, ছত্র ইত্যাদি নিয়া হাজির। রাজোচিত মর্য্যাদা নিয়া ব্রজবিদেহী মোহান্ত-মহারাজ সাধুদের মিছিলে নেতৃত্ব করিবেন, ইহাই তাঁহাদের অভিলাষ।

সন্তদাস বাবাজী কিন্তু এ প্রস্তাবে একেবারে বাঁকিয়া বসিলেন। ইষ্টদেব রাধাবিহারীজী ও গুরুদেব উভয়েই যে এই পবিত্র ধামে সাক্ষাৎভাবে বিরাজমান! তাই কোনমতেই তিনি এই স্থানে হস্তীপৃষ্ঠে আরোহণ করিতে রাজী নহেন। তাঁহার এই দৃঢ়তার জন্য অগত্যা পদব্রজেই সেদিনকার পরিক্রমা শুরু হইল। উত্তর ভারতের সাধু সমাজের দৃষ্টিতে তৎকালে তিনি শুধু কাঠিয়াবাবাজীর উত্তরাধিকারী ব্রজবিদেহী মোহান্তরূপেই সম্মানার্হ নহেন, এক শক্তিমান মহাপুরুষরূপেও তাঁহার খ্যাতি প্রতিপত্তির অন্ত নাই। অন্যান্য বৈষ্ণব মোহান্তেরা তাই বাধ্য হইয়া সেদিন হস্তীপৃষ্ঠ ত্যাগ করিয়া পদব্রজে যাত্রা করিলেন। পুরাতন আড়ম্বরপূর্ণ রাজসিক পরিক্রমার পরিবর্ত্তে এবার দেখা যায় এক ভক্তিবিনম্র শোভাযাত্রা। এ দৃশ্যটি ব্রজমণ্ডলের জনগণের অন্তর গভীরভাবে স্পর্শ করে।

হরিদ্বারে সে-বার কুম্ভমেলায় অনুষ্ঠান চলিতেছে। সৌম্যদর্শন, তেজঃপুঞ্জকলেবর সন্তদাস মহারাজ শিষ্য ভক্তদলসহ কন্‌খলের গঙ্গাতটে তাঁহার আসন স্থাপন করিয়াছেন। এই মেলায় অবস্থান-কালে, শুধু ভারতীয় বৈষ্ণব সাধুদের মধ্যেই নয়, সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের মধ্যেও তাঁহার প্রতিষ্ঠা ও মর্য্যাদা অসামান্যরূপে বৃদ্ধি পায়।

এই সময়ে ভোলাগিরি মহারাজের আশ্রমে সাধু সন্ন্যাসীদের

এক সম্মেলন হয়। গিরি মহারাজের সহিত বরাবরই সন্তদাসজীর বড় প্রীতির সম্বন্ধ, তাই সন্তদাস মহারাজকে তিনি এ সম্মেলনে যোগদানের জন্য সাদর আমন্ত্রণ জানাইয়াছেন। ভোলানন্দজীর কয়েকজন শিষ্য আসিয়া তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিয়া নিয়া গেলেন। সম্মেলনের নিকটে পৌঁছিয়া দেখা গেল, ভোলানন্দজী পুষ্পমাল্য হস্তে সন্তদাস মহারাজের জন্য সাগ্রহে প্রতীক্ষা করিতেছেন। সাক্ষাৎমাত্র গিরিজী সানন্দে তাঁহার গলায় মালা দিয়া সম্বর্দ্ধনা জানাইলেন।

সভার মধ্যস্থলে মূল্যবান বস্ত্রমণ্ডিত একটি তক্তপোষ, উহাতে পাশাপাশি দুইটি আসন পাতা রহিয়াছে। গিরিমহারাজ ও সন্তদাসজী উহাতে উপবেশন করিলেন, তারপর উপস্থিত সাধু ও সন্ন্যাসীদের সম্মতিক্রমে সন্তদাস মহারাজকে এ সম্মেলনের সভাপতি নির্ব্বাচন করা হয়। বিভিন্ন মণ্ডলী ও সম্প্রদায়ের কাছে ভারতীয় অধ্যাত্মজীবনের বহুমুখী ধারার প্রশস্তি জানাইয়া সন্তদাসজী যাহা বলিলেন তাহা আশা ও আনন্দের বাণী বহন করিয়া আনে।

সন্তদাস মহারাজ সাধুদের বলিলেন, "আমরা দেখি শীতের অবসানে বসন্তের উন্মেষের আগে আম্র মুকুল উদ্গত হয়। চারদিকে প্রকৃতির মধ্যেকার লক্ষণ জানিয়ে দেয়, ঋতুরাজ বসন্তের আবির্ভাবের আর দেরী নেই। তেমনি, বর্ত্তমানে যে নানা ধর্ম্ম-সম্প্রদায় তাঁদের নানা আদর্শ ও কর্ম্মপদ্ধতি নিয়ে জনকল্যাণে ব্রতী হয়েছেন, তা থেকেও প্রতীয়মান হয়—ভারতের শুভদিন নিকটে। আপনারা স্ব স্ব সাধন ও আদর্শ প্রচারে অবিচলিত থাকুন, লোকমঙ্গলের জন্য চেষ্টিত থাকুন, কিন্তু যা-ই করুন না কেন, ভগবৎ উপাসনাই যেন মুখ্য কর্ম্মরূপে সম্মুখে বর্ত্তমান থাকে। মানুষের প্রত্যেকটি অনুষ্ঠিত কর্ম্মের প্রকৃত সিদ্ধি ভাগবত জীবনের উপরই নির্ভরশীল, একথা যেন আমরা কখনো বিস্মৃত না হই।"

ব্রজবিদেহী মোহান্ত সন্তদাসজীকে ভোলানন্দ গিরি মহারাজ

চিরদিনই অত্যন্ত সম্মান ও প্রীতির চক্ষে দেখিতেন। এবারকার কুম্ভমেলা হইতে ফিরিবার সময়ে সন্তদাস বাবাজী গিরি মহারাজের সঙ্গে দেখা করিতে যান। বাবাজী মহারাজের জীবনীকার ধনঞ্জয়দাসজী ইহার এক মনোজ্ঞ চিত্র আঁকিয়াছেন—"সে এক অপূর্ব্ব দৃশ্য। তিনি আসিয়াছেন সংবাদ পাইবামাত্র গিরীজী তাঁহার গুম্ফাঘর হইতে বাহির হইয়া আসিলেন এবং তাঁহাকে দেখিয়াই প্রেমভরে আলিঙ্গন করিলেন। দুজনেই সেই তপস্যাগৃহে প্রবিষ্ট হইলেন। অতঃপর সেখানে যে কি হইল, তাহা আমরা কি বলিব? অল্পক্ষণ পরে যখন তাঁহারা বাহিরে আসিলেন, তখন তাঁহাদের উভয়েরই পরস্পরের প্রতি প্রিয় বয়স্যের ন্যায় ব্যবহার দেখিলাম। প্রস্থানের সময় নূতন তসরের কাপড় ও চাদর উপঢৌকন দিয়া ভোলাগিরি মহারাজ স্বয়ং দ্বার পর্য্যন্ত আসিয়া তাঁহাকে বিদায় দিয়া গেলেন।"

বহু প্রতিষ্ঠাবান সাধু সন্তদাসজীকে উচ্চকোটির সিদ্ধপুরুষ বলিয়া স্বীকৃতি দিতেন, শ্রদ্ধা জানাইতেন। ত্রিহুতের রামানন্দী প্রাচীন সাধু স্বামী রামদাস ইহাদের অন্যতম। ভগবৎ-প্রেমে তন্ময় এই সাধুটি প্রায় প্রত্যহ সন্তদাস মহারাজের সম্মুখে আসিয়া তাঁহাকে দণ্ডবৎ প্রণাম করিতেন। আবার কখনো কখনো দেখা যাইত, প্রেমাবিষ্ট নয়নে সন্তদাসজীর দিকে চাহিয়া তিনি করুণ মিনতিভরা কণ্ঠে কি যেন প্রার্থনা করিতেছেন, অস্ফুট স্বরে গান গাহিতেছেন।

কৃষ্ণদাসজী নামে নিম্বার্ক সম্প্রদায়ের এক প্রাচীন মহাত্মা জয়পুরে বাস করিতেন। জনসমাজে তিনি সিদ্ধবাবা নামেই বেশী পরিচিত ছিলেন। সন্তদাস বাবাজীর প্রতি ইঁহার অনুরাগ ছিল অসাধারণ। শুধু তাঁহাকে দেখিতেই সিদ্ধবাবা ব্যাকুলভাবে মাঝে মাঝে জয়পুর হইতে বৃন্দাবনে আসিয়া উপস্থিত হইতেন। দূর হইতে সন্তদাসজীকে দর্শন করামাত্র এ বৃদ্ধ সাধু 'জয় হো মহারাজ

জয় হো মহারাজ' বলিয়া ছুটিয়া আসিতেন ও দণ্ডবৎ করিতেন। উভয়ের প্রেম-মিলনের এ দৃশ্য দেখিয়া উপস্থিত ব্যক্তিদের আনন্দের অবধি থাকিত না।

সমগ্র ভারতের বৈষ্ণব মোহান্তগণ সন্তদাস বাবাজীকে যে শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে দেখিতেন তাহার তুলনা বিরল। বাবাজী মহারাজ অসুস্থতার জন্য ১৩৪০ সালের কুম্ভমেলায় যোগ দিতে অসমর্থ হন, কিন্তু নিজের কয়েকটি বিশিষ্ট শিষ্যকে এই সময়ে উজ্জয়িনী মেলাক্ষেত্রে তিনি পাঠাইয়া দেন। তাঁহাদের উপর নির্দ্দেশ থাকে, মেলার মোহান্তদের তাঁহারা যেন সন্তদাসজীর দণ্ডবৎ জ্ঞাপন করেন। একথা শুনিয়াই মোহান্তগণ সসম্ভ্রমে বলিয়া উঠিলেন—"সে কি কথা! সন্তদাস মহারাজ আমাদের গুরুতুল্য, তিনি কেন আমাদের দণ্ডবৎ জানাবেন? আপনারা আশ্রমে ফিরে গিয়ে বরং আমাদের সষ্টাঙ্গ প্রণাম তাঁকে নিবেদন ক'রবেন।"

গুরুভাইদের মধ্যে সন্তদাস বাবাজীর প্রভাব কত বেশী ছিল, একটি ঘটনা হইতে তাহা বুঝা যাইবে। সে-বার কলিকাতায় আসিয়া তিনি তাঁহার জ্যেষ্ঠ গুরুভ্রাতা অভয়নারায়ণ রায়ের সহিত দেখা করিতে গিয়াছেন। কথাবার্ত্তা শেষ হইয়াছে, সন্তদাস মহারাজ এবার বিদায় গ্রহণ করিবেন, এমন সময় অভয়বাবু ভূমিতে লুটাইয়া পড়িয়া তাঁহাকে প্রণাম করিয়া ফেলিলেন। ব্যগ্রভাবে তাঁহাকে বাধা দিতে গিয়াও সন্তদাসজী কোনমতে ঠেকাইতে পারিলেন না। অভয়বাবু উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিলেন, "আমি ঠিকই করেছি। আপনি কনিষ্ঠ হলেও আমা অপেক্ষা বড়—আমি সারা অন্তর দিয়ে সত্যই অনুভব করি যে, আপনি শ্রীগুরুদেব কাঠিয়াবাবার স্বরূপ প্রাপ্ত হয়েছেন। আপনার বাইরেকার চেহারাটিও বাবার চেহারার মতই হয়ে গিয়েছে!"

গুরুর সহিত সন্তদাসজীর এ একাত্মকতা তাঁহার একান্ত

আত্মনিবেদনেরই ফল। এক শিষ্যের নিকট এ সম্বন্ধে তিনি লিখিয়াছেন "বাবা, তোমাকে নিশ্চয় করিয়া বলিতেছি যে আমার নিজের কোন শক্তি নাই। তবে সদ্গুরু আমাকে গ্রহণ করিয়া আপনার করিয়া লইয়াছেন। তিনি আমার এই ঘটে থাকিয়া তোমাদের গুরু হইয়াছেন এবং তিনিই তোমাদের কল্যাণ বিধান করিবেন। এ বিষয়ে তুমি কোন সংশয় রাখিও না।"

গুরুশক্তি শিষ্যের জীবনে কি করিয়া কোন্ পথে সঞ্চারিত হয়, সে বিষয়ে তাঁহার মতামত ছিল দৃঢ় ও দ্ব্যর্থহীন। তাঁহার মতে, শিষ্য যত বেশী আজ্ঞাবহ ও আত্মনিবেদিত হইবে, ততই বেশী তাঁহার মধ্যে গুরুপ্রদত্ত অধ্যাত্মশক্তি খুলিতে থাকিবে। অহং-এর প্রাচীরটিকে উঁচু করিয়া রাখিলেই যত বিপদ।

পরম্পরাগত গুরুশক্তির মূল্য ও মর্য্যাদা সন্তদাস মহারাজের দৃষ্টিতে ছিল অত্যন্ত বেশী। তিনি প্রায়ই বলিতেন "এই জগৎ সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে ব্রহ্মবিদ্ গুরুরূপে আবির্ভূত হয়ে ব্রহ্ম তাঁর স্বরূপ প্রাপ্তির জন্য ব্রহ্মবিদ্যার উপদেশ করেছেন। ঐ উপদেশ উপযুক্ত শিষ্যদের মধ্যে স্ফুরিত করার শক্তিটি তিনিই গুরুতে সঞ্চারিত করেছেন। এ শক্তি পরম্পরা ক্রমে এসেছে। পরম্পরারূপে আগত এই শক্তি যিনি লাভ না করেছেন, তিনি যত শক্তিশালী যত জ্ঞানীই হোন না কেন, শিষ্যকে মোক্ষ লাভ করাতে পারেন না।"

দীক্ষা দানেও দীক্ষাপ্রাপ্ত শিষ্যদের সাধন-জীবন গঠনে সন্তদাস মহারাজের কৃপার অন্ত ছিল না, ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের সহস্র সহস্র নরনারী এ মহাপুরুষের আশ্রয় লাভ করিয়া ধন্য হন।

বাবাজী মহারাজ কিন্তু অনেক সময় এমন সব ব্যক্তিকেও দীক্ষা দিয়াছেন, সাধারণ বুদ্ধির দিক দিয়া যাহাদের কোনমতেই অবাঞ্ছনীয় মনে না করিয়া পারা যায় না। এ বিষয়ে সমালোচনার ভাব নিয়া কেহ কিছু বলিলে তিনি উত্তর দিতেন, "দেখ বাবা, কারুর হাতে যদি অন্নের ভাণ্ড থাকে ক্ষুধিতের অধিকার যে তার ওপরই সব

চাইতে বেশী হয়। পাপী যখন ব্যাকুল হয়ে শুদ্ধতর, মহত্তর জীবনের আশায় আশ্রয় খুঁজে ফিরে, তখন কি তাকে কৃপা করা হবে না? তাকে আশ্রয় দেওয়া হবে না?"

এ সম্পর্কে কাঠিয়াবাবাজীর করুণার কথা, অযোগ্য পাপী-তাপীকে উদ্ধারের কথা বলিতে বলিতে সন্তদাস মহারাজের দুই চোখ জলে ভরিয়া উঠিত। গুরুদেবের কথা উল্লেখ করিয়া কহিতেন, "আমার বাবা তো অযোগ্যবোধে আমায় প্রত্যাখ্যান করেননি!—একথা যখন মনে করি, তখন আর আমি এদের ফেরাতে পারি কই?"

সে-বার এক দুশ্চরিত্র ব্যক্তি ব্যাকুলভাবে বারবার মিনতি করায় সন্তদাসজী সদয় হন, তাঁহাকে দীক্ষা দেন। ইহার পরও লোকটির চরিত্রে স্খলন-পতন দেখা যাইতে থাকে। নব দীক্ষিত শিষ্যটি সখেদে গুরুকে একদিন সব কথা জানাইলেন।

করুণাময় সন্তদাস উত্তরে কহিলেন, "বাবা, এসব ঘটছে তোমার প্রাক্তনের জন্য। ভয় কি? আমিই তো রয়েছি—তোমার সমস্ত ত্রুটি বিচ্যুতির কথা জেনেই তো আমি তোমায় দীক্ষা দিয়েছি!"

আত্ম-সংশোধনের জন্য শিষ্যটি তখন ব্যাকুল। একদিন তাই সজল নয়নে সর্ব্বসমক্ষে গুরুদেবের কাছে নিজের অপকার্য্যের বর্ণনা দিতে লাগিলেন! সব শুনিয়াও গুরুজীর কোন ভাবান্তর দেখা গেল না। প্রশান্ত কণ্ঠে বলিলেন, "ভয় নেই, নাম কর, নাম কর! সব ঠিক হয়ে যাবে।" এই ভ্রষ্টচরিত্র লোকটি উত্তরকালে তাঁহার কৃপায় এক ভক্ত সাধকে পরিণত হয়।

নামের শক্তি অমোঘ—একথাটি প্রায়ই সন্তদাস বাবাজীর মুখে শুনা যাইত। অযোগ্য শিষ্যকে কেন তিনি আশ্রয় দেন, এ প্রশ্ন করা হইলে তখনি বলিতেন, "দেখ, একালে তাঁর নাম অতি অল্প লোকেই করে। এ ব্যক্তি কোন্ সূত্রে যেন—'ভগবানের নাম ক'রবো ব'লে আমার কাছে এসে উপস্থিত হয়েছে। আর আমিও তার ভেতরে দুই একটি শিষ্য-লক্ষণ দেখেছি—তাকে শ্রীভগবানের

চরণে অর্পণ করেছি। এখন তার বস্তু, তিনিই শুদ্ধ করে নেবেন।”

সন্তদাসজী মহারাজের স্বাস্থ্য এক সময়ে খুব ভাঙ্গিয়া পড়ে। বৃদ্ধ অপটু শরীরে কোন পরিশ্রমই সহ্য হয় না, অথচ এই ভগ্নস্বাস্থ্য নিয়াই মুমুক্ষুদের দীক্ষাদানে তাঁহার বিরাম নাই। এক একদিন শরীরের অবসন্নতা দেখিয়া শিষ্যদের ভয় হয়। দীক্ষাদান স্থগিত রাখার জন্য কোন কোন ভক্ত এ সময়ে তাঁহাকে অনুরোধ জানায়। একথা শোনামাত্র ফুটিয়া উঠে মহাপুরুষের এক করুণাঘন রূপ। স্নেহ-সজল চক্ষে তিনি শিষ্যদের দিকে চাহিয়া কহেন, “বাবা, তা হলে এ শরীরটা আছে কি জন্য, সেকথা কি তোমরা আমায় বলতে পার?”

শিষ্যদের আর বাক্‌স্ফুর্ত্তি হইল না।

কিন্তু সেখানে সন্ন্যাসী শিষ্যদের চরিত্র গঠন ও সাধন ভজনের মৌলিক প্রশ্নটি জড়িত, সেখানে কিন্তু সন্তদাস মহারাজের সতর্ক দৃষ্টির অবধি থাকিত না। তাঁহার বজ্র-কঠোর শাসন মুহূর্ত্তমধ্যে নিষ্করুণভাবে নামিয়া আসিত।

বৃন্দাবন-আশ্রমে গভীর রাত্রিতে সেদিন সন্তদাসজী শয়ন করিয়া আছেন। একটি সেবক-শিষ্য নীরবে তাঁহার পদ সম্বাহনে রত। রাত্রিতে আশ্রমে কয়েকটি সাধু অতিথির আগমন হয়, প্রসাদান্ন বিতরণে তাই যথেষ্ট দেরী হইয়াছে। ক্লান্ত শিষ্যগণ ভোজন শেষ করিয়া সবেমাত্র বিশ্রাম করিতে গিয়াছেন। সব কাজই শেষ হইয়াছে, শুধু রান্নাঘরটি পরিষ্কার করা হয় নাই,—একথাটি কানে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই বৃদ্ধ বাবাজী মহারাজ শয্যার উপর উঠিয়া বসিলেন।

কহিলেন, “বাবা, তোরা সবাই ক্লান্ত হয়েছিস্। আজ তোদের এ কাজটা আমিই বরং করে দিচ্ছি। ঠাকুরজীর ভোগের ঘরের কাজ—এতে কখনো অনিয়ম করতে নেই।” শিষ্যদের লজ্জার সীমা

রহিল না, সকলে মিলিয়া কাজটি তখনি শেষ করিয়া ফেলিলেন।

বিগ্রহসেবার ভারপ্রাপ্ত শিষ্যটির একদিন ঠিক সময়ে ঘুম ভাঙ্গে নাই, যমুনা-স্নান করিয়া ঠাকুর সেবায় বসিতে কিছুটা দেরী হইয়াছে। কিন্তু মন্দিরে ঢুকিয়াই তিনি দেখেন, অপটু শরীর নিয়া সন্তদাস মহারাজ ইতিমধ্যেই সেবাকার্য্যে লাগিয়া গিয়াছেন। শিষ্যটি বারংবার তাঁহার ক্রটির জন্য মার্জ্জনা চাহিতে লাগিলেন। সন্তদাসজী আসন ছাড়িয়া হঠাৎ উঠিয়া দাঁড়াইলেন, তারপর তাঁহার গণ্ডে সজোরে এক চপেটাঘাত করিয়া কহিতে লাগিলেন, "এত বেলায়ও ঠাকুরজীকে ওঠানো হয়নি! তোমার যদি পূজা করবার ইচ্ছা না থাকে, আমায় বল্‌লেই পারতে। ঠাকুরজী আজো আমায় এমন অসমর্থ করেননি যে, তাঁর সেবা আমি করতে পারবো না।" সেদিনকার এ কঠোর শাসনে আশ্রমিকগণ অধিকতর সতর্ক না হইয়া পারেন নাই।

প্রবল শীতের মধ্যেও শিষ্যদের এক জোড়া কাপড়ের জুতা পরিতে সন্তদাসজী সম্মতি দিতেন না। কেহ কখনো তাহাদের জন্য সহানুভূতি দেখাইলে উত্তর দিতেন, "না বাবা, এটা ঠিক নয়। আমার শরীর আজ বৃদ্ধ ও অচল হয়েছে, তাই এখন আমি কাপড়ের জুতো পায়ে দিই, নইলে সাধু হবার পর থেকে এযাবৎ কোন জুতোই আমি ব্যবহার করিনি। সাধুর পক্ষে জুতো ব্যবহার করা সঙ্গত নয়।"

সাধু-শিষ্যদের নিয়ন্ত্রণে তাঁহার কঠোরতার অন্ত ছিল না, ক্রটি দেখিলেই তিনি পাখা, চেলাকাঠ অথবা লাঠিদ্বারা প্রহার চালাইতেন। শাসন ও তিরস্কারের পর আবার হঠাৎ শান্ত হইয়া তাহাদিগকে আদর আপ্যায়নও কম করিতেন না। স্নেহভরা কণ্ঠে তখন ক্ষুব্ধচিত্ত শিষ্যদের বুঝাইতেন, "যাতে তোমাদের অভিমান দূর হয়, আর কল্যাণের পথে অগ্রসর হতে পারো সেই জন্যই তো এত তিরস্কার করি। যখনই গুরুর কাছে ফটকার খাবে, তখন তার

বিশেষ উদ্দেশ্য রয়েছে ভেবে প্রসন্নচিত্তে তা গ্রহণ ক'রবে। ফলে, চিত্ত নির্ম্মল হবে, ভগবৎ দর্শনের অধিকার লাভ করবে। স্মরণ রেখো, যিনি আশ্রিতজনের অভিমান বাড়াতে দেন, তিনি কখনো সত্যকার গুরু হতে পারেন না।"

একটি কিশোর বয়স্ক ব্রজবাসী মহারাজের শিষ্যত্ব লাভের সৌভাগ্য অর্জ্জন করে। শিষ্যটির সহিত তিনি কিন্তু অহৈতুকভাবে বড় বেশী প্রীতিপূর্ণ ব্যবহার করিতেন, সে যেন তাঁহার এক বয়স্য বা সখা। এ সম্বন্ধে প্রশ্ন করা হইলে সন্তদাসজী অপর শিষ্যদের বলিয়াছিলেন, "দেখ বাবা, কার কিসে কল্যাণ হয় আর কি তার প্রয়োজন, তা তোমরা কি বুঝবে? এ ছেলেটি পিতা মাতার বড় আদরের সন্তান ছিল। নিতান্ত বালক বয়সে ঘর ছেড়ে সে এখানে এসেছে। একটু আদর বা মিষ্টি কথা না পেলে এ বয়সে আশ্রমের কঠোর জীবনযাত্রার মধ্যে টিকে থাকতে পারবে কেন? এজন্যই ওর প্রতি এরূপ ব্যবহার আমায় করতে হয়। জেনে রেখো, যোগী কারুরই বশ নয়।"

আশ্রমের মেথরটিকে রোজ প্রসাদান্ন বিতরণ করা হয়। একদিন পঙ্গতের সময় হঠাৎ বহু সাধু অতিথির আগমন হওয়ায় ভোজন দ্রব্য কম পড়িয়া গেল। ভাঙ্গীকে সেদিন আর খাবার দেওয়া হয় নাই।

ব্যাপারটি কিন্তু বাবাজী মহারাজের দৃষ্টি এড়াইল না। তিনি এ সম্বন্ধে প্রশ্ন করিয়া বসিলে শিষ্যেরা জানান, অসময়ে বহু অভ্যাগত আসায় মেথরকে আজ আর প্রসাদ বাটিয়া দেওয়া যায় নাই।

সন্তদাসজী ক্রোধে একেবারে ফাটিয়া পড়িলেন! ক্রুদ্ধ কণ্ঠে কহিলেন, "তোমাদের কোন কথাই আমি শুনতে চাইনে। আজ থেকে মেথরের জন্য প্রসাদান্ন আলাদা ক'রে রাখবে, তারপর অপরকে বিতরণ করবে। খবরদার! এরূপ যেন আর কখনো না ঘটে।" মেথরকে তখনই প্রচুর সিধা দিয়া বিদায় করা হইল।

ইহার পর শান্ত, স্নেহপূর্ণ কণ্ঠে বাবাজী কহিলেন, "ছাখো, মা যেমন ঘৃণা না ক'রে আমাদের মলমূত্র পরিষ্কার করেন, এরাও কি তাই করে না? এদের কি রোজ ছুটি প্রসাদ দেওয়া উচিত নয়?"

নিজ আচরণের মধ্য দিয়া বাবাজী মহারাজ অনেক সময় শিষ্যদের সম্মুখে প্রকৃত আদর্শ তুলিয়া ধরিতেন। আশ্রমের সমস্ত কিছু কাজ যে রাধাবিহারীজীর, শিষ্যদের ধৃতিতে এটি আনিয়া দিতে তাঁহার কখনো ভুল হইত না। একবার সন্তদাসজী কোন কার্য্যোপলক্ষে মথুরায় গিয়াছেন—সন্ধ্যার সময় তাঁহার ফিরিবার কথা। কিন্তু রাত্রি নয়টা বাজিয়া গেল, তবুও বাবাজীর দেখা নাই। সকলে বড় উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িয়াছেন। হঠাৎ দেখা গেল, বৃদ্ধ মহারাজ একটি সুবৃহৎ চালকুমড়া কাঁধে করিয়া মন্থর গতিতে আসিতেছেন।

চিন্তিত শিষ্যেরা এই বিলম্বের জন্য তাঁহাকে অনুযোগ দিলে তিনি বলিতে লাগিলেন, "বাবা, সন্ধ্যার সময় মথুরায় একটি এক্কার জন্য দরদস্তুর করলাম। রাত্রি হয়েছে বলে ওরা বেশী ভাড়া হাঁকলো —প্রায় এক টাকা। ঠাকুরজীর পয়সা এভাবে ব্যয় করতে ইচ্ছা হলো না, তাই হেঁটেই এসেছি, আর এতে তেমন কষ্টও কিছু হয়নি। মনে রেখো, ঠাকুরজীর পয়সা অপব্যয় করতে নেই।"

সন্তদাসজী সেবার শ্রীহট্ট অঞ্চলে ভ্রমণ করিতেছেন। কয়েকটি শিষ্য ব্যতীত অপর সম্প্রদায়ের একটি তরুণ সাধুও সে সময়ে তাঁহার সঙ্গে রহিয়াছে। একদিন দেখা গেল, বাবাজী মহারাজের প্রণামীর টাকার কিছুটা ঐ ছেলেটি চুরি করিয়াছে। সংবাদটি সন্তদাসজীর কানে যাওয়া মাত্র ক্রোধোদ্দীপ্ত হইয়া তাহাকে প্রহার করিতে লাগিলেন। তরুণ সাধুটি বার বার তাঁহার চরণে পড়িয়া ক্ষমা চাহিতেছে কিন্তু সন্তদাসজীর এ ব্যাপারটি নিয়া উত্তেজনার অবধি নেই।

সাধুটিকে দিয়া তখনই তিনি এক স্বীকৃতিপত্র লিখাইয়া নিলেন। তারপর সরোষে তাহাকে বলিয়া দিলেন—এরূপ দোষ আর কখনো করিলে তাহাকে উলঙ্গ করিয়া বহিষ্কৃত করিয়া দেওয়া হইবে। সঙ্গে

সঙ্গেই এক শিষ্যকে আদেশ দিলেন, ঐ কাগজখানিকে যেন সতর্ক ভাবে তাঁহার ঝুলিতে এখনই রাখিয়া দেওয়া হয়। ভাবটা এই—উহা একটি গুরুত্বপূর্ণ দলিল, কোন মতেই হাতছাড়া করা চলিবে না!

রাত্রিতে বাবাজী মহারাজ শয্যায় বিশ্রাম করিতেছেন। সঙ্গীয় সেবক শিষ্যটি তাঁহাকে এ সুযোগে অনুরোধ জানাইলেন, দুষ্কৃতিকারী নূতন সাধুটিকে অবিলম্বে বৃন্দাবন পাঠানো হোক, নতুবা তাহাকে নিয়া ঝঞ্চাটে পড়িতে হইবে, দুর্নামেরও অন্ত থাকিবে না।

মুহূর্ত্তমধ্যে সন্তদাসজী করুণার্দ্র হইলেন। আবেগজড়িত কণ্ঠে কহিতে লাগিলেন, "বাবা, তাহলে তো ওর আর কোন আশাই থাকিবে না। বরং তোদের সৎসঙ্গে থেকে যদি ওর সংশোধন হয়, তাই কি ভাল নয়?"

স্ব-স্বরূপে অবস্থিত থাকিয়া এই মহাপুরুষ বাহ্যজীবনের প্রতিটি কাজ এক সুদক্ষ অভিনেতার মতই দিনের পর দিন সম্পন্ন করিয়া যাইতেন। আশ্রমের ঘাস চুরি করিতে গিয়া কেহ হয়তো ধরা পড়িয়াছে, বাবাজী ক্রোধে ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া তাহাকে চপেটাঘাত করিতেছেন। আবার ঠিক পরক্ষণেই দেখা যায় শিষ্যদের সম্মুখে পরম প্রশান্তি নিয়া ভগবৎ-তত্ত্বের ব্যাখ্যায় তিনি রত। আশ্রম-সম্পত্তি নিয়া বৈষয়িক লোকদের সঙ্গে চুলচেরা হিসাব নিকাশ করার পরই ভক্তি গদগদ কণ্ঠে শাস্ত্রব্যাখ্যায় তিনি মত্ত হইয়া পড়েন।

দ্বৈতসত্তার এই বৈচিত্র্য বাহিরের লোকের দৃষ্টিতে হয়তো তেমন ধরা পড়িত না, কিন্তু অন্তরঙ্গ শিষ্যদের ইহা অজানা ছিল না। গুরুজীর এ আদর্শ তাহাদের পক্ষে কল্যাণকর না হইয়া পারে নাই।

সদ্‌গুরুরূপে সন্তদাসজী নানা বিস্ময়কর লীলা, নানা যোগবিভূতি শিষ্যদের জীবনে প্রকটিত হইতে দেখা গিয়াছে। আশ্রিত শিষ্যদের সামান্যতম আচরণ ও কর্ম্ম কোনদিনই এ শক্তিমান মহাপুরুষের সদা-সতর্ক দৃষ্টি এড়াইয়া যায় নাই।

সন্তদাস মহারাজ সে সময়ে ভুবনেশ্বরে রহিয়াছেন। শিষ্য নির্ম্মল

মিত্র মহাশয় আরও কয়েকজন গুরুভ্রাতাসহ একদিন তাহাকে দেখিতে যাইতেছেন। পথিমধ্যে ভুবনেশ্বর-মন্দিরের সম্মুখে তাঁহারা দেখিলেন, কয়েকটি সাধু একত্রে উপবেশন করিয়া আছেন। নির্ম্মলবাবু প্রভৃতি হাত উঁচু করিয়া জোড়হাতে ইঁহাদের নমস্কার করিলেন, তারপর গন্তব্য স্থানের দিকে চলিয়া গেলেন।

সন্তদাসজীর সহিত তাঁহাদের সাক্ষাৎ হইবামাত্র সকলকে তিরস্কার করিয়া তিনি বলিয়া উঠিলেন, "কিগো! তোমাদের একি অদ্ভূত ব্যবহার, বলতো? সাধু সন্ন্যাসী দেখলে ভক্তিভরে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করতে হয়, তা ক'রো নি কেন?" সকলে বিস্মিত হইয়া ভাবিতে লাগিলেন, গুরুমহারাজের দিব্য দৃষ্টি কি এভাবে সর্ব্বত্রই তাঁহাদের অনুসরণ করিয়া চলিয়াছে?

উজ্জয়িনীর কুম্ভে সেবার সন্তদাসজী উপস্থিত হইতে পারেন নাই, শিষ্য অনন্তদাস তাঁহার প্রতিনিধিরূপে সেখানে গিয়াছেন। বাবাজী মহারাজের ছত্রের নীচে তাঁহার আসনটি রক্ষিত থাকে, আর অনন্তদাস উহার নিকটে উপবেশন করেন। মেলাক্ষেত্রে আগত অন্যান্য লোকের সঙ্গে ভক্ত সুরেন্দ্র বসু মহাশয়ও সস্ত্রীক সেখানে উপস্থিত। হঠাৎ এক সময়ে দেখা গেল, সুরেন্দ্রবাবুর স্ত্রী সন্তদাসজীর ছত্রের নীচে বসিয়া আকুলভাবে ক্রন্দন করিতেছেন। ব্যস্ত হইয়া সকলে তাঁহাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইলেন। মহিলাটি কথঞ্চিৎ শান্ত হইয়া সকলকে বলিলেন, বাবাজী মহারাজের আসন শূন্য দেখিয়া তাঁহার মন বড় ক্ষুব্ধ হইয়া উঠে, তিনি ভাবিতে থাকেন, 'বাবা এসময়ে উপস্থিত থাকলে কত আনন্দই না হতো। আমার মাথায় হাত দিয়ে সস্নেহে কত আশীর্ব্বাদই না করতেন।' ইহার পর অন্তরের ক্ষোভ ও ব্যাকুলতা ক্রন্দনে ফাটিয়া পড়ে। সঙ্গে সঙ্গেই তিনি দেখিতে পান, সন্তদাসজী ঐ নির্দ্দিষ্ট আসনটিতেই সশরীরে উপবিষ্ট রহিয়াছেন এবং এই মহিলা ভক্তের শিরে হাত বুলাইয়া আশীর্ব্বাদ জানাইতেছেন! এ দৃশ্য দেখিয়াই তাঁহার এ কান্না।

আর একটি শিষ্যার অলৌকিক দর্শনও কম বিস্ময়কর নয়। ইনি সন্তদাসজীর শিষ্য শ্রীধীরেন্দ্র দাশগুপ্তের স্ত্রী। ইহাদের কন্যাটি এক সময়ে মরণাপন্ন কাতর হয়। মহিলাটি তখন একান্তভাবে গুরুদেবের কথা স্মরণ করিয়া প্রার্থনা নিবেদন করিতে থাকেন। অকস্মাৎ তিনি দেখেন, সন্তদাসজীর জ্যোতির্ম্ময় মূর্ত্তি তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মান।

তিনি লিখিয়াছেন, "কতক্ষণ আমি বাবাকে দেখিলাম তাহা আন্দাজ করিতে পারিব না। কিছুকাল পর তিনি আমার কন্যার মাথার কাছে দাঁড়াইয়া অমৃত মাখানো অভয় দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকাইয়া ক্রমেই যেন ঘরের দেওয়ালের সাথে মিলাইয়া যাইতে আরম্ভ করিলেন। সেই দৃষ্টি, সেই রূপ আমার অন্তরে গাঁথা হইয়া আছে। মনে করিলেই আমার সমস্ত শরীর আনন্দে শিহরিয়া উঠে। আমার কন্যাটি ক্রমে রোগমুক্ত হয়।"

ইহার পর মহিলা ভক্তটি সন্তদাসজীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে যান। ভক্তিভরে তাঁহাকে প্রণাম করিয়া উঠামাত্র বাবাজী মৃদু, সস্নেহ কণ্ঠে কহিলেন, "বাইরের দিকে বেশী তাকাবি না, অন্তরের দিকে তাকালেই সব পাবি। আমি যে সব সময়েই তোদের কাছে আছি।"

বাবাজী মহারাজের জীবন-লীলার শেষ অধ্যায়টি এবার আসিয়া পড়িতেছে। ক্রমে ক্রমে তিনি আরও অন্তর্ম্মুখীন হইয়া উঠিলেন। এই সময়ে একবার শিষ্য ও ভক্তবৃন্দের অনুরোধে তিনি গৌহাটিতে উপনীত হন। স্থানীয় হরিসভায় তাঁহাকে নিয়া খুব আনন্দ উৎসব হইতেছে—এ সময়ে একদল লোক তাঁহাকে অনুরোধ জানাইলেন, "আপনি ভারতের সর্ব্বদ্রষ্টা ঋষিদের মহিমা আজ কিছু কীর্ত্তন করুন। আপনার মত মহাপুরুষের মুখে আমরা তা শুনতে চাই।"

বাবাজী মহারাজ সম্মত হইলেন। ভাবতন্ময় অবস্থায় তাঁহার দুই চক্ষু নিমীলিত হইল। সভায় বহু ভক্ত, শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত ও আধুনিক

শিক্ষায় শিক্ষিত ব্যক্তির সমাবেশ হইয়াছে। সকলেরই দৃষ্টি এই জটাজুটমণ্ডিত তেজঃপুঞ্জকলেবর মহাসাধকের দিকে কেন্দ্রীভূত। কিন্তু আগ্রহ-ব্যাকুল শ্রোতাদের বিস্মিত করিয়া বাবাজী মহারাজ এ সময়ে এক কাণ্ড করিয়া বসিলেন। কোন কিছু বলার সব চেষ্টাই তাঁহার বারবার ব্যর্থ হইয়া গেল। ঋষিদের স্মরণে মুহ্যমান মহাপুরুষ অবোধ বালকের মত ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। সমবেত জনতা বিস্ময় বিমুগ্ধ। অনেকেরই নয়নে পুলকাশ্রু উদগত হইতেছে। সকলে এবার সমস্বরে বলিয়া উঠিলেন, "আর আপনার কিছু বলতে হবে না, আমাদের প্রশ্নের উত্তর মিলেছে। আমরা এটা এত সুন্দররূপে বুঝিয়াছি যে, অনেক কথায় ঠিক এমনটি বোঝা যেত না।"

বাবাজী মহারাজের মধ্যে বালক স্বভাবটি এসময়ে বৃদ্ধি পাইতে থাকে। স্বভাব গাম্ভীর্য্যের স্থলে উদ্গত হয় এক আনন্দঘন রসায়িত ভঙ্গী। অন্তরে বাহিরে তখন অবিরলধারে দিব্য আনন্দের স্রোত প্রবাহিত হইতেছে, মাঝে মাঝে মনের আনন্দে তিনি গান ধরেন—

তোরা কে যাবিরে আয়রে ভাই,
সবে মিলে প্রেমধামে যাই।
তথায় প্রেমময়ের প্রেম-মুখ—
এসো, দেখে প্রাণ জুড়াই।

কলিকাতা সহরে সেবার শেষবারের মত তাঁহার আগমন। সুপ্রসিদ্ধ আইনজীবী, সন্তদাসজীর দীর্ঘদিনের ঘনিষ্ঠ সুহৃদ্ শ্রীযুক্ত ব্রজলাল শাস্ত্রী তাঁহাকে দেখিতে আসিয়াছেন। বাবাজী মহারাজ তাঁহাকে কহিলেন, "আমি যেদিন সংসার ছেড়ে শ্রীবৃন্দাবন যাত্রা করি সেদিন যেমন তোমরা আমার সহায় হয়ে প্রকৃত বন্ধুর কাজ করেছিলে, এবারও সেইরূপ সহায় হয়ে শ্রীবৃন্দাবনের গাড়ীতে তুলে দাও। আমার শরীর আর থাকবে না। শ্রীগুরুদেবের আশ্রমের প্রতি বড় আকর্ষণ বোধ করছি, শরীরটা যাতে সেখানে পৌঁছে তার ব্যবস্থা কর। আবার সেদিনের মত প্রকৃত বন্ধুর কাজ কর।"

কাহারো বুঝিতে বাকী রহিল না, বাবাজী মহারাজ শীঘ্রই লীলা সংবরণ করিবেন। ১৩৪২ সালের ২২শে কার্ত্তিক তারিখে শিষ্য-সেবকগণসহ সন্তদাস বাবাজী শ্রীবৃন্দাবনে রওনা হইলেন। মহাপ্রয়াণের লগ্নটি এবার আসিয়া গেল, মর জীবনের লীলায় ছেদ টানিয়া দিয়া মহাপুরুষ নিত্যলীলায় প্রবিষ্ট হইলেন। দেহটি শ্রীবৃন্দাবনে পৌঁছিবার পর আশ্রম লোকে লোকারণ্য হইয়া উঠে, মহাসমারোহে যমুনার যুগলঘাটে অগ্নিসংস্কার সম্পন্ন হয়।

মথুরার বনওয়ারীলাল ভাটনগর সন্তদাসজীর এক অনুগৃহীত শিষ্য। বাবাজী মহারাজের শেষ কৃত্য সমাপ্ত হইবার পর তিনি এ দুঃসংবাদ শ্রবণ করেন। ভক্ত বনওয়ারীলালের সমগ্র অন্তর মথিত করিয়া খেদোক্তি ধ্বনিত হইতে থাকে,—বাবাজী মহারাজের শেষ দর্শন তাঁহার ভাগ্যে ঘটিয়া উঠিল না। মথুরায় নিজ গৃহে বসিয়া সেদিন তিনি সারাদিন অশ্রু বিসর্জ্জন না করিয়া পারেন নাই।

সন্ধ্যার পর এক অলৌকিক দৃশ্য দেখিয়া ভক্ত বনওয়ারীলালের বাক্‌স্ফূর্ত্তি হইল না। তিনি দেখিলেন, বাবাজী মহারাজ তাহার সম্মুখে আবির্ভূত হইয়া সস্নেহ কণ্ঠে বলিতেছেন, "বেটা, শুধু লৌকিক দৃষ্টিতেই তো আমার এ দেহ পরিত্যক্ত হয়েছে। তুমি শুধু শান্ত হও। তোমরা সর্ব্বদাই আমার দৃষ্টির সম্মুখে রয়েছো, এটা জানবে। তুমি বৃন্দাবনের আশ্রমে শুধু মাঝে মাঝে যেও, আমায় দর্শন করে এসো।"

একলা শুধু বনওয়ারীলাল ভাটনগর নয়, আরও বহুতর শিষ্য তিরোভাবের পর সন্তদাসজীর অলৌকিক দর্শনে বঞ্চিত হন নাই।

